হযরত ইমাম গাযালী (র)

সৌভাগ্যের পরশমণি

তৃতীয় খণ্ড ঃ বিনাশন

আবদুল খালেক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

সৌভাগ্যের পরশমণি

তৃতীয় খণ্ড ঃ বিনাশন

বিনাশন খণ্ডে বর্ণিত বিষয়

ধর্মপথে অগণিত বিপদসমাকীর্ণ ভয়াবহ স্থান আছে, ইহাদিগকে মুহ্‌লিকাত বা মারাত্মক বিনাশের স্থান বলে। অসাবধানতাবশত এই বিপদসমাকীর্ণ স্থানসমূহে পতিত হইলে মানুষ তাহার উৎকৃষ্ট গুণরাজি হারাইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। এই বিনাশের স্থানসমূহ কি, উহাদের হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি, এই খণ্ডে তৎসমুদয় বর্ণিত হইবে এবং দশটি অধ্যায়ে এই খণ্ড সমাপ্ত হইবে।

প্রথম অধ্যায় ঃ রিয়াযত বা চরিত্র সংশোধনের জন্য কঠোর সাধনা; মন্দ স্বভাব বর্জন ও সৎস্বভাব অর্জন করিবার উপায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কামভাব ও অতিরিক্ত পানাহারের অপকারিতা এবং এই দুই কুপ্রবৃত্তি দমনের উপায়।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাহুল্য কথনের অপকারিতা ও ইহার প্রতিকার এবং রসনার বিপদসমূহ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ক্রোধ ও ঈর্ষা দমনের উপায় এবং ইহাদের বিপদসমূহ।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ দুনিয়ার মহব্বত অর্থাৎ সংসারাসক্তির প্রতিকার এবং 'দুনিয়ার মহব্বত সকল গোনাহ্‌র মূল' উক্তির তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মালের মহব্বত অর্থাৎ ধনাসক্তির প্রতিকার ও কৃপণতার বিপদসমূহ।

সপ্তম অধ্যায় ঃ সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রতিকার এবং এতদুভয়ের বিপদসমূহ।

অষ্টম অধ্যায় ঃ ইবাদতে রিয়া অর্থাৎ প্রদর্শনেচ্ছা, কপটতা এবং নিজকে পুণ্যবান ও সাধু বলিয়া প্রকাশ করারূপ ব্যাধিসমূহের প্রতিকার।

নবম অধ্যায় ঃ অহঙ্কার ও আত্মগর্ব এবং স্বীয় কাজ উত্তম বলিয়া মনে করার অপকারিতা; উহাদের প্রতিকার।

দশম অধ্যায় ঃ উদাসীনতা, অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার প্রতিকার।

মানুষের মন্দ স্বভাবের মূলসমূহ এই দশটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইল। এই মূলগুলি হইতেই অন্যান্য সমস্ত দোষ-ত্রুটি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ধর্মপথে বিচরণকালে মানবকে বিপদসমাকীর্ণ এই দশটি স্থান পার হইতে হয়। যিনি এই দশটি স্থান নিরাপদে অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি কুস্বভাবের মলিনতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বীয় অন্তরের পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার অন্তর এইরূপ উপযুক্ত হইয়া উঠে যে, তিনি ঈমানের গূঢ় তত্ত্বসমূহ– যথা, মা'রিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান, আল্লাহ্‌-প্রেম, আল্লাহ্‌র একত্ব জ্ঞান, আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা ইত্যাদি হিতকর গুণরাজি ও ঈমানের উজ্জ্বল পরিচ্ছদে সুশোভিত হইতে পারেন।

প্রথম অধ্যায়

চরিত্র সংশোধনের সাধনা ও কুস্বভাব বর্জনের উপায়

প্রথমত এই অধ্যায়ে সৎস্বভাবের ফযীলত বর্ণনা করা হইবে। তৎপর ইহার হাকীকত বর্ণিত হইবে। ইহার পর দেখান হইবে যে, মানুষের পক্ষে সৎস্বভাব অর্জন করা অসম্ভব নহে। তৎপর ইহা অর্জনের উপায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহার পর নিজের দোষ চিনিবার প্রণালী, সৎস্বভাবের নিদর্শনাবলী বর্ণিত হইবে। শেষে শিশুদের প্রতিপালন এবং তাহাদিগকে নীতিপরায়ণ ও সৎস্বভাবী করিয়া তোলার উপায়-পদ্ধতি নির্দেশিত হইবে। পরিশেষে মুরীদের প্রাথমিক রিয়াযতের উপায় ও ইহার পথ প্রদর্শন করা হইবে।

সৎস্বভাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিদান— আল্লাহ্‌ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎকৃষ্ট স্বভাবী বলিয়া প্রশংসা করত বলিয়াছেন ঃ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা), আপনি অত্যন্ত উন্নত ও সৎস্বভাবের অধিকারী।" হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন– "সৎস্বভাবের উন্নত আদর্শ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন– "কেবল সৎস্বভাবকে দাঁড়ির এক পাল্লায় স্থাপন করিয়া অন্যান্য সমুদয় বস্তু অপর পাল্লায় স্থাপন করিলে সৎস্বভাবই অধিক ভারী হইবে।"

এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করিল– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, ধর্ম কি বস্তু?" তিনি বলিলেন– "সৎস্বভাব।" ঐ ব্যক্তি ডানে-বামে ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার ঐ একই প্রশ্ন করিতেছিল এবং তিনি প্রত্যেকবারই ঐ একই উত্তর দিতেছিলেন। অবশেষে রাসূলে মাক্‌বুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– "তুমি কি অবগত নও যে, ক্রোধের বশীভূত না হওয়াকেই ধর্ম বলে?"

লোকে রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল– "কোন্‌ বস্তু সর্বোত্তম?" তিনি ফরমাইলেন– "সৎস্বভাব।" এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।" তিনি বলিলেন– "তুমি যে স্থানেই থাক না কেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে।" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল– "আরও উপদেশ দিন।" তিনি ফরমাইলেন– "তোমার দ্বারা অকস্মাৎ কোন খারাপ কার্য হইয়া পড়িলে, পরক্ষণেই কোন না কোন সৎকর্ম করিবে, তাহা হইলে এই সৎকর্ম উক্ত অসৎকর্ম চুকাইয়া ফেলিবে।" সেই ব্যক্তি আবার নিবেদন করিল– "আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন।" তিনি বলিলেন– "প্রফুল্লাত ও সৎস্বভাবের সহিত লোকদের সঙ্গে মিলিবে।" অন্যত্র

রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,- "আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে সৎস্বভাব ও সুন্দর চেহারা দান করিয়াছেন তাহাকে তিনি দোযখে নিক্ষেপ করিবেন না।"

কতিপয় লোক একদা রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, অমুক স্ত্রীলোক সর্বদা রোযা রাখে এবং সমস্ত রাত্রি নামায পড়ে, কিন্তু তাহার স্বভাব বড় খারাপ; অশ্লীল ও কর্কশ বাক্যে প্রতিবেশীদিগকে অহরহ কষ্ট দিয়া থাকে।" ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলেন- "তাহার স্থান দোযখ।" তিনি অন্যত্র বলেন- 'সির্কা যেমন মধুকে বিনষ্ট করে, কুস্বভাবও সেইরূপ মানুষের ইবাদতসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।"

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইরূপ প্রার্থনা করিতেন- "হে আল্লাহ্, আমার শারীরিক আকৃতি যেমন সুন্দর করিয়াছ, আমার প্রকৃতিও সেইরূপ সুন্দর কর।" তিনি আরও বলিতেন- "হে আল্লাহ্, তোমার নিকট আমি স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সৎস্বভাব প্রার্থনা করিতেছি।"

একদিন কতিপয় লোক রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল- "আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যাহা দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্ পদার্থ সর্বোৎকৃষ্ট?" তিনি বলেন, "সৎস্বভাব।" তিনি আরও বলেন- "বরফ যেমন সূর্যের উত্তাপে গলিয়া যায়, সৎস্বভাব সেইরূপ গোনাহ্সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলে।"

হযরত আবদুর রহমান সাম্‌রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি ফরমাইলেন- 'গতকল্য আমি একটি বিস্ময়কর ঘটনা দর্শন করিয়াছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবারে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহার সম্মুখে পর্দা ছিল বলিয়া আল্লাহ্র দর্শন লাভ করিতে পারিতেছিল না। সেই সময় তাহার সৎস্বভাব আগমন করিয়া পর্দাটি দূর করত তাহাকে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছাইয়া দিল।"

রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "সৎস্বভাবের ফলে মানব 'ছায়িমুদ্দাহ্র' ও 'কায়িমুল্লায়লের' মর্যাদা লাভ করিতে পারে।" অর্থাৎ সারা বৎসর রোযা রাখিলে ও সমস্ত রজনী জাগ্রত থাকিয়া নামায পড়িলে যে মর্যাদা লাভ করা যায়, কেবল সৎস্বভাবের ফলে সেই মর্যাদা লাভ করা যায়। ইবাদত কম করিলেও সেই ব্যক্তি পরকালে বড় বড় আসন লাভ করিবে।

রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ছিল। একদা কতিপয় স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে গোলমাল করিতেছিল। এমন সময় হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা সরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "হে

শত্রুগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভয় কর না?" তাহারা বলিল- "আপনি রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অনেক তীব্র ও কঠিন।" রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "হে ইব্‌নে খাত্তাব (অর্থাৎ ওমর), যে আল্লাহ্র হস্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ, শয়তান তোমাকে দর্শন করা মাত্র ভয় পায় এবং যে পথে তুমি আগমন কর, সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে পলায়ন করে।"

হযরত ফুযাইল ইব্‌ন-আইয়ায (র) বলেন- "কুস্বভাবী আলিমের সংসর্গ অপেক্ষা সৎস্বভাবী কুকর্মীর সংসর্গ আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।" এক কুস্বভাবী ব্যক্তির সহিত পথে হযরত ইব্‌ন মুবারক (র)-এর সাক্ষাত ঘটিল। কিছুক্ষণ উভয়ে একত্রে পথ চলার পর পৃথক হইয়া সেই ব্যক্তি অন্যদিকে যাইতে লাগিল। ইহাতে হযরত ইব্‌ন-মুবারক (র) রোদন করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তরে বলিলেন- "ঐ দুর্ভাগা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার স্বভাবটি অপরিবর্তিতভাবে সাথে লইয়া গেল। এতক্ষণ আমার সংসর্গে থাকিয়াও স্বীয় চরিত্র সংশোধন করিয়া লইতে পারিল না, এই জন্যই আমি রোদন করিতেছি।"

হযরত কাত্তানী (র) বলেন- "সৎস্বভাবী ব্যক্তি সূফী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি সৎস্বভাবে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি আমা অপেক্ষা অধিক সূফী। হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মু'আয (র) বলেন- "কুস্বভাব এত বড় গোনাহ্ যে, তাহার বিপক্ষে কোন ইবাদতই সুফল দান করিতে পারে না এবং সৎস্বভাব এত বড় ইবাদত যে, কোন গোনাহ্ই তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।"

সৎস্বভাবের হাকীকত— আলিমগণ সৎস্বভাবের মূলতত্ত্ব ও পরিচয় দিতে যাইয়া বিভিন্নরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। যিনি যাহা বুঝিয়াছেন তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহার পূর্ণ পরিচয় কেহই প্রদান করেন নাই। কেহ প্রসন্ন বদনকে সৎস্বভাবের নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ অপরের প্রদত্ত যাতনা সহ্য করাকে সৎস্বভাবের নিদর্শন বলিয়াছেন। কেহ-বা প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে সৎস্বভাবের চিহ্ন বলিয়াছেন। এইরূপে যাঁহার হৃদয়ে যেরূপ উদয় হইয়াছে, তিনি সেইভাবেই সৎস্বভাবের লক্ষণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত এই সকল সৎস্বভাবের শাখা-প্রশাখা মাত্র; ইহার পূর্ণ পরিচয় নহে। আমরা ইহার পূর্ণ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

দুই প্রকার বস্তু দিয়া আল্লাহ্ মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন; একটি শরীর ও অপরটি আত্মা। চর্মচক্ষু দ্বারা আমরা শরীর দেখিতে পারি কিন্তু জ্ঞান-চক্ষু ব্যতীত আত্মার দর্শন লাভ করিতে পারি না। এর উভয় বস্তুই অবস্থা বিশেষে সুন্দর হইয়া থাকে, আবার অবস্থা বিশেষে কুশ্রী হয়। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুশ্রী হইলে ইহাকে শারীরিক সৌন্দর্য বলে, আর অন্তরের আভ্যন্তরীণ আকৃতি সুশ্রী হইলে ইহাকে স্বভাবের সৌন্দর্য বলে।

শুধু শরীরের অঙ্গবিশেষ যেমন, চক্ষু, ওষ্ঠ ইত্যাদি যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর ও একের সহিত অপরের মিল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেই তাহাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইতে পারে। তদ্রূপ মানব হৃদয়ের বৃত্তিসমূহ ঠিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত না হইলে সেই হৃদয়কেও সুন্দর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না।

সৎস্বভাব অর্জনের উপায়—হৃদয়ের সমুদয় বৃত্তি বা শক্তিসমূহ মোটামুটি চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা ঃ (১) জ্ঞান-শক্তি, (২) ক্রোধ বা শাসন-ক্ষমতা, (৩) কামশক্তি বা লোভ-লালসা, (৪) এই তিনটি শক্তিকে মধ্যপন্থায় অর্থাৎ সমীচীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখিবার বিচার-শক্তি।

জ্ঞানকে এই স্থানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অর্থে গ্রহণ করা হইল। এই শক্তি পূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত ও স্ফূর্ত হইলে লোকের কথোপকথনের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা উপলব্ধি করা যায়, কাজ-কর্মের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ তারতম্য করিয়া লওয়া যায় এবং ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য নিরূপণ করা চলে। এই জ্ঞান-শক্তি উপযুক্তরূপে বিকশিত হইলে মানবহৃদয় জ্ঞানের উৎস হইয়া যায় এবং তখন ইহা মানুষের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّؤْتَى الْحِكْمَا فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا অর্থাৎ "আর যাহার হিক্‌মত অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান হাসিল হয়, তাহার প্রচুর কল্যাণের বস্তু হাসিল হয়।"

ক্রোধ বা শাসন-ক্ষমতা যখন ধর্মজ্ঞান ও শরীয়তের আজ্ঞাবহ থাকে, তাহাদের আদেশে উঠা-বসা করে, তখনই ইহাকে উত্তম বলা যায়। কামশক্তি বা লোভ-লালসাও তদ্রূপ ধর্মজ্ঞান ও শরীয়তের অবাধ্য না হইয়া আজ্ঞাধীন হইয়া চলিলে এবং সেই আজ্ঞাধীনতা তাহার জন্য সহজ ও সুখকর হইলে তাহাকেও উত্তম বলা যায়। ক্রোধ ও লোভ-লালসাকে খর্ব বা বৃহৎ দেখিলে যে শক্তি ন্যায্যবিচার করত খর্বকে বৃহৎ করিয়া ও বৃহৎকে খর্ব করিয়া বরাবর ও সামঞ্জস্যশীল করিয়া দেয়, সেই শক্তি যখন ধর্ম ও বুদ্ধির ইঙ্গিতে চলে, তখন ইহাকেও সুন্দর বলা যায়।

ক্রোধকে শিকারী কুকুরের সঙ্গে, লোভকে ঘোড়ার সঙ্গে এবং বুদ্ধিকে স্বয়ং শিকারীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ঘোড়া কখনও অবাধ্য ও হটকারী, আবার কখনও শিষ্ট ও শায়েস্তা হইয়া থাকে। শিকারী কুকুরও কখন কখন আজ্ঞানুবর্তী হইয়া থাকে, কখন কখন আবার বিগড়াইয়া যায়। ঘোড়াটি বেশ শিষ্ট ও কুকুরটি আজ্ঞাধীন না হইলে শিকারী শিকার ধরিবার কোন আশা করিতে পারে না; বরং ইহাতে শিকারীর প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা থাকে। অবাধ্য ঘোড়া শিকারীকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিয়া ও কুকুর বিগড়াইয়া গিয়া স্বীয় প্রভুকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে পারে।

ক্রোধ ও লোভকে বুদ্ধি ও ধর্মের আজ্ঞাবহ করিয়া রাখাই বিচারশক্তির কাজ। বিচারশক্তি কখন কখন লোভকে ক্রোধের উপর চাপাইয়া দিয়া ক্রোধের অবাধ্যতা খর্ব করিয়া দেয়; আর কখন কখন লোভের কামনাকে খর্ব করিবার নিমিত্ত তাহার উপর

ক্রোধকে দণ্ডধারীরূপে নিয়োজিত করিয়া ইহাকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করে। এই চারি প্রকারে শক্তি বা বৃত্তি সমান অনুপাতে বিকশিত হইয়া নিজ নিজ কার্য ঠিকভাবে সুসম্পন্ন করিলেই সৎস্বভাব পূর্ণতা লাভ করে। ইহাদের দুই একটি শক্তি বা বৃত্তি উত্তম হইলেই স্বভাবকে সুন্দর বলা যায় না; যেমন কোন ব্যক্তির ওষ্ঠ সুন্দর, কিন্তু চক্ষু কদাকার অথবা চক্ষু সুন্দর, কিন্তু নাসিকা কদাকার হইলে তাহাতে সর্বাঙ্গ-সুন্দর বলা চলে না।

কুস্বভাবের কারণ— উক্ত চারিটি শক্তির সমুদয়ই কুৎসিত হইয়া গেলে স্বভাবও পূর্ণরূপে কুৎসিত হইয়া যায় এবং এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট লোক দ্বারা সর্ববিধ কুকর্ম সংঘটিত হয়। দ্বিবিধ কারণে এই শক্তিসমূহ বিশ্রী ও জঘন্য হইয়া পড়ে। প্রথমত প্রত্যেকটি শক্তি যে পরিমাণে বিকশিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া উচিত, ইহা সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে ইহা বিশ্রী ও জঘন্য হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি শক্তি যে পরিমাণে বিকশিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া উচিত, সেই সীমা হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া বিকল ও শক্তিহীন হইয়া গেলেও ইহা বিশ্রী ও জঘন্য হইয়া থাকে।

জ্ঞানশক্তি সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং মন্দ কার্যে ইহাকে নিয়োজিত করিলে ইহা হইতে তখন প্রতারণা, কপটতা ও জ্ঞান-গর্ব জন্ম হইয়া থাকে। ইহাই আবার পরিমিতরূপে বিকশিত না হইয়া খর্ব হইয়া গেলে নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা ও হঠকারিতা উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞানশক্তি পরিমিতরূপে বিকশিত ও স্ফূর্ত হইলে মানুষ উত্তমরূপে কার্যাদি পরিচালন ও বিচারে অভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ করিতে পারে এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও দূরদর্শিতা অর্জন করিত সমর্থ হয়।

ক্রোধ সীমা ছাড়াইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দুঃসাহসিকতা জন্মে; আবার পরিমিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে কাপুরুষতা ও ভীরুতা উৎপন্ন হয়। আবার ক্রোধ পরিমিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অত্যল্পতা ও অত্যধিকতার দোষে দুষ্ট না হইলে সৎসাহস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সৎসাহস হইতে বদান্যতা, বীরত্ব, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নির্ভয়তা, ক্রোধ নিবারণের শক্তি এবং তদনুরূপ অন্যান্য সৎস্বভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিয়া বর্ধিত হইলে দুঃসাহসিকতা উৎপন্ন হয়, মানুষকে বিপদসঙ্কুল কার্যে নিক্ষেপ করে এবং তখন তদনুরূপ কুস্বভাবসমূহ উৎপন্ন হয়। ক্রোধের স্বল্পতার দরুন কাপুরুষতা ও ভীরুতা জন্মে এবং ইহা হইতে আবার আত্ম-অমর্যাদা, অসহায়তা, পরপদ-লেহন, চাটুকারিতা ইত্যাদি কুস্বভাব উৎপন্ন হয়।

সেইরূপ কামশক্তি বা লোভ-লালসা সীমার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে দুরাশা, দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মে। ইহা হইতেই কামুকতা, অপবিত্রতা, কলুষতা, অকৃতজ্ঞতা, ধনীদের নিকট দীনতা-হীনতা স্বীকার এবং দীনহীন দরিদ্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। আর তদনুরূপ মন্দ স্বভাবগুলি পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া মানুষকে কুস্বভাবী করিয়া তোলে। আবার এই কামশক্তি বা লোভ-লালসা নিয়মিত ও পরিমিতরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন করিলে ইহাকে পরহেযগারী বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই

পরহেযগারী হইলে লজ্জা, অল্পে তুষ্টি, সরলতা, সহিষ্ণুতা, রসজ্ঞতা, অপরের মন আকর্ষণের ক্ষমতা ও গুণগ্রাহিতা ইত্যাদি সদগুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মধ্যপন্থা—মোটের উপর ঐ সকল শক্তি বা বৃত্তির দুই প্রান্ত রহিয়াছে এবং এই উভয় প্রান্তই খারাপ। এই দুই প্রান্তের ঠিক মধ্যস্থলে চুল অপেক্ষা সূক্ষ্ম একটি সরল ও উৎকৃষ্ট মধ্যপন্থা রহিয়াছে, ইহাকে সিরাতুল মুস্তাকীম বা মধ্যপথ বলে। ইহা পুলসিরাত সদৃশ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। যিনি জীবদ্দশায় এদিক ওদিক না হইয়া সোজা এই মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তিনি নিরাপদে ও নির্ভয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া যাইবেন। এই জন্যই আল্লাহ্ মানুষকে স্বভাবে উক্ত উভয় প্রান্ত পরিত্যাগ করত মধ্যপথ অবলম্বনের আদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا

অর্থাৎ "এবং তাহারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না ও কৃপণতাও করে না, (বরং) এতদুভয়ের মধ্যপথে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকে।" (সূরা ফুরকান, রুকু-৬)

রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ অর্থাৎ

"এবং তুমি নিজের হাত নিজের গলার সহিত বাঁধিয়া রাখিও না, আর ইহাকে সম্পূর্ণভাবে খুলিয়াও দিও না; (যাহাতে তোমার সমস্তই ব্যয় হইয়া যায় এবং তুমি অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়।") (সূরা বানী ইসরাঈল, রুকূ ৩, পারা ১৫।)

দেহের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের আকৃতি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর হইলেই যেমন মানুষকে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা যায় তদ্রূপ আভ্যন্তরীণ বৃত্তিগুলিই অনুমিতরূপে মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইলেই স্বভাবকে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইতে পারে।

স্বভাবের বিভাগ—মানুষের স্বভাবকে প্রধানত চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী— যাহার প্রত্যেকটি মানসিক বৃত্তি পূর্ণভাবে বিকশিত ও স্ফূর্ত হইয়া সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তাহার স্বভাবকে প্রথম শ্রেণীর পূর্ণমাত্রার সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা হয়। এইরূপ মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া চলা জগদ্বাসীর অবশ্য কর্তব্য। হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কেহই এইরূপ আদর্শ, সর্বাঙ্গ সুন্দর ও উন্নত সৎস্বভাব লাভ করিতে পারে নাই। আল্লাহ্ তদানীন্তনকালে যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সাল্লামকে সর্বাঙ্গ সুন্দর দৈহিক দান করিয়াছিলেন তদ্রূপ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাঙ্গ সুন্দর মানসিক সৌন্দর্য প্রদান করত চিরকালের জন্য জগতের আদর্শ করিয়া রাখিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী— যাহার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি বা শক্তি পূর্ণমাত্রায় কুশ্রী, তাহার স্বভাবও পূর্ণমাত্রায় জঘন্য ও অসুন্দর। মানব সমাজ হইতে এইরূপ জঘন্য প্রকৃতির

লোককে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। সে মানবরূপী শয়তান। শয়তানের অন্তর ও মানসিক বৃত্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় জঘন্য এবং এইজন্যই সে এতদূর কদর্য ও মন্দ হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণী— পূর্ণমাত্রায় কুস্বভাব ও পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাব এতদুভয়ের মধ্যবর্তী, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাবের অধিকতর নিকটবর্তী স্বভাবকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

চতুর্থ শ্রেণী— পূর্ণমাত্রায় কুস্বভাব ও পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাবের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় কুস্বভাবের অধিকতর নিকটবর্তীটিকে চতুর্থ শ্রেণীর স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সাধারণত দেখা যায়, মধ্যবর্তী সুশ্রী ও মধ্যবর্তী কুশ্রী লোক জগতে অধিক; শারীরিক সৌন্দর্যেও পূর্ণমাত্রায় সুশ্রী বা পূর্ণমাত্রায় কুশ্রী লোক অত্যন্ত বিরল। স্বভাব সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাব জগতে অতি বিরল হইলেও ইহার নিকটবর্তী ভাল স্বভাব অর্জনের জন্য প্রতিটি নর-নারীকে আপ্রাণ চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। স্বভাবের প্রতিটি বৃত্তিকে সুশ্রী করিতে না পারিলেও অধিকাংশগুলিকে সুশ্রী করিবার চেষ্টা করা উচিত। শারীরিক সৌন্দর্য ও কদর্য মূর্তির মধ্যস্থলে যেমন কোন বিভাগ চিহ্ন নাই, সৎস্বভাব ও মন্দস্বভাবের মধ্যেও সেইরূপ কোন স্পষ্ট সীমারেখা নাই। সৎস্বভাবের শাখা-প্রশাখা অসংখ্য। তথাপি উহাদিগকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা ঃ- (১) জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধি, (২) শাসনশক্তি বা ক্রোধ, (৩) কামশক্তি বা লোভ এবং (৪) এই তিনটি বৃত্তির প্রত্যেকটিকে অপরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার বিচারশক্তি। এই চারি শ্রেণীর শক্তিই মানব স্বভাবের মূল শাখা। উহা হইতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বহির্গত হইয়াছে।

সৎস্বভাব অর্জন— মানুষ চেষ্টা দ্বারা স্বভাবের উন্নতি করিয়া সৎস্বভাব অর্জন করিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ যাহাকে যেরূপ আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন শত চেষ্টা করিয়াও ইহার পরিবর্তন পরিবর্ধন করা যায় না; যেমন, কোন উপায়ে লম্বা মানুষকে খর্ব বা খর্ব মানুষকে লম্বা এবং সুন্দর আকৃতিকে কদাকার আকৃতিতে ও কদাকার আকৃতিকে সুন্দর আকৃতিতে পরিবর্তন করা যায় না। এইরূপ মানসিক বৃত্তি বা স্বভাবকেও পরিবর্তন করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ। মানবস্বভাব অপরিবর্তনীয় হইলে নীতি-শিক্ষা, চরিত্র সংশোধনের জন্য সাধনা ও পরিশ্রম, উপদেশ প্রদান ইত্যাদি নিরর্থক ও বৃথা হইত।

রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "তোমাদের স্বভাবকে সুন্দর কর।" স্বভাবের উন্নতি সাধন সম্ভব না হইলে তিনি কখনও এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন না। চেষ্টা করিলে পশুকেও আজ্ঞাবহ করা যায় এবং বন্য পশুও পোষ মানিতে বাধ্য হয়। সুতরাং মানবস্বভাব সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। মানুষের সকল কার্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর উপর তাহার কোন ক্ষমতা চলে না; যেমন খোরমার বীচি হইতে কেহই সেব বৃক্ষ জন্মাইতে পারে না।

কিন্তু খোরমার অঙ্কুর যত্নের সহিত প্রতিপালিত করিয়া উত্তম বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে পারা যায়। মানবস্বভাব সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে।

ক্রোধ ও লোভকে আজ্ঞাবহ রাখার প্রতিবন্ধক— মানব হৃদয়ে ক্রোধ ও লোভের যে বীজ রহিয়াছে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা উৎপাটন করা যায় না; কিন্তু কঠোর সাধনা ও যত্নের দ্বারা ইহাকে আজ্ঞাধীন ও সমতার মধ্যে আনয়ন করা যায়। পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা হইলেও ক্রোধ এবং লোভকে শাসনে রাখা কঠিন কার্য সন্দেহ নাই। ইহা কঠিন হওয়ার দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথম, জন্মগতভাবেই কাহারও অন্তরে ক্রোধ ও লোভ অত্যন্ত বলবান। দ্বিতীয়, বহুদিন কেহ লোভ ও ক্রোধের আজ্ঞাধীন রহিয়াছে, ফলে অন্তরে উহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বভাব অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ— স্বভাব অনুসারে মানুষকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। **প্রথম**—স্বচ্ছ অন্তরবিশিষ্ট লোক অর্থাৎ এখন পর্যন্ত যাহার অন্তরে ভাল বা মন্দের কোন প্রভাব বা ছায়া পতিত হয় নাই এবং যেভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেইভাবেই রহিয়াছে। কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ কিছুই বুঝে নাই এবং সৎ বা অসৎ কোন কার্যেরই অভ্যাস হয় নাই। এরূপ স্বচ্ছ অন্তর দেখাদেখি বা সংসর্গক্রমে পারিপার্শ্বিকতার আচরণ ও ছায়া অতি তাড়াতাড়ি গ্রহণ করিতে পারে। সে যাহা দেখে বা শুনে তাহা অতি শীঘ্র তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। তাহার জন্য একজন উপযুক্ত সুশিক্ষকের প্রয়োজন যিনি তাহাকে তা'লীম দিবেন, অসৎ স্বভাবের আপদসমূহ তাহার নিকট বর্ণনা করিবেন। মানব সন্তানের হৃদয় শৈশবকালে এরূপ স্বচ্ছই থাকে। তৎপর মাতাপিতা ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করত তাহাদের অন্তরে সংসারাসক্তি জন্মাইয়া তাহাদিগকে সেই প্রবৃত্তির উপর স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেয়। ফলে তাহারা যদৃচ্ছভাবে জীবনযাপন করিতে থাকে। সন্তানাদির ধর্মরক্ষার দায়িত্ব পিতামাতার উপর অর্পিত হইয়াছে। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজকে এবং তোমাদের পরিজনবর্গকে দোযখের অগ্নি হইতে বাঁচাও।" **দ্বিতীয়**— যাহার অন্তরে এখন পর্যন্ত ভ্রমাত্মক বিশ্বাস স্থান লাভ করে নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল ক্রোধ ও লোভের আজ্ঞাবহ থাকার দরুন উহা তাহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার উপর অবাধ প্রভুত্ব চালাইতেছে। ইহা সত্ত্বেও সে বেশ বুঝিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে, তাহা ভাল নহে। এরূপ লোককে পুনরায় সুপথে আনয়ন করা কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। তাহাকে সুপথে ফিরাইয়া আনিতে হইলে দুইটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যথা—(১) কুঅভ্যাসগুলি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। (২) আত্মসংশোধনের বীজ অন্তরে বপন করিতে হইবে। আত্মসংশোধনের আগ্রহ ও চেষ্টা নিজ হইতেই হৃদয়ে জন্মিলে তাড়াতাড়ি খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করত সৎপথে প্রত্যাবর্তন সহজসাধ্য হইবে। **তৃতীয়**— যে ব্যক্তি অহরহ কুকর্ম করে ও যাহার অন্তরে এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে; এই সমস্ত কর্ম করা যে অন্যায় ইহা সে উপলব্ধিই করিতে পারে না

এবং তাহার দৃষ্টিতে মন্দকার্য ভাল বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর লোক অতি অল্পই সুপথে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয়। **চতুর্থ**— যে ব্যক্তি মন্দকার্যকে উত্তম মনে করিয়া অহরহ করিতে থাকে এবং মন্দকার্য করিয়া আত্মগৌরবে বাহাদুরী প্রদর্শন করে; যথা—আমি এতগুলি লোককে হত্যা করিয়াছি; এত পরিমাণ মদ্য পান করিয়াছি ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোক অতি কঠিন রোগে আক্রান্ত, ইহার কোন প্রতিকার নাই। একমাত্র অপার করুণাময় আল্লাহ্‌র অযাচিত রহমত তাহার উপর বর্ষিত হইলে সে সুপথে ফিরিয়া আসিতে পারে, অন্যথায় নয়।

কুস্বভাবের প্রতিষেধক— কু-প্রবৃত্তিরূপ ব্যাধির একটিমাত্র মহৌষধ রহিয়াছে এবং কেহ এই মারাত্মক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে চাহিলে, তাহাকে এই ঔষধই সেবন করিতে হইবে। কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করাই এই মহৌষধ। কু-প্রবৃত্তি যাহা চায় তাহার বিপরীত কার্য না করিলে ইহাকে বিনাশ করা যায় না। প্রত্যেক পদার্থই ইহার বিপরীত পদার্থকে ধ্বংস করে। উষ্ণতার প্রভাবে রোগ জন্মে, ঠাণ্ডা দ্রব্য ব্যবহারে ইহার উপশম হয়। সেইরূপ ক্রোধের প্রভাবে যে কুস্বভাব উৎপন্ন হয়, সহিষ্ণুতায় ইহার বিরাম হয়। অহঙ্কারের প্রাধান্যহেতু যে মন্দ স্বভাব উৎপন্ন হয়, নম্রতাই ইহার একমাত্র ঔষধ। কৃপণতা হইতে যে হীন ও জঘন্য স্বভাব জন্মে, দীন দরিদ্রদিগকে দান ও অন্যান্য সৎকার্যে ধন ব্যয় করিলে ইহা নিবৃত্ত হয়।

উহা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়েও এই একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। সৎকার্য করিতে করিতে ইহার অভ্যাস যাহার হইয়া গিয়াছে, দেখা যায় যে, তাহার স্বভাব ততই উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শরীয়তে সৎকার্যের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। মানব-হৃদয়ে সদ্‌গুণ যোগ করিয়া দেওয়া এবং ইহার প্রতি তাহাকে উন্মুখ করিয়া তোলাই শরীয়তের লক্ষ্য।

অভ্যাস মানবের দ্বিতীয় স্বভাব—মানুষ চেষ্টা করিয়া যেরূপ অভ্যাস করে, তাহাই বদ্ধমূল হইয়া তাহার স্বভাবগত হইয়া পড়ে। সেইজন্যই অভ্যাসকে মানবের দ্বিতীয় স্বভাব বলে। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শৈশবকালে বালক-বালিকাগণ বিদ্যালয়ে গমন ও বিদ্যাভ্যাস করিতে চাহে না। কিন্তু বিদ্যালয়ে যাইতে তাহাদিগকে বাধ্য করিলে এবং বল প্রয়োগে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে পরে ইহাই তাহাদের স্বভাবে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহারা বিদ্যার সুস্বাদ অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে থাকে এবং আর কখনও বিদ্যাচর্চা হইতে বিরত থাকিতে পারে না।

আরও দেখ, যে ব্যক্তি কবুতর উড়ানো, দাবা, জুয়া বা অন্য কোন প্রকার খেলাধুলায় অভ্যস্ত হয়, উহাই তাহার স্বভাবগত হইয়া যায়। তখন সে এই কার্যে এত মত্ত হইয়া পড়ে যে, জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-দৌলত ইহাতেই বিনাশ করিয়া ফেলে, কিন্তু তবুও ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। এমন কাজ অনেক আছে যাহা প্রথমত স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সর্বদা সেই কাজ করিতে থাকিলে বিরুদ্ধভাব বিদূরিত হইয়া অবশেষে ইহাই স্বভাবে পরিণত হইয়া পড়ে।

অভ্যাসে স্বভাবের বিকৃতি— চৌর্যবৃত্তিকে সকলেই অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কিন্তু চুরি কার্যে কেহ অভ্যস্ত হইয়া গেলে ইহাই তাহার নিকট প্রিয় হইয়া উঠে। এমন নিপুণ চোরও আছে যে চৌর্যবৃত্তির শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত বা হস্তকর্তনের দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়াও নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করিতে থাকে। নপুংসক লোকেরা হীন অপকর্ম করিয়া একজন অপরজন অপেক্ষা নিজের জঘন্য কার্যের জন্য গৌরব করিয়া থাকে। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আলিম, আমীর-ওমরা ও বাদশাহগণ যেরূপ উৎকৃষ্ট কার্যে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন, নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ ঠিক সেইরূপ অপকর্মে তাহাদের দক্ষতা ও পটুতার বাহাদুরী করিয়া থাকে। দীর্ঘকালের অভ্যাসের দরুনই এইরূপ হইয়া যায়।

আরও অনুধাবন কর, মানুষ মাটি খায় না; ইহা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু কোন ব্যক্তি মাটি খাইবার অভ্যাস করিলে ক্রমে তাহার এই অবস্থা হয় যে, মাটি না পাইলে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। মৃত্তিকা ভক্ষণে কঠিন পীড়ার সম্ভাবনা থাকিলেও সে ইহা হইতে বিরত হয় না। মৃত্তিকা ভক্ষণের মত মানবস্বভাববিরুদ্ধ কার্য অভ্যাসের ফলে তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। এমতাবস্থায়, যাহা তাহার স্বভাব অনুযায়ী এবং তাহার জন্য পানাহারতুল্য তাহা নিয়মিতরূপে অহরহ অভ্যাস করিলে কেন ইহা মানবস্বভাবে পরিণত হইবে না?

কুপথ্যে লালসা পীড়ার লক্ষণ– হৃদয় ও দেহ উভয়ের জন্যই এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌র মা'রিফাত অর্থাৎ তাঁহার পরিচয়লাভ ও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার, ক্রোধ ও লোভকে আজ্ঞাধীন রাখা ইত্যাদি বৃত্তিসমূহ মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম। ফেরেশ্‌তাদের স্বভাবেও এইগুলি রহিয়াছে। এই সুপ্রবৃত্তিগুলিই হৃদয়ের খাদ্য। এই সমস্ত নিয়মিতরূপে বিকশিত ও স্ফূর্ত হইলেই মানব-হৃদয়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কখন কখনও এই স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের উলটা দিকেও মানব হৃদয়ের অনুরাগ ও আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। হৃদয়ের ব্যাধি হইতেই এই বিরুদ্ধ ভাব-প্রবণতা জন্মিয়া থাকে। শারীরিক ব্যাধি হইলে যেমন মানবের স্বাভাবিক পানাহারে রুচি থাকে না, বরং ধ্বংসকারী কুপথ্যের দিকে লালসা ও মনের টান বৃদ্ধি পায়; হৃদয়ের ব্যাধি হইলেও ঠিক তদ্রূপ হইয়া থাকে। হৃদয় পীড়িত হইলেও কল্যাণকর সুপথ্য পরিত্যাগ করিয়া ধ্বংসকারী কুপথ্য ভোজনে মন অধিক লালায়িত হইয়া উঠে।

আল্লাহ্‌র মা'রিফাত লাভ ও তাঁহার আদেশ পালনে বিরত হইয়া মানব মন যখন অন্যান্য বিষয়ের দিকে অনুরক্ত হইয়া পড়ে, তখন মনে করিবে যে হৃদয় পীড়িত হইয়াছে। এই মারাত্মক ব্যাধির কথাই পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলিতেছেন– فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ 'তাহাদের অন্তঃকরণসমূহে ভীষণ ব্যাধি রহিয়াছে।" اِلَّا। مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ অর্থাৎ 'তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটে নির্মল ও সুস্থ হৃদয় উপস্থিত করিবে" (সূরা– শুআরা, রুকু ৫)।

দৈহিক ব্যাধি যেমন ইহলৌকিক জীবনে ধ্বংস ও দুর্দশা আনয়ন করে, হৃদয়ের ব্যাধিও তদ্রূপ পারলৌকিক জীবনে বিনাশ ও দুর্দশা আনয়ন করে। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে তিক্ত ও বিস্বাদ ঔষধ সেবন না করিলে যেমন শারীরিক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুস্থ হওয়া যায় না, তদ্রূপ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে না চলিলেও হৃদয়ের ব্যাধি দূর করিয়া সুস্থ হৃদয় লাভ করা যায় না।

আন্তরিক ব্যাধির ঔষধ ও প্রয়োগ-বিধি– মোটের উপর, শারীরিক ও আন্তরিক ব্যাধির ঔষধের প্রয়োগ-বিধি একই রকম। উষ্ণতার প্রভাবে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় ইহাতে ঠাণ্ডা ঔষধ এবং ঠাণ্ডার প্রভাবে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় ইহাতে উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে সুফল লাভ করা যায়। যাহার হৃদয় অহমিকা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, সে যদি কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বল প্রয়োগে নম্রতা ও হীনতা অবলম্বন করে, তবে সে এই ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইতে পারে। আবার কাহারও হৃদয়ে নম্রতা সীমা অতিক্রমপূর্বক অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে হীনতার কূপে নিমগ্ন করিবার উপক্রম করিলে গর্ব ও অহমিকাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া দিলেই এই ব্যাধির উপশম হইবে।

সৎস্বভাব অর্জনের উপায়— সৎস্বভাব অর্জনের তিনটি উপায় আছে।

প্রথম উপায়— জন্মগতভাবে প্রাপ্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাভাবিক উপায়। পরম করুণাময় আল্লাহ্ অনুগ্রহপূর্বক মানব সৃজনের সময়েই সৎস্বভাবের মূলগুলি তাহার অন্তরে রোপণ করিয়া দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা শিষ্টাচারে অত্যন্ত উন্নত বা খুব উচ্চ শ্রেণীর দাতা তাঁহারা এই সমস্ত মহৎবৃত্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই স্বাভাবিক কারণের অস্তিত্ব অধিকাংশ স্থানে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় উপায়— যত্ন ও পরিশ্রমসাধ্য উপায়। কুপ্রবৃত্তির সহিত লড়াই করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত নিজেকে সর্বদা সৎকর্মে নিযুক্ত রাখিলে ক্রমশ সৎকর্মের অভ্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

তৃতীয় উপায়— সৎসংসর্গ। সৎস্বভাবী ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের সদ্গুণ স্বতঃই অন্তরে প্রবেশ লাভ করে।

স্বভাবের তারতম্য হওয়ার কারণ— যে ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে সৎস্বভাবের এই তিনটি উপায়ই লাভ করিয়াছেন, তিনি পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাব অর্জন করিবার সুবিধা পাইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে সৃষ্টির সময়েই সৎস্বভাবের মূলসমূহ রোপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যিনি সৎসংসর্গের সুযোগ লাভ করিয়াছেন এবং নিজেও চেষ্টা ও যত্নের সহিত সৎকর্মে অভ্যস্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনি পরম সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হইয়াছেন।

অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি এই তিনটি উপায় হইতেই বঞ্চিত রহিয়াছে অর্থাৎ সৃষ্টির সময়ে কুস্বভাবের মূলসমূহ অন্তরে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অসৎলোকের সংসর্গে জীবন অতিবাহিত করিতেছে এবং নিজেও অসৎকর্মে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্বভাবও পূর্ণতা লাভ করে, তবে ইহা খারাপের দিকে পূর্ণতা।

মানবস্বভাবের উল্লিখিত দুইটি প্রান্ত আছে, একটি মন্দের দিকে শেষ প্রান্ত এবং অপরটি সুন্দরের দিকে শেষ প্রান্ত। দুই প্রান্তের মধ্যে অসংখ্য দরজা বা সোপান আছে। সৎস্বভাব অর্জনের পূর্ববর্ণিত ত্রিবিধ উপায়ের তারতম্য অনুসারে মানুষ সেই সমস্ত সোপানের কোন না কোন সোপানে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ঐ উপায়সমূহের একাংশ বা অধিকাংশ লাভে সমর্থ হয়, তাহার স্বভাবও সেই পরিমাণে সুন্দর বা কদর্য হইয়া থাকে। এইজন্যই পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ط وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

অর্থাৎ "অনন্তর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ সৎকার্য করিবে, সে উহা দেখিতে পাইবে; আর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ মন্দ কার্য করিবে, সে উহা দেখিতে পাইবে।"

আত্মার পাপ-পুণ্যের ফলভোগ—বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানুষ সকল কাজ করিয়া থাকিলেও উহার সহিত মন সঞ্চালিত করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মনের মিলন না ঘটিলে কোন কাজই সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং সকল কাজের ফল অন্তরে যাইয়া সঞ্চিত হয় ও অন্তরই এই সমস্ত কাজের ফল ভোগ করিয়া থাকে। আত্মাকেই পরকালের সফর করিতে হইবে এবং তাহাকেই আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব আত্মাকে নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্যের আধার ও পূর্ণমাত্রায় গুণবান করিয়া তুলিতে হইবে, যেন ইহা আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার উপযুক্ত হইয়া উঠে। তজ্জন্য আত্মাকে মুকুরের ন্যায় সরল, নির্মল ও স্বচ্ছ করিয়া তোলা আবশ্যক। তাহা হইলে আলমে মালাকুতের অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের ছায়া ইহাতে সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইতে পারে।

আত্মা এই অবস্থায় উন্নীত হইলে এমন অপার সৌন্দর্য নয়নগোচর হইতে থাকিবে এবং এরূপ পরম আনন্দ উভোগে আসিবে যে, উহার তুলনায় বেহেশ্তও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। পরকালের সুখ ও আনন্দ জড়দেহ কিছুট ভোগ করিবে সত্য, কিন্তু একমাত্র আত্মাই ইহার স্বাদ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিবে। দেহ আত্মারই আজ্ঞাবহ।

পাপ-পুণ্যের গূঢ়তত্ত্ব—দেহ ও আত্মা একই শ্রেণীর পদার্থ নহে। কারণ, আত্মা আধ্যাত্মিক জগতের পদার্থ এবং দেহ জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত। দর্শন পুস্তকে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। দেহ আত্মা হইতে পৃথক হইলেও দেহের সঙ্গে আত্মার এক রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। দেহ দ্বারা কোন সৎকাজ সম্পন্ন হইলে ইহার ফলে দেলে একটি নূর বা জ্যোতি উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা দেল জ্যোতির্ময় ও সুশোভিত হইয়া উঠে। অপরপক্ষে, দেহ দ্বারা কোন কুকর্ম সম্পন্ন হইলে এক প্রকার অন্ধকার উৎপন্ন হইয়া দেলকে আবৃত করিয়া ফেলে। পূর্বোক্ত নূরকেই পুণ্য কহে এবং ইহাই সৌভাগ্যের মূল। আর শেষোক্ত অন্ধকারকেই পাপ বলে এবং ইহাই দুর্ভাগ্যের অঙ্কুর।

উৎকৃষ্ট গুণাবলী অর্জনই মানবজীবনের লক্ষ্য—দেহ ও আত্মার মধ্যে উক্ত প্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই মানবকে এই জড়জগতে আনয়ন করা হইয়াছে, যেন আত্মা দেহকে নিয়োজিত করিয়া জীবনের চরম ও পরম সৌভাগ্যের বীজগুলি সঞ্চয় করিয়া লইতে পারে। এই উৎকৃষ্ট গুণাবলি অর্জনে মানুষ তাহার দেহকে ফাঁদ বা যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

আত্মার উপর কার্যের প্রভাব—লেখা কাজটি আসলে আত্মারই কাজ, যদিও অঙ্গুলি দ্বারাই লেখন কার্যটি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি সুন্দর হরফে লিখিতে চাহিলে সর্বপ্রথম বিশেষ যত্নে সুন্দর হস্তাক্ষরের আকৃতি অঙ্কন করিতে বারবার চেষ্টা করিতে হয়। কিছুকাল এরূপ করিতে থাকিলে সুন্দর অক্ষরের আকৃতিগুলি হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহার পর তৎসমূদয়ের প্রতি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিয়া সেই আঙ্গুলের সাহায্যে হৃদয়স্থিত অক্ষরগুলি কাগজের উপর অঙ্কিত করিয়া দিলেই লিখন কার্যটি সুসম্পন্ন হয়।

সেইরূপ মানব হস্তপদাদি বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে সৎকার্য করিতে থাকিলে হৃদয়ফলকে ইহার সাধু চিত্র অঙ্কিত হইতে থাকে। কিছুদিন ক্রমাগত সৎকার্যাদি করিতে থাকিলে এই চিত্রটি হৃদয়ে একটি সুদৃঢ় স্থায়ীভাবে পরিণত হইয়া যায়। মানব এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে সৎকার্যাবলী তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত সাধু ছবিগুলি অনুরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, বিশেষ পরিশ্রম সহকারে নিজেকে সৎকার্যে প্রবৃত্ত করিয়া লওয়াই সমস্ত সৌভাগ্যের সূচনা। এইরূপে নিজেকে জোর-জবরদস্তি সৎকার্যে নিয়োজিত করিলে এবং পুনঃ পুনঃ সৎকার্যের অনুষ্ঠান সর্বদা করিতে থাকিলে এই সৎ অভ্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন ইহার নূরও হৃদয় হইতে বাহিরের দিকে বিচ্ছুরিত হইতে আরম্ভ করে এবং ইতঃপূর্বে যে কার্য জোর-জবরদস্তি ও বিশেষ পরিশ্রম সহকারে করিতে হইত তাহা এখন স্বাভাবিক আগ্রহ ও আনন্দের সহিত হইতে থাকে। দেহ ও দেলের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে অর্থাৎ দেহ স্বীয় কার্যের প্রভাব দেলে প্রতিফলিত করিতে পারে, এবং দেলও আপন ভাবের আলোক বা অন্ধকার দেহের উপর বিস্তার করিতে পারে, এই কারণেই উক্ত বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্য আনমনা হইয়া কোন কার্য করিলে ইহার প্রতিফল নিতান্ত নগণ্য হইয়া যায়।

ঔষধের পরিমাণ নিরূপণ—ঠাণ্ডারোগে গরম ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। এইজন্য ঠাণ্ডারোগে আক্রান্ত ব্যক্তি গরম দ্রব্য যত পাইবে ততই ভক্ষণ করিবে, ইহা কিছুতেই সঙ্গত নহে। ইহা করিলে ঠাণ্ডা দূর হইয়া অত্যধিক গরমের দরুণ আবার অপর একটি নূতন রোগ দেখা দিতে পারে। তাই ঔষধ প্রয়োগেরও একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। ঔষধ সেবনকালে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ইহাতে গরমও না আসে এবং ঠাণ্ডাও না আসে বরং স্বভাবে এই সুন্দর সাম্যভাব স্থাপিত হয়। ইহাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। প্রকৃতি সাম্যভাবপ্রাপ্ত হইলে ঔষধ সেবন ছাড়িয়া দিয়া এই সাম্যভাব রক্ষার্থে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রকৃতি যাহাতে আবার ঠাণ্ডা বা গরম না হইয়া যায়, এইরূপ আহার্য্য ভক্ষণ করা উচিত।

দৈহিক প্রকৃতির দুইটি প্রান্ত আছে—একটি শীতল, অপরটি উষ্ণ। এই দুই প্রান্তের উভয়টিই মন্দ। এই দুই প্রান্তকে দুই পার্শ্বে রাখিলে ঠিক মাঝখানে একটি নাতিশীতোষ্ণ মধ্যস্থান বা মধ্যপথ রহিয়াছে। হৃদয়ের স্বভাবের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ইহারও দুইটি প্রান্ত ও একটি মধ্যপথ আছে। এই মধ্যপথ অবলম্বন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা ধন দান করিবার জন্য কৃপণকে আদেশ দিয়া থাকি। কিন্তু এই দানেরও একটা সীমা আছে। যে পর্যন্ত দান করা তাহার পক্ষে সহজ ও কোন কষ্টের কারণ না হয়, সেই পর্যন্ত দান করাই তাহার পক্ষে উচিত, নিজের যথাসর্বস্ব দান করিয়া পরের ভারস্বরূপ এবং অপচয়ের অপরাধে অপরাধী হওয়া উচিত নয়। চিকিৎসাশাস্ত্র যেরূপ দৈহিক রোগে ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া দিয়াছে। যে পরিমাণ দান করিবার আদেশ শরীয়তে রহিয়াছে, হৃষ্টচিত্তে সেই পরিমাণ দানে মানুষের অভ্যস্ত হওয়া উচিত এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণে কৃপণতা করা কিছুতেই তাহার পক্ষে সঙ্গত নহে। তদ্রূপ যাহা খরচ করিতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে, তাহার ব্যয় করিবার কল্পনাও হৃদয়ে স্থান দেওয়া সঙ্গত নহে। এইরূপে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করিলেই অন্তরের সাম্যভাব রক্ষিত হইবে।

শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অনুসারে চলিতে যাহাদের হৃদয়ে আগ্রহ ও আসক্তি নাই, বরং অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া নিজকে ধরিয়া বাঁধিয়া শরীয়তের আদেশ পালন করিতে হয়, মনে করিতে হইবে যে, তাহাদের হৃদয় রোগাক্রান্ত। কিন্তু তাহাদের রোগ তত মারাত্মক ও জঘন্য নয়। জোরজবরদস্তি কায়ক্লেশে শরীয়তের আদেশ পালন করিতে থাকিলেই এই রোগে আরাম হইবে এবং পরিশেষে উহাই তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ও স্বভাবগত হইয়া যাইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রাসূলে মাকবূল (সা) বলেন, "মনের খুশী ও আনন্দের সহিত আল্লাহ্‌র আদেশ পালন কর। তাহা যদি না পার তবে বল প্রয়োগে কষ্টে-সৃষ্টেই ইহা পালন কর। এইভাবে পালন করিলেও বহু সওয়াব পাইবে।"

যে ব্যক্তি অনিচ্ছায় কষ্টে-সৃষ্টে দান করে তাহাকে দাতা বলে না। যে ব্যক্তি মনের খুশী ও আনন্দে, সহজ ও সরলভাবে দান করে তাহাকেই দাতা বলে। কিন্তু যে ব্যক্তি বহু চেষ্টা ও যত্নে স্বীয় ধনের হেফাযত করে এবং অপচয় করে না, তাহাকে কৃপণ বলা চলে না। বরং ধন জমাইয়া রাখাই যাহার প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে এবং কিছু ব্যয় করিতে চাহিলেই প্রবৃত্তি তাহাকে বাধা প্রদান করে, ফলে সে পরাজিত হইয়া আর ব্যয় করে না, তাহাকে কৃপণ বলা হইয়া থাকে।

শরীয়তের নির্দেশ পালনে সন্তোষ আবশ্যক— মোটের উপর, শরীয়তের নির্দেশ পালন যেন মানুষের জন্য সহজ সরল হইয়া যায় এবং বলপ্রয়োগে কষ্টে-সৃষ্টে যেন নির্দেশ পালন করিতে না হয়, মানুষের স্বভাব এইরূপ হইয়া যাওয়া উচিত। যে ব্যক্তি তাহার পরিচালন ভার শরীয়তের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে এবং বিনা দ্বিধায় ও

সন্দেহে কোন প্রকার বাদানুবাদ না করিয়া মনের আনন্দে সহজ সরলভাবে শরীয়তের নির্দেশ পালন করিয়া চলে, সেই ব্যক্তিই এইরূপ সৎস্বভাব অর্জন করিয়াছে বলিতে হইবে। এইদিকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ্ রাসূলে মাক্‌বূল (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا
فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থাৎ "অনন্তর আপনার প্রতিপালকের শপথ ইহারা মু'মিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা না হইবে যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে ঝগড়া সংঘটিত হয় উহাতে তাহারা আপনার দ্বারা মীমাংসা করাইবে। অনন্তর আপনার এই মীমাংসায় নিজেদের অন্তরে সঙ্কীর্ণতাবোধ না করে এবং পুরাপুরিভাবে সমর্থন করিয়া লয়" (সূরা নিসা, রুকু-৯)।

এই আয়াতে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে এবং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে, তাই অতি সংক্ষেপে সামান্য ইঙ্গিত করা যাইতেছে। ফেরেশতার গুণাবলী অর্জন করাই মানবের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, কেননা গুণ ও ধর্ম সম্বন্ধে মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। আলমে মালায়িকাহ্ অর্থাৎ ঊর্ধ্ব আধ্যাত্মিক জগত তাহাদের উভয়েরই উৎপত্তিস্থল। আলমে মালায়িকাহ্ হইতে মুসাফিরের ন্যায় মানুষ এই জড় জগতে আগমন করিয়াছে। সংসারে অবস্থানের দরুন মানুষ সংসারের কতিপয় গুণ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। এই গুণরাজি ফেরেশতার গুণ হইতে বিভিন্ন হইবে বলিয়া মানুষকে ফেরেশতা শ্রেণী হইতে পৃথক থাকিতে হইবে। তাই মানুষকে যখন আলমে মালায়িকাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে তখন নবার্জিত গুণগুলি বর্জন করত ফেরেশতাদের গুণ লইয়াই সেই দেশে যাত্রা করা উচিত। এই জড় জগতে অর্জিত কোন বিজাতীয় গুণ সাথে লইয়া যাওয়া কিছুতেই উচিত নহে।

এই জগতে ধন-সম্পদ জমাইবার বাসনা যাহার প্রবল, ধন-সম্পদের প্রতিই সে আসক্ত। আবার যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ধন সম্পদ খরচ করিতে লালায়িত সেও ধন সম্পদের প্রতিই অনুরক্ত, আর যে ব্যক্তি স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও অহঙ্কার প্রকাশে আগ্রহান্বিত সেও সাংসারিক ব্যাপারে লোকদের প্রতি আশ্বস্থ না হইয়া পারে না। ফেরেশতাগণ কিন্তু না ধন-সম্পদের প্রতি অনুরক্ত, না লোকদের প্রতি আসক্ত। আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতিই তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন না। মানবেরও তদ্রূপ ধন-সম্পদ এবং লোকদের প্রতি আসক্তি ছিন্ন করিয়া ফেলা উচিত।

দুনিয়া বর্জনে মধ্যপন্থা—ধন-সম্পত্তি ও যশ-প্রতিপত্তির আসক্তি ছিন্ন করিয়া ফেলিলে মন পাক-পবিত্র হইতে পারে। কিন্তু এই জড় জগতে জীবন ধারণের জন্য স্বাভাবিক ক্ষুৎপিপাসা ইত্যাদি যে সকল চিন্তা হইতে মানবমন একেবারে মুক্ত হইতে

পারে না তৎসমুদয় মধ্যপথ গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে মনের উপর উহাদের কোন প্রভাব আছে বলিয়াই মনে হইবে না। উপমাস্বরূপ, পানি কখনও শীতাতপ হইতে সম্পূর্ণ শূন্য হইতে পারে না। কিন্তু মধ্যমাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহাকে শীতাতপশূন্য বলিয়া মনে হয়। মানব প্রবৃত্তি সম্পর্কে যে মধ্যপথ গ্রহণের নির্দেশ রহিয়াছে ইহাই তাহার তাৎপর্য। অতএব দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মানবমন যেন কেবল আল্লাহ্‌তে নিমজ্জিত থাকিতে পারে তৎপ্রতি মানুষের যত্নবান হওয়া আবশ্যক। এইজন্যই আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ অর্থাৎ "বল, আল্লাহ্, অনন্তর আর সমস্ত পরিত্যাগ কর।" এই পবিত্র আয়াতে কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর হাকীকত বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ও মলিনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাই আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا -

অর্থাৎ "হে মানব, এমন তোমাদের মধ্যে কেহই নাই, যে ব্যক্তি সেই অবস্থার উপর দিয়া না গিয়াছে, এই বিধান তোমার প্রভু দৃঢ়ভাবে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন" (সূরা মরিয়ম, রুকু ৫, পারা ১৬)।

তাওহীদের মরতবা অর্জন রিয়াযতের লক্ষ্য—উল্লিখিত বর্ণনা হইতে মোটামুটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ যে, রিয়াযত বা চরিত্র সংশোধনের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা-তদবীর, পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, উহার একমাত্র লক্ষ্য তাওহীদ বা একত্ব বিশ্বাসের মরতবা লাভ করা। একমাত্র তাওহীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পথ চলিতে চলিতে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে না, একমাত্র তাঁহার ইবাদতেই মশগুল থাকিবে এবং তাহা ব্যতীত অন্য কাহারও আকাঙ্ক্ষা তোমার হৃদয়ে থাকিবে না। এইরূপ ভাবপ্রাপ্ত হইলেই সৎস্বভাবসমূহ মানুষের অর্জিত হয় এবং মানবীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানুষ হাকীকত অর্থাৎ যথার্থ অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে।

চরিত্র সংশোধনের উপায়—চরিত্র সংশোধনের কার্যে অতি কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করিতে হয়। ইহা এত কঠিন ও দুঃসাধ্য যে, ইহাতে মৃত্যুযন্ত্রণার ন্যায় যাতনা রহিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কামিল পীর বা সুনিপুণ অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের নির্দেশ অনুসারে চলিলে কাজটি অনায়াসসাধ্য হইয়া যায়। কামিল পীর প্রথমেই স্বীয় মুরীদকে আল্লাহ্‌র হাকীকতের দিকে আহ্বান করেন না, কারণ তখনও তাহার এই শিক্ষা গ্রহণের শক্তি অর্জিত হয় নাই।

উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য কর, শৈশবকালে বালক-বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সময় তাহাদিগকে প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি বা রাজত্বের প্রলোভন দেখাইলে কোনই ফল হয় না; কারণ প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি বা রাজত্ব যে কি পদার্থ তাহারা তখনও উপলব্ধি করে

নাই। তাহারা যাহার আস্বাদ লাভ করিয়াছে এবং যাহা বুঝে তাহার প্রলোভন দিলেই সুফল দর্শে। বরং শিশুদিগকে যদি বল, "বাপু, বিদ্যালয়ে গমন কর, পড়া শেষ হইলে শিক্ষক মহাশয় তোমাকে ডাণ্ডা-গুলী খেলিতে দিবেন এবং আমিও তোমাকে একটি শুক পাখি ক্রয় করিয়া দিব," তাহা হইলে এই প্রলোভনে শিশু অবশ্যই বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠশালায় গমন করিবে।

শিশু আর একটু বয়স্ক হইলে তাহাদিগকে নানারূপ সুন্দর ও বিচিত্র বসন-ভূষণের প্রলোভন দেখাইলে উপকার হয় এবং তাহারা খেলতামাশা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হয়। বালকের বয়স আরও বৃদ্ধি পাইলে যদি প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তির আশ্বাস দিয়া বল- "বাবা, সুন্দর বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হওয়া ত রমণীদের কাজ। কঠোর পরিশ্রম ও যত্নের সহিত বিদ্যা শিক্ষা কর, তাহা হইলে লোকে তোমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে, তোমাকে প্রভুত্ব দান করিবে এবং তুমি একজন বড়লোক হইয়া যাইবে," তবে উপকার পাইবে।

তাহার বয়স আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বলিবে- "বাবা, এ জগতে প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি বা বড়মানুষির কোনই মূল্য নাই। মৃত্যুর সাথে সাথে সমস্তই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং পরকালের চিরস্থায়ী বাদশাহী লাভের জন্য বিদ্যা শিক্ষা কর।" এইরূপে প্রলোভন দিতে থাকিলে শৈশবকাল হইতেই অতিশয় আনন্দ ও আগ্রহের সহিত মানব বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হয়। ধর্মপথের পথিকদিগকেও রিয়াযতকালে এই নিয়মানুসারে পরিচালনা করা আবশ্যক।

পীর যদি প্রাথমিক অবস্থায়ই মুরীদকে এক লাফে চরম ও পরম লক্ষ্যবস্তু আল্লাহ্‌কে ধরিবার নির্দেশ দান করেন তবে ইহা তাহার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রথম হইতেই একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ইখলাস বা পূর্ণ বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে কাজ করিয়া যাওয়া নিতান্ত দুরূহ ও দুঃসাধ্য বিষয়। তাই কামিল পীর স্বীয় মুরীদকে ধর্মপথে চলিবার অনুমতি প্রদান করিয়া বলেন, "হে শিষ্যবৃন্দ, তোমরা সৎস্বভাব অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করিতে থাক, তোমরা সৎ হইলে লোকে তোমাদের প্রশংসা করিবে।"

এইরূপে প্রশংসা লাভের দিকে আকৃষ্ট করিয়া মুরীদদের অন্তর হইতে অতিরিক্ত পানাহারের লিপ্সা ও ধনাসক্তি দমন করিতে হইবে। ইহাতে পানাহারের লোভ ও ধনাসক্তি দমন হইবে বটে, কিন্তু তৎপরিবর্তে গর্ব ও যশ-প্রতিপত্তির লালসা তাহাদের অন্তরে জন্মলাভ করিবে। কিন্তু পীর যখন দেখিবেন যে, মুরীদের অন্তর হইতে লিপ্সা ও ধনাসক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তখন তিনি তাহার যশ-প্রতিপত্তির লালসা ও প্রশংসা পাইবার লোভকে দমন করিতে চেষ্টা করিবেন। তজ্জন্য বাজারে ও প্রকাশ্য পথে ভিক্ষুকের বেশে বিচরণ করিবার নিমিত্ত মুরীদকে নির্দেশ দিতে হইবে। ইহাতে অন্তর হইতে যশোলিপ্সা, সম্মান-লালসা, মান-অভিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন ভিক্ষুকবেশ পরিবর্তন করিয়া তাহাকে মেথররূপে পায়খানা পরিষ্কার ইত্যাদি নিকৃষ্ট ও

ঘৃণ্য কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে ঘৃণ্য প্রবৃত্তিও তাহার হৃদয় হইতে চূর্ণ হইয়া যাইবে। এই নিয়মে পীর মুরীদের অন্তরে যখন যে প্রবৃত্তি প্রবল দেখিবে তখনই মাত্রা পরিমাণ ইহার ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। একবারে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি দমনের আদেশ দিলে ইহা মুরীদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা দুর্দমনীয় রিপু—ভোজন-লালসা ও ধনাসক্তি তত বড় রিপু নহে। যশ ও প্রশংসা লাভের আশায় উহা পরিত্যাগ করিবার কষ্ট সহ্য করা চলে। কিন্তু উহার চেয়ে অত্যন্ত প্রবল রিপুও মানব অন্তরে বিদ্যমান আছে। ভোজন-লালসা, ধনাসক্তি ইত্যাদি রিপুসমূহকে সাপ-বিচ্ছুর সহিত তুলনা করিলে রিয়া বা সুখ্যাতি প্রিয়তা ও প্রদর্শনেচ্ছাকে নিঃসন্দেহে ভীষণ বিষধর অজগরের সহিত তুলনা করা চলে। সমস্ত রিপু দমন হইয়া গেলেও রিয়া রিপু মানব মনে দুর্দমনীয়রূপে থাকিয়া যায়। সকল রিপু চূর্ণ করিবার পরও ধর্মপরায়ণ লোকদিগকে রিয়া দমন করিতে অত্যন্ত কষ্ট করিতে হয়। আর এই রিপুকে দমন করিতে পারিলেই মানব ধর্মপথের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে।

আন্তরিক রোগ নির্ণয়ের উপায়—দেহ, হস্তপদ, চক্ষু ইত্যাদি সুস্থ আছে, না রোগাক্রান্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, যে কাজের জন্য ঐ অঙ্গ সৃজন করা হইয়াছে, তদ্বারা তাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতেছে কিনা। অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে দেখিলেই মনে করিতে হইবে, উহা সুস্থ আছে। চক্ষু দিয়া যদি অনায়াসে সুন্দররূপে দর্শন করা যায়, কর্ণ দিয়া যদি অনায়াসে সুন্দররূপে শ্রবণ করা যায় তবেই মনে করিবে যে, ইহারা রোগাক্রান্ত হয় নাই। দেলকে যেভাবে ও যে কার্যের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা যদি ঠিক সেইভাবে থাকে ও ঐ কার্য তদ্বারা অনায়াসে সুসম্পন্ন হয় তবে মনে করিবে দেলও সুস্থ আছে। সৃজনেরকালে দেলের যে ভাব বা গুণ ছিল তাহা বিশুদ্ধ ও অবিকৃত থাকিলেই সে তাহার কাজ সহজে আনন্দের সহিত করিতে পারিবে।

অবিকৃত হৃদয়ের নিদর্শন—দুইটি নিদর্শন দ্বারা হৃদয়ের অবস্থা নির্ণয় করা চলে; প্রথম, ইরাদা বা বাসনা, দ্বিতীয়, কুদরত বা শক্তি। এস্থলে ইরাদা অর্থে আল্লাহ্‌কে তাহা ব্যতীত অন্যান্য সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবার বাসনাকে বুঝিতে হইবে। পানাহার যেমন শরীরের খাদ্য, মা'রিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পরিচয় জ্ঞান তদ্রূপ হৃদয়ের খাদ্য। যে ব্যক্তির পানাহারের বাসনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, মনে করিবে, তাহার শরীরে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। তদ্রূপ যে হৃদয় হইতে আল্লাহ্‌কে জানিবার ও তাঁহাকে ভালবাসিবার বাসনা বিলুপ্ত হইয়াছে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, মনে করিবে যে, সেই হৃদয়ও রোগাক্রান্ত হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ الاية অর্থাৎ "(হে নবী, আপনি) বলুন, তোমাদের পিতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, স্ত্রী সকল এবং তোমারে আত্মীয়গণ এবং ধন-সম্পত্তি যাহা (তোমরা) উপার্জন করিয়াছ এবং বাণিজ্য যাহার বন্ধ হওয়াকে ভয়

করিতেছ এবং যে ঘরগুলি পছন্দ করিতেছ, (এ সমুদয়) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার পক্ষে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, তবে ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর যে, আল্লাহ্ নিজের হুকুম উপস্থিত করেন" (সূরা তওবা, রুকু ৩, পারা ১০)।

কুদরত অর্থে বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র আজ্ঞা পালনে যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় তাহা যেন স্বাভাবিকভাবে ও অনায়াসে হইয়া যায় এবং প্রবৃত্তির উপর বলপ্রয়োগ করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া নিজের দ্বারা পালন করিয়া না লইতে হয় এবং আরাম ও আনন্দ, যওক-শওকের সহিত অনায়াসে ও স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে। তাহা হইলে ক্রমে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের আনন্দ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, ইহার সহিত আদেশ পালনের শক্তিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই রাসূলে মাক্‌বূল (সা) বলেন ঃ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ "নামাযকে আমার চোখের পুতলি করা হইয়াছে।" ইহার অর্থ এই যে, তিনি নামাযে অসীম আনন্দ লাভ করিতেন।

আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ হওয়া মানবের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কাজেই তাঁহার প্রতিটি আদেশ পালনে অসীম আনন্দ লাভ করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহাতে আনন্দ অনুভব করে না তাহার হৃদয় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে আনন্দ না পাওয়াই হৃদয় পীড়িত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। মানুষ নিজের দোষ-ত্রুটি দেখিতে পায় না। সে স্বীয় পীড়া সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকিলেও তাহার হৃদয়ে রোগ জন্মিয়াছে ধরিয়া লইয়া তাহার চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

রোগ চিনিবার কৌশল—চারিটি উপায়ে আন্তরিক রোগ বা নিজের দোষ-ত্রুটি বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম—কামিল পীরের সংসর্গে থাকিলে তিনি তাহার দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু বর্তমান যমানায় এইরূপ কামিল পীর অতি বিরল। সুতরাং এই উপায়ের সুবিধা বর্তমানে নিতান্ত দুর্লভ।

দ্বিতীয়—কোন সদয় ধর্মবন্ধুকে নিজের দোষ-ত্রুটি পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত করা। যে ব্যক্তি স্নেহের বশবর্তী হইয়া মিষ্টবচনে দোষ লুক্কায়িত করিবেন না, বা হিংসার বশবর্তী হইয়া নগণ্য দোষ অতিরঞ্জিত করিয়া বাড়াইয়া তুলিবেন না, এইরূপ আল্লাহ্ ভীরু লোককে নিজের দোষ পর্যবেক্ষকরূপে নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ বন্ধুও বর্তমান যমানায় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। হযরত দাউদ তায়ীকে (র) কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- "আপনি লোক সংসর্গে থাকেন না কেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন- "যাহারা আমার নিকট হইতে আমার দোষ লুক্কায়িত করিবে, তাহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমার কি লাভ।"

তৃতীয়—শত্রুগণ তোমার সম্বন্ধে যাহা বলে তাহা শ্রবণ কর। শত্রুগণ কেবল দোষই দেখিয়া থাকে। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার বশবর্তী হইয়া তাহারা ক্ষুদ্র দোষকে

লোকের নিকট বড় করিয়া প্রকাশ করিবে বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদের উক্তিতে কিছু সত্য অবশ্যই থাকিবে।

চতুর্থ—অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখিয়া নিজের মধ্যে এইরূপ দোষ-ত্রুটি আছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে এবং থাকিলে সযত্নে উহা পরিত্যাগ করিবে। আর এরূপ দোষ-ত্রুটি না থাকিলেও নিজকে নির্দোষ বলিয়া মনে করিবে না এবং সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকিবে যেন এবং বিধ দোষ-ত্রুটি তোমাকে কখনও স্পর্শ করিতে না পারে। হযরত ঈসা (আ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- "আপনি এত উত্তম শিষ্টাচার কাহার নিকট হইতে শিখিলেন?" তিনি বলিলেন- "কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা করি নাই, তবে অপরের মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছি উহা তৎক্ষণাত সযত্নে বর্জন করিয়াছি।"

স্বীয় দোষ অনুসন্ধান আবশ্যক—যে ব্যক্তি অত্যন্ত নির্বোধ কেবল সেই নিজেকে দোষমুক্ত বলিয়া মনে করে। বুদ্ধিমানগণ নিজদিগকে এইরূপ দোষমুক্ত বলিয়া ধারণা করেন না। একদা হযরত ওমর (রা) হযরত হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন- "রাসূলে মাক্বূল (সা) আপনার নিকট মুনাফিকদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আপনি তাহাদের নিদর্শনাবলীর কোনটি আমার মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন কি?" এইরূপে প্রত্যেকেরই স্বীয় দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ আন্তরিক রোগের মহৌষধ ও শ্রেষ্ঠ জিহাদ—চিকিৎসায় সুফল লাভ করিতে হইলে প্রথমেই রোগ নির্ণয় করিয়া লওয়া দরকার। রোগ না চিনিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায় না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করাই সর্ববিধ হৃদরোগের মহৌষধ। এইজন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى۔

অর্থাৎ "এবং যে ব্যক্তি (স্বীয়) আত্মাকে কু-প্রবৃত্তি হইতে দমিত রাখিয়াছে অবশ্যই বেহেশত তাহার বাসস্থান" (সূরা নাযিআত, রুকু ২, পারা ৩০)।

একদা রাসূলে মাক্বূল (সা) জিহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করত সাহাবা (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "আমরা ক্ষুদ্র জিহাদে জয়ী হইয়া আসিলাম, না বৃহৎ জিহাদে?" সাহাবা (রা) নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), বৃহৎ জিহাদ কাহাকে বলে?" রাসূলে মাক্বূল (সা) বলিলেন- "প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করাকে বৃহৎ জিহাদ বলে।"

রাসূলে মাক্বূল (সা) বলেন- "পরিশ্রমে তোমরা দুঃখিত হইও না এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতায় তোমরা মনকে মোটেই অবকাশ দিও না। যদি দাও, তবে তাহাকে অন্যায় কাজে অবকাশ দিয়াছ বলিয়া সে কিয়ামতের দিন তোমার সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইবে এবং তোমাকে তিরস্কার করিতে থাকিবে। এমনকি এই কারণে তোমার এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাইয়া লা'নত করিয়া বলিবে- 'আমাকে অন্যায় কাজে অবকাশ দিয়াছিলে কেন?"

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন- "নিতান্ত অবাধ্য ও দুর্দমনীয় পশুকে যেমন সুদৃঢ় লাগাম দিয়া রাখিতে হয়, তদপেক্ষা মজবুত ও কঠিন লাগাম দ্বারা মানুষের মনকে সর্বদা আবদ্ধ রাখা কর্তব্য।"

হযরত সররি সকতী (র) বলেন, "আখরোট ফল মধুতে ডুবাইয়া ভক্ষণ করিবার জন্য আমার মন চল্লিশ বৎসর যাবত আকাঙ্ক্ষা করিতেছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি ভক্ষণ করি নাই।"

হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) বলেন- "লাগাম পর্বতে গমনের পথে বহু ডালিমবৃক্ষে অসংখ্য সুন্দর পাকা ডালিম ঝুলিতেছে দেখিতে পাইলাম। ইহা দেখিয়াই আমার ডালিম খাইবার ইচ্ছা হইলে একটি ডালিম পাড়িয়া দানা মুখে দিলাম। কিন্তু ইহা নিতান্ত টক ছিল বলিয়া খাইতে না পারায় ফেলিয়া দিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, এক ব্যক্তি রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছেন এবং অগণিত বোল্তা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দংশন করিতেছে। আমি তাঁহাকে 'আস্সালামু আলায়কুম' বলিয়া অভিবাদন করিলাম। তিনি 'ওয়া আলায়কাস্সালাম ইয়া ইবরাহীম' বলিয়া জওয়াব দিলেন। আমি ইহাতে বিস্মিত হইয়া বলিলাম- 'হে দরবেশ, কিরূপে আপনি আমাকে চিনিলেন?' তিনি বলিলেন- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে চিনে তাহার নিকট কিছুই গোপন থাকে না।' আমি বলিলাম- 'বুঝিলাম আল্লাহ্র সহিত আপনার প্রগাঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ আপনি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র। তবে কেন বোল্তার দংশন হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন না?' তিনি উত্তর দিলেন- 'আপনিও ত আল্লাহ্র একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র। আপনি কেন ডালিম ভক্ষণের অভিলাস হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলেন না? ডালিমের অভিলাষরূপ বোল্তার দংশনের ক্ষত ত পরলোকে প্রকাশিত হইবে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা দিবে; অপরদিকে, এই বোল্তার দংশনের ক্ষত এই জড় জগতেই শেষ হইয়া যাইবে।"

প্রবৃত্তি দমনের উপকারিতা—যদিও জঙ্গলের ডালিম বৈধ ও ইহা ভক্ষণে কোন অন্যায় নাই, তথাপি ধর্মপরায়ণ সতর্ক ব্যক্তিগণ হালাল ও হারাম, এই উভয়ের লোভকে সমান অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন। তুমি যদি লোভ দমন না কর ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব অপসারণ করিয়া সন্তুষ্ট না হইতে পার, তবে তোমার প্রবৃত্তি অত্যন্ত লোভী হইয়া যাইবে এবং অবশেষে তোমার নিকট হারাম বস্তু যাচ্ঞা করিতে থাকিবে। এইজন্য সতর্ক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ হালাল বস্তুর লোভও বর্জন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রবৃত্তি যাহাতে লোভী হইতে না পারে, এইজন্য অতি যত্নের সহিত লোভের পথই তাহারা রুদ্ধ করিয়া দেন। ইহাতে এই সুফল দর্শে যে, হারামের লোভ হইতে তাঁহারা পূর্ণভাবে অব্যাহতি লাভ করেন। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হযরত ওমর (রা) বলেন- 'হারামে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় আমি সত্তর বার হালাল দ্রব্য হইতেও হস্ত সংকুচিত করিয়া লই।"

আবার দেখ, হালাল দ্রব্য উপভোগ করিলেও মানব এক সুন্দর আস্বাদ লাভ করে। ফলে সংসারের প্রতি হৃদয়ের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে মন সংসারে আবদ্ধ

হইয়া যায়। তখন সংসার তাহার নিকট বেহেশতের মত সুন্দর বলিয়া মনে হয় এবং সে মৃত্যুকে অতি কঠোর বলিয়া ভয় করিতে থাকে; অতি সুখ ও আনন্দের লিপ্সায় যে উন্মত্ত হইয়া থাকে, তাহার মনে চিন্তাশূন্যতা দেখা দেয়; আল্লাহ্‌র যিকির ও মুনাজাত করিলেও সে উহার মাধুর্য এবং স্বাদ অনুভব করিতে পারে না। নিজকে হালাল দ্রব্য ভোগ করিতে না দিলে হৃদয় বিষণ্ণ হয় ও মন ভাঙ্গিয়া পড়ে, সংসারের প্রতি মন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয় এবং পরকালের পরম সৌভাগ্য ও চরম আনন্দ লাভের নিমিত্ত হৃদয় অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠে। এইরূপ ভগ্নহৃদয়ের এক তসবীহ্ মনের উপরে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, সুখের সময়ের শত শত তসবীহ্ এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না।

একমাত্র আল্লাহ্-প্রেমের পথ উন্মুক্ত রাখা কর্তব্য—শিকারী বাজপাখির সঙ্গে মানব-প্রবৃত্তিকে তুলনা করা যাইতে পারে। বাজকে সুশিক্ষিত এবং আজ্ঞাধীন করিতে সমর্থ হইলেও ইহার সম্বন্ধে শিকারী উদ্বেগশূন্য হয় না; বরং শিকার ধরিয়া সে ঘরে ফিরিলে বাজের চক্ষুদ্বয় সেলাই করিয়া রাখে যেন অন্যান্য পদার্থ ইহার দৃষ্টিপথে পতিত না হয়। ইহার চক্ষু বন্ধ করিয়া না রাখিলে সে চতুস্পার্শ্বের দ্রব্যাদির প্রতি প্রলুব্ধ হইয়া শিকার ধরিবার শিক্ষা-দীক্ষা ভুলিয়া যাইতে পারে। এইরূপে চক্ষু বন্ধ রাখিয়া শিকারী প্রাণ রক্ষার জন্য বাজপাখিকে কিছু গোশত দেয়। মালিকের নিকট হইতে আহার্য পাইয়া বাজ তাহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ও আজ্ঞাধীন হইয়া উঠে।

শিকারী বাজকে যেরূপ সতর্কতার সহিত রাখে, মানব-প্রবৃত্তিকেও সেইরূপ সতর্কতার সহিত রাখা কর্তব্য। প্রবৃত্তিকে ইহার সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য ও অভ্যাস হইতে বিরত রাখিয়া কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাকে আসক্ত ও অনুরক্ত রাখিতে হইবে। প্রবৃত্তির যাবতীয় অভ্যাস পরিত্যাগ না করিলে এবং চক্ষু, কর্ণ, রসনা বন্ধ করিয়া নির্জনতা অবলম্বনপূর্বক মনকে ক্ষুধা, নির্বাকতা ও অনিদ্রার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত না করিলে সে আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় ইহা খুব কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হইবে। প্রথম প্রথম দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে মাতৃদুগ্ধ ছাড়ানও দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে একবার দুধ ছাড়াইতে সমর্থ হইলে কিছু দিনের মধ্যে এমন হয় যে, বলপ্রয়োগে মাতৃস্তন দান করিলেও শিশু আর মাতৃদুগ্ধ পান করে না।

রিয়াযতের বর্ণনার সারাংশ—রিয়াযতের সারাংশ এই, যে দ্রব্য যাহার নিকট অধিক প্রিয়, তাহাকে সর্বপ্রথম সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং যে প্রবৃত্তি হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে, ইহারই বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে। মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি যাহার নিকট অধিক প্রিয়, অতি সত্বর উহা পরিত্যাগ করা তাহার কর্তব্য। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে যাহাদের মন আনন্দ পায়, অতি শীঘ্র তাহাদের ধন-সম্পদ বিতরণ ও ব্যয় করিয়া দেওয়া উচিত। সেইরূপ আল্লাহ্‌র প্রেম ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যে যে ব্যক্তি আনন্দ পায়, বলপ্রয়োগে ইহা তাহার নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিতে হইবে।

অপরপক্ষে, যাহা মানুষের চিরকালের সাথী তৎপ্রতিই তাহার আসক্ত হওয়া আবশ্যক। মৃত্যুকালে যাহা বাধ্য হইয়াই ছাড়িয়া যাইতে হইবে, মৃত্যুরপূর্বেই স্বেচ্ছায় তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। কেবল আল্লাহ্ই মানুষের চিরকালের সাথী। এইজন্যই তিনি হযরত দাউদ (আ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন- "হে দাউদ, আমিই তোমার একমাত্র সাথী; অতএব তুমিও আমার সাথী হইয়া থাক।" রাসূলে মাক্‌বূল (সা) বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ) ফুৎকারে আমার অন্তরে এই বাণী প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন ঃ اَحْبِبْ مَا اَحْبَبْتَ فَانَّكَ مُفَارِقُه অর্থাৎ "যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ভালবাস, কিন্তু নিশ্চয় জানিও তোমাকে ইহা একদিন ছাড়িতেই হইবে।"

সৎস্বভাবের নিদর্শন—আল্লাহ্ কুরআন শরীফে মুসলমানদের গুণরূপে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন উহাই সৎস্বভাবের নিদর্শন। তিনি বলেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ الاية অর্থাৎ "নিশ্চয় মু'মিনগণ মুক্তি পাইয়াছে (অভীষ্ট লাভ করিয়াছে) সেই (মু'মিনগণ) যাহারা আপন নামাযের মধ্যে মিনতিকারী এবং অনর্থক (কাজ ও কথা) হইতে মুখ ফিরায় এবং যাহারা যাকাত পরিশোধ করে এবং যাহারা আপন লজ্জাস্থানগুলির রক্ষাকারী, কিন্তু নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অথবা তাহাদের হাত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে (সেই) বান্দীদের প্রতি, নিশ্চয় তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করা হয় নাই। অনন্তর যাহারা উহা ব্যতীত চেষ্টা করে অপিচ তাহারাই সীমালংঘনকারী এবং সেই (মু'মিন সকল) যাহারা নিজেদের আমানত দ্রব্যসমূহ ও নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যাহারা আপন নামাযসমূহ রক্ষা করিয়া থাকে এই সকল লোকই উত্তরাধিকারী" সূরা মু'মিন রুকু ১, পারা ১)।

আল্লাহ্ সৎস্বভাবের নিদর্শন সম্বন্ধে আরও বলেন ঃ اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ অর্থাৎ "তওবাকারী ইবাদতকারী" (সূরা তওবা, রুকু ১৪, পারা ১১)।

তিনি আরও বলেন ঃ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الاَرْضِ هَوْنًا অর্থাৎ "এবং সেই সকল লোক আল্লাহ্‌র বান্দা যাহারা ভূতলে মৃদুভাবে পদবিক্ষেপ করিয়া নম্রতার সহিত চলে" (সূরা ফুরকান, রুকু ৬, পারা ১৮)।

উল্লিখিতগুলিই মুসলমানের প্রকৃত গুণ এবং সৎস্বভাবের নিদর্শন। আর আল্লাহ্ মুনাফিকদের নিদর্শনাবলী বর্ণনাকালে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, উহা মন্দ স্বভাবের লক্ষণ।

মুমিন ও মুনাফিকদের তুলনা—রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "মুমিনের জীবনের লক্ষ্য নামায, রোযা এবং ইবাদত আর মুনাফিকদের জীবনের লক্ষ্য পশুর মত পানাহার।"

হযরত হাতিম আসাম (রঃ) বলেন– "মুসলমান কখনও নিশ্চিন্ত থাকে না; বরং সর্বদা সৎচিন্তা ও উপদেশ আহরণে ব্যগ্র থাকে; অপরদিকে, মুনাফিক সর্বদা লোভ ও কামনা-বাসনায় মগ্ন থাকে। মুসলমান খোদা ভিন্ন আর কাহাকেও ভয় করে না;

মুনাফিক কিন্তু খোদা ভিন্ন সকলের ভয়ে অধীর ও ব্যস্ত থাকে। মুসলমান এক খোদা ব্যতীত আর কাহারও আশা করে না; কিন্তু মুনাফিক এক খোদা ভিন্ন আর সকলেরই আশা করিয়া থাকে; মুসলমান স্বীয় ধন ধর্মকার্যে ব্যয় করিয়া থাকে; মুনাফিক কিন্তু অমূল্য ধনরত্ন সামান্য পার্থিব ধনের লালসায় বিসর্জন দিয়া থাকে। মুসলমান সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকে, কিন্তু তবুও যথাযথ ইবাদত হইল না বলিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে রোদন করিতে থাকে; অপরপক্ষে, মুনাফিক সর্বক্ষণ পাপকার্যে রত থাকে, অথচ আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করে। মুসলমান নির্জনতা পছন্দ করে; অপরপক্ষে, মুনাফিক লোকসংসর্গ ও সংসারের কোলাহলপূর্ণ জীবন যাপন করিতে ভালবাসে। মুসলমান যথাসাধ্য পরিশ্রম সহকারে ভূমি চাষ ও বীজ বপন করিয়াও ফসল লাভের সৌভাগ্য নসিবে হয় কিনা– এই আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থাকে; অপরপক্ষে, মুনাফিক ভূমিও কর্ষণ করে না, বীজও বপন করে না, অপরের শ্রমে উৎপন্ন ফসলে নিজের গোলা ভর্তি করিবার কামনা করে।"

সৎস্বভাবসমূহ—কামিল ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত গুণরাজিকে সৎস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন– লজ্জাশীলতা, অল্প কথা বলা, দুঃখকে লঘু মনে করা, সত্য কথা বলা, সৌজন্য ও ঘনিষ্ঠতার সহিত সকলের সঙ্গে অবস্থান, কর্তব্যকার্যে যত্ন ও পরিশ্রম, অত্যধিক ইবাদত করা, অধিক ভুল-ত্রুটি না করা,অনাবশ্যক বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত না হওয়া, বিশ্বপ্রেমিক হওয়া, সকলের মঙ্গল কামনা করা, মাহাত্ম্য, করুণা, ধীরতা, ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, গম্ভীরতা, কোমল হৃদয়তা, অপরকে সহায়তা করিবার বাসনা, প্রলোভন হইতে বাঁচিবার শক্তি, অল্প আশা করা, অপরকে গালি না দেওয়া এবং অভিশাপও না করা, একের কথা অপরের নিকট না বলা, পরনিন্দা ও অশ্লীল কথা হইতে বিরত থাকা, হঠকারিতা না করা ও দুঃসাহস বর্জন করা, হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করা, প্রফুল্ল বদনে থাকা ও মিষ্ট কথা বলা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত অপরের সহিত মিত্রতা বা শত্রুতা করা, ক্রোধ ও সন্তোষ শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই হওয়া।

ধৈর্য সৎস্বভাবের নিদর্শন—ধৈর্য হইতে অধিকাংশ স্থলে সৎস্বভাবের পরিচয় মিলে। ধৈর্য সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা এস্থলে বর্ণনা করা যাইতেছে।

কাফিরগণ রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল এবং তাঁহাকে অসীম দুঃখ-কষ্ট দিয়াছিল, প্রস্তরাঘাতে তাহারা তাঁহার দাঁত পর্যন্ত ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি এই সমস্ত অবিচার, অত্যাচার নির্বিকারচিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের মঙ্গলের জন্য নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন– 'হে আল্লাহ্, তাহাদের প্রতি দয়া কর, কারণ তাহারা অজ্ঞান, কিছুই বুঝে না।"

একদা হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) এক নির্জন পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। এমন সময় এক সৈনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটিল। সৈনিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিল– "তুমি কি গোলাম?" তিনি বলিলেন– "হাঁ, আমি গোলাম।" সিপাহী আবার জিজ্ঞাসা করিল– "মানব বসতি কোন দিকে বলিতে পার?" হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) বলিলেন– "কবরস্থান।" সিপাহী বলিল– "আমি লোকালয় তালাশ করিতেছি।" তিনি বলিলেন– "কবরস্থানই লোকের স্থায়ী বাসস্থান।" ইহাতে সৈনিক রাগান্বিত হইয়া হযরত ইবরাহীম আদহামের মস্তকে এতজোরে বেত্রাঘাত করিল যে, মস্তক বিদীর্ণ হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া নগরের দিকে চলিল। লোকে ইহা দেখিয়া সিপাহীকে ভৎসনাপূর্বক বলিল– "বেটা নির্বোধ, কত বড় অন্যায় করিলে। ইনিই শ্রেষ্ঠ দরবেশ হযরত ইবরাহীম আদহাম (র)।" সৈনিক তৎক্ষণাত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক হযরতের পদচুম্বন করিল এবং নিবেদন করিল– "আপনি স্বীয় পরিচয় না দিয়া কেন বলিলেন যে, আপনি গোলাম?" হযরত বলিলেন– "আমি স্বাধীন নই, বাস্তবিকই আমি আল্লাহ্‌র গোলাম।" সিপাহী সবিনয়ে আরয করিল– "না বুঝিয়া অন্যায় করিয়াছি; আমাকে মাফ করুন।"

হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) সহাস্য বদনে বলিলেন– "তখনই তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। যে সময় তুমি আমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিলে তখনই তোমার মঙ্গল কামনা করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিয়াছি।" অভিশাপ না দিয়া দোআ করার কারণ লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন– "আমি অবগত ছিলাম যে, তোমার বেত্রাঘাতের দরুন আমি প্রচুর পুণ্য লাভ করিব। সুতরাং যাহার কারণে আমি পুণ্য লাভ করিব, সেই ব্যক্তি আমার কারণে পাপী হইবে, ইহা আমি সমীচীন মনে করি নাই।"

হযরত আবূ উছমান হাইরীকে (র) এক ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আহারে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করা অপেক্ষা তাঁহার স্বভাব পরীক্ষা করাই সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল। হযরত তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলে সে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না এবং বলিল– "সব শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন কিছুই খাইবার নাই, ফিরিয়া যাও।" ইহা শুনিয়া তিনি পূর্বের ন্যায় সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর চলিয়া গেলে সেই ব্যক্তি আবার তাঁহাকে আহ্বান করিল। তিনি কোন আপত্তি না করিয়া আবার তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে এবারও সে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না এবং পূর্বের ন্যায় বলিল যে, কিছুই খাইবার নাই। সেই ব্যক্তি কয়েকবারই এইরূপ করিল। তাঁহাকে আহবান করিলেই তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া অম্লান বদনে আগমন করিতেন এবং গৃহে প্রবেশ করিতে না দিয়া তাড়াইয়া দিলে নির্বিকারে চলিয়া যাইতেন। ইহাতে তিনি অসহিষ্ণু হইতেন না। ইহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি অবশেষে নিবেদন করিল– "হে মহাত্মন, আপনাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমি এরূপ কাজ করিয়াছি। আমাকে মাফ করুন। বুঝিলাম আপনার স্বভাব অতি উত্তম।" ইহা শুনিয়া হযরত হাইরী (র) সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– "এরূপ পরীক্ষা দ্বারা আমার মধ্যে কি গুণ দেখিতে পাইলে? এইভাবে আমাতে যে গুণ দেখিলে তাহাতো কুকুরের মধ্যেও আছে।

কুকুরকে আহ্বান করিলেই প্রসন্ন বদনে হাযির হইবে, আবার কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দাও, নির্বিকার চিত্তে চলিয়া যাইবে। ইহাতে কি মাহাত্ম্য আছে?"

একদা জনৈক ব্যক্তি ছাদের উপর হইতে এক বড় রেকাবিপূর্ণ ছাই হযরত আবূ উছমান হাইরীর (র) মাথার উপর নিক্ষেপ করিল। এই দুর্ব্যবহারে তিনি ধৈর্যচ্যুত না হইয়া অম্লান বদনে তাঁহার পরিধানের পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া লইলেন এবং আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল- "আপনার উপর ছাই নিক্ষেপ করাতে আপনি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন কেন?" তিনি বলিলেন- "যে ব্যক্তি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযোগী তাহার উপর মাত্র ছাই নিক্ষেপ করা হইয়াছে, এইজন্যই আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলাম।"

হযরত আলী ইব্‌ন মূসা রেযার (র) দেহ ধূসর বর্ণের ছিল। নেশাপুরে তাঁহার গৃহের তোরণ দ্বারে একটি স্নানাগার ছিল। তিনি স্নানাগারে গমন করিলে অন্য কেহই তথায় থাকিত না। একদা তিনি উক্ত স্নানাগারে গমন করিলেন, এবং ইহা তাঁহার জন্য খালি করিয়া দেওয়া হইল। তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে উক্ত স্নানাগারের চৌকিদার অন্যমনস্ক হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। এই সুযোগে এক গঁওয়ার ব্যক্তি স্নানাগারে প্রবেশ করিল। সে হযরত আলী ইব্‌ন মূসা রেযাকে (র) দেখিয়া তাঁহাকে স্নানাগারের একজন ভৃত্য বলিয়া মনে করিল এবং তাঁহাকে আদেশ করিল- "যাও, পানি লইয়া আস।" তিনি তৎক্ষণাত তাহাকে পানি আনিয়া দিলেন। সে গঁওয়ার আবার বলিল- "যাও মাটি লইয়া আইস।" তিনি তৎক্ষণাত তাহাকে মৃত্তিকাও আনিয়া দিলেন। এইরূপে সে গঁওয়ার হযরতকে আদেশের পর আদেশ দিতে লাগিল, আর তিনিও নির্বিকার চিত্তে সকল আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে চৌকিদার আসিয়া উপস্থিত হইল। উক্ত গঁওয়ার হযরতের প্রতি যে সকল আদেশ করিতেছিল সে উহা শুনিতে পাইল এবং তাঁহার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিতেছিল তাহাও দেখিল। চৌকিদারের অসাবধানতা ও অনুপস্থিতির দরুনই যে এই অঘটন ঘটিল, ইহা সে ভালরূপেই বুঝিতে পারিল। অতএব সে স্নানাগার হইতে পলায়ন করিল। হযরত স্নানাগার হইতে বহির্গত হইলে তাঁহাকে জানাইল যে, চৌকিদার স্বীয় অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তির ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। হযরত বলিলেন- "তাহাকে পালাইয়া যাইতে নিষেধ কর এবং বল যে, তাহার কোন দোষ নাই, বরং দোষ ঐ ব্যক্তির হইতে পারে যে কৃষ্ণবর্ণ কদাকার বান্দীর গর্ভে স্বীয় সন্তানের জন্ম দিয়াছে।"

হযরত আবদুল্লাহ (র) একজন কামিল দরবেশ ছিলেন। তিনি দর্জির কাজ করিতেন। এক অগ্নি উপাসক সর্বদা তাঁহার নিকট হইতে জামা-কাপড় ইত্যাদি সেলাই করাইয়া নিত। কিন্তু সেলাইয়ের পারিশ্রমিকরূপে সে সর্বদা তাঁহাকে জাল টাকা দিত এবং তিনি দেখিয়া শুনিয়াই বিনা আপত্তিতে এই জাল টাকা গ্রহণ করিতেন। একদা তিনি দোকানে ছিলেন না। অগ্নি উপাসক এমন সময় সেলাইয়ের পারিশ্রমিক দিতে আগমন করিল। কিন্তু হযরতের শিষ্য জাল টাকা দেখিয়া গ্রহণ

করিল না। দোকানে আসিয়া ইহা জানিতে পারিলে তিনি শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "তুমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলে না কেন? বহু বৎসর যাবত এই অগ্নি উপাসক আমাকে জাল টাকা দিয়া আসিতেছে এবং আমি কখনও ইহা তাহার নিকট প্রকাশ করি নাই। বরং এই জাল টাকা দিয়া সে অপর মুসলমানকে ঠকাইবে ভাবিয়া সর্বদা উহা গ্রহণ করিয়াছি।"

হযরত উয়াইস করনী রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন কোন স্থানে গমন করিতেন তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া বালকেরা তৎপ্রতি পাথর নিক্ষেপ করিত। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন- "হে প্রিয় বালকগণ, ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করিও। বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করিয়া আমার পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হইতে পারিব না।"

হযরত আহ্‌নাফ ইব্‌ন কাইস (র) একদা রাস্তা দিয়া গমনকালে এক ব্যক্তি তাঁহাকে গালি দিতে দিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের আপন লোকদের গৃহের নিকটবর্তী হইয়া দন্ডায়মান হইলেন এবং সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- "হে বন্ধু, গালিগালাজ আরও অবশিষ্ট থাকিলে উহাও এখনই আমাকে দিয়া দাও, অন্যথায় আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি শুনে যে, তুমি আমাকে গালিগালাজ করিতেছ, তবে তাহারা তোমাকে যাতনা দিবে।"

একদা একজন স্ত্রীলোক হযরত মালিক ইব্‌ন দীনারকে (র) রিয়াকার (অর্থাৎ সুখ্যাতিপ্রিয় ও লোক দেখানো সৎকর্মশীল) বলিয়া আহ্বান করিল। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন- "হে পুণ্যশীলা রমণী, বস্‌রাবাসিগণ আমার প্রকৃত নাম ভুলিয়া গিয়াছিল। তুমি উত্তম করিয়াছ যে ইহা স্মরণ করাইয়া দিলে।"

পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাবের নিদর্শন—বুযুর্গগণ স্বভাবের যে সোপানে উপনীত হইয়াছেন উহাই পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাব। তাঁহারা অতি যত্নের সহিত কুস্বভাব হইতে নিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিয়া থাকেন। তখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাদের নয়নগোচর হয় না এবং তাঁহারা অন্যকিছু দর্শন করিলে কেবল তাহা দ্বারাই দর্শন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই অবস্থাপ্রাপ্ত হয় নাই, সে যেন সৎস্বভাব অর্জন করিয়াছে বলিয়া অহঙ্কারে প্রবৃত্ত না হয়।

শিশুদের প্রতিপালন ও শিক্ষা—শিশু-সন্তানগণ মাতা-পিতার নিকট আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানতস্বরূপ। তাহাদের হৃদয় পাক-পবিত্র বহুমূল্য রত্নের ন্যায়। তাহাদের পবিত্র অন্তরে এখনও দুনিয়ার আবিলতা ও পাপের ছাপ পড়ে নাই; উহা মোমের ন্যায় কোমল। যে চিত্রই অঙ্কন করিতে চাও উহাতে অতি সহজে অঙ্কন করিতে পারিবে; উহা কর্ষণোপযোগী উর্বরা পবিত্র ভূমি সদৃশ, যে বীজই উহাতে বপন কর না কেন, উত্তমরূপে অঙ্কুরিত হইবে। শিশুদের অন্তরে যদি সৎকর্ম ও সৎস্বভাবের বীজ বপন কর, তবে তাহারা উত্তরকালে ইহকাল পরকালের পরম সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইবে

এবং ইহার সুফল মাতা-পিতা ও শিক্ষকগণও ভোগ করিবে। আর যদি তাহাদের অন্তরে কুকর্ম ও কুস্বভাবের বীজ বপন কর, তবে তাহারা হতভাগ্য, দুশ্চরিত্র, দুরাচার ও পাপিষ্ঠ হইয়া উঠিবে এবং ইহার কুফলও মাতাপিতা এবং শিক্ষকগণকে ভোগ করিতে হইবে। এই জন্যই আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ "তোমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের অগ্নি হইতে বাঁচাও।"

দুনিয়ার অগ্নির তুলনায় দোযখের অগ্নি কত ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক! দুনিয়ার অগ্নি, কষ্ট ও মসীবতে যাহাতে অবুঝ শিশুগণ নিপতিত না হয় তজ্জন্য মাতা-পিতা কত সযত্ন ও সতর্ক থাকে! কাজেই অনুধাবন কর, পরকালের চিরস্থায়ী অগ্নি, কষ্ট ও মসীবত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সযত্ন ও সতর্ক হওয়া কতটুকু আবশ্যক। এইজন্যই তাহাদিগকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন।

শিশু সন্তানগণ যাহাতে উত্তরকালে আল্লাহ্র ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে উত্তম শিক্ষা ও সৎস্বভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। অসৎ সংসর্গ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে, কেননা অসৎ সংসর্গ হইতেই সমস্ত পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহারা যেন উত্তম খাদ্য ও সুন্দর বসন-ভূষণের প্রতি আসক্ত না হয়। অন্যথা উহা ব্যতীত তাহারা চলিতে পারিবে না এবং উহা অর্জনেই তাহাদের সমস্ত জীবন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। প্রথম হইতেই তাহাদের সুশিক্ষা ও সৎস্বভাবের জন্য যত্নবান হইবে।

শিশুর জন্য সতী-সাধ্বী ধাত্রী নিয়োগ—শিশুকে স্তন্যদান করিবার জন্য সতী-সাধ্বী, সৎস্বভাবী ও হালাল ভক্ষণকারী ধাত্রী নিযুক্ত করিবে: কারণ তাহার স্বভাব মন্দ হইলে এই মন্দ স্বভাব অলক্ষ্যে শিশু মনে প্রতিফলিত হইয়া যাইবে; ধাত্রী হারাম ভক্ষণ করিলে তাহার দুধও অপবিত্র হইবে। এই দুধ পান করিয়া শিশু লালিত পালিত ও বর্ধিত হইলে ইহার প্রভাব তাহার স্বভাবে থাকিয়া যাইবে এবং ইহার কুফল পরবর্তীকালে প্রকাশিত হইবে।

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা—শিশু যখন প্রথম কথা বলিতে আরম্ভ করে, তখন সর্বপ্রথম যেন আল্লাহ্র নাম তাহার রসনা দ্বারা উচ্চারিত হয়। এইজন্য পূর্ব হইতেই তাহাকে আল্লাহ্র নাম শিখাইতে থাকিবে। কোন অসমীচীন বিষয়ে শিশু লজ্জাবোধ করিলে ইহাকে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিবে এবং শিশুর মধ্যে যে বুদ্ধিদীপ্তির প্রাধান্য রহিয়াছে ইহার প্রমাণস্বরূপ ধরিয়া লইবে। মন্দ কথায় ও কর্মে যদি শিশু অনুতপ্ত হয়, তবে মনে করিবে যে, তাহার বুদ্ধিমত্তা লজ্জাকে প্রহরীস্বরূপ তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

আহারের আদব—শিশুর মধ্যে প্রথমত ভক্ষণ প্রবৃত্তি দেখা দেয়। অতএব আহারে রীতিনীতি, আদব-কায়দা তাহাকে শিক্ষা দিবে। ডান হাত দ্বারা 'বিস্মিল্লাহ্' বলিয়া খাওয়া আরম্ভ করিতে হইবে। খুব ভালরূপে চিবাইয়া আস্তে আস্তে খাইতে

হইবে। অন্যের মুখের গ্রাসের দিকে দৃকপাত করা উচিত নয়। নিজের সম্মুখ হইতে লুকমা গ্রহণ করিবে এবং এক লুকমা খাওয়ার পূর্বে অন্য লুকমার দিকে হাত বাড়াইবে না। হাত ও কাপড়ে খাদ্য ভরিয়া লইবে না। কখন কখন শিশুকে তরকারী ব্যতীত রুটি খাইতে দিবে, যেন সে সর্বদা সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণে অভ্যস্ত না হইয়া যায়। অতিরিক্ত ভোজন যে মন্দ, ইহা তাহার নিকট প্রতিপন্ন করিয়া তুলিবে এবং বলিবে যে অতিরিক্ত ভোজন পশু ও নির্বোধদের কার্য। যাহারা অতিরিক্ত ভোজন করে তাহদের কুৎসা শিশুর নিকট বর্ণনা করিবে; সৎস্বভাবী লোকের প্রশংসা তাহার সম্মুখে বর্ণনা করিবে, তাহা হইলে সেও প্রশংসার লালসায় সৎস্বভাবী হইয়া উঠিবে।

শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ—সাদা পোশাক পরিধান করা যে অধিক পছন্দনীয় ইহা শিশুর নিকট প্রতিপন্ন করিয়া তুলিবে এবং রেশমী ও রঙ্গিন কাপড় পরিধান করা যে মন্দ, ইহা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিবে। শিশুকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে- "হে বৎস, রেশমী ও বিচিত্র রঙ্গের পোশাকে সজ্জিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিও না, ইহা কুলটা রমণী ও নীচ শ্রেণীর লোকদের কাজ। কাপুরুষ ও রমণীগণই স্বীয় অঙ্গভূষণে লিপ্ত হয়; মানবের এই সমস্ত বাহ্য পোশাক-পরিচ্ছদের আবশ্যকতা নাই।"

শৈশবে সৎসংসর্গ—যে সকল বালক সুস্বাদু খাদ্য ও উত্তম বসন ভূষণে অভ্যস্ত তাহাদের সংসর্গে শিশুদিগকে বিদ্যালয়েও পাঠাইবে না। এইরূপ বালকদের নিকট হইতে শিশুদিগকে এত দূরে রাখিবে যেন তাহারা শিশুদের দৃষ্টিপথেও পতিত না হয়। তাহা না হইলে তাহাদের কুস্বভাব ও কুকর্মে শিশুগণ গা ভাসাইয়া দিয়া নিজেদের জীবন বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। সন্তানগণ যাহাতে কুসংসর্গে পতিত না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। কুসংসর্গ হইতে তাহাদিগকে সযত্নে রক্ষা না করিলে তাহারা লম্পট, লজ্জাহীন, চোর, মিথ্যাবাদী, অসভ্য ও পাপিষ্ঠ হইয়া উঠিবে বরং পরে বহু চেষ্টা করিলেও তাহাদের এই কুস্বভাব দূর করা দুঃসাধ্য হইয়া যাইবে।

শিশুদের প্রাথমিক পাঠ্য বিষয়—শিশুদিগকে বিদ্যালয়ে প্রথমে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিবে, সৎ ও পরহেজগার লোকদের কাহিনী এবং সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের নসীহত, রীতিনীতি, চালচলন সম্বলিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে দিবে। উপন্যাস, নাটক, নভেল, নায়ক-নায়িকাদের প্রেমের কাহিনী, রমণীদের সৌন্দর্য-বর্ণনা ও প্রশংসাপূর্ণ পুস্তক ইত্যাদি কখনও তাহাদিগকে পাঠ করিতে দিবে না।

শিশুদের শিক্ষক নির্বাচন—শিশুদের শিক্ষক নির্বাচনেও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কেহ এইরূপ ধারণাও পোষণ করে যে, উপন্যাস, নাটক, নভেল, প্রেমের কাহিনী ইত্যাদি অধ্যয়নে মানুষের চতুরতা ও প্রতিভা বৃদ্ধি পায়। এই প্রকার লোক মনুষ্যরূপ শয়তান। সন্তানদের শিক্ষার ভার কখনও এমন লোকের উপর অর্পণ করিবে না। এইরূপ শিক্ষক শিষ্যদের অন্তরে কুস্বভাব ও কুকর্মের বীজ বপন করিয়া থাকে।

শিশুদের অন্যায় সংশোধন—শিশু-সন্তানগণ সৎকর্ম করিলে এবং সৎস্বভাবী হইলে এইজন্য তাহাদিগকে প্রশংসা করিবে; তাহাদের প্রিয় বস্তু তাহাদিগকে

পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিবে এবং লোকসম্মুখেও তাহাদের সুখ্যাতি প্রকাশ করিবে। কোন সময় হঠাৎ তাহারা কোন অন্যায় করিয়া ফেলিলে দুই একবার উপেক্ষা করিয়া যাইবে। কেননা, প্রত্যেক ছোটখাট দোষ-ত্রুটিতে তাহাদের প্রতি রাগান্বিত হইলে এবং তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে এইরূপ ক্রোধ ও ভৎসনায় অবশেষে কোন সুফল দর্শিবে না। মনে কর, তোমার শিশু সন্তান গোপনে কোন অন্যায় কাজ করিল; তুমি যদি তজ্জন্য তাহাকে বারংবার তিরস্কার করিতে থাক, তবে এই অন্যায় কার্যে তাহার সাহসিকতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন সে প্রকাশ্যভাবে অন্যায় কাজ করিতে থাকিবে। আর সন্তান যদি বারংবার অন্যায় করিতে থাকে, তবে গোপনে একবার তাহাকে খুব তিরস্কার করিবে এবং বলিবে– "খবরদার, পুনরায় কখনও এরূপ অন্যায় কাজ করিবে না। লোকে যেন তোমার এই অন্যায় জানিতে না পারে, তাহা না হইলে তোমার দুর্নাম রটিবে এবং কেহই তোমাকে সম্মান করিবে না।"

শিশুদের শয্যা—নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া পিতা স্বীয় সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে এবং সন্তানের মনে যেন পিতার ভয় জাগরিত থাকে, মাতা এইরূপ শিক্ষা দিবে। দিনের বেলা তাহাদিগকে শয্যা গ্রহণ করিতে দিবে না। তাহা না হইলে তাহারা অলস হইয়া যাইবে। রজনীতে তাহাদিগকে কোমল বিছানায় শুইতে দিবে না। শক্ত বিছানায় শুইলে তাহাদের শরীরও সুদৃঢ় ও শক্ত হইয়া কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী হইবে।

শিশুদের খেলাধুলা—সন্তানগণ যাহাতে সক্রিয় ও উদ্যমশীল হইতে পারে তজ্জন্য সমস্ত দিনের মধ্যে তাহাদিগকে এক ঘন্টাকাল খেলাধুলার অনুমতি দিবে। তাহাদের হৃদয় যেন সঙ্কীর্ণ ও বিমর্ষ না হইয়া যায় তৎপ্রতিও বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। সঙ্কীর্ণতা ও বিমর্ষতা হইতে ক্রমান্বয়ে শিশু-প্রকৃতি অসৎস্বভাব ধারণ করিতে পারে এবং অবশেষে ইহার ফলে তাহার মন অন্ধ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।

শৈশবে দান ও নম্রতা শিক্ষার ব্যবস্থা—শৈশবকালেই সন্তানদিগকে বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা দিবে। তাহারা যেন শৈশবকাল হইতে সকলের সহিত সবিনয় ও নম্র ব্যবহার করে এবং সমবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিকট সংকোচহীনতা ও ধৃষ্টতা না দেখায়। অপর বালক-বালিকাদের নিকট হইতে যেন তাহারা কিছুই গ্রহণ না করে, বরং তোমার সন্তানের দ্বারা অন্যান্য বালক-বালিকাকে কিছু আহার্য সামগ্রী দানের ব্যবস্থা করিবে।

অন্যের গলগ্রহ হইতে নিবৃত্তি—সন্তানদিগকে খুব ভালরূপে বুঝাইয়া দিবে যে, কেবল ফকীর ও নির্জীব লোকেরাই অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকে। তাহাদিগকে এইরূপ সুযোগই দিবে না যাহাতে তাহারা অন্যের নিকট টাকা-পয়সা বা অন্য কোন বস্তু চাহিবার ইচ্ছা করিতে পারে। শিশুদিগকে এইরূপ প্রশ্রয় দিলে উত্তরকালে তাহারা প্রলোভনে পড়িয়া অন্যায় কাজে লিপ্ত হইবে এবং এইরূপে তাহাদের জীবন বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

শিশুদের আদব ও সবর—শিশুদিগকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিবে যে, লোকের সম্মুখে যেন তাহারা থুথু না ফেলে এবং নাক পরিষ্কার না করে; লোক সমাবেশে উপবেশন করিতে হইলে যেন আদবের সহিত উপবেশন করে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে যেন পিছনে রাখিয়া উপবেশন না করে। তাহাদিগকে চিবুক হস্তের উপর রাখিয়া উপবেশনক করিতে দিবে না। এইরূপে বসা দুর্বলতার লক্ষণ। অতিরিক্ত কথা বলিতে তাহাদিগকে নিষেধ করিবে। তাহারা যেন কখনও শপথ না করে এবং জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে নিজ হইতে যেন কোন কিছু না বলে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে সম্মান করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিবে এবং তাহাদের আগে আগে চলিতে নিষেধ করিবে। তাহারা যেন কাহাকে কখনও গালিগালাজ এবং অভিশাপ না করে। বালকদিগকে বুঝাইয়া বলিবে, "হে বৎসগণ, দোষ-ত্রুটির জন্য যদি উস্তাদ শাস্তি দেন তবে চীৎকার করিয়া রোদন করিও না এবং শাস্তি হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত কাহারও সুপারিশ উপস্থিত করিও না বরং উস্তাদের প্রহারে ধৈর্যাবলম্বন করিবে; কেননা ধৈর্যধারণ করা পুরুষের লক্ষণ, আর রোদন ও চীৎকার করা বান্দী-দাসী ও স্ত্রীলোকদের কাজ।"

বাল্য ও যৌবনে পাঠ্য বিষয়—সন্তান সাত বৎসরে উপনীত হইলে তাহাকে স্নেহের সহিত ওযু-গোসল প্রভৃতি শারীরিক পবিত্রতা বিধানের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিবে এবং নামায পড়িতে আদেশ করিবে। দশ বৎসর বয়সে নামাযে ত্রুটি করিলে তাহাকে মারিয়া-পিটিয়া নামায পড়িতে বাধ্য করিবে। চুরি, অবৈধ দ্রব্য ভক্ষণ ও মিথ্যা বলা যে মন্দ ও কুৎসিত, উহা তাহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবে।

এই পদ্ধতিতে সন্তানদিগকে লালন পালন করিয়া তাহারা যৌবনে উপনীত হইলে এই সকল কর্ম, আদব-কায়দা ও রীতি-নীতির প্রকৃত তাৎপর্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে। তাহা হইলে এই সমস্ত বিষয়ের সুফল তাহাদের অন্তরে প্রতিফলিত হইবে। তাহাদিগকে আহারের তাৎপর্য বুঝাইতে যাইয়া বলিবে– "আল্লাহ্ ইবাদতের জন্য মানব সৃজন করিয়াছেন, ইবাদতে শারীরিক শক্তি অর্জনের জন্যই কেবল আহারের প্রয়োজন। দুনিয়াতে সে মোসাফিরের ন্যায় আসিয়াছে, পরকালই তাহার প্রকৃত বাসস্থান। অতএব, পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করাই তাহার পার্থিব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মৃত্যু অতি সত্বর, অকস্মাৎ ও অদৃশ্যভাবে আসিয়া মানুষকে এই জড়-জগত হইতে লইয়া যাইবে, দুনিয়া এইভাবেই পড়িয়া থাকিবে, সঙ্গে যাইবে না। অতএব যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী ও পরম রমণীয় বেহেশতে প্রবেশ ও আল্লাহ্র প্রসন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পার্থিব জীবন খাটাইয়া পরকালের সম্বল সংগ্রহ করে সে-ই বুদ্ধিমান।"

এইরূপে তাহাদের নিকট দোযখের ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং ভীষণ শাস্তির কথাও বর্ণনা করিবে। সৎকর্মের পুরস্কার ও কুকর্মের শাস্তি তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবে। এই নিয়ম-পদ্ধতিতে সন্তানদিগকে লালন পালন করিলে ও শিক্ষা দিলে সৎস্বভাবসমূহ তাহাদের অন্তরে প্রস্তরের উপর অঙ্কিত রেখার ন্যায় সুদৃঢ় ও মজবুত হইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রথম হইতেই এই নিয়ম-পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়া দুনিয়ার

আবিলতা ও কুসংসর্গে তাহাদিগকে অসহায় ছাড়িয়া দিলে এবং অধিক বয়স্ক হইলে উপদেশ দিতে শুরু করিলে, ইহাতে কোনই উপকার দর্শিবে না, বরং এই উপদেশ বাণী তখন প্রাচীর-পৃষ্ঠের ধুলিকণার ন্যায় তৎক্ষণাৎ ঝরিয়া পড়িবে।

হযরত সহল তস্তরীর (র) শৈশবকালীন শিক্ষা—হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন– "আমার তিন বৎসর বয়সের সময় আমার মামা মুহাম্মদ ইব্‌ন সাওয়ারকে নামায পড়িতে দেখিয়া তাঁহার দিকে আমি চাহিয়া থাকিতাম। একদা তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– 'হে বৎস, যে করুণাময় আল্লাহ্ তোমাকে পয়দা করিয়াছেন তাঁহার যিকির কর না কেন?' আমি বলিলাম– 'হে মাতুল, কেমন করিয়া তাঁহার যিকির করিতে হয় আমি ত জানি না।' তিনি বলিলেন– 'রজনীতে শয়ন করিবারকালে রসনাযোগে নয় বরং মনে মনে তিনবার বলিবে, আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন।'

"আমি কতক রজনীতে শয়নকালে ঐ বাক্যগুলি মনে মনে বলিয়া শয্যা গ্রহণ করিতাম। তৎপর তিনি বলিলেন– 'বৎস, ঐ কথাগুলি প্রত্যহ রজনীতে সাতবার বলিয়া শয্যা গ্রহণ করিবে'। আমিও তদ্রূপ করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে এগারবার বলিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিলেন। আমিও তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিলাম। কতক দিনের মধ্যেই ঐ কথাগুলির এক অপূর্ব মাধুর্য আমার মনে অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে একটি বৎসর অতিবাহিত হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন– 'হে বৎস, তোমাকে আমি যাহা শিক্ষা দিয়াছি, আজীবন তাহা করিতে থাক; পরমবন্ধুরূপে ইহা তোমার ইহকাল পরকালে সহায়ক হইবে।' মামার আদেশানুসারে উক্ত বাক্যগুলি কয়েক বৎসর আমি অভ্যাস করিয়া চলিলাম এবং উহার মাধুর্য ও সুখাস্বাদ আমার অন্তরে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে মামা একদিন আমাকে বলিলেন– 'হে বৎস, যে ব্যক্তির সহিত আল্লাহ্ থাকেন, যাহার দিকে আল্লাহ্ চাহিয়া আছেন এবং আল্লাহ্ যাহাকে দেখিতেছেন, সে কখনও আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন পাপকর্ম করিতে পারে না। সতর্ক হও বৎস, তুমি কখনও কোন গোনাহ করিও না, আল্লাহ্ অহরহ তোমাকে দেখিতেছেন।'

"তৎপর আমাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠান হইল। প্রথম প্রথম আমার মন ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, তাই একদিন আমি মামাকে বলিলাম– 'বহুক্ষণ উস্তাদের নিকট বিদ্যাভ্যাসে লিপ্ত থাকা আমার জন্য কষ্টকর হইতেছে। আমাকে প্রত্যহ এক ঘন্টার জন্য উস্তাদের নিকট প্রেরণ করুন। অবশেষে তাহাই করা হইল। এইরূপে সাত বৎসর বয়সের সময় আমি কুরআন শরীফ পড়িয়া লইলাম। দশ বৎসর বয়সের সময় আমার সর্বদা উপর্যুপরি রোযা রাখার অভ্যাস হইয়া গেল। সন্ধ্যাকালে যবের রুটি দ্বারা ইফতার করিতাম। এইরূপে আমার বার বৎসর বয়স কাটিয়া গেল। তের বৎসর বয়সের সময় ধর্ম বিষয়ে এক জটিল প্রশ্ন আমার হৃদয়ে উদিত হইল। স্বদেশের জ্ঞানীগণ এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম হইলে ইহার মীমাংসার জন্য আমি বস্‌রা নগরে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। অনুমতি লইয়া আমি বস্‌রায় গমন করিলাম। তথাকার বহু আলিমের নিকট আমার প্রশ্নের

মীমাংসা চাহিলাম; কিন্তু তাঁহাদের মীমাংসায় আমার সন্দেহ দূর হইল না। অবশেষে এক শ্রেষ্ঠ আবিদের সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি অনায়াসে আমার সন্দেহ খন্ডন করিলেন। বহুদিন আমি তাঁহার সাহচর্যে ছিলাম এবং তৎপর স্বীয় মাতৃভূমি 'তস্তরে' প্রত্যাবর্তন করিলাম।

"স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আমার কর্মধারা এইরূপ ছিল– আমি একবারে এক দেরেম মূল্যের যব কিনিয়া তদ্দ্বারা রুটি তৈয়ার করিয়া লইতাম। দিবসে বরাবর নিরবচ্ছিন্নভাবে রোযা রাখিতাম এবং সন্ধ্যাকালে ইফতার করিয়া এই শুষ্ক রুটি আহার করিতাম। রুটির সহিত কোন ব্যঞ্জন খাইতাম না। এইরূপে এক দেরেম মূল্যের যবে আমার এক বৎসরের খোরাক চলিত। তারপর দিবারাত্র কিছুই না খাইয়া রোযা রাখিবার অভ্যাস করিতে লাগিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমি ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলাম। তৎপর পাঁচ দিবা-রাত্রি কিছুই না খাইয়া রোযা রাখিবার অভ্যাস করিয়া লইলাম। অবশেষে দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ দিন হইতে সাত দিন এবং সাত দিন হইতে পঁচিশ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইলাম; অর্থাৎ পরিশেষে পঁচিশ দিবা-রাত্র নিরন্তর উপবাসে রোযা রাখিয়া পঁচিশ দিবসের শেষ সন্ধ্যাবেলায় শুধু শুষ্ক রুটি দ্বারা ইফতার করিয়া লইতাম। দিবসে এইরূপে রোযা রাখিতাম এবং তৎসঙ্গে সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহ্র ইবাদত ও যিকির-শোগলে লিপ্ত থাকিতাম। এইভাবে বিশ বৎসর সবর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম।"

মহৎ ও শ্রেষ্ঠ কাজের বীজ শৈশবকালেই শিশুর অন্তরে বপন করা উচিত, ইহা বুঝাইবার জন্যই এই কাহিনী বর্ণিত হইল।

মুরীদের প্রাথমিক শর্তসমূহ ও রিয়াযত

ধর্মপথে না চলার কারণ– যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবারে উপনীত হয় নাই, তাহার কারণ কি এবং ইহার বাধা কোথায় জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কেহ গন্তব্যস্থানে না পৌঁছিলে বুঝিতে হইবে যে, সে আদৌ পথ চলে নাই, পথ না চলার কারণ তালাশ করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহার হৃদয়ে পথ চলার প্রেরণাই ছিল না; প্রেরণা না থাকা ও চলিবার চেষ্টা না করার কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিবে, লক্ষ্যবস্তু বা গন্তব্যস্থান কত লোভনীয় ও উৎকৃষ্ট, ইহা সে অবগত নহে এবং ইহার উপর তাহার পূর্ণ ঈমান নাই। যে ব্যক্তি ভালরূপে অবগত হইয়াছে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়াছে যে, দুনিয়া অপবিত্র, নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু এবং পরকাল পরম রমণীয়, উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী, তাহার হৃদয়ে পরকাল লাভের প্রেরণা, আসক্তি ও পরকালের সম্বল সংগ্রহের যত্ন ও চেষ্টা স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃহত্তর ও উৎকৃষ্ট পদার্থ লাভের লালসায় নিকৃষ্ট ও হীন পদার্থ পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। কেহ যদি জানে যে, অদ্য মৃৎপাত্র পরিত্যাগ করিলে কল্য সে বহুমূল্য স্বর্ণপাত্র লাভ করিবে, তবে তাহার পক্ষে

মৃৎপাত্র পরিত্যাগ করাও দুষ্কর নহে। কিন্তু এইরূপ স্বার্থত্যাগ একমাত্র দৃঢ় বিশ্বাসের ফলেই হইয়া থাকে।

আজকাল পরকালের প্রতি মানবের বিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল। কারণ, পরকালের খাঁটি পথ-প্রদর্শক নিতান্ত দুর্লভ। পরহেজগার আলিমগণই প্রকৃত পথ প্রদর্শক ও ধর্মপথের উজ্জ্বল ভাস্কর। কিন্তু এইরূপ আলিম আজকাল দুনিয়া হইতে লোপ পাইয়াছে। প্রদর্শক শুণ্য পথটি মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পরিচালক না থাকিলে পরিচালিত হইবে কিরূপে? এই জন্যই মানবসমাজ আজ সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত। বর্তমান কালে আলিমই খুব বিরল। তদুপরি তাহাদের হৃদয়ে সংসারাসক্তি অত্যন্ত প্রবল। পথ প্রদর্শকই পথভ্রান্ত হইয়া দুনিয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, এমতাবস্তায় কিরূপে তাহারা দুনিয়া হইতে মানবজাতিকে পরকালের দিকে পরিচালিত করিবে? এতদ্ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের পথ পরস্পর ভিন্নমুখী। পূর্বদিকের ঠিক বিপরীত দিকে যেমন পশ্চিমদিক, দুনিয়া ও আখিরাতের পথও ঠিক তদ্রূপ। সুতরাং মানব একটির নিকটবর্তী হইলে অপরটি হইতে দূরে সরিয়া যায়।

যাঁহারা আল্লাহ্র অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই তিনি বলেন ঃ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا অর্থাৎ "এবং যে ব্যক্তি পরকালের কামনা করে এবং তাহার জন্য চেষ্টা করে যেরূপ চেষ্টা করা উচিত।" এই আয়াতে আল্লাহ্ পরকালের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করিবার আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং সেই চেষ্টা কিরূপ এবং কিরূপেই বা সেই চেষ্টা করিতে হইবে, ইহা প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক।

ধর্মপথ-যাত্রীর প্রাথমিক রিয়াযত– উল্লিখিত আয়াতে سَعٰى অর্থাৎ চেষ্টার মর্ম হইল পথ চলা। পথ চলার প্রথম সোপানেই কতিপয় শর্ত রহিয়াছে। পথ চলিতে হইলে অবশ্যই এই শর্তসমূহ পালন করিতে হইবে। পরিশেষে একটি দুর্গ রহিয়াছে, ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ধর্মপথ যাত্রীর প্রথম সোপান

প্রতিবন্ধক দূরীকরণ– উল্লিখিত শর্তসমূহের প্রথম শর্ত এই, তোমার ও আল্লাহ্র মধ্যে যতগুলি পর্দা বা প্রতিবন্ধক আছে উহা ছিন্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে তুমি এই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

"এবং আমি তাহাদের সম্মুখে এক প্রাচীর এবং পশ্চাতে এক প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি" (সূরা য়াসীন, রুকূ ১, পারা ২২)। রিয়াযত পথের পর্দা বা প্রতিবন্ধকসমূহ চারিভাগে বিভক্ত– (১) ধন, (২) সম্মান, (৩) অন্ধ অনুকরণ ও (৪) পাপ।

ধন—ইহা এক ভীষণ অন্তরায়। ধনাসক্তি মানব মনে এত কঠিন বন্ধন সৃষ্টি করে যে, ইহা ছিন্ন করা দুষ্কর এবং ইহা হইতে নিস্তার না পাইলে আধ্যাত্মিক পথেও চলো যায় না। মানুষকে তাহার শরীর খাটাইয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হয়। অতএব তাহার শরীর সুস্থ ও সবল রাখা দরকার এবং এইজন্য তাহার আহারের আবশ্যক। আবার আহার সংগ্রহের জন্য ধনের প্রয়োজন। এইরূপে অত্যাবশ্যক পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্যও ধনের আবশ্যকতা রহিয়াছে। অপরদিকে, ধনাসক্তি ছিন্ন না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। এমতাবস্থায়, জীবন ধারণ উপযোগী নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রাহ করা যাইতে পারে, এই পরিমাণ ধনে সন্তুষ্ট থাকিয়া অবশিষ্ট ধন নিজ হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ আবশ্যক পরিমাণ ধনে হৃদয় লিপ্ত ও আসক্ত হয় না। অপরদিকে, যে ব্যক্তি কপর্দকহীনভাবে একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিয়া সাধনায় লিপ্ত থাকে, তাহার পক্ষে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা নিতান্ত সহজসাধ্য হয়।

সম্মান—সম্মান কামনা একটি ভীষণ বাধা এবং যত্নের সহিত ইহাও ছিন্ন করিতে হইবে। ইহার উপায় এই– যে স্থানে লোকে তোমাকে সম্মান করে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে গমন করিবে যেখানে কেহই তোমাকে জানে না, কারণ যশ ও সুখ্যাতি হইয়া গেলে লোক সংসর্গে থাকিবার ও তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টায়ই তুমি লিপ্ত হইয়া পড়িবে। যে ব্যক্তি লোক সংসর্গে আনন্দ পায়, সে কখনও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় না।

অন্ধ অনুকরণ—কোন ব্যক্তি কাহারও মতের প্রতি আস্থাবান হইলে অপর বিরুদ্ধ মতের উপর দোষারোপ করত সে স্বীয় গৃহীত মত রক্ষার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। এমতাবস্থায়, অন্য কোন মতকে তাহার অন্তরে স্থান দিবার অবকাশ থাকে না। এইজন্যই অন্ধ অনুকরণ ধর্ম পথযাত্রীর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ভিন্নমতের প্রতি এইরূপ একগুঁয়ে মনোভাব সযত্নে পরিহার করিতে হইবে।

অবশেষে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই) কলেমার প্রকৃত মর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং ইহার মর্ম হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। উক্ত কলেমার সারমর্ম এই- আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই উপাসনার উপযোগী নাই, এমন কোন ব্যক্তি, শক্তি বা বস্তু নাই যাহার আদেশ পালন করিয়া জীবন যাপন করা যাইতে পারে। লোভ যাহার হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে লোভই তাহার উপাস্য হইয়া পড়িয়াছে। তদ্রূপ অন্য কোন ভাব বা বস্তু যেন হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহাকে ব্যাকুল করিয়া না তোলে। এইরূপ ভাব ও বস্তু হইতে হৃদয়ের অব্যাহতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যক। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সকল পদার্থের প্রভাব হইতে হৃদয়কে মুক্ত করিতে হইলে কঠোর সাধনা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

হৃদয়ের উপর আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কঠোর সাধনা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত ধর্মমত-পার্থক্যের বাদানুবাদ এই ক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগে না।

পাপ—ধর্মপথ-যাত্রীর কঠিনতম প্রতিবন্ধক পাপ। কারণ, পাপ করিলে তৎক্ষণাৎ ইহার ছাপ হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় এবং হৃদয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে। বার বার পাপানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে হৃদয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র অনুকম্পার ছায়া এইরূপ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হৃদয়ে কিরূপে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে? অবৈধ উপায়ে অর্জিত জীবিকা গ্রহণে হৃদয় গভীর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। হালাল জীবিকা হৃদয়কে এত উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করে যে, আর কিছুতেই তদ্রূপ হয় না। কিন্তু হারাম উপায়ে অর্জিত জীবিকা এই আলোকরশ্মি বিনষ্ট করিয়া দেয়। অতএব হারাম দ্রব্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে এবং হালাল দ্রব্য ব্যতীত কখনও গ্রহণ করিবে না। যে ব্যক্তি শরীয়তের প্রকাশ্য আদেশ অনুসারে চলে না এবং যাবতীয় কাজ-কারবার, লেনদেন তদনুযায়ী পরিচালনা করে না, ধর্ম ও শরীয়তের মর্ম তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হউক এইরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। সে ঐ ব্যক্তি সদৃশ যে আরবী বর্ণ পরিচয়ের পূর্বে কুরআন শরীফ ও ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অধ্যয়নের আশা করে।

যথারীতি ওযু-গোসল করিয়া পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিলে যেমন মানুষ নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার উপযোগী হয় তদ্রূপ ধর্মপথযাত্রী উল্লিখিত চতুর্বিদ অন্তরায় ছিন্ন করিলে সে আধ্যাত্মিক পথে চলিবার উপযোগী হয়।

ধর্মপথ-যাত্রীর দ্বিতীয় সোপান

পীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস- পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধর্মপথে চলিবার সময় মানুষকে কতকগুলি বিপদসঙ্কুল ভয়ের স্থান পার হইতে হয়। অপরিচিত ও অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে একাকী পথ চলাতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। এইজন্য কামিল পীর বা পথপ্রদর্শকের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কামিল পীর হইলে তাহার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া মুরীদের উচিত। নিজের বাসনা-কামনা ও মতামত বিসর্জন দিয়া পীরের আনুগত্য ও নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁহার আদেশ পালন করা মুরীদের কর্তব্য। কামিল পীরের সাহায্য ব্যতীত এই পথে চলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ, ইহা প্রকাশ্য স্থূল রাজপথ নহে, বরং এই পথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। আল্লাহ্ পর্যন্ত একটিমাত্র সরল পথ রহিয়াছে। কিন্তু শয়তান এই পথে অসংখ্য বেড়াজালের সৃষ্টি করিয়াছে, সহস্র-সহস্র ভ্রান্ত পথের আবিষ্কার করিয়া যাত্রীদিগকে বিভ্রান্ত ও গুমরাহ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, সুনিপুণ ও অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শক ব্যতীত এইরূপ বিপদসঙ্কুল রাস্তায় কিরূপে চলা সম্ভবপর হইতে পারে?

উপযুক্ত পীরের হাতে নিজের যাবতীয় বিষয় সমর্পণ করিয়া দিবে। এমন কি, তোমার সামান্য কাজও নিজের দায়িত্বে রাখিবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, তোমার সুচিন্তিত ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা পীরের ভ্রম অধিক মঙ্গলজনক। অভিজ্ঞ পীরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস ও তাঁহার আনুগত্য স্বীকারকেই ইতঃপূর্বে সনদ বলা হইয়াছে। পীরের কোন কার্য বা বাক্যের মর্ম বুঝিতে অক্ষম হইলে হযরত খিযির (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা স্মরণ করিবে। পীর ও মুরীদগণের উদ্দেশ্যেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

কামিল পীরগণ এমন অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন যাহা মুরীদগণ বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। বিশ্ববিখ্যাত হাকীম জালীনূসের যমানায় এক ব্যক্তির ডান হাতের আঙ্গুলে বেদনা হইয়াছিল। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বেদনার স্থানে ঔষধ মালিশ করিতেছিল, কিন্তু ইহাতে বেদনা উপশম হইতেছিল না। জালীনূস পীড়িত ব্যক্তির পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে ঔষধ দিতে লাগিলেন। ইহাতে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিতে লাগিল "কি নির্বোধের কাজ! অঙ্গুলিতে বেদনা, আর পৃষ্ঠে ঔষধ? ইহাতে কি লাভ হইবে?" কিন্তু জালীনূসের চিকিৎসায় রোগীর অঙ্গুলির বেদনা উপশম হইল। তিনি আরও অবগত ছিলেন যে, স্নায়ু সকল মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে স্নায়ু বাম দিক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দেহের ডান দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; যে স্নায়ু ডান দিক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দেহের বাম দিকে চলিয়া গিয়াছে। মুরীদগণ যাহা বুঝিতে অক্ষম তেমন বিষয়ে তাহারা যেন মাথা না ঘামায়, এই উদ্দেশ্যেই উপমাটি বর্ণিত হইল।

হযরত খাজা বূ-আলী (র) একদিন তদীয় পীর হযরত শায়খ আবুল কাসিম গার্গানীর (র) নিকট স্বীয় স্বপ্ন-বিবরণ প্রদান করিতেছিলেন। তখন হযরত শায়খ (র) রাগান্বিত হইয়া পূর্ণ এক মাস তাঁহার সহিত কোন কথাবার্তা বলেন নাই; তাঁহার ক্রোধের কারণও তিনি অবগত ছিলেন না। তৎপর হযরত শায়খ (র) একদিন হযরত খাজা বূ-আলী (র)-কে স্বপ্ন বিবরণ প্রদানকালে তুমি বলিয়াছিলে, আমি যেন তোমাকে কোন কার্যের আদেশ দিতেছি, আর স্বপ্নেই তুমি ইহার উত্তরে বলিলে, 'কেন করিব?' হযরত শায়খ (র) আবার বলিলেন- "লক্ষ্য কর, আমার আদেশের প্রতি তোমার সন্দেহের অবকাশ না থাকিলে স্বপ্নেও তুমি 'কেন করিব' এই বাক্য বলিতে না।"

ধর্মপথ-যাত্রীর তৃতীয় সোপান

নির্জনে অনাহারে অনিদ্রায় কালাতিপাত—কামিল পীরের হস্তে মুরীদ তাহার সমস্ত কাজ সমর্পণ করিলে তিনি তাহাকে একটি দুর্গের সন্ধান দান করেন, যাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সকল বিপদাপদ হইতে মুক্ত হইয়া সে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর

হইতে পারে। চারিটি প্রাচীর এই দুর্গ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরগুলি এই-প্রথম নির্জনতা, দ্বিতীয় নীরবতা, তৃতীয় ক্ষুধা ও চতুর্থ অনিদ্রা। ক্ষুধা দ্বারা শয়তানের পথসমূহ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। অনিদ্রা দ্বারা হৃদয় আলোকিত হয়। নীরবতা অতিরিক্ত বাক্যালাপের কলুষতা হইতে হৃদয়কে রক্ষা করে এবং নির্জনবাস লোকসমাজে অবস্থানজনিত মলিনতা হইতে মনকে বিশুদ্ধ রাখে; চক্ষু ও কর্নের পথসমূহও নির্জনবাসে রুদ্ধ হইয় থাকে।

হযরত সহল তস্তুরী (র) বলেন- "যে সকল দরবেশ আব্‌দালশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নির্জনবাসে নীরবতা অবলম্বন করত ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অনিদ্রায় কালাতিপাত করিয়াছেন বলিয়াই এত উন্নত শ্রেণীতে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন।"

ধর্মপথ-যাত্রীর দ্বিতীয় রিয়াযত

কুপ্রবৃত্তি দমন—উল্লিখিত পার্থিব সম্বন্ধ হইতে পূর্ণ মুক্তি লাভ করিলে মুরীদ পথ চলিবার উপযুক্ত হয়। পথ চলিতে থাকিলে কতকগুলি ধ্বংসকারী কণ্টকাকীর্ণ বন-জঙ্গল তাহার নয়নগোচর হইবে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইতে হইলে তাহাকে সর্বপ্রথম এই সমস্ত বন-জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। মানুষের কুপ্রবৃত্তিসমূহই এই ধ্বংসকারী কণ্টকাকীর্ণ বন-জঙ্গল। কুপ্রবৃত্তির সহিত জড়িত সকল বিষয় তাহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সম্মান-লিপ্সা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, ধনাসক্তি, উৎকৃষ্ট পানাহারের ইচ্ছা, উত্তম বসন-ভূষণের লালসা, অহমিকা, রিয়া প্রভৃতি মনোভাবে কুপ্রবৃত্তির মূল প্রোথিত রহিয়াছে। অতএব যে কার্যের সহিত কুপ্রবৃত্তির কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে হৃদয় ছিন্ন করিয়া লইবে। তাহা হইলেই চলার পথের সমস্ত ধ্বংসকারী কণ্টাকাকীর্ণ বন-জঙ্গল বিদূরিত হইবে এবং যাবতীয় আবিলতা ও মলিনতা হইতে হৃদয় পাক-পবিত্র হইয়া উঠিবে।

প্রতিটি মানুষের অন্তরেই সকল কুভাব প্রবল হইয়া রহে নাই। যে ব্যক্তি যে কুভাব পোষণ করে তাহার হৃদয়ে সেই কুভাব প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপে কাহারও হয়ত একটি, কাহারও দুইটি বা ততোধিক কুভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মনে কর, কাহারও অন্তরে মাত্র একটি কুভাব প্রবল হইয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, ইহা হইতেও তাহার হৃদয় পবিত্র করিতে হইবে। ইহা বলিলে চলিবে না যে, সমস্ত কুভাব দমন হইয়া মাত্রা একটা থাকিলে কি অনিষ্ট করিবে? তবে ইহা দমন করিতে নিজের মনগড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না; বরং অভিজ্ঞ পীর যে ব্যবস্থা প্রদান করেন তদনুযায়ী কার্য করিবে। কারণ, স্মরণ রাখিও, অভিজ্ঞ পীরগণ অবস্থা বিশেষে এই ব্যবস্থারও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়া থাকেন।

ধর্মপথ-যাত্রীর তৃতীয় বা শেষ রিয়াযত

আন্তরিক যিকির—কুভাবসমূহ দমন হইয়া গেলে উর্বর ও কর্ষিত ক্ষেত্রের মত মানব হৃদয় বীজ বপনের উপযোগী হইয়া উঠে এবং তখনই বীজ বপন শুরু করিবে। আল্লাহ্‌র যিকির এই বীজ। আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কল্পনা হইতে অন্তর মুক্ত করিয়া নির্জনে বসিয়া মনে ও মুখে 'আল্লাহ্, আল্লাহ্' বলিতে থাকিবে। এইরূপ যিকির সর্বদা করিতে থাকিলে এমন এক সময় আসিবে যখন মুখের শব্দ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তখন কেবল হৃদয়ের মধ্যে ঐ যিকির সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইতে থাকিবে। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যে, হৃদয়ও তখন 'আল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণে অনুভূতিশূন্য হইয়া পড়িবে এবং ইহার মর্ম ও উদ্দেশ্যমাত্র তখন অন্তরে প্রবল হইয়া থাকিবে। মর্মটি কোন অক্ষর দ্বারা আবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত নয়; ইহাতে কোন অক্ষর নাই; ইহা না আরবী, না ফারসী।

'আল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণ না করিয়া হৃদয় দ্বারা অসাড়ে যিকির করাও এক প্রকার বাক্য। শব্দটি গূঢ় মর্মের আচ্ছাদনমাত্র। ইহা বীজ নহে, বরং মর্মই বীজ। সুতরাং এই মর্ম অন্তরে এইরূপ স্থায়ী, সুদৃঢ় ও প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে যেন বিনা চেষ্টায় অন্তর ইহার সংস্রব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। বরং এই সংস্রব এত দৃঢ় করিয়া লওয়া উচিত যে, উহা ছিন্ন করিতে গেলে যেন অন্তরে ভীষণ আঘাত লাগে তবুও ইহা ছিন্ন হয় না। হযরত শিবলী (র) স্বীয় মুরীদকে আদেশ করিয়াছিলেন- "এক শুক্রবার হইতে অপর শুক্রবার পর্যন্ত তোমার হৃদয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের চিন্তা আসিলে, আমার নিকট তোমার আগমন হারাম।" পার্থিব সকল সংস্রব, চিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির কণ্টক হইতে অন্তর নির্মুক্ত করত তথায় আল্লাহ্‌র যিকিররূপ বীজ বপন করিতে পারিলে মুরীদের শ্রমসাধ্য তখন আর কিছুই থাকে না।

রিয়াযতের পরবর্তী অবস্থার প্রতীক্ষা—আল্লাহ্‌র যিকিররূপ বীজ অন্তরে বপন করা পর্যন্ত ক্রিয়া-কলাপের সহিত তাহার চেষ্টার সংস্রব ছিল তৎপর ধর্মপথযাত্রী শুধু 'কি ঘটিবে' 'কি ফল প্রকাশিত হইবে' এই অধীর প্রতীক্ষায় কালযাপন করিবে। কঠোর সাধনায় যে বীজ সে বপন করিয়াছে প্রবল আশা যে, ইহা বিনষ্ট হবে না। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْلَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আখিরাতের চাষ চাহে আমি তাহার জন্য তাহার চাষের মধ্যে বৃদ্ধি দেই।" এই সোপান সমাগত হইলে বিভিন্ন মুরীদ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন মুরীদের অন্তরে 'আল্লাহ্' শব্দের নানাবিধ মর্ম উদিত হইতে থাকে; আবার কখন কখন নানারূপ ভ্রান্ত ধারণাও জাগিয়া উঠে। শেষোক্ত অবস্থা হইতে কেহ

কেহ মুক্তি পাইলেও ফেরেশতাগণের আকৃতি ও আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের আত্মাসমূহ নানা প্রকার রমণীয় আকৃতিতে তাহারা দেখিতে পায়। কখন কখন এই দৃশ্যসমূহ স্বপ্নেও দেখা যায়; আবার কোন কোন সময় জাগ্রত অবস্থায়ও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তৎপর মুরীদগণ আরও নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে উহার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভবপর নহে। আর বর্ণনা করিলেও কোন লাভ নাই। রাস্তার দৃশ্যের বর্ণনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যও নহে, বরং কিরূপে পথ চলিতে হয়, ইহা দেখাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ। আর পথ চলিবার সময় নিজেই-ত সব কিছু দেখিতে পাইবে।

বিভিন্ন ব্যক্তির সম্মুখে বিভিন্ন পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পথের যাত্রীদের পক্ষে কি কি পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় উহার পূর্বাভাষ না দেওয়াই ভাল। পূর্বেই শ্রবণ করিলে উহাদের দর্শনেচ্ছা হৃদয়ে উদিত হইয়া ইহাই তাহার চলার পথের অন্তরায় হইয়া উঠে। অতএব এই সোপানে উপনীত হইয়া কি ঘটে ও কি প্রকাশিত হয়, এই প্রতীক্ষায় থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ইহাই যাহিরী ইলমের শেষ সীমা। ইহার পর কি হইবে, কি ঘটিবে বাহ্যজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না। কিন্তু ভালরূপে জানিয়া রাখ, এই সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকিলেও অবশ্য সত্য বলিয়া ইহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। ইহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কোন কোন লোক উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানের বহির্ভূত কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভোজন-লিপ্সা ও কামরিপু

দেহে উদর একটি জলাধারতুল্য এবং ইহা হইতে যে সমস্ত শিরা-উপশিরা নিঃসৃত হইয়া সর্বদেহে বিস্তৃত হইয়াছে উহারা ঐ জলাধার হইতে নির্গত পয়ঃপ্রণালীস্বরূপ। উদর হইতেই মানবের সকল বাসনা-কামনা জন্মিয়া থাকে। জন্ম হইতেই ভোজন-স্পৃহা মানব হৃদয়ে দেখা দেয়। এইজন্যই ইহা তাহার হৃদয়ে এত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে যে, কোন মতেই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা যাইতে পারে না। এই কারণেই মানবের আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বেহেশ্‌ত হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ভোজন-স্পৃহা সকল প্রবৃত্তির মূল। ভোজনে উদর তৃপ্ত হইলেই কামভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে। ধন ব্যতীত মানবের ভোজন-স্পৃহা ও কামরিপু চরিতার্থ করা যায় না। অতএব ভোজন-লালসা ও কামভাবের সাথে সাথেই মানব হৃদয়ে ধনাসক্তি জাগরিত হয়। ধন সংগ্রহ করিতে সুখ্যাতি ও প্রভুত্বের প্রয়োজন হয়। এই কারণে মানব হৃদয়ে সুখ্যাতি-প্রিয়তা ও প্রভুত্ব-লালসা জন্মিয়া থাকে। সুখ্যাতি ও প্রভুত্ব রক্ষা করিতে গিয়া লোকের সঙ্গে কলহ-বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়। আর সংঘর্ষ হইতেই মানব হৃদয়ে সাধারণত ঈর্ষা, অহঙ্কার, পক্ষপাতিত্ব, শত্রুতা, রিয়া, মনোমালিন্য প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অনুধাবন কর, ভোজন-প্রবৃত্তিকে ইহার স্বাভাবিক গতিতে বর্ধিত হইতে দিলে এই মূল শিকড় হইতেই সকল কুপ্রবৃত্তি মাথা তুলিয়া উঠে। অপরপক্ষে, ভোজন-প্রবৃত্তিকে দমন ও আজ্ঞাবহ রাখিতে পারিলে এবং সর্বদা ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি অর্জন করিতে পারিলে, ইহাই আবার সকল কল্যাণের মূল উৎসস্বরূপ হইয়া থাকে।

এই অধ্যায়ে ক্ষুধার ফযীলত ও উপকারিতা এবং অল্পাহারের অভ্যাস গঠনের নিমিত্ত কি নিয়ম-পদ্ধতিতে চেষ্টা করিতে হইবে, তদ্বিষয় বর্ণিত হইবে। পরিশেষে কামরিপু হইতে কি কি অপবাদ দেখা দেয় এবং ইহা দমনে কি কি কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে ইহাও প্রদর্শিত হইবে।

হাদীসে ক্ষুধার ফযীলত—রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "তোমরা স্বীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা যুদ্ধ কর। ইহাতে তোমরা কাফিরদের সঙ্গে জিহাদের সওয়াব সদৃশ সওয়াব লাভ করিবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট কোন দ্রব্যই ক্ষুৎপিপাসা অপেক্ষা অধিক প্রিয় নহে।" তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করে, তাহার জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বার উন্মোক্ত হইবে না।" কতিপয় লোক রাসূলে মাক্‌বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল- "ইয়া

রাসূলাল্লাহ্, কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ?" তিনি বলিলেন- "যে ব্যক্তি অল্প ভোজন করে, অল্প হাসে এবং ছতর ঢাকিবার মত বস্ত্রে পরিতৃপ্ত হয়।" তিনি বলেন- "ক্ষুধা সমস্ত কাজের সরদার।" তিনি অন্যত্র বলেন- "পুরাতন কাপড় পরিধান কর এবং অর্ধ পেট পুরিয়া পানাহার কর; উহা নবীগণের আচরণের এক অংশ।" তিনি বলেন- 'ধ্যান করা অর্ধেক ইবাদত এবং অল্পাহার পূর্ণ ইবাদত।" তিনি বলেন- "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট উত্তম, যে অধিক পরিমাণে ধ্যান করে এবং অল্প পরিমাণে ভোজন করে; আর তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র বড় শত্রু যে অধিক পরিমাণে পানাহার করে এবং অধিক নিদ্রা যায়।"

তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি অল্প ভোজন করে, ফেরেশতাগণের নিকট আল্লাহ্ তাহার প্রশংসা করিয়া বলেন- 'হে ফেরেশতাগণ, দেখ, আমি তো ঐ ব্যক্তিকে ভোজন-স্পৃহায় জড়িত রাখিয়াছি; কিন্তু সে আমার সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছে। হে ফেরেশ্তাগণ, সাক্ষী থাক, এই ব্যক্তি যত গ্রাস কম আহার করিবে, আমি তাহাকে বেহেশ্তে তত সোপান সমুন্নত করিয়া দিব।" তিনি বলেন- "অধিক পানাহার দ্বারা অন্তর নির্জীব করিও না। অন্তর শস্যক্ষেত্রস্বরূপ, অতিবৃষ্টি হইলে ইহার শস্য নষ্ট হইয়া যায়।" তিনি বলেন- "মানবের পক্ষে পূর্ণ করিবার যতগুলি পাত্র আছে তন্মধ্যে উদর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। মানুষের মেরুদণ্ড বলবান ও সবল রাখিবার নিমিত্ত (যাহাতে সে দাঁড়াইতে পারে) যে কয়েক গ্রাস খাদ্যের আবশ্যক, এই পরিমাণ ভোজন যথেষ্ট। ইহার অতিরিক্ত ভোজন করিতে হইলে উদরের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা, এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং অবশিষ্ট অংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখিবে।" হাদীসের অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, "এক-তৃতীয়াংশ যিকিরের জন্য শূন্য রাখিবে।"

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন- "তোমরা নিজদিগকে বসনশূন্য ও ক্ষুধার্ত রাখ, তাহা হইলে তোমাদের হৃদয় আল্লাহ্র দর্শন লাভ করিবে।" রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "রক্ত প্রবাহের মত শয়তান মানব শরীরের শিরায়-শিরায় চলাচল করে। ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা তোমরা শয়তানের পথ সংকুচিত কর।" তিনি বলেন- "মুমিন এক আঁতড়ি পূর্ণ করিয়া আহার করে, আর মুনাফিক সাত আঁতড়ি পূর্ণ করিয়া আহার করে।" অর্থাৎ মুসলমানের আহারের তুলনায় মুনাফিকের আহার সাতগুণ বেশী। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন- "রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলিলেন- 'বেহেশ্তের দ্বারে সর্বদা ধাক্কা দিতে থাক, তাহা হইলে উহা উন্মুক্ত হইবে।' আমি আরয করিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কিরূপে বেহেশ্তের দ্বারে ধাক্কা দিতে থাকিব?' তিনি বলিলেন- 'ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা।"

একদা রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে হযরত হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আন্হুর উদ্গার উঠিল। হযরত (সা) তাঁহাকে বলিলেন- "এই উদ্গার দূর

কর। কারণ, যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিবে, পরকালে সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকিবে।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন- "রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনও তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন নাই। কখন কখন তাঁহার অত্যধিক ক্ষুধাদৃষ্টে তাঁহার উপর আমার দয়ার উদ্রেক হইত এবং আমি তাঁহার পবিত্র উদরে হাত বুলাইতাম এবং আরয করিতাম- 'আমার দেহ মন আপনর জন্য উৎসর্গ হউক, যে পরিমাণ খাইলে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, সেই পরিমাণ ভোজনে কি আপত্তি আছে?' তিনি বলিতেন, হে আয়েশা, আমার অগ্রবর্তী শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ভ্রাতৃগণ আল্লাহ্র নিকট হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন; আমি যদি খুব তৃপ্তিপূর্বক আহার করি, তবে আমার মর্তবা তাঁহাদের মর্তবা অপেক্ষা কম হইয়া যায় কিনা, আমার এই আশঙ্কা হয়। তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া পরকালের গৌরব খর্ব করা অপেক্ষা সামান্য কয়দিন (ক্ষুধার যন্ত্রণা) সহ্য করা আমার নিকট অধিক প্রিয় এবং আমি আমার ভ্রাতৃগণের নিকট পৌঁছিব, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার নিকট আর কিছুই নাই।"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "আল্লাহ্র শপথ, এই উক্তির পর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক সপ্তাহের অধিক কাল বাঁচিয়া ছিলেন না।" একদা হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এক খন্ড রুটি লইয়া রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন- 'ইহা কি?' তিনি বলিলেন- 'আমি একখানা রুটি প্রস্তুত করিয়াছি। আপনাকে না দিয়া ইহা খাইয়া ফেলিতে আমার ইচ্ছা হইল না।' হযরত (সা) বলিলেন, 'তিনদিন (অনাহারের) পর ইহাই প্রথম তোমার পিতার মুখে প্রবেশ করিবে।"

মহামনীষীদের উক্তিতে ক্ষুধার ফযীলত—হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহে একাদিক্রমে তিনদিন গমের রুটি কেহই আহার করেন নাই।" হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন, "সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া প্রভাত কাল পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা রজনীতে এক গ্রাস কম ভোজন করাকে আমি অধিক পছন্দ করি।" হযরত ফুযায়ল (র) নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ক্ষুধিত থাকিতে তুমি কেন ভয় কর? হায়! হায়! আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার প্রিয়জনকে যে ক্ষুধা প্রদান করিয়াছেন, তুমি ইহাতে পরিতাপ করিতেছ?" হযরত কাহ্মাশ (র) নিবেদন করিতেন- " হে খোদা, আমাকে তুমি অন্নবস্ত্রহীন রাখিয়া থাক, আবার রজনীতে আমাকে তোমার সহবাসে নির্জনে স্থান দান কর। তুমি ত তোমার প্রিয়জনের সহিতই এইরূপ আচরণ করিয়া থাক; কিরূপে আমি এইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিলাম?" হযরত মালিক ইব্‌ন দীনার (র) বলেন, "যে ব্যক্তি অভাব মোচন উপযোগী খাদ্য পাইয়া পরমুখাপেক্ষী হয় না, সেই পরম সুখী।" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে ওয়াসি (র) বলেন, "না, না, বরং ঐ ব্যক্তিই সুখী, যিনি সকাল-সন্ধ্যায় সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন।"

হযরত সহল তস্তুরী (র) বলেন- "বুযুর্গগণের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ক্ষুধা অপেক্ষা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলজনক পদার্থ আর কিছুই নাই এবং পরিতৃপ্ত আহার অপেক্ষা পারলৌকিক হানিকর বস্তু আর নাই। হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যায়িদ (র) বলেন- "একমাত্র ক্ষুধার যাতনা সহ্য করার জন্যই আল্লাহ্ মানুষকে ভালবাসিয়া থাকেন; এতদ্ব্যতীত আর কোন কারণই নাই যদ্দরুন তিনি মানুষকে ভালবাসিতে পারেন। একমাত্র ক্ষুধার কল্যাণেই মানুষ পানির উপর দিয়া চলিতে পারে এবং একমাত্র ক্ষুধার দরুনই মানুষ ভূমি আঁকড়াইয়া ধরে।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে চল্লিশ দিন হযরত মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্র সহিত কথা বলিয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি কিছুই ভোজন করেন নাই।

ক্ষুধার উপকারিতা ও পরিতৃপ্ত ভোজনের অপকারিতা

ক্ষুধার ফযীলতের কারণ—ঔষধ কটু বলিয়া ইহার কোন ফযীলত নাই; বরং পীড়া দূর করিয়া স্বাস্থ্য দান করিতে পারে বলিয়াই ইহার এত ফযীলত। তদ্রূপ ক্ষুধা কষ্টদায়ক বলিয়াই ইহার কোন ফযীলত নাই। বরং ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগে যে মঙ্গল ও উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে তদ্দরুনই ইহার এত ফযীলত। ক্ষুধা হইতে নিম্নবর্ণিত দশ প্রকার উপকার পাওয়া যায়।

প্রথম উপকারিতা—ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগে আত্মা স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও দীপ্তিমান হয়। উদর পূর্ণ থাকিলে আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও স্মরণশক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলে এক প্রকার উত্তাপ মস্তকে প্রবেশ করিয়া মানুষকে বুদ্ধিহীন করিয়া তোলে, এমনকি তাহার কল্পনা ও উদ্ভাবন-শক্তি বিক্ষিপ্ত ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। এইজন্যই রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "অল্প ভোজনে স্বীয় হৃদয়কে জীবন্ত কর এবং ক্ষুধা দ্বারা ইহাকে পবিত্র কর। তাহা হইলে হৃদয় নির্মল, সুস্থ ও কার্যদক্ষ হইবে।" অন্যত্র তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখে তাহার অন্তর নিতান্ত দীপ্তিশালী হয় এবং তাহার বুদ্ধির বিচক্ষণতা বৃদ্ধি পায়।" হযরত শিব্লী (র) বলেন, "আমার এমন কোনদিন অতিবাহিত হয় নাই যেদিন আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্ত হইয়া বসিয়াছিলাম, অথচ হিক্মত ও উপদেশ গ্রহণশক্তি আমার অন্তরে সজীব হইয়া উঠে নাই।"

রাসূলে মাক্বূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "উদার পূর্ণ করিয়া ভোজন করিও না, তাহা হইলে তোমার অন্তরে আল্লাহ্- পরিচয়ের আলো নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।" মা'রিফাত (আল্লাহ্- পরিচয়) বেহেশ্তের পথ এবং ক্ষুধা মা'রিফাতের দরগাহ্। এই কারণেই অনাহারে থাকাকে বেহেশ্তের দ্বারে ধাক্কা দেওয়া বলে, যেমন রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "তোমরা ক্ষুধা দ্বারা সর্বদা বেহেশ্তের দ্বারে ধাক্কা দিতে থাক।"

দ্বিতীয় উপকারিতা—ক্ষুধায় মন কোমল হয় এবং যিকির ও মোনাজাতের আস্বাদ লাভ করে। পরিতৃপ্ত ভোজনে মন কঠিন হইয়া পড়ে এমনকি যিকিরের মাধুর্য মানব অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, রসনার অগ্রভাগ হইতেই ইহা নিঃশেষ হইয়া যায়। হযরত জুনায়দ বাগ্দাদী (র) বলেন, " যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাহার মধ্যস্থলে ভোজনের থলিয়া রাখিয়া মোনাজাতের মাধুর্য লাভ করিতে চাহে, কখনও তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।"

তৃতীয় উপকারিতা—ক্ষুধার ফলে অহঙ্কার ও গাফ্লত (কর্তব্য কার্যে অমনোযোগিতা) অপসারিত হয়। অহঙ্কার ও গাফ্লত দোযখের দ্বার; পক্ষান্তরে, ভগ্নহৃদয়তা, সহায়সম্বলহীনতা ও দারিদ্র্য বেহেশ্তের দ্বার। পরিতৃপ্ত ভোজনে অহঙ্কার ও গাফ্লত জন্মে এবং ক্ষুধা মানবকে অসহায়, দীন ও ভগ্নহৃদয় করিয়া দেয়। মানব যতক্ষণ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও উপায়হীন বলিয়া মনে করিতে না পারে এবং এক গ্রাস অন্ন সংগ্রহে অক্ষম হইয়া সমস্ত জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন না দেখে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। বিশ্বের সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের কুঞ্জিসমূহ রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করত বলিলেন- উহার স্পৃহা আমার নাই, বরং একদিন অনাহারে থাকা ও পরদিন ক্ষুধা নির্বাপিত করাকে আমি অধিক ভালবাসি। যেদিন অনাহারে থাকিব সেই দিন ধৈর্য ধারণ করিব, আর যেদিন ক্ষুধা নির্বাপিত করিব সেইদিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।"

চতুর্থ উপকারিতা—সর্বদা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে লোকে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কষ্ট বুঝিতে পারে না, অতঃপর তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশের সুবিধাও সেই পাইতে পারে না এবং পরকালের আযাবের কথাও সে ভুলিয়া যায়। তুমি ক্ষুধার্ত থাকিলে দোযখবাসীদের ক্ষুধার কথা তোমার স্মরণ হইবে, পিপাসার্ত হইলে কিয়ামত দিবসে সমবেত জনতার পিপাসার বিষয় তোমার স্মরণ হইবে। পরকালের ভয় ও আল্লাহ্র বান্দাগনের প্রতি দয়া প্রকাশ বেহেশ্তের দ্বারস্বরূপ। এই কারণেই লোকে যখন হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- "সমস্ত জগতের ধনাগার আপনার নিকট থাকা সত্ত্বেও আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন কেন?" তখন তিনি বলিলেন- "তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলে দরিদ্রগণকে ভুলিয়া যাইতে পারি; আমার এই আশঙ্কা হয়।"

পঞ্চম উপকারিতা—প্রবৃত্তি দমন করা মানুষের পরম সৌভাগ্যের বিষয়; আর নিজেকে প্রবৃত্তির বশবর্তী করিয়া রাখা তাহার চরম দুর্ভাগ্য। দুর্দমনীয় পশুদিগকে একমাত্র ক্ষুধা দ্বারাই আজ্ঞাবহ করা চলে। তদ্রূপ মানব প্রবৃত্তি দমন করিতে হইলেও ক্ষুধা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করা ক্ষুধার একমাত্র উপকারিতা নহে, বরং ক্ষুধাকে সকল উপকারের পরশমণি বলা যাইতে পারে। কারণ, প্রবৃত্তির তাড়না হইতেই সমস্ত পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রবৃত্তির তাড়না পরিতৃপ্ত ভোজনেই জন্মে।

হযরত যুন্নুন মিস্‌রী (র) বলেন- "আমি যখনই তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছি, আমার হৃদয়ে তখনই কোন পাপ বা পাপের বাসনা প্রবিষ্ট হইয়াছে।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন- "রাসূলে মাক্‌বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম যে বিদ্‌আতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করা। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলে মানব হৃদয়ে প্রবৃত্তিসমূহ সবল হইয়া উঠে। ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিলে বহু কল্যাণ ও উপকারিতা লাভ করা যায়। কিন্তু এই সকল বাদ দিলেও ইহাতে যে কামরিপু নিস্তেজ হয় এবং বাহুল্য কথনের ইচ্ছা হ্রাস পায় ইহাই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি তৃপ্তির সহিত আহার করে সে বাহুল্য কথা ও পরনিন্দায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার কামরিপু প্রবল হইয়া উঠে।

মানুষ চেষ্টা দ্বারা অন্যান্য আচরণ হইতে স্বীয় ইন্দ্রিয়কে বাঁচাইতে সমর্থ হইলেও অসংযত দৃষ্টি হইতে চক্ষুকে রক্ষা করা বড় দুরূহ ব্যাপার। আবার চক্ষুকে বাঁচাইতে পারিলেও অন্তরকে অসঙ্গত কল্পনা হইতে বিরত রাখা অত্যন্ত দুষ্কর। একমাত্র ক্ষুধা মানুষকে এই আপদসমূহ হইতে রক্ষা করিতে পারে। এইজন্যই বুযুর্গগণ বলেন- "আল্লাহ্‌র ধনাগারে ক্ষুধা একটি অমূল্য রত্ন। তিনি সকলকে ইহা দান করেন না, একমাত্র তাঁহার প্রিয়জনকে ইহা দান করিয়া থাকেন।" একজন অভিজ্ঞ হাকিম বলেন- "কেহ এক বৎসরকাল তরকারি ব্যতীত শুষ্ক রুটি তাহার অভ্যাসের অর্ধেক পরিমাণ ভক্ষণ করিলে আল্লাহ্ তাহার মন হইতে রমণী-চিন্তা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিবেন।"

ষষ্ঠ উপকারিতা—যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকে তাহার নিদ্রাও হ্রাস পায়। অল্প নিদ্রা হইলে ইবাদত ও যিকির-ফিকিরের সুবিধা পাওয়া যায়। বিশেষভাবে রাত্রিকালই ইবাদতের উৎকৃষ্ট সময়। যে ব্যক্তি তৃপ্তির সহিত আহার করে, তাহার উপর নিদ্রা প্রবল হইয়া উঠে এবং নিদ্রার প্রভাবে সে মৃত্যের ন্যায় পড়িয়া থাকে। এইরূপে তাহার অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। একজন কামিল পীর প্রত্যহ রাত্রে ভোজনের সময় বলিতেন- "হে শিষ্যগণ, অধিক ভোজন করিও না; অধিক ভোজন করিলে অধিক নিদ্রা যাইতে হইবে। তাহা হইলে কিয়ামত দিবসে তোমাদিগকে অধিক অনুশোচনা করিতে হইবে।" সত্তর জন মহামনীষী সিদ্দীক একমতে বলিয়াছেন- "অধিক পানি পান করিলে নিদ্রার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।"

পরমায়ু মানবের একমাত্র অমূল্য সম্পদ এবং প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তাহার এক একটি অমূল্য রত্ন। ইহার পরিবর্তে পরকালের পরম সৌভাগ্য লাভ করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে, অপনিদ্রায় জীবন বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যে বস্তু সেই নিদ্রাকে অপসারিত করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কি থাকিতে পারে? রাত্রিকালে তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া গভীর নিদ্রায় আবিষ্ট হইলে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগ্রত হইলেও ভরা উদরে নামায পড়িতে কষ্ট হয় এবং মোনাজাতের আস্বাদ পাওয়া যায় না; নিদ্রা তখন তাহার উপর প্রবল থাকে। এতদ্ব্যতীত পরিতৃপ্ত আহারের ফলে রজনীতে

স্বপ্নদোষও হইতে পারে। এমতাবস্থায়, গোসলের কোন সুবিধা সে নাও পাইতে পারে। গোসলের কোন সুবিধা না পাইলে সারা রাত্রি অপবিত্রাবস্থায় কাটাইতে হয়। ইহাতে ইবাদত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। গোসলের সুবিধা পাইলেও ইহার কষ্ট অথবা ভোগ করিতে হয়। আরামের সহিত হাম্মামে গোসল করিবার পয়সা হয়ত তাহার নিকট নাও থাকিতে পারে। আবার হাম্মামে গমন করাও নিরাপদ নহে। তথায় কোন যুবতীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে ইহাতে বহু বিপদের আশংকা রহিয়াছে। হযরত আবূ সুলায়মান (র) বলেন, "স্বপ্নদোষ শাস্তিস্বরূপ।" পরিতৃপ্ত ভোজনে স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে। এই কারণেই ইহাকে শাস্তি বলা হইয়াছে।

সপ্তম উপকারিতা—ক্ষুধার ফলে মানুষের অবকাশকাল দীর্ঘ হয়। এই অবকাশকাল বিদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য সৎকর্মে ব্যয় করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত আহার করে তাহার পরমায়ুর অধিকাংশ সময় আহার, শয়ন, আহার্য-দ্রব্যাদি খরিদ ও উহার প্রস্তুত কার্যে অপচয় হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ভোজনের দরুণ তাহাকে বহুবার পায়খানায় যাইতে হয়, শৌচপ্রক্ষালনাদি কার্যেও তাহার বহু সময় ব্যয় হয়। এইরূপে নানারূপ বেহুদা কার্যে তাহার জীবনের বিরাট অংশ অতিবাহিত হয়। মানুষের প্রতিটি নিশ্বাস এক একটি অমূল্য রত্ন এবং তাহার পরমায়ু একটি পরম সম্পদ। বেহুদা কার্যে ইহা ব্যয় করা নির্বুদ্ধিতার কার্য।

হযরত সররি সকতি (র) বলেন- "হযরত আলী জুরজানীকে যবের ছাতু পানিতে মিশাইয়া পান করিতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- 'আপনি রুটি আহার করেন না কেন?' তিনি উত্তরে বলিনে- 'ছাতুর শরবত পান করিতে যে সময়ের দরকার হয়, রুটি চর্বন করিয়া আহারে ইহা অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় হয়। এই অবকাশে সত্তর বার তসবীহ পড়া যায়। এইজন্য চল্লিশ বৎসর হইল আমি রুটি খাই না। রুটি চর্বণের জন্য বিরাট কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকা আমি উচিত মনে করি না।"

ক্ষুধা সহ্য করিয়া যে ব্যক্তি অভ্যস্ত হইয়াছে, রোযা রাখা, ইতিকাফ অর্থাৎ দুনিয়ার সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত হওয়া এবং সর্বদা পাক-পবিত্র থাকা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। পরকালের সওদাগরের পক্ষে এই লাভ নগণ্য নহে। হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন, "উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে ছয়টি দোষ জন্মে- (১) ইবাদতের মাধুর্য পাওয়া যায় না; (২) জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রখরতা বিনষ্ট হয়; (৩) সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দৈন্যে সমবেদনা লোপ পায়; কারণ, পরিতৃপ্ত ভোজনকারী মনে করে যে, সকলেই তাহার ন্যায় পানাহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছে; (৪) পাকস্থলী ভারী হইয়া ইবাদতে কষ্ট হয়; (৫) ভোগ-বিলাসের বাসনা বৃদ্ধ পায়; (৬) যে সময় অন্যান্য মুসলমান মসজিদে যাতায়াত করে, তখন পেটের দাসগণ পায়খানার দিকে দৌড়াদৌড়ি করে।

অষ্টম উপকারিতা—স্বল্পভোজীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ঔষধের ব্যয়ভার বহন, চিকিৎসকের মানাভিমান ও রসিকতা এবং পীড়ার কষ্ট তাকে বরদাশত করিতে হয়

না। ফাস্‌দ উন্মোচন, সিঙ্গা লাগানো এবং তিক্ত ও স্বাদহীন ঔষধ ব্যবহারের যাতনাও তাহাকে সহ্য করিতে হয় না। জ্ঞানীগণ একমতে বলিয়াছেন– "অল্প ভোজন ব্যতীত এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে নিরন্তর উপকার রহিয়াছে এবং কোন অপকারের লেশমাত্রও নাই।" হাদীস শরীফে আছে– "রোযা রাখ, তাহা হইলে তোমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে।"

নবম উপকারিতা—যে ব্যক্তি কম খায় তাহার খরচও কম। এই জন্যই তাহার অধিক ধনের আবশ্যক হয় না। মানবের সকল বিপদাপদ, পাপ, হৃদয়ের অশান্তি অধিক ধনের আবশ্যকতা হইতে উদ্ভব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ অধিক পরিমাণে ভোজন করিতে চায়, ইহা যোগাড়ের উদ্বেগ ও চেষ্টায় তাহার সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সে লোভের বশবর্তী হইয়া অবৈধ ও সন্দেহজনক উপায়ে ধন লাভ করিবে। কোন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন– "আমার অভাব দেখা দিলে ইহা মোচনের জন্য অধিকাংশ স্থলে যে বিষয়ে আমি অভাব অনুভব করি, ইহা বর্জন করিয়া থাকি। ইহা আমার নিকট অতি সহজসাধ্য।" অপর একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন– "আমি কেন অপরের নিকট হইতে ধার চাহিব এবং স্বীয় উদরের নিকট হইতে ধার গ্রহণ করিব না? বরং ধারের আবশ্যক হইলে আমি উদরের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তাহাকে বলিয়া থাকি– "অমুক বস্তুর অভিলাষ বর্জন কর।" হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি জানিতেন যে, কোন বস্তু দুর্মূল্য তবে তিনি তাহাদিগকে বলিতেন– "ইহা পরিত্যাগ করিয়া সুলভ কর।"

দশম উপকারিতা—ভোজন প্রবৃত্তি দমন করত উদর বশীভূত করিতে পারিলে মানুষ সদ্‌কা, বদান্যতা, পরোপকার, পরদুঃখ মোচন প্রভৃতি সৎকার্য করিতে সমর্থ হয়। অনুধাবন কর, যাহা উদরে প্রবেশ করে, ইহার অধিকাংশ বহির্গত হইয়াপায়খানায় পতিত হয় এবং যাহা সদ্‌কা ও দানে ব্যয়িত হয় উহা আল্লাহ্‌র করুণার হস্তে যাইয়া সঞ্চিত হয়। রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এক ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তিকে দেখিয়া বলেন– "যাহা তুমি উদরে ভর্তি করিতেছ, ইহা অন্যত্র ব্যয় করিলে (অর্থাৎ দান ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করিলে) উত্তম হইত।"

অল্পাহারের অভ্যাস সম্বন্ধে নিয়ম ও সাবধানতা—হালাল জীবিকা অর্জনের পর তিনটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা ধর্মপথ-যাত্রীদের অবশ্য কর্তব্য।

প্রথম কর্তব্য– অল্প ভোজন। উদর পূর্ণ করিয়া ভোজনে যাহারা অভ্যস্ত একেবারে অকস্মাৎ তাহাদের পক্ষে অল্প ভোজন সঙ্গত নহে। অন্যথা হিতের চেয়ে বরং অহিতের আশংকা রহিয়াছে। অতি ভোজনে অভ্যস্ত হইয়া অকস্মাৎ অল্পাহার করিলে যে শারীরিক কষ্ট হয়, ইহা সহ্য করাও দুঃসাধ্য। অতএব অতি ভোজনের অভ্যাস ক্রমশ হ্রাস করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অভ্যাস হইতে একটি রুটি কম ভোজন করিতে চায়, সে প্রথমে এক গ্রাস কমাইবে, তৎপর দিন দুই গ্রাস, তৃতীয় দিন তিন গ্রাস কমাইবে। এইরূপে প্রত্যহ এক এক গ্রাস কমাইলে এক মাসে একটি রুটি কম হইবে এবং ইহা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। তাহা হইলে দেহেরও কোন অনিষ্ট হইবে না এবং স্বাস্থ্যও ঠিক থাকিবে।

খাদ্যের পরিমাণ—স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী ভোজনের পরিমাণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম—সিদ্দীকগণ যে পরিমাণ ভোজনে অভ্যস্ত এবং ইহাই সর্বোত্তম নিয়ম। ইহা এই– যে পরিমাণ ভোজনে কেবল জীবনীশক্তি বজায় থাকে এবং যাহা হইতে কমাইলে প্রাণহানির আশঙ্কা হয়। হযরত সহল তস্তরী (র) এই পরিমাণই ভোজন করিতেন। তিনি বলেন– "প্রাণ, বুদ্ধি এবং ক্ষমতা এই তিনটি দ্বারা ইবাদতকার্য সম্পন্ন হয়। খাদ্যাভাবে এই তিনটির কোন একটি বিকৃত হওয়ার উপক্রম না হইলে ভোজন করা সঙ্গত নহে। অনাহারজনিত দুর্বলতার দরুন বসিয়া বসিয়া নামায পড়া, তৃপ্তির সহিত আহার করত দণ্ডায়মান হইয়া নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। খাদ্যাভাবে প্রাণহানি বা বুদ্ধি লোপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে ভোজন করা কর্তব্য, কারণ, বুদ্ধি ব্যতীত ইবাদত করা যায় না, আর প্রাণই ত মানবের মূলধন।" লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল– "আপনি কি নিয়মে ভোজন করিতেন?" তিনি বলিলেন– "তিন দেরেম মূল্যের খাদ্যে আমার সারা বৎসর চলিত। এক দেরেমের চাউলের আটা এক দেরেমের মধু এবং এক দেরেমের ঘৃত খরিদ করিয়া সমস্তগুলি একত্রে মিশাইয়া তিন শত ষাইটটি লাড্ডু প্রস্তুত করিতাম। প্রত্যহ ইফতারের পর একটি করিয়া লাড্ডু খাইতাম।" লোকে তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল– "এখন কি ধরনে আহার করেন?" তিনি বলিলেন– "এখন কোনরূপ অভ্যাস নাই। পাইলে আহার করি, না পাইলে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকি– এখন আহার-অনাহার সমতুল্য।"

খৃষ্টান সাধুদের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যহ আটার মাযার অধিক খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ খাদ্যের পরিমাণ ক্রমশ ইহা অপেক্ষাও অধিক কমাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয়—ইহাতে প্রায় চারি ছটাক ওজনের খাদ্যে দৈনিক আহার শেষ হয়। এই পরিমাণ খাদ্যে পূর্ণবয়স্ক একজন লোকের এক-তৃতীয়াংশ উদর পূর্ণ হইতে পারে। রাসূলে মাকবুল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

ثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلذِّكْرِ -

অর্থাৎ "উদরের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা ও এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ যিকিরের জন্য খালি রাখিবে।" অন্য রেওয়ায়েতে উদরের এক-তৃতীয়াংশ নিশ্বাসের জন্য খালি রাখিতে বলা হইয়াছে। রাসূলে মাকবুল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন– "কয়েক গ্রাস ভোজনই যথেষ্ট।" চারি ছটাক রুটিতে দশ গ্রাসের কম হইবে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু সাত বা নয় গ্রাসের অধিক ভোজন করিতেন না।

তৃতীয়– ইহাতে দৈনিক প্রায় অর্ধসের ওজনের খাদ্যে ভোজন শেষ হয়। এই পরিমাণ ময়দার খামীর প্রস্তুত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাড্ডু তৈয়ার করিলে তিনটি লাড্ডু হইবে। প্রায় অর্ধসের রুটিতে সাধারণত পেটের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হইয়া ইহার অর্ধাংশ পর্যন্ত পূর্ণ হইতে পারে।

চতুর্থ– এই শ্রেণীর ভোজনের পরিমাণ দৈনিক অর্ধসেরের কিছু বেশী। কিন্তু ভোজনের পরিমাণ ইহার অধিক হইলেই ইহা অপচয়ের মধ্যে গণ্য হইবে। আল্লাহ্ এই অপচয় নিষেধ করিয়া বলেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ -

অর্থাৎ "আহার কর এবং পান কর, কিন্তু অপব্যয় করিও না। অবশ্যই আল্লাহ্ অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না।" (সূরা আ'রাফ, রুকু ৩, পারা ৮)

ভোজনের পরিমাণ নির্ধারণের নিয়ম—ভোজনের পরিমাণ নির্ধারণে সকলের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এবং শারীরিক পরিশ্রমের তারতম্যানুসারে ভোজনের পরিমাণেও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তথাপি ইহার পরিমাণ সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করা যাইতে পারে। ইহা এই– "সর্বদা কিছু ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন শেষ করিবে।" পূর্ববর্তী জ্ঞানীগণের অনেকে ভোজনের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এই সাধারণ নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন যে, ক্ষুধা প্রবল না হইলে তাঁহারা ভোজন করিতেন না এবং কিছু ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকিতেই ভোজন হইতে বিরত হইতেন।

ক্ষুধার নিদর্শন—ক্ষুধা কাহাকে বলে তাহাও জ্ঞাত হওয়া উচিত। তরকারি ব্যতীত ভোজনের লালসা প্রবল হইয়া উঠিলে এবং খাদ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট, যবের কি বাজরার পার্থক্য করিবার অবকাশ না পাইলে বুঝিতে হইবে বাস্তবিক ক্ষুধা হইয়াছে। অন্নের সঙ্গে কিছু ব্যঞ্জন চাহিলে মনে করিবে প্রকৃত ক্ষুধা হয় নাই।

সাহাবা ও বুযুর্গগণের ভোজনের পরিমাণ—অধিকাংশ সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্হুমের দৈনিক ভোজনের পরিমাণ এক পোয়ার অধিক ছিল না। তন্মধ্যে কাহারও কাহারও আহারের পরিমাণ এব সপ্তাহে প্রায় সাড়ে তিন সের ছিল। তাঁহারা খোরমা ভক্ষণ করিলে এক সপ্তাহে প্রায় পাঁচ সের পরিমাণ আহার করিতেন। কারণ, ভক্ষণের সময় খোরমার বীচি ফেলিয়া দিতে হয়। হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন– "রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবিতকালে এক শুক্রবার হইতে অপর শুক্রবার পর্যন্ত আমার আহার প্রায় সাড়ে তিন সের যবের আটা ছিল। আল্লাহ্র কসম, পরকালে তাঁহার নিকট গমনের পূর্বে আমি কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিব না।" রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরলোকগমনের পর কোন কোন ব্যক্তির ভোজন ও ও বসন-ভূষণে বিলাসিতার নিদর্শন লক্ষ্য করিয়া তিনি কখনও তাহাদিগকে ভৎসনা করিতেন, আবার কোন সময় আফসোস করিয়া বলিতেন– "হায়! হায়! তোমরা সেই উৎকৃষ্ট আচরণ পরিত্যাগ করিয়াছ!"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "সেই ব্যক্তি আমার পরম বন্ধু ও অন্তরঙ্গ যে অদ্য আমার জীবিতকালে যে প্রণালীতে আছে, সেই প্রণালীতেই পরলোকগমন করিতে পারে।" এই হাদীসের উল্লেখ করিয়া হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিতেন– "হায়! তোমরা সেই উৎকৃষ্ট আচরণ পরিত্যাগ

করিয়াছ, যবের আটা বর্জন করত ময়দা সানাইতে আরম্ভ করিয়াছ; সরু সরু রুটি তৈয়ার করিতেছ; এক অন্নের সঙ্গে দুই রকমের তরকারি খাইতেছ; দিবারাত্রে পৃথক পৃথক পোশাক পরিধান করিতেছ। এইরূপ (বিলাসিতা) রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ছিল না। তখন প্রায় অর্ধসের খোরমা দ্বারা দুই জন সূফী ব্যক্তির আহার চলিত। ইহা হইতে আবার বীচি ফেলিয়া দেওয়া হইত।" হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন– "নিখিল জগত রক্তময় হইলেও আমার খাদ্য তন্মধ্য হইতে হালালই হইবে।" ইহার মর্ম এই যে, নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন মানুষ আহার না করে। কিন্তু এবাহতী সম্প্রদায় ইহার উদ্দেশ্য এই বুঝিয়া লইয়াছে যে, হারাম বস্তু অধিকার করিলেই হালাল হইয়া থাকে। এই ধারণা সত্য নহে। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হস্তে সদ্কার মাল হইতে একটি খোরমা গিয়াছিল; ইহাকেও তিনি হালাল বলিয়া গণ্য করেন নাই।

দ্বিতীয় কর্তব্য—ভোজনের সময়। ভোজনের পরিমাণের ন্যায় ইহার সময় সম্বন্ধেও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ভোজনের সময়ও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী—যাঁহারা তিনদিনের অধিক সময় পরে ভোজন করিয়া থাকেন তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপও ছিলেন যে, তাঁহারা এক সপ্তাহ, দশ দিন, বার দিন, এমন কি ইহার অধিক কালও অনাহারে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাবিয়ীগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন যে, একাদিক্রমে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁহারা অনায়াসে অনাহারে কাটাইয়া দিতেন। হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু অধিকাংশ সময়ে ছয় দিন অন্তর ভোজন করিতেন। হযরত ইবরাহীম আদ্হাম (র) ও হযরত সাওরী (র) তিনদিন অন্তর ভোজন করিতেন। বুযুর্গগণ বলেন– " যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন অনাহারে থাকে, স্বর্গরাজ্যের অদ্ভূত বিষয়সমূহের কোন বস্তু অবশ্যই তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে।"

জনৈক খৃস্টান সাধুর সঙ্গে এক সূফীর বাদানুবাদ হইল। সূফী সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন কর না কেন?" সাধু বলিলেন– "আমাদের নবী হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনাহারে কাটাইতেন। সত্য নবী ব্যতীত কেহই এত দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকিতে পারেন না। তোমাদের নবী ইহা করেন নাই।" সূফী বলিলেন– "তাঁহার উম্মতের মধ্যে আমি একজন নগণ্য গোলাম। আমি চল্লিশ দিন অনাহারে থাকিতে পারিলে তুমি ঈমান আনয়ন করিবে?" সাধু বলিলেন– "হাঁ, ঈমান আনিব।" তৎপর সূফী সেই স্থানে পঞ্চাশ দিন পানাহার ব্যতীত বসিয়া রহিলেন। ইহার পর তিনি সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আরও কিছু দিন অনাহারে ধৈর্য ধারণ করিয়া কাটাইব কি?" সাধু বলিলেন– "হাঁ" সূফী তৎপর ষাট দিন অনাহারে পূর্ণ করিলেন। খৃস্টান সাধূ ইহা দেখিয়া মুসলমান হইলেন।

তিনদিনের অধিককাল যাহারা অনাহারে যাপন করিতে সমর্থ তাহারা অত্যন্ত উন্নত মর্যাদার অধিকারী। চেষ্টা দ্বারা কেহই এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহার সম্মুখে এ জগতের পরপারের কোন কাজ উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে মগ্ন

হইলে স্বাস্থ্যও পালন হয় এবং তিনি নিজেও ইহাতে বিভোর হইয়া ক্ষুৎপিপাসা একেবারে ভুলিয়া যান, কেবল তেমন লোকই এত উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর লোক একাদিক্রমে দুই দিবস, তিন দিবস আহার না করিয়া অতিবাহিত করেন। ইহা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর এবং অধিকাংশ দরবেশ ব্যক্তি এই নিয়মে ভোজন করিয়া থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর লোকে প্রতিদিন একবার করিয়া ভোজন করে এবং ইহাই সর্বনিম্ন শ্রেণী। প্রত্যহ দুইবার ভোজন করিলে দ্বিতীয়বারের ভোজন অপচয়ের মধ্যে গণ্য হয়।[১] প্রত্যহ দুইবার আহার করা সঙ্গত নহে; প্রত্যহ দুইবার আহার করিলে ক্ষুধা কাহাকে বলে বুঝাই যায় না।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সকালে আহার করিলে বিকালে আহার করিতেন না; আবার বিকালে আহার করিলে সকালে আহার করিতেন না। তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে সম্বোধন করিয়া বলেন- "খবরদার, কখনও অপব্যয় করিও না। দিনে দুইবার ভোজন করা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য।" যে ব্যক্তি দিবসে একবার ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে প্রাতে ভোজন করা শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে তাহাজ্জুদের সময় দেহটা হাল্‌কা মনে হয় এবং অন্তর নির্মল থাকে ও আনন্দ অনুভব হয়। কোন ব্যক্তি রাত্রে আহার করিতে ইচ্ছা করিলে দিবসে রোযা রাখিয়া ইফ্‌তারের সময় একটি রুটি এবং শেষ রাত্রে আর একটি রুটি গ্রহণ করিতে পারে।

তৃতীয় কর্তব্য—খাদ্যের প্রকার। গমের ছাঁকা আটা শ্রেষ্ঠ আহার্য বস্তু; যবের ছাঁকা আটা মধ্যম এবং ছাঁকা ব্যতীত যবের আটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যঞ্জনের মধ্যে গুশ্‌ত ও মিষ্টান্ন উৎকৃষ্ট; সিরকা ও লবণ অপকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তেলে ভাজা রুটিকে মধ্যম শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য গণ্য করা হয়। পরকালের যাত্রীদের আচরণ এই যে, তাঁহারা অন্নের সহিত কোন তরকারি গ্রহণ করেন না এবং কোন বস্তু আহারের ইচ্ছা হইলে তাঁহারা উহা আহার করেন না। আর তাঁহারা বলেন- "প্রবৃত্তি লালসার বস্তু পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলে মনে অহমিকা, মোহ এবং অন্ধকার দেখা দেয়; সে তখন দুনিয়াতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পছন্দ করে এবং মৃত্যুকে সে শত্রু বলিয়া মনে করে। সংসারকে সঙ্কীর্ণ ও অনুদার করিয়া লওয়া মানুষের উচিত; তাহা হইলে ইহাকে সে জেলখানাতুল্য মনে করিতে পারিবে এবং একমাত্র মৃত্যুবরণ যে সংসাররূপ জেলখানা হইতে পরিত্রাণের উপায় ইহা বুঝিতে সমর্থ হইবে। হাদীস শরীফে আছে- "আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা মিহি আটা আহার করে তাহারা নিকৃষ্ট।" এই হাদীস

১. হযরত ইমাম গাযালী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হির যমানায় লোকদের শারীরিক শক্তি বর্তমান যমানার লোকদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। বর্তমান যমানার লোকগণ অত্যন্ত দুর্বল। অধিক সময় অনাহারে থাকিলে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া বৃহত্তর ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্তী যুগের মাশায়িখগণ ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় এই পরিমাণ আহার করিয়া ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহাই হউক, পানাহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম পালন করিবার পূর্বে খাঁটি পীর বা মুহাককেক আলিমের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। (অনুবাদক)

দ্বারা মিহি আটা হারাম করা হয় নাই। কোন কোন সময় ইহা আহার করা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বদা আহার করিলে মনে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিবে এবং হৃদয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যাহারা ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত, যাহাদের দেহ ইহাতেই পরিপুষ্ট, যাহারা দিবা-রাত্র খাদ্যসামগ্রী ও সুন্দর বসন-ভূষণের চিন্তায় মগ্ন এবং যাহাদের মুখে কেবল বড় বড় উক্তি, তাহারা আমার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল- "হে মূসা, জানিয়া রাখ, কবর তোমার বাসস্থান; অতএব বিলাসিতা হইতে তোমার শরীরকে বাঁচাও।" পার্থিব সম্পদ ও সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবার যাবতীয় বস্তু যাহার অর্জিত হইয়াছে এবং সকল বাসনাই যাহার পূর্ণ হইয়াছে, জ্ঞানীগণ তাহাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া গণ্য করেন না। হযরত ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বেহ (র) বলেন- "চতুর্থ আসমানে দুইজন ফেরেশ্‌তার পরস্পর দেখা হইল। তাঁহাদের একজন বলিলেন- 'অমুক য়াহূদী অমুক মাছ খাইবার ইচ্ছা করিয়াছে, ধীবরের জালে মাছ আটকাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমি গমন করিতেছি।' অন্য ফেরেশ্‌তা বলিলেন- 'অমুক আবিদ ঘি আহারের ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া এক ব্যক্তি এক পেয়ালা ঘি তাহার নিকট আনয়ন করিয়াছে, আমি ইহা ফেলিয়া দিবার জন্য যাইতেছি।" একদা এক ব্যক্তি ঠাণ্ডা পানিতে মধু মিশ্রিত করিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি ইহা পান করিলেন না বরং প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন- "ইহার হিসাবের দায়িত্ব হইতে আমাকে দূরে রাখ।"

একবার পীড়িতাবস্থায় হযরত ইব্‌ন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাজা মাছ খাওয়ার ইচ্ছা হইল। হযরত নাফে রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "মদীনা শরীফে মাছ তখন নিতান্ত দুর্লভ ছিল। অনেক পরিশ্রম ও অন্বেষণের পর দেড় দেরহেম মূল্যে একটি মাছ আমি কিনিয়া আনিলাম এবং ইহা ভাজিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিলাম। এমন সময় একজন ফকীর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন- 'লও, ইহা এই ফকীরকে প্রদান কর।' আমি বলিলাম- 'মাছ খাইবার আপনার ইচ্ছা হইয়াছে জানিয়া অনেক পরিশ্রমে আমি ইহা যোগাড় করিয়াছি। আপনি ইহা ভক্ষণ করুন। ইহার মূল্য আমি ফকীরকে দান করিতেছি।' তিনি বলিলেন- 'না, এই মাছই তাহাকে দান কর।' ফকীরকে আমি মাছটি দান করিলাম। কিন্তু তৎপর তাহার পশ্চাদানুসরণ করত মূল্য প্রদানে মাছটি আবার আমি খরিদ করিয়া আনিয়া হযরত ইব্‌ন ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর সম্মুখে পুনরায় উপস্থিতপূর্বক বলিলাম- 'আমি তাহাকে ইহার মূল্য দিয়াছি।' তিনি পূর্ববৎ বলিলেন- 'এই মাছটি তাহাকেই (ঐ ফকীরকে) দিয়া আস এবং ইহার মূল্যও ফিরাইয়া গ্রহণ করিও না।' তিনি আরও বলিলেন- 'আমি রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি- 'কোন দ্রব্য ভোজনের কাহারও ইচ্ছা হইলে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সে যদি ইহা ভোজনে বিরত থাকে, তবে আল্লাহ্ তাহার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দিয়া থাকেন।"

হযরত ওত্‌বাতুল গোলাম (র) আটার খামীর সূর্যের উত্তাপে শুকাইয়া ভোজন করিতেন; আগুনে ভাজিয়া রুটি তৈয়ার করিয়া খাইতেন না। রুটি যেন সুস্বাদু না হয়,

এইজন্যই তিনি ইহা করিতেন। তিনি ঠান্ডা করিবার উদ্দেশ্যে পানি ছায়াতে রাখিতেন না, বরং গরম পানিই পান করিতেন। হযরত মালিক ইব্ন দীনারের (র) দুধ পানের প্রবল ইচ্ছা ছিল; কিন্তু চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি দুধ পান করেন নাই। এক ব্যক্তি কতকগুলি খোরমা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি খোরমাগুলি হাতে রাখিলেন এবং পরিশেষে উহা সেই ব্যক্তিকে ফেরত দিয়া বলিলেন– "তুমিই উহা ভক্ষণ কর; কারণ, চল্লিশ বৎসর যাবত আমি খোরমা ভক্ষণ করি না।" হযরত আবূ সুলায়মান দারানীর (র) অন্যতম মুরীদ হযরত আহ্‌মদ ইব্ন হাওয়ারী (র) বলেন– "একদা আমার পীর লবণের সহিত গরম রুটি খাইতে চাহিলেন। আমি ইহা আনয়ন করিলাম। তিনি এক টুকরা রুটি মুখে দিবার উপক্রম করত ইহা রাখিয়া দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন– 'হে খোদা, আমার অভিলষিত বস্তু তুমি আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়া দিলে, ইহা আমার প্রতি শাস্তি স্বরূপ। আমি তওবা করিলাম, তুমি আমার গোনাহ্ মাফ কর।"

হযরত মালিক ইব্ন যয়গাম (র) বলেন– "একদা বস্‌রার কোন বাজারের মধ্য দিয়া গমনের সময় এক প্রকার তরকারি দেখিয়া আমার ইহা খাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমি শপথ করিয়া বলিলাম যে, ইহা আমি ভক্ষণ করিব না। চল্লিশ বৎসর অতীত হইল; ধৈর্য ধারণ করিয়া ইহা ভোজনে নিবৃত্ত রহিয়াছি।" হযরত মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন– "পঞ্চাশ বৎসর হইল আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি; আমার দুগ্ধ পানের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আজ পর্যন্ত উহা পান করি নাই এবং যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত না হইব, সেই পর্যন্ত পান করিব না।" হযরত হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফ (র) বলেন– "একদা আমি হযরত দাউদ তায়ীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলাম গৃহাভ্যন্তর হইতে আওয়ায আসিতেছে– 'একবার তুই গাজরের অভিলাষ করিয়াছিলি, আমি তোর সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছি; এখন তোর আবার খোরমার অভিলাষ হইয়াছে! ইহা কখনও তোকে ভক্ষণ করিতে দিব না।' তৎপর আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি ব্যতীত সেই স্থানে আর কেহই নাই। তখন আমি মনে করিলাম, তিনি নিজেকেই ঐরূপ তিরস্কার করিতেছিলেন।"

একদা হযরত ওত্‌বাতুল গোলাম (র) হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যায়িদকে (র) বলিলেন– "অমুক ব্যক্তি তাহার অন্তরের অবস্থা আমাকে জানাইলেন। কখনও আমার তদ্রূপ অবস্থা হয় না।" হযরত আবদুল ওয়াহিদ (র) বলিলেন– "ইহার কারণ এই যে, সেই ব্যক্তি তরকারী ব্যতীত শুধু রুটি খাইয়া থাকেন এবং তুমি খোরমার সহিত রুটি খাইয়া থাক।" হযরত ওত্‌বাতুল গোলাম বলিলেন– "খোরমা না খাইলে কি আমার সেই অবস্থা হইবে?" তিনি বলিলেন– "হ্যাঁ।" সেইদিন হইতে হযরত ওত্‌বাতুল গোলাম (র) খোরমা খাওয়া পরিত্যাগ করিলেন। তৎপর একদিন তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "আপনি কি খোরমার জন্য রোদন করিতেছেন?" উত্তরে হযরত আবদুল ওয়াহিদ (র) বলিলেন– "তাঁহার প্রবৃত্তি খোরমা চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার স্থির সঙ্কল্প হইতে সে জানিতে পারিয়াছে যে, সে কখনও ইহা খাইবে না। অতএব প্রবৃত্তি এখন হতাশ হইয়া কাঁদিতেছে।" হযরত আবূ বকর জালা (র) বলেন– 'এক ব্যক্তিকে আমি চিনি। তাঁহার কোন খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের

ইচ্ছা হইয়াছিল; ইহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি দশ দিবস অনাহারে থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহাকে আমি বলিলাম– 'দশ দিবস অনাহারে থাকা অপেক্ষা প্রবৃত্তি যে পদার্থ চাহিয়াছিল ইহা চিরতরে পরিত্যাগ করাই উত্তম কাজ।" বুযুর্গ ও ধর্মপথ-যাত্রীদের কাজ এইরূপই হইয়া থাকে।

অভিলষিত খাদ্য বর্জনের উপায়—উপরিউক্ত উপায়ে কেহ যদি সকল বাঞ্ছিত বস্তুর লোভ সম্পূর্ণরূপে সংবরণ করিতে না পারে, তবে ইহাদের কতকগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া অবশিষ্টগুলি ক্রমান্বয়ে বর্জনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। তাহার কোন বস্তু খাওয়ার লালসা হইলে নিজে না খাইয়া ইহা অপরকে প্রদান করা উচিত। সর্বদা গুশ্‌ত ভক্ষণ করিবে না। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন,– "যে ব্যক্তি একাদিক্রমে চল্লিশ দিন গুশ্‌ত ভক্ষণ করে তাহার হৃদয় কঠোর হইয়া পড়ে এবং যে ব্যক্তি একাদিক্রমে চল্লিশ দিন গুশ্‌ত ভক্ষণ করে না তাহার স্বভাব মন্দ হয়।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হু স্বীয় পুত্রকে আহার গ্রহণ সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই মধ্যপন্থা। তিনি তাঁহার পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলেন– "হে বৎস, এক বেলা গুশ্‌ত, এক বেলা রওগন তৈল, এক বেলা দুগ্ধ, এক বেলা সির্কার সহিত রুটি ভক্ষণ করিবে। আবার কোন কোন সময় ব্যঞ্জন ব্যতীত শুধু রুটিও ভোজন করিবে।"

ভোজনান্তে কর্তব্য—মুস্তাহাব নিয়ম এই যে, তৃপ্তির সহিত পানাহার করিয়া কখনও শয্যা গ্রহণ করিবে না। তাহা হইলে দ্বিবিধ মোহ তোমাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে। হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে– "নামায ও যিকিরের জন্য ভোজন পরিত্যাগ কর এবং ভোজন করিয়া শয়ন করিও না। অন্যথা আত্মা মলিন হইয়া যাইবে।" বুযুর্গগণ বলিয়াছেন– "ভোজনান্তে চারি রাকআত নামায, একশত বার তাসবীহ্ বা কুরআন শরীফ হইতে কিছু অংশ পাঠ কর।"

হযরত সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু পরিতৃপ্ত ভোজন করিলে সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিতেন এবং বলিতেন– "চতুষ্পদ জন্তুকে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করাইলে তদ্দারা আয়াসসাধ্য কাজ করাইয়া লওয়া উচিত।" একজন বুযুর্গ স্বীয় মুরীদগণকে বলিতেন– "বাঞ্ছিত দ্রব্য আহার করিও না; আর যদি ইহা আহার কর, তবে ইহা অন্বেষণ করিও না; যদি ইহা অন্বেষণ কর, তবে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইও না।"

ভোজন-লালসা দমনের কারণ—ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিবার একমাত্র কারণ কু-প্রবৃত্তিসমূহের শক্তি হ্রাস করত ইহাদিগকে বশবর্তী ও মার্জিত করা। ইহারা সরল ও বশবর্তী হইয়া গেলে ভোজনের প্রকার, পরিমাণ ও সময় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালনের আবশ্যকতা নাই। এই জন্য কামিল পীরগণ ভোজন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পালনের জন্য স্বীয় মুরীদগণকে আদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলেন না। কারণ ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা ভোগ করা ভোজন-প্রবৃত্তি দমনের উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহার প্রভাবে প্রবৃত্তিসমূহকে বশীভূত করাই মূল উদ্দেশ্য।

ক্ষুধা ও ভোজনের সামঞ্জস্য বিধান—এই পরিমাণ পানাহার করিবে যাহাতে পাকস্থলী পূর্ণ হইয়া দুর্বহ হইয়া না উঠে এবং ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণাও ভোগ করিতে না

হয়। এই উভয় অবস্থাই অনিষ্টকর এবং ইবাদত হইতে মানুষকে বিরত রাখে। ফেরেশতাগণের গুণরাজি অর্জন করিতে পারিলেই মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ফেরেশতাগণ ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করেন না; অপরপক্ষে ভোজনজনিত উদরের গুরুভারও তাঁহাদিগকে বহন করিতে হয় না। প্রথম হইতেই প্রবৃত্তির উপর জোর-জবরদস্তি করত ইহাকে দমন না করিলে মানুষ এইরূপ সাম্যভাব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কোন কোন বুযুর্গ নিজেকে অপূর্ণ মনে করত সর্বদা বিশেস সতর্কতার সহিত পথ চলিয়া থাকেন এবং বারবার স্বীয় প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া থাকেন ও ইহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। আবার কোন কোন কামিল ব্যক্তি উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইয়া সাম্যভাব লাভ করত স্থিতিশীল হন।

ফেরেশ্‌তাদের মত ক্ষুৎপিপাসা সম্বন্ধে সাম্যভাব লাভের অধিকার যে মানুষেরও আছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই ইহার উত্তম প্রমাণ। তিনি কখন কখন এমন নিরন্তর অনাহারে একাদিক্রমে রোযা রাখিতেন যে, লোকে মনে করিত তিনি আর কখনও ইফতার করিবেন না। আবার কোন কোন সময় তিনি এইরূপভাবে ভোজন করিতেন যে, লোকে ধারণা করিত তিনি আর কখনও রোযা রাখিবেন না। সাধারণতঃ ঘরে কোন আহার্য-সামগ্রী পাইলে তিনি সামান্য ভক্ষণ করিতেন, নতুবা অনাহারে রোযা রাখিতেন। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে তিনি মধু ও গুশ্‌ত বেশী পছন্দ করিতেন।

হযরত মা'রূফ কর্‌খীকে (র) কেহ কোন উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতে দিলে তিনি ইহা ভোজন করিতেন। কিন্তু হযরত বিশ্‌রে হাফীকে (র) কেহ কোন উৎকৃষ্ট বস্তু দিলে তিনি কখনও ইহা আহার করিতেন না। লোকে হযরত মা'রূফ কর্‌খীকে (র) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন– "আমার ভ্রাতা বিশ্‌রে হাফী বৈরাগ্য ও পরহেজগারীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছেন, আর আমি মা'রূফ ইহা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। 'আমি আল্লাহ্‌র গৃহে মেহ্‌মান, তিনি যাহা দান করেন তাহাই আহার করি। না দিলে ধৈর্যের সহিত অনাহারে থাকি। গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের কোন অধিকার আমার নাই।" এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যাহারা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে অসমর্থ, এইরূপ নির্বোধগণই বৃথা গর্ব করিয়া বলিয়া থাকে–

"আমরা মা'রূফ কর্‌খীর (র) মত আরিফ ও আল্লাহ্‌র মেহ্‌মান।" কেবল দুই প্রকার লোকই রিয়াযত হইতে নিরস্ত থাকে– (১) সিদ্দীকগণ, যাঁহারা কঠোর সাধনায় ও যত্নে স্বীয় কর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করিয়া লইয়াছেন এবং (২) যে নির্বোধ মনে করে– "সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করিয়া লইয়াছি," অথচ কিছুই সম্পন্ন হয় নাই।

একমাত্র আল্লাহ্‌র শক্তি ব্যতীত অন্য কোন শক্তি হযরত মা'রূফ করখী (র) নিজের মধ্যে দেখিতে পাইতেন না; আমিত্ব বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। তাঁহাকে কেহ আঘাত করিলে বা গালি দিলে তিনি রাগান্বিত হইতেন না। তিনি মনে করিতেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতেই তাঁহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি এইরূপ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই তেমন উক্তি শোভা পাইয়া

থাকে। হযরত বিশরে হাফী, হযরত সরি সকতি, হযরত মালিক ইব্‌ন দীনার কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহুম প্রমুখ মহাসাধক কামিল বুযুর্গগণও প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা হইতে উদ্বেগশূন্য না হইয়া সর্বদা সাবধান থাকিতেন। এমতাবস্থায়, অপরের পক্ষে ঐরূপ উক্তি পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নহে। কি সাধ্য যে তাহারা হযরত মা'রূফ করখীর (র) মত অবস্থার দাবী করে?

পানাহার পরিত্যাগের আপদ—পানাহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগের চেষ্টা করিলে ইহা হইতে দুইটি আপদ জাগিয়া উঠে। প্রথম– মানুষ পানাহার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার গোপন রহস্য প্রকাশিত হউক, ইহাও সে পছন্দ করে না। এমতাবস্থায়, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে আহার করে এবং প্রকাশ্যে আহার করে না। ইহা জাজ্জ্বল্যমান কপটতা এবং এই কপটতাই প্রথম আপদ। দ্বিতীয়– এইরূপও হইয়া থাকে যে, শয়তান আহার প্রবৃত্তি বিনাশকারীকে গর্বিত করিয়া তোলে এবং বলে– "ভোজনস্পৃহা বিনাশনে মহা উপকার নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে লোক তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তোমার অনুকরণ করিবে এবং এইরূপে মুসলমান সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।" তুমি শয়তানের এই প্রকার প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হইলে প্রতারণা ও অহমিকা দোষে দুষ্ট হইবে। ইহাই দ্বিতীয় আপদ।

আহার-প্রবৃত্তি বিনাশকারীর আপদের প্রতিকার—আহার প্রবৃত্তি বিনাশকারী উল্লিখিত আপদদ্বয় হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে বাজার হইতে লোকের সম্মুখে লোভনীয় বস্তু খরিদ করা তাহার কর্তব্য। ইহা গৃহে আনয়ন করত স্বয়ং ভোজন না করিয়া লুক্কায়িতভাবে দীনদরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ সংকল্পের নিদর্শন এবং মহা সাধক সিদ্দীকগণ এইরূপ কার্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কার্য নিতান্ত দুঃসাধ্য। ইহা প্রসন্নচিত্তে সহজভাবে করিতে পারিলে বুঝিতে হইবে, সংকল্প বিশুদ্ধ হইয়াছে। আর ইহাতে হৃদয়ের স্বাভাবিক আনন্দ ও প্রসন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হইলে বুঝিবে, মনের গোপন কোণে এখনও রিয়া রহিয়াছে। অতএব আহার প্রবৃত্তি বিনাশকারীর হৃদয়ে রিয়া থাকিলে তাহাকে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্‌র আজ্ঞাধীন দাস বলা চলে না' বরং সে প্রবৃত্তিরই আজ্ঞাধীন দাস। আর যে ব্যক্তি আহার প্রবৃত্তি দমন করিতে যাইয়া রিয়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, তাহাকে এমন ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যে বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয়ে পানি নিকাশকারী পুতিগন্ধময় ময়লাযুক্ত নর্দমায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

আহার-প্রবৃত্তি কর্তনের পর কাহারও হৃদয়ে উল্লিখিত আপদের সন্ধান মিলিলে লোকের সম্মুখে সামান্য ভক্ষণ করা তাহার উচিত। ইহাতে তাহার ক্ষুধাও নিবৃত্ত হইবে এবং রিয়া হইতেও অব্যাহতি লাভ করিবে।

কামরিপু

কামরিপুর আপদ—আল্লাহ্ মানব হৃদয়ে কামভাব এইজন্য চাপাইয়া দিয়াছেন যে, ইহার উত্তেজনায় সে স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গমে বীজ বপন করিবে এবং ফলে মানব বংশ

বিলুপ্ত হইবে না। সম্ভোগকালে সে যেন স্বর্গীয় সুখ-আস্বাদের একটু নমুনা পায়, ইহাও কামভাব প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু কামরিপুর বশীভূত হইয়া গেলে মানুষকে বহুবিধ ভয়ংকর আপদে নিপতিত হইতে হয়।

একদা শয়তান হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে সম্বোধন করিয়া বলিল– "নির্জনে কোন কামিনীর সঙ্গে কখনও বসিবে না; কারণ নির্জনে কোন কামিনীর সহিত উপবেশন করিলে আমি তাহাদের পিছনে এইরূপভাবে লাগিয়া যাই যে, অবশেষে তাহাদিগকে বিপদে না ফেলিয়া কখনও বিরত হই না।" হযরত সা'য়ীদ মুসায়েব (র) বলেন– "আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণকে কামিনীর ফাঁদে আটকাইতে না পারিয়া শয়তান নিরাশ হইয়া রহিয়াছে। কামিনীর ফাঁদকে আমি যত ভয়াবহ মনে করি, আর কোন বিষয়কেই তত ভয়াবহ মনে করি না। এই কারণেই আমি স্বীয় গৃহ ও আমার পুত্রের গৃহ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যাই না।"

কামরিপুর অবস্থা—অবস্থা বিশেষে কামরিপু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ঃ (১) অত্যধিক, (২) অত্যল্প ও (৩) মধ্যম। কামভাব সীমা অতিক্রম করিয়া অনিয়মিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মানুষ অশ্লীল ব্যভিচারকর্মে লজ্জা বোধ করে না এবং তখন ইহাতেই সে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। কামপ্রবৃত্তি এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ইহার শক্তি হ্রাস করিবার নিমিত্ত বরাবর রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। ইহাতেও কামরিপুর উত্তেজনা হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করা আবশ্যক। কামভাব একেবারে জাগরিত না হওয়াও অনিষ্টকর। আর কামভাবের মধ্যম অবস্থা এই যে, যদি হৃদয়ে কামভাব জাগরিত হয়, তবে ইহা মানবের বশীভূত থাকে।

অবস্থাবিশেষে কামবর্ধক দ্রব্য ব্যবহারের অনুমতি—কামপ্রবৃত্তি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত নির্বোধের কাজ। ভীমরুলের বাসায় খোঁচা দেওয়ার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। কেহ ভীমরুলের বাসায় খোঁজা দিলে ভীমরুল তাহাকে দংশন না করিয়া নিরস্ত হয় না। তদ্রূপ কামপ্রবৃত্তিকেও উত্তেজিত করিবার জন্য কেহ ঔষুধ ব্যবহার করিলে ইহাও তাহার দুর্গতি না ঘটাইয়া নিরস্ত থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছে, তাহার স্ত্রীদের যথাযথ হক আদায় ও তাহাদিগকে যত্নের সহিত রক্ষার উদ্দেশ্যে বীর্যবর্ধক ঔষধ ব্যবহার ও পুষ্টিকর আহার তাহার পক্ষে নিন্দনীয় নহে, কারণ, স্বামী পত্নীদের দুর্গস্বরূপ যাহাতে তাহারা আশ্রয় লইয়াছে।

'গারায়িবুল আখ্‌বার' কিতাবে বর্ণিত আছে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার কামভাবের দুর্বলতা অনুভব করেন। এমতাবস্থায়, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তাঁহাকে 'হারিসা' খাইতে বলেন। কারণ তাঁহার নয় জন স্ত্রী ছিলেন, দুনিয়ার সকল লোকের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হারাম ছিল এবং নিখিল বিশ্ব হইতে তাঁহাদের কামনা বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত ছিল।

প্রেমাসক্তি—কামপ্রবৃত্তির আপদসমূহের অন্যতম বড় আপদ প্রেমাসক্তি। ইহা বহুবিধ পাপের মূল কারণ। যৌবনের প্রথম হইতেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না

করিলে প্রেমাসক্ত হইয়া মানুষ পাপসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে পারে। চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখাই সতর্কতা অবলম্বনের উত্তম ব্যবস্থা।

কামিনীর প্রতি সংযমহীন দৃষ্টিপাতের আপদ—অকস্মাৎ কোন কামিনী দৃষ্টিগোচর হইলে তৎক্ষণাত তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হইবে এবং এইরূপে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন পুনর্বার তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত না হয়। এইরূপে প্রথম হইতেই চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখা সহজসাধ্য। কিন্তু প্রথমে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিয়া পরিশেষে ইহাকে বশীভূত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে প্রবৃত্তিকে চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। পশুর গতি পরিবর্তন করিতে চাহিলে প্রথমেই ইহার লাগাম ধরিয়া আকর্ষণ করিলে ইহা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু হস্ত হইতে লাগাম পরিত্যাগ করিয়া পরে ইহার লেজ ধরিয়া আকর্ষণ করিলে কোন লাভ হয় না; লেজ ধরিয়া ইহার গতি ফিরানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। মোটের উপর চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখাই মূল উদ্দেশ্য।

হযরত সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন– "হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম চক্ষুর দরুনই বিপদে পতিত হইয়াছিলেন।" হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম স্বীয় পুত্রকে নসীহত করিয়াছিলেন– "বাঘ ও অজগরের পিছনে গমন করা বরং শ্রেয়ঃ, কিন্তু তবুও রমণীর পিছনে ধাবিত হওয়া কখনই সঙ্গত নহে।" হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলায়হিস্ সালামকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল– "ব্যভিচার কোথা হইতে জন্মে?" তিনি বলিলেন– "চক্ষু হইতে।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্যে (অসংযত) দৃষ্টি একটি বিষময় তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখে, আল্লাহ্ তাহাকে এইরূপ ঈমান দান করেন যাহার মাধুর্য সে আপন অন্তরে অনুভব করে।" তিনি বলেন– "আমার পরলোকগমনের পর আমার উম্মতের জন্য রমণীর ন্যায় এত কঠিন বিপদ আর কিছুই থাকিবে না।" তিনি অন্যত্র বলেন– "গুপ্তাঙ্গের মত চক্ষুও যিনা করে।" কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাতই চক্ষের যিনা। যে ব্যক্তি চক্ষুকে সংযত রাখিতে পারে না, অনতিবিলম্বে ইহা দমনের উপায় অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। কঠোর সাধনা ও রোযা দ্বারা কামপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত ও সংযত করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী না হইলে বিবাহ করিয়া হালাল উপায়ে স্ত্রী-সম্ভোগ করত দুর্দমনীয় কামরিপু দমন করিতে হইবে।

বালকদের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টির আপদ—রমনীয় অজাতশ্মশ্রু কিশোর বালকের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাতেও ভীষণ বিপদের আশংকা রহিয়াছে। কিশোর বালকের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত কখনও জায়েয হইতে পারে না। কামভাবের তাড়নায় কিশোর বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবৈধ। কিন্তু সবুজ বৃক্ষলতাদি পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ মাঠ, নানা বর্ণ ও গন্ধের ফুল ও কলিকা এবং সুরম্য কারুকার্য দেখিলে যেরূপ সুখ অনুভূত হয়, কিশোর বালকের সুন্দর মূর্তি দর্শনেও যদি মনে তদ্রূপ আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। তবে ইহা তখনই দোষহীন বলিয়া গণ্য হইবে যখন

দর্শকের হৃদয় সেই বালকের সঙ্গলাভের জন্য উৎসুক না হইয়া উঠে; কেননা ফুল, কলিকা ও সবুজ তৃণক্ষেত্র যতই রমণীয় হউক না কেন, দর্শক উহাদিগকে স্পর্শ ও চুম্বনাদি করিতে লালায়িত হয় না, বরং উহা দেখিয়াই আনন্দ লাভ করে। সুন্দর বালক দেখিলে যদি কেহ তাহার সঙ্গলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তবে ইহাকে কামপ্রবৃত্তি বলিয়া মনে করিবে এবং ইহাই পুরুষ সম্ভোগরূপ জঘন্য ব্যভিচারের প্রথম ধাপ।

একজন কামিল পীর বলেন- "কোন সুন্দর কিশোর বালকের সহিত আমার কোন মুরীদের সাক্ষাত ঘটিলে আমি যেরূপ ভীত হই, ভীষণ ক্রুদ্ধ বাঘ লাফাইয়া পতিত হইলেও আমি তত ভয় করি না।"

কামপ্রবৃত্তি দমনের উপায়—জনৈক ধর্মপথ-যাত্রী বলেন- "একদা আমার হৃদয়ে কামভাব এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ইহার উত্তেজনায় আমি অধীর হইয়া খুব ক্রন্দন করিলাম এবং ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অনেক প্রার্থনা করিলাম। রাত্রে স্বপ্নে একজন বুযুর্গকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার কি হইয়াছে?' আমি তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। তিনি আমার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিলেন। আমি জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, আমার কামপ্রবৃত্তি শান্ত ও সংযত হইয়াছে! এক বৎসর কাটিয়া গেলে আবার কামভাব প্রবল হইয়া উঠিল। আমি আবার রোদন করিয়া কামভাব দমনের জন্য নিবেদন করিলাম। স্বপ্নে পুনরায় সেই বুযুর্গকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- 'তুমি কি চাও যে, আমার মধ্যস্থতায় তোমার কামভাব দমন হউক?' আমি বলিলাম- 'হাঁ।' তিনি আমাকে মাথা নোয়াইতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। তৎপর তিনি তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া আমার গ্রীবাদেশে প্রহার করিলেন। জাগ্রত হইয়া দেখিলাম আমার কামভাব শান্ত হইয়াছে। বৎসরান্তে আবার কামপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি আবার পূর্ববৎ রোদন করিয়া প্রার্থনা করিলাম এবং স্বপ্নে সেই বুযুর্গের সাক্ষাত লাভ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন- 'অন্তর হইতে যাহার উৎপাটন আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, ইহার উচ্ছেদের জন্য কতবার প্রার্থনা করিবে?' তৎক্ষণাত আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তৎপর আমি বিবাহ করিয়া কামপ্রবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করিলাম।"

কামরিপুর বিরুদ্ধাচরণে সওয়াব—রিপু যত অধিক বলবান হইবে, ইহার বিরুদ্ধাচরণে তত অধিক সওয়াব মিলিবে। কামভাবের ন্যায় এত বলবান কোন রিপু মানুষের আর নাই। তদুপরি ইহা তাহাকে অতি হীন কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

যাহারা প্রবল তাড়না সত্ত্বেও কামভাব চরিতার্থ করে না, তাহারা সকলেই যে আল্লাহ্‌র ভয়ে এই হীন কাজ হইতে বিরত থাকে তাহা নহে; বরং অধিকাংশ লোকই সুযোগের অভাব, অক্ষমতা ও লোকলজ্জার ভয়ে নিরস্ত থাকে। লোকলজ্জার ভয় এই যে, ব্যভিচার প্রকাশ হইলে বদনাম রটিবে। যাহারা এই ত্রিবিধ কারণে কামরিপু দমন করে, তাহারা কোনই সওয়াব পাইবে না। কেননা, কেবল সাংসারিক স্বার্থের

অনুরোধে তাহারা এইরূপ কুৎসিত কর্ম হইতে নিরস্ত থাকে, শরীয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রমের ভয়ে নহে। তবে যে কোন কারণেই হউক, গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

যাহার কামরিপু চরিতার্থ করিবার সম্পূর্ণ শক্তি ও সুবিধা আছে এবং ইহা সমাধানের পথে কোন বাধাবিঘ্ন নাই, কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সে গোনাহ্ হইতে নিরস্ত থাকে, সে মহা সওয়াব পাইবে। এই প্রকার ব্যক্তি ঐ সাত শ্রেণীর লোকের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিবে। তদুপরি কামভাব দমন ব্যাপারে সেই ব্যক্তি হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের তুল্য মর্যাদা লাভ করিবে। কেননা তিনি কামরিপু বিজয়ীদের একচ্ছত্র অগ্রগামী নেতা।

রমণী-প্রলোভন সংবরণের উপাখ্যান—(১) হযরত সুলায়মান ইব্‌নে বাশার অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ ছিলেন। এক পরমা সুন্দরী যুবতী স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে চাহিল, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি বলেন, সেই রাত্রে স্বপ্নে তাঁহার সহিত হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সাল্লামের সাক্ষাত ঘটে। তাঁহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- "আপনি কি হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম?" তিনি বলিলেন- "হাঁ; আমি সেই ইউসুফ যাহার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু তুমি সেই সুলায়মান যাহার ইচ্ছাও হয় নাই।" এই উক্তিতে কুরআন শরীফের এই আয়াতের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا অর্থাৎ 'অবশ্য সেই রমণী (যুলায়খা) ইচ্ছা করিয়াছিল তাঁহার (হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের) দিকে এবং তিনিও (হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম) অভিলাষ করিয়াছিলেন সেই রমণীর (যুলায়খার) দিকে।

(২) হযরত সুলায়মান ইব্‌নে বাশার (র) হইতে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন- "আমি হজ্জের উদ্দেশে বহির্গত হইয়াছিলাম। মদীনা শরীফ অতিক্রম করিয়া 'আইওয়া' নামক স্থানে উপনীত হইলে কিছু খাদ্যসামগ্রী খরিদ করিবার জন্য আমার সাথী দূরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় আরব বংশীয় এক পরমা রূপবতী রমণী নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র তুল্য মুখমণ্ডল হইতে ঘোমটা উন্মুক্ত করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং আবেগপূর্ণ দুইটি কবিতা আবৃত্তি করিল। কবিতার মর্মে আমি বুঝিলাম প্রবল ক্ষুধা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে এবং সে কিছু আহার্য সামগ্রী প্রার্থনা করিতেছে। আমি তাহাকে খাদ্যদ্রব্য দিতে চাহিলাম; কিন্তু সে স্পষ্টভাবে বলিল যে, সে ইহা প্রার্থনা করে নাই, বরং যুবকের নিকট যুবতীর যে সম্ভোগ ইহার জন্যই সে লালায়িত। ইহা শ্রবণে আমি অবনত মস্তকে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া সেই যুবতীর কাম-বাসনা অপসারিত হইল এবং তাহার মুখমণ্ডল ঘোমটা দ্বারা আবৃত করত সে স্বীয় গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল।

"এমন সময় আমার সাথী খাদ্য সামগ্রী লইয়া প্রত্যাবর্তন করত আমার

মুখমণ্ডলে রোদনের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, গৃহে স্ত্রী-পুত্র রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের বিরহ যাতনায় রোদন করিলাম। আমার সাথী বলিলেন- "যাঁহার হৃদয় পার্থিব মায়া-মমতার ঊর্ধ্বে, স্ত্রী-পুত্রের বিরহ তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কখনও হইতে পারে না; অবশ্য অপর কোন ব্যাপার হইয়াছে।' যাহা হউক, বহু অনুনয়-বিনয়ের পর আমি তাঁহাকে প্রকৃত ঘটনা আনুপূর্বক শুনাইলাম। ইহা শুনিয়া আমার সাথীও রোদন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে ঐরূপ প্রলুব্ধ করিলে তিনি কখনও লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না, এইজন্যই তিনি রোদন করিতেছেন।

"সে যাহাই হউক, আমরা মক্কা শরীফে উপনীত হইয়া তওয়াফ ও হজ্জের অন্যান্য ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলাম। তৎপর এক প্রকোষ্ঠে আমি নিদ্রিত হইলে স্বপ্নযোগে উন্নত দেহ, প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত মূর্তি, চন্দ্রবদন বিশিষ্ট, পরম রমণীয় গৌরবর্ণ এক ব্যক্তির দর্শন লাভ করিলাম। তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন- 'আমার নাম ইউসুফ।' আমি বলিলাম- 'আপনি ইউসুফ সিদ্দীক?' তিনি বলিলেন- 'হাঁ।' আমি বলিলাম- আযীযের স্ত্রী সম্পর্কে আপনার কাহিনী অত্যন্ত অদ্ভুত ও অলৌকিক।' তিনি বলিলেন- 'আরব বংশীয়া যুবতী সম্পর্কে তোমার উপাখ্যান ইহা অপেক্ষা অধিক অদ্ভুত ও অলৌকিক।"

(৩) হযরত ইব্‌নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "অতীতকালে তিনজন লোক দেশ পর্যটনে বাহির হন। রজনী আগমনে নিরাপদ হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা এক পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হঠাৎ একটি প্রস্তর পর্বতশিখর হইতে ঐ গুহার মুখে এইরূপে পতিত হইল যে, গুহার ভিতর হইতে বাহির হইবার আর কোন পথ রহিল না। (প্রস্তরখণ্ড এত ভারী ছিল যে,) তাঁহারা ইহা নড়াইতেও অসমর্থ ছিলেন। নিতান্ত অসহায় এই তিনজন লোক (প্রাণ বাঁচাইবার কোন উপায় না দেখিয়া) পরস্পর পরামর্শ করত স্থির করিলেন- 'চল, আমরা তিনজনে নিজ নিজ সৎকর্মের নাম উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি, ইহাতে হয়ত তিনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।"

"তাঁহাদের একজন নিবেদন করিলেন- 'হে খোদা, তুমি অবগত আছ, আমার মাতাপিতা ছিলেন। তাঁহাদিগকে ভোজন না করাইয়া আমি কখনও ভোজন করি নাই এবং আমার স্ত্রী-পুত্রদিগকেও আহার প্রদান করি নাই। একদা কোন কার্য উপলক্ষে আমি কিছু দূরে গিয়াছিলাম। গভীর রাত্রে আমি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম, আমার মাতাপিতা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। আমি এক পেয়ালা দুধ লইয়া আসিয়াছিলাম। ইহা হস্তে ধারণপূর্বক তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গের প্রতীক্ষায় শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সন্তানগণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় অত্যন্ত রোদন করিতেছিল।

আমি তাহাদিগকে বলিলাম- 'আমার মাতাপিতা পান করিবার পূর্বে তোমাদিগকে কিছুতেই দিব না।' আমার মাতাপিতা প্রভাতকাল পর্যন্ত নিদ্রিত রহিলেন। আমি দুগ্ধের পেয়ালা হাতে লইয়া সারা রাত্রি দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সন্তানগণ ও আমরা স্বামী-স্ত্রী সকলেই ক্ষুধিত ছিলাম। হে খোদা, যদি তুমি জান যে, কেবল তোমার সন্তোষ অর্জনের জন্যই আমি ঐ কার্য করিয়াছিলাম, তবে আমাদের এই বিপদ দূর কর।' এই ব্যক্তির প্রার্থনার ফলে প্রস্তরখণ্ড সরিয়া একটু ফাঁক হইল, কিন্তু মানুষ বাহির হইয়া আসিতে পারে, ইহা এত প্রশস্ত হইল না।

"তৎপর দ্বিতীয় ব্যক্তি নিবেদন করিলেন- 'হে খোদা, তুমি অন্তর্যামী তুমি জান, আমার চাচার এক কন্যা ছিল। আমি তাহার প্রতি আশিক ছিলাম। সে আমার কথা মানিত না। এমন সময় এক বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইহাতে নিঃসহায় হইয়া সে আমার প্রতি হাসি-তামাসা করিতে লাগিল। আমি যাহা বলিব, সে তাহাই করিবে, এই অঙ্গীকারে আমি তাহাকে একশত বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। মোটের উপর আমি যখন অপকর্মের নিকটবর্তী হইলাম তখন সে বলিল- 'তুমি ভয় কর না? আল্লাহ্‌র মোহর তাঁহার আদেশ ব্যতীত উন্মুক্ত করিতে যাইতেছ?" আমি ভীত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। নিখিল বিশ্বে সেই যুবতীর ন্যায় আমার নিকট লোভনীয় আর কিছুই ছিল না, তথাপি আর কখনও আমি তাহার কামনা করি নাই। হে খোদা, তুমি যদি জান যে, কেবল তোমার প্রসন্নতা লাভের জন্যই আমি ঐরূপ করিয়াছি, তাহা হইলে এই বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।' পুনরায় প্রস্তরখণ্ড আরও একটু নড়িয়া গেলে গুহার মুখ পূর্বাপেক্ষা বড় হইল, কিন্তু (সেই পথ) মানুষ বাহির হইবার উপযোগী হইল না।

"পরিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ নিবেদন করিতে লাগিলেন-'হে খোদা, তুমি জান। একবার আমি কয়েকজন শ্রমিক-মজুর কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। সকলকেই তাহাদের বেতন দিয়াছিলাম, কিন্তু একজন তাহার বেতন না লইয়াই চলিয়া গেল। তাহার বেতন দিয়া একটি ছাগল খরিদ করত তদ্দ্বারা আমি ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিলাম। ইহাতে অনেক ধন জমা হইল। একদা সেই মজুর তাহার বেতন নিতে আসিল। তখন গাভী, বলদ, উট, ছাগল, দাস-দাসী ইত্যাদি বহু সামগ্রী ঐ কারবারে সঞ্চিত হইয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম-'এই সমস্তই তোমার বেতন (তুমি এই সমস্ত লইয়া যাও)।' সে বলিল- 'আপনি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন?' আমি বলিলাম-'না, ঠাট্টা নয়; বাস্তবিকই এই সমস্ত তোমার বেতন হইতে সঞ্চিত হইয়াছে।' এই কথা বলিয়া সকল ধন-সম্পদ তাহাকে দিয়া দিলাম; উহা হইতে আমি এক কপর্দকও গ্রহণ করিলাম না। হে খোদা, তুমি যদি অবগত থাক যে, শুধু তোমার সন্তোষ লাভের জন্যই আমি ঐ কার্য করিয়াছি, তবে আমাদের এই বিপদ দূর কর।' প্রস্তরখণ্ড তৎক্ষণাত সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইল, রাস্তা উন্মুক্ত হইল, তাঁহারা বাহির হইয়া আসিলেন এবং বিপদ দূর হইল।"

(৪) হযরত করব ইব্‌নে আবদুল্লাহ মুযানী (র) বলেন- "এক কসাই তাহার প্রতিবেশীর এক দাসীর প্রতি আশিক ছিল। একদা সেই দাসী কোন কার্য উপলক্ষে এক জনশূন্য পার্বত্য-পথে গমন করিতেছিল দেখিয়া গোপনে সেই কসাই তাহার পশ্চাতে লাগিল এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দাসী তখন তাহাকে বলিল- 'হে যুবক, তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসি। কিন্তু কি করিব, আমি যে আল্লাহ্‌কে ভয় করি।' ইহা শুনিয়া কসাইর চৈতন্যোদয় হইল এবং বলিল- 'হে সাধ্বী, তুমি যখন আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন আমি কিরূপে তাঁহাকে ভয় করিব না?' ইহা বলিয়া সে তওবা করিল এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল। পথে তাহার প্রবল তৃষ্ণা হইল, এমনকি ইহাতে তাহার প্রাণহানির উপক্রম হইল। এমন সময় তদানীন্তনকালের পয়গম্বর কর্তৃক প্রেরিত একজন লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কসাইর ব্যাকুল অবস্থা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- 'তুমি কি আপদের সম্মুখীন হইয়াছ?' কসাই বলিল- 'প্রবল তৃষ্ণা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন- 'এস, আমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র নিকট মেঘের জন্য প্রার্থনা করি, যেন শহরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত মেঘ আমাদের উপর ছায়া দান করিতে থাকে।' কসাই বলিল- 'আমার কোন সৎকর্ম নাই যাহাতে আমার প্রার্থনা গৃহীত হইতে পারে। আপনি প্রার্থনা করুন, আমি 'আমীন' (তাহাই হউক) বলিব।'

"যাহাই হউক, কসাইর কথানুযায়ী প্রার্থনা করা হইল। ফলে মেঘ আসিয়া তাঁহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়া সাথে সাথে চলিতে লাগিল। যখন তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিলেন, তখন মেঘটি কসাইর উপর ছায়া প্রদান করিতে করিতে চলিতে লাগিল এবং পয়গম্বরের প্রেরিত ব্যক্তি প্রখর রৌদ্রে চলিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি কসাইকে বলিলেন- 'হে যুবক, তুমি ত বলিয়াছিলে, তোমার কোন সৎকর্ম নাই, এখন দেখিতেছি মেঘ কেবল তোমাকে ছায়া দানের জন্যই আগমন করিয়াছে। তোমার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা কর।' কসাই বলিল- 'এক দাসীর কথায় আমি আজ অপকর্ম হইতে তওবা করিয়াছি, এতদ্ব্যতীত আমি আর কিছুই জানি না।' ঐ ব্যক্তি বলিলেন-'তাহাই হইবে। কারণ আল্লাহ্‌র নিকট তওবাকারীর প্রার্থনা যেরূপ কবূল হইয়া থাকে, আর কাহারও প্রার্থনা তদ্রূপ কবূল হয় না।"

রমণীর প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি ও ইহার আপদ—যে কাজ করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে, অথচ ইহা হইতে সে নিজেকে বিরত রাখে, এমন উদাহারণ জগতে নিতান্ত বিরল। অতএব যে কারণে মানুষ প্রথমত গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহা দমন করাই তাহার পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। মানুষ যে কামরিপুর তাড়নায় উত্তেজিত হইয়া কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়, চক্ষুই ইহার আদি কারণ।

হযরত আলী ইব্‌নে যিয়াদ (র) বলেন- "রমণীদের গাত্রাবরণের উপরও দৃষ্টিপাত করিও না। ইহাতে হৃদয়ে কামরিপু জাগিয়া উঠে।" স্ত্রীলোকদের পরিহিত বস্ত্র-দর্শন করা, তাহাদের সুগন্ধের ঘ্রাণ লওয়া এবং তাহাদের কণ্ঠস্বর শ্রবণ হইতে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য। কামিনীদের নিকট সংবাদ পাঠানো, কোন সংবাদ তাহাদের নিকট হইতে শোনা, যে পথ দিয়া গমন করিলে রমণীদের দৃষ্টি তোমার উপর পতিত হয়, তুমি তাহাদিগকে দেখিতে না পাইলেও সেই পথ অবলম্বন করা তোমার উচিত নহে। কারণ, এইরূপ কার্যে মানব হৃদয়ে কামরিপু ও কুভাবের বীজ উপ্ত হয়। তদ্রূপ রমণীদের পক্ষেও পুরুষদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে অকস্মাৎ তাহাদের উপর দৃষ্টি পড়িয়া গেলে ইহাতে কোন পাপ হইবে না বটে, কিন্তু এমন স্থলে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা অবৈধ। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"তোমার পক্ষে প্রথম দৃষ্টি বৈধ, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি অবৈধ।" তিনি অন্যত্র বলেন-" কোন ব্যক্তি যদি কাহারও প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজকে রক্ষা করত প্রেমাসক্তি লুক্কায়িত রাখে এবং সেই প্রেমানলে বিদগ্ধ অবস্থায় সে পরলোকগমন করে, তবে সেই ব্যক্তি শহীদের মর্তবা লাভ করিবে।" এস্থলে নিজকে রক্ষা করার অর্থ এই- প্রথম দৃষ্টি ত অকস্মাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়িয়া গিয়াছিল, তৎপর চক্ষু সংযত রাখা, ইচ্ছা করিয়া দ্বিতীয়বার না দেখা, দর্শনের সুযোগ অন্বেষণ না করা, প্রেমাসক্তি হৃদয়ে গোপন রাখা এবং ইহার কোন নিদর্শনও প্রকাশ না করা।

রমণী সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ—নিমন্ত্রণ-আসর ও সভা-সমিতিতে পর্দা ব্যতীত নর-নারীর একত্রে উপবেশন এবং রমণী-প্রদর্শনীতে যেরূপ জঘন্য কুফল ফলিয়া থাকে, অন্য আর কিছুতেই তদ্রূপ ঘটে না। এইরূপ সভা ও সমাজে কেবল চাদর এবং চিত্তাকর্ষক অবগুণ্ঠন ও ঘোমটা দর্শনে কামভাব অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে; কেননা, ইহাতে পুরুষের হৃদয় ও চক্ষু অত্যধিক প্রলুব্ধ হইয়া থাকে। ইহার চেয়ে বরং সাজসজ্জা ব্যতীত সাধারণ বেশে অনাবৃত বদনে থাকাও ভাল। শুভ্র ও নানা বিচিত্র রঙ্গের চাদর পরিধান করিয়া চিত্তাকর্ষক অবগুণ্ঠনে বহির্গত হওয়া নারীদের পক্ষে অবৈধ। যে সকল নারী এইরূপ করে, তাহারা পাপী। যে পিতা, ভাই এবং স্বামী এইরূপ গর্হিত কার্যে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মতি দেয়, তাহারাও এই পাপের অংশী হইবে। কোন পুরুষের পক্ষে কামভাবে স্ত্রীলোকের পরিহিত বস্ত্র পরিধান করা, ইহা হাতে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা বা গন্ধ লওয়া, হার বা অন্য কোন কোন প্রকার চিত্তাকর্ষক বস্তু রমণীদের নিকট প্রেরণ করা বা তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা বা তাহাদের সহিত মিষ্টি বাক্যালাপ করা বৈধ নহে। তদ্রূপ স্ত্রীলোকদের পক্ষেও পরপুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা অবৈধ। কিন্তু নিতান্ত অপরিহার্য কারণবশত রমণীদের পক্ষে কর্কশ ভাষায় পরপুরুষদের সহিত কথা বলার বিধান আছে। এই সম্বন্ধে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সহধর্মিনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ـ

অর্থাৎ "যদি তোমরা পরহেযগারী কর তবে কথায় নম্রতা করিও না, তাহা হইলে যাহার অন্তরে রোগ আছে সে (তোমাদের প্রতি) লোভ করিবে এবং সোজা কথা বল।"

কোন স্ত্রীলোক পেয়ালার যে স্থানে মুখ দিয়া পানি পান করিয়াছে, ইচ্ছাপূর্বক সেই স্থানে মুখ দিয়া পানি পান করা এবং কোন নারী দন্তে কামড়াইয়া যে ফলের অংশবিশেষ কর্তন করত রাখিয়া দিয়াছে, ইহা আহার করা পুরুষের পক্ষে সঙ্গত নহে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ আয়্যুব আন্‌সারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর গৃহে অবস্থানকালে যে বর্তনে পানাহার করিতেন, যে বস্তু তিনি স্বীয় মুবারক অঙ্গুলী ও মুখে স্পর্শ করিতেন, পবিত্র জ্ঞানে সওয়াব লাভের আকাঙ্ক্ষায় হযরত আবূ আয়্যুব আন্‌সারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর স্ত্রী ও সন্তানগণ সেই বর্তনের সেই সেই স্থানে স্পর্শ করিতেন। এই কার্যে যখন নিষ্কলুষ মনোভাব ও শ্রদ্ধার সংমিশ্রণ ঘটে, তখন উহাতে সওয়াব হয়। আনন্দানুভব ও কামভাব চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে পরস্ত্রীর উচ্ছিষ্ট পানাহার করিলে পাপ হইবে এবং পরকালে আযাব ভোগ করিতে হইবে। অতএব সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বনে পরস্ত্রীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকল বস্তু হইতে দূরে সরিয়া থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রিয় পাঠক, সতর্ক হও, যে সকল দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোক পর্দাবিহীনভাবে মানুষের সম্মুখে বিচরণ করে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য শয়তান মানব হৃদয়ে উত্তেজনা দিতে থাকে। তখন শয়তানের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়া বলিবে- "আমি এই রমণীর প্রতি কেন চোখ তুলিয়া চাহিব? সে কুশ্রী হইলে আমার মন বিরক্ত হইবে, আবার পাপী ত হইবই। মন বিরক্ত হওয়ার কারণ এই যে, সেই রমণী সুন্দরী হইবে এই আশায়ই তো আমি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিব। আর সে সুন্দরী হইলে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা আমার পক্ষে হারাম। ইহাতে পাপ ত আছেই, তদুপরি বেদনাও হয়ত পাইব এবং কামনাও অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া দুর্দমনীয় লালসায় তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইলে আমার ইহ-পরকাল সমূলে বিনষ্ট হইবে।"

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পথে চলিবারকালে হঠাৎ এক সুন্দরী রমণীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তৎক্ষণাত তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করত স্ত্রী-সম্ভোগ করিলেন। তৎপর অনতিবিলম্বে স্নানান্তে গৃহের বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন- "যাহার সামনে পরপত্নী আসিয়া পড়ে এবং শয়তান তাহাকে যদি কামভাবে উত্তেজিত করে, তৎক্ষণাত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্ত্রী-সম্ভোগ করা উচিত। তোমার নিজ স্ত্রীর নিকট যাহা আছে, পরস্ত্রীর নিকটও তাহাই আছে।"

তৃতীয় অধ্যায়

বাহুল্য কথন-লালসা বর্জনের উপায় ও রসনার আপদ

জিহবা আল্লাহ্‌র বিচিত্র সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অন্যতম অদ্ভুত শিল্প। বাহ্যত ইহাকে শুধু একটি মাংসখণ্ড বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবপক্ষে ইহার অবাধ প্রভাব নিখিল বিশ্বের উপর রহিয়াছে। ইহার শক্তি যে কেবল বর্তমানের উপরই চলে তাহা নহে, বরং যে সমুদয় বস্তু এখনও সৃষ্ট হয় নাই এবং যাহার অস্তিত্ব অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, এই সমস্তের উপরও ইহার শক্তি চলে। ইহা বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের বিষয়সমূহ সমভাবে অনায়াসে বর্ণনা করিতে পারে। রসনা বুদ্ধির প্রতিনিধিস্বরূপ। কারণ, বুদ্ধির সীমার বাহিরে কিছুই নাই এবং বুদ্ধিতে যাহা আসে, চিন্তায় ও কল্পনায় যাহা অংকিত হয়, রসনা তৎসমুদয়ই অবাধে বর্ণনা করিতে পারে। রসনা ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের এইরূপ অপ্রতিহত শক্তি চলে না। দেখ, আকার ও রং ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে চোখের আধিপত্য নাই; শব্দ ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের উপর কানের অধিকার নাই। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়াদির অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ, এক একটি নির্ধারিত বিষয় বা ক্ষেত্রের উপর ইহাদের এক একটি শক্তি সীমাবদ্ধ। সমস্ত দেহরাজ্যের উপর মনের যেরূপ অপ্রতিহত শক্তি চলে রসনারও সকল বিষয়ের উপর তদ্রূপ শক্তি রহিয়াছে। হৃদয়ের সাথে রসনাও সমান তালে কাজ করিয়া যাইতে পারে। মনে পূর্ব হইতে সংগৃহীত ছবি বা ভাব গ্রহণ করিয়া রসনা ভাষার সাহায্যে ইহা ব্যক্ত করে।

মনের উপর রসনার প্রভাব—একদিকে মন হইতে ছবি বা ভাব সংগ্রহ করিয়া রসনা যেরূপ ইহা ভাষায় বর্ণনা করে, অপরদিকে, মনও তদ্রূপ রসনার বর্ণনা হইতে ছবি বা ভাব গ্রহণ করিয়া নিজের মধ্যে অঙ্কন করিয়া লইতে পারে। এইজন্য রসনা যাহা প্রকাশ করে, ইহার প্রভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য কর, রোদন বা বিলাপের সময় শোকগাথা রসনায় প্রকাশ করিতে থাকিলে একপ্রকার দীনভাব বা করুণারস মনকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। এইরূপ আবর্তনের দরুণ মানব-হৃদয়ে এক প্রকার তাপের সৃষ্টি হয়। এই হৃদয়োত্তাপ পরিশেষে মস্তকে যাইয়া আক্রমণ করিলে নয়নপথে অশ্রুবারি নির্গত হয়। তদ্রূপ মানুষ যখন আনন্দোদ্দীপক ও সুভাবের বাক্য বলে, তখন আনন্দে তাহার মন উদ্বেলিত হইতে থাকে এবং ইহার প্রভাবে তাহার হৃদয়ে প্রবৃত্তিসমূহ জাগিয়া উঠে। মোটকথা, মানুষ যেরূপ বাক্য বলে তাহার হৃদয়ে তদনুরূপ ভাবই জন্মিয়া থাকে। বক্তার কথা তাহার নিজ অন্তরে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, শ্রোতার অন্তরেও তদ্রূপ প্রভাব বিস্তার করে।

এইজন্য অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ বা শ্রবণ করিলে অন্তর অন্ধকার হইয়া যায় এবং সত্য ও সাধু বাক্যে মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

মিথ্যাবাদীদের অন্তর বিকৃত—মিথ্যা ও বক্র কথা বলিলে মানবমন অমসৃণ মুকুরের মত কর্কশ ও আঁকাবাঁকা হইয়া পড়ে। অমসৃণ মুকুরে যেমন কোন বস্তুর যথার্থ ছায়া প্রতিফলিত হয়না, কর্কশ ও টেরা হৃদয়ফলকেও তদ্রূপ কোন বস্তুর ছায়া যথার্থভাবে প্রতিবিম্বিত হয় না। অতিরঞ্জনকারী কবি ও মিথ্যাবাদীর অধিকাংশ স্বপ্নই অসত্য হইয়া থাকে। কারণ, মিথ্যাকথনের দরুণ তাহাদের হৃদয় অমসৃণ হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা সত্য কথা বলিতে অভ্যস্ত তাহাদের স্বপ্নও সত্য হইয়া থাকে।

মিথ্যাবাদী আল্লাহ্‌র যথার্থ দর্শনে বঞ্চিত—মিথ্যাবাদীর অন্তরে কোন পদার্থের ছায়া যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত না হওয়ার দরুন এখন যেমন সে সত্যস্বপ্ন দর্শন করে না, তদ্রূপ পরকালেও সে আল্লাহ্‌র যথার্থ দর্শন লাভ করিবে না; সে সব ফাঁপা ও শূন্য দেখিবে। আল্লাহ্‌র দর্শন সর্বাধিক মাধুর্যপূর্ণ; কিন্তু মিথ্যাবাদী এই পরম সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকিবে। সে যে আল্লাহ্‌র যথার্থ দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকিবে তাহাই নহে, বরং অমসৃণ মুকুরে যেমন পরম সুন্দর মুখমণ্ডলও কুশ্রী ও ভীষণ দেখায় মিথ্যাবাদীর হৃদয়ে পরলোকের বিষয়াদিও তদ্রূপ দেখাইবে এবং ইহাতে তাহার দুঃখ ও যাতনার সীমা থাকিবে না। মোটকথা, হৃদয়ের মসৃণতা ও বন্ধুরতা রসনা নিঃসৃত বাক্যের উপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ সত্য বলিলে হৃদয় মসৃণ হয়, আর মিথ্যা বলিলে অমসৃণ হয়। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "অন্তর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ঈমান ঠিক হয় না এবং রসনা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ঈমান ঠিক হয় না।"

মোটকথা, জিহবার অনিষ্টকারিতা ও আপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করা একটি অতীব জরুরী ধর্ম কর্তব্য। অতএব, এই অধ্যায়ে প্রথমত নীরবতার ফযীলত বর্ণিত হইবে; তৎপর রসনাপ্রসূত অনিষ্ট ও আপদসমূহ ক্রমশ বর্ণিত হইবে, যথা ঃ- বহুকথন, নিরর্থক বাক্য ব্যয়, ঝগড়া, বাদানুবাদ, অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, গালাগালি ও তিরস্কার করা, ধিক্কার ও অভিশাপ দেওয়া, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, মিথ্যা বলা, পরনিন্দা ও চোগলখোরী করা, দ্বিমুখী হওয়া, অতিরিক্ত প্রশংসা করা ইত্যাদি। সঙ্গে-সঙ্গে ইহাদের অনিষ্টকারিতা হইতে পরিত্রাণের উপায়ও প্রদর্শন করা হইবে।

নীরবতার উপকারিতা—রসনা হইতে বহু আপদ জন্মে। উহা হইতে নিস্তার লাভ করা বড় দুষ্কর; আর নীরবতা অবলম্বনই নিস্তার লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। অতএব, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কথা বলা উচিত নহে। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন- "যাহার আহার, নিদ্রা ও বাক্য অত্যাবশ্যক অভাব মোচনের জন্যই হইয়া থাকে, তিনি আব্‌দাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।"

আল্লাহ্ বলেন ঃ

لاَ خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوٰهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ -

অর্থাৎ "সাধারণ লোকের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে মঙ্গল নাই। হাঁ, তবে যে ব্যক্তি এরূপ যে দান অথবা কোন সৎকার্য বা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করিয়া দিবার উৎসাহ প্রদান করে (ইহাতে মঙ্গল আছে)।"

রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ مَنْ صَمَتَ نَجٰى অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মৌন রহিয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে।" তিনি অন্যত্র বলেন- "উদর, কামেন্দ্রিয় ও রসনার ক্ষতি হইতে আল্লাহ্ যাহাকে বাঁচাইয়াছেন, সে সকল আপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।"

হযরত মা'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু একদা রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "কোন কাজ উত্তম?" তিনি স্বীয় পবিত্র রসনা মুখ হইতে বাহির করত অঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন; অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইহাই বলিলেন যে, মৌন থাকাই উত্তম কার্য। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "আমি একদা হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখিতে পাইলাম, তিনি হাত দ্বারা স্বীয় রসনা টানিতেছেন এবং রগড়াইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- 'হে আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি, আপনি কি করিতেছেন?' তিনি বলিলেন- 'এই ক্ষীণ বস্তুটি (আমার উপর) অনেক কাজ চাপাইয়া দিয়াছে।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "রসনাই মানুষের অধিকাংশ পাপের উৎস।" একদা তিনি লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- 'সহজতম ইবাদত তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি, ইহা নীরব রসনা ও সৎস্বভাব।" তিনি অন্যত্র বলেন- "যাহারা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহাদিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন ভাল কথা ব্যতীত আর কিছুই না বলে, অথবা নীরব থাকে।" লোকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করিল- "আমাদিগকে এমন কিছুর সন্ধান প্রদান করুন যদ্দ্বারা আমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিব।" তিনি বলিলেন- "কখনও কথা বলিও না।" তাহারা বলিল- "ইহা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।" তিনি বলিলেন- "তাহা হইলে ভাল কথা ব্যতীত আর কিছুই বলিও না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কোন মুসলমানকে গম্ভীর ও নীরব দেখিতে পাইলে তাহার সংসর্গ কর; এইরূপ ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞানহীন হইতে পারে না।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন- "ইবাদতের দশটি অংশ; নীরবতার মধ্যে উহার নয়টি এবং অবশিষ্ট একটি লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করত নির্জনবাসে রহিয়াছে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে তাহার কথায় অধিক অপরাধ ও ভুল হয়, সে বড় পাপী; দোযখের অগ্নিই তাহার জন্য প্রকৃষ্ট স্থান।"

এই কারণেই হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু মুখে পাথর দিয়া থাকিতেন যেন কথা বলিতে না পারেন। হযরত ইব্‌নে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "কারাবদ্ধ থাকিবার নিমিত্ত রসনার ন্যায় এমন উপযুক্ত পদার্থ আর কিছুই নাই।"

হযরত ইউনুস ইব্‌নে ওবায়দ (র) বলেন- "আমি যাহাদিগকে নীরবে থাকিতে দেখিয়াছি, দেখিলাম তাহাদের সকল কর্মেই সুফল ফলিয়া থাকে।" একদা হযরত আমীর মুআবিয়ার সম্মুখে বহুলোক বাক্যালাপ করিতেছিল; কেবল হযরত আহ্‌নাফ (রা) নীরবে বসিয়াছিলেন। হযরত আমীর মুআবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "তুমি কিছু বলিতেছ না কেন?" তিনি বলিলেন- "অসত্য কথা বলিতে আল্লাহ্‌কে ভয় করি, আর সত্য বলিতে তোমাদিগকে ভয় করিয়া থাকি।" হযরত রাবী ইব্‌নে খাসিম (র) বিশ বৎসর পর্যন্ত পার্থিব কোন বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। প্রত্যুষে জাগ্রত হইয়াই তিনি কাগজ ও কলম দোয়াত নিকটে রাখিতেন এবং প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়া দিতেন। রজনীতে আবার নিজের নিকট হইতে ঐ সকল বাক্যের হিসাব গ্রহণ করিতেন।

রসনা হইতে বহু বিপদ উৎপন্ন হয়। রসনা হইতে অহরহ নিরর্থক কথাই বহির্গত হয়। বলা খুব সহজ; কিন্তু কোন্ কথা ভাল, আর কোন্‌টি মন্দ, ইহা বুঝা বড় দুষ্কর। এইজন্যই মৌনব্রত অবলম্বনে এত ফযীলত রহিয়াছে। নির্বাক থাকিলে ভাল-মন্দ নির্ধারণ সমস্যা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, মানসিক শান্তি অটুট থাকে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ধ্যানের অধিক সময় ও সুযোগ মিলে।

কথার শ্রেণী বিভাগ—লোকে যে সকল কথা বলে উহাকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণী—যে কথায় কেবল ক্ষতিই ক্ষতি।

দ্বিতীয় শ্রেণী—যে কথায় উপকার ও অপরকার মিশ্রিত রহিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণী—যে কথায় উপকার ও অপকার কিছুই নাই; ইহাই নিরর্থক কথা। তবে ইহার অপকারিতা এতটুকু যে, সেই কথা বলিতে যে সময় লাগে ইহা বৃথা অপব্যয় হইয়া থাকে।

চতুর্থ শ্রেণী—যে কথায় কেবল উপকারই উপকার এবং যাহাতে অপকারের লেশমাত্রও নাই।

এই চারি শ্রেণীর কথার মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর কথা বলিবার অনুপযুক্ত; উহা সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। একমাত্র শেষোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কথা সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ - الاية -

আর রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও এই সম্বন্ধেই বলিয়াছেন- "যে ব্যক্তি মৌন রহিয়াছে সে মুক্তি পাইয়াছে।"

রসনার বিপদসমূহ সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত না হইলে উল্লিখিত বর্ণনার গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না। এইজন্যই ইন্‌শাআল্লাহ্ একে একে এই আপদসমূহ বিস্তারিতভাবে আমরা বর্ণনা করিয়া দিতেছি।

রসনার আপদ

প্রথম আপদ—নিরর্থক অপ্রয়োজনীয় বাক্য। যে বাক্য বলার কোন আবশ্যকতা নাই, যাহা না বলিলে ইহকাল ও পরকালের কোন অনিষ্ট হয় না, এইরূপ কথা বলিলে মুসলমানী সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। এইজন্য রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যাহাতে মানুষের (ইহকাল ও পরকালে) কোন লাভ নাই তাহা পরিহার করাই তাহার ইসলামের সৌন্দর্য।" এই বেহুদা অনাবশ্যক কথা কাহাকে বলে ইহাও উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। ধরিয়া লও, অনেক লোকের মধ্যে উপবেশন করিয়া তুমি তোমার দেশ-ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করিতেছ, বিদেশ পর্যটনে যে সকল পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও বাগানাদি তুমি দর্শন করিয়াছ, উহার ঘটনা শুনাইতেছ, বিদেশ ভ্রমণকালে তোমার কি কি অবস্থা ঘটিয়াছে উহা বলিতেছ। এই সমুদয় বিষয় যাহা দর্শন, শ্রবণ ও ভোগ করিয়াছ যথাযথ বর্ণনা করিতেছ এবং উহার কোন বিষয় হ্রাস-বৃদ্ধি করিতেছ না। এতদ্‌সত্ত্বেও এই সকল ঘটনা বর্ণনা করা নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয়; কেননা তুমি উহা বর্ণনা না করিলে কিছুই ক্ষতি হইবে না।

মনে কর, তোমার সহিত কাহারও সাক্ষাত ঘটিল এবং নিরর্থক তুমি তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলে। এইরূপ প্রশ্নোত্তরে তোমার বা উত্তরদাতার কোনই লাভ বা ক্ষতি নাই। তাহা হইলেই এইরূপ প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয়। আবার এমন প্রশ্নও হইয়া থাকে যাহাতে উত্তরদাতার অনিষ্ট হয়। যেমন মনে কর, তুমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে- " আজ তুমি রোযা রাখিয়াছ কি?" সে যদি ঠিক বলে- "হাঁ, আমি রোযা রাখিয়াছি," তবে ইবাদত প্রকাশ করা হয়। আবার রোযা অস্বীকার করিলেও মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। সুতরাং অনুধাবন কর, একটা অশোভন প্রশ্ন করিয়া তাহাকে কিরূপ উভয় সঙ্কটে নিপতিত করিলে। তদ্রূপ যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর- "তুমি কোথা হইতে আসিলে? তুমি কি কর? তুমি পূর্বে কি করিতেছিলে?" ব্যক্তিগত কারণে এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান অসঙ্গত ও অসুবিধাজনক ভাবিয়া জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হয়ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। অপরদিকে, মিথ্যা অবশ্য বর্জনীয় এবং একটি মহাপাপ। যে উক্তিতে কোন লাভ-লোকসান, উপকার-অপকার এবং মিথ্যার লেশমাত্রও নাই ইহাকেই নিরর্থক কথা বলে।

বর্ণিত আছে, মহাত্মা লুকমান হাকীম পূর্ণ এক বৎসরকাল যাবত হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের নিকট গমনাগমন করিতেছিলেন। তিনি যখনই গমন করিতেন তখনই হযরত বর্ম নির্মাণে লিপ্ত থাকিতেন। কিন্তু তিনি কি কাজে লিপ্ত ছিলেন, ইহা লুকমান হাকীম বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, জানিবার ইচ্ছা থাকিলেও কোনদিন জিজ্ঞাসা করেন নাই। পরিশেষে, হযরত দাঊদ আলায়হিস সালাম কাজটি সমাপ্ত করত এতদিনে প্রস্তুত বর্মটি পরিধানপূর্বক বলিলেন- "যুদ্ধের জন্য ইহা উৎকৃষ্ট পোশাক।" লুকমান হাকীম তখন বুঝিলেন যে, ইহা বর্ম এবং বলিলেন- "নীরবতা আশ্চর্য কৌশল, কিন্তু ইহার প্রতি কাহারও আসক্তি নাই।"

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারীর ত্রিবিধ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; যথা ঃ (১) মানুষের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া, (২) জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপের সুযোগ লাভ করা, অথবা (৩) জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা তাহার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা। অনাবশ্যক কথনের অভিলাষ পরিহারের দুই প্রকার উপায় আছে; যথা ঃ জ্ঞানমূলক উপায় ও অনুষ্ঠানমূলক উপায়।

জ্ঞানমূলক উপায়—হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইবে যে মৃত্যু সম্মুখে অতি সন্নিকটে রহিয়াছে, কখন জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইবে নিশ্চয়তা নাই। জীবনের যে সময়টুকু বাকী আছে ইহা বৃথাকাজে অপব্যয় না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র যিকিরে অতিবাহিত করিতে হইবে। ইহাই পরকালের সম্পদ। কাজেই এই সম্পদ যত অধিক সম্ভব সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত আর বৃথা কথনে সময় অপচয় করিলে স্বীয় ক্ষতিই সাধন করা হয়।

অনুষ্ঠানমূলক উপায়—এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে অনাবশ্যক কথনের সুযোগ-সুবিধা বিদূরিত হয়। নির্জনে অবস্থান করিলে বা মুখে প্রস্তরখন্ড রাখিলে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় না।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, ওহুদের যুদ্ধে এক যুবক শহীদ হইলেন। দেখা গেল, তাঁহার উদরে প্রস্তরখন্ড বাঁধা রহিয়াছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিনি উদরে পাথর বাঁধিয়া জিহাদে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী পুত্রের মুখমন্ডল হইতে ধুলিবালি অপসারণ করিতে করিতে বলিলেন ঃ هَنِيْـئًا لَّكَ الْجَنَّةُ অর্থাৎ " হে বৎস, তোমার জন্য বেহেশ্‌ত মোবারক হউক।" ইহা শুনিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "কিরূপে তুমি অবগত হইলে (যে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে)? হয়ত সে এমন দ্রব্যে কৃপণতা করিয়াছে যাহা তাহার পক্ষে একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় বা এমন বিষয়ে কথা বলিয়াছে যাহাতে তাহার আবশ্যকতা ছিল না।" এই হাদীসের তাৎপর্য এই, পরকালে শহীদের নিকট হইতেও নিরর্থক কথার হিসাব গ্রহণ করা হইবে এবং এমন ব্যক্তির বদনই প্রসন্ন যাহার কোন যাতনা নাই ও হিসাব প্রদান করিতে হইবে না।

একদা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "এক বেহেশ্‌তী ব্যক্তি এখন দরজা দিয়া আসিতেছে।" এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তথায় আগমন করিলেন। সাহাবাগণ তাঁহার আমল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আপনার আমল (ক্রিয়াকলাপ) কি?" তিনি বলিলেন– "আমার আমল ত অতি সামান্য। কিন্তু যে-দ্রব্যে আমার আবশ্যকতা নাই ইহার নিকটেও আমি গমন করি না এবং অপরের অমঙ্গল কামনা করি না।" তোমার বক্তব্য যদি একটি বাক্যে প্রকাশ করিতে পার, অথচ তোমার কথা দীর্ঘ করত দুইটি বাক্যে প্রকাশ কর, তবে দ্বিতীয় বাক্যটি অনাবশ্যক কথার মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং পরকালে ইহা তোমার বিপদের কারণ হইবে।

একজন সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "কেহ আমাকে কোন প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর প্রদান আমার নিকট পিপাসার্তের পক্ষে ঠান্ডা পানি অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইলেও অনাবশ্যক কথনের আশংকায় আমি উত্তর প্রদানে নিরস্ত থাকি।" হযরত মুরতারাফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) বলেন– "সর্বস্থানে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ অপেক্ষা তাঁহার গৌরব ও মাহাত্ম্য তোমাদের অন্তরে অধিক হওয়া আবশ্যক। যেমন, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির প্রতি বিরক্ত হইয়া আল্লাহ্‌র নাম লইয়া ইহাদিগকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নহে।" রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি বাহুল্য কথা হইতে বিরত রহিয়াছে এবং অতিরিক্ত ধন বিতরণ করিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ থলিয়ার মুখের বন্ধন খুলিয়া স্বীয় মুখে বন্ধন লাগাইতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান।" তিনি অন্যত্র বলেন– "বাচালতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তু মানবের আর কিছুই নাই।"

সতর্ক হও। কারণ, মানুষ যাহা কিছু বলে তৎসমুদয়ই তাহার আমলনামায় লিখিত হয়। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ "মানুষের সহিত আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত চৌকিদার ফেরেশ্‌তাগণ সর্বদা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন; মানুষের মুখ হইতে যে কোন বাক্যই নির্গত হউক না কেন, তৎক্ষণাত তাঁহারা ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।"

দ্বিতীয় আপদ—বিদআত[১] ও পাপকার্যের বর্ণনা করা। বিদআত বিষয় লইয়া নিরর্থক বাক্যালাপ, বাক্-বিতন্ডা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং পাপানুষ্ঠানের গল্প করা নিতান্ত অনুচিত ও ক্ষতিকর। পাপানুষ্ঠানের গল্প এই মনে কর, একের সহিত অপরের ঝগড়া হইল; একজন অপরজনকে গালি বা কষ্ট দিল; কেহ-বা মদ্যপান, নৃত্যগীতাদির আসর জমাইল; আর তুমি এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলে বা কুৎসিত কোন বিষয় রসিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়া মানুষকে হাসাইলে। তদুপরি, বিদআতের আলোচনায় এবং পাপানুষ্ঠানের বর্ণনাতেও রসনার উল্লিখিত প্রথম প্রকার আপদ রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহাতে অনাবশ্যক কথায় মূল্যবান সময় অপচয় এবং বক্তার ইসলামী গাম্ভীর্য ও মর্যাদা নষ্ট হয়। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমন লোক আছে, যে অসতর্কভাবে এইরূপ কথা বলিয়া ফেলে যাহার গূঢ়তত্ত্ব সে উপলব্ধি করে না, অথচ ইহা তাহাকে দোযখের কূপ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। আবার এমন লোকও আছে, যে অসতর্কভাবে এইরূপ কথা বলিয়া ফেলে যাহা তাহাকে বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।

তৃতীয় আপদ—অন্যের কথার প্রতিবাদ করা ও বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া। কোন কোন মানুষের স্বভাব এই যে, অপরের কথা শুনিলেই সে বাদ-প্রতিবাদে ইহা অগ্রাহ্য করে এবং বলে– 'ইহা এমন নয় তেমন; ঐ উক্তির অর্থ সেইরূপ নহে, এইরূপ। তুমি

১. শরীয়তে অনুমোদিত নহে এইরূপ নতুন নতুন চালচলন ও আচরণকে ধর্ম-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে উহাকে বিদ্‌আত বলে। –অনুবাদক।

নির্বোধ, মূর্খ ও মিথ্যাবাদী; আমি বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সত্যবাদী।" এইরূপ বাদানুবাদে দুই প্রকার অনিষ্ঠকর প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে; যথা ঃ- (১) অহঙ্কার ও (২) হিংস্রতা।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'যে ব্যক্তি কথোপকথনের সময় বাদানুবাদ ও ঝগড়া হইতে বিরত থাকে এবং অসত্য কথা বলে না, তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি গৃহ প্রস্তুত হয়। আর যে ব্যক্তি সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক সত্য কথাও বলে না, তাহার জন্য বেহেশ্‌তের উচ্চ স্থানে একটি গৃহ নির্মিত হয়।" শেষোক্ত ব্যক্তির সওয়াব এত অধিক হওয়ার কারণ এই, অপরের অযৌক্তিক ও অসত্য বাক্য সহ্য করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন- "স্বীয় মত সত্য হইলেও তর্কস্থলে যে ব্যক্তি বাদানুবাদে নিরস্ত থাকে না, তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে নাই।"

পার্থিব বিষয়াদিতে বাদানুবাদ—ধর্মমত লইয়াই যে কেবল বাদানুবাদ হয়, তাহা নহে, বরং পার্থিব দৈনন্দিন ছোটখাট বিষয়াদি লইয়াও বাদানুবাদ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, কেহ একটি ডালিম দেখিয়া বলিল- "ইহা মিষ্টি; আর তুমি বলিলে- না, ইহা টক।" অথবা কেহ বলিল- "অমুক স্থান এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে; আর তুমি বলিলে- "না, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না।" এই প্রকার বাদানুবাদ নিতান্ত অন্যায়। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কাহারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হইলে দুই রাকাআত নামায ইহার প্রায়শ্চিত্ত।" কেহ কিছু বলিলে ইহার ভুল-ত্রুটি বাহির করিয়া সমালোচনা করা অবৈধ এবং ইহাও উল্লিখিত বাদ-প্রতিবাদের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ করিলে লোকের মনে অযথা কষ্ট দেওয়া হয় এবং কোন মুসলমানকে অকারণে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নহে। অপরপক্ষে, ঐরূপ বাক্যসমূহের ভুল-ত্রুটি প্রকাশ করিয়া সংশোধন করাও অবশ্য কর্তব্য নহে। বরং ঐ সকল স্থানে নীরব থাকাই ঈমানের নিদর্শন।

ধর্ম বিষয়ে বাদানুবাদ—ধর্ম-বিষয় অবলম্বনে বাদানুবাদকে 'জিদাল' বলে। ইহাও দূষণীয়। কিন্তু সত্য বিষয় বুঝাইয়া দিলে যদি প্রতীয়মান হয় যে, অপরপক্ষ মানিয়া লইবে, তবে নির্জনে বলাতে কোন দোষ নেই; নচেৎ নীরব থাকাই উত্তম। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "ধর্ম-বিষয় লইয়া কোন জাতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রবল না হইয়া উঠা পর্যন্ত সেই জাতি পথভ্রষ্ট হয় না।" লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদানকালে বলিলেন- " হে বৎস, ধর্ম-বিষয় লইয়া আলিমগণের সহিত ঝগড়া করিও না। অন্যথা তাঁহারা তোমাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিবেন।"

অযৌক্তিক ও অসত্য কথার প্রতিবাদ না করিয়া নিস্তব্ধ থাকা বড় সহিষ্ণুতার প্রমাণ। ইহাতে জিহাদে বিধর্মীগণের অন্যায় আক্রমণ সহ্য করার সওয়াবের ন্যায় সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত দাউদ তা'য়ী (র) লোকসংসর্গ ত্যাগ করত নির্জন বাস অবলম্বন করিলে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন- "তুমি বাহিরে আস না কেন?" তিনি বলিলেন- "আত্ম-দমন করত ধর্মবিষয়ে বাদানুবাদ হইতে নিজকে বিরত রাখিতেছি।" হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিলেন- "ধর্ম-বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদের সভায় গমন কর ও শ্রবণ কর; কিন্তু কিছু না বলিয়া চুপ থাক।" তিনি বলিলেন- "হাঁ, আমি ইহাই করিয়া আসিতেছি; কিন্তু উহা অপেক্ষা কঠিন অধ্যবসায়ের কার্য আর কিছুই নাই।"

কোন স্থানের লোক ধর্ম বিষয়ক কুসংস্কারে লিপ্ত হইলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা মান-মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে যদি বলে, ধর্ম-মত লইয়া তর্ক-বিতর্ক করা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত একটি ভাল কাজ, তবে মনে করিবে যে, সেই স্থানে কঠিনতম বিপদ নামিয়া আসিয়াছে। তাহাদের হিংস্রতা ও অহমিকা তাহাদিগকে ঐরূপ বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু সাধারণ লোক বুঝিতে না পারিয়া মনে করে, ধর্ম-বিষয় লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা একটি সওয়াবের কাজ এবং ক্রমে-ক্রমে বাদ-প্রতিবাদ করিবার অভিলাষ তাহাদের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, পরে কিছুতেই তাহারা উহা হইতে বিরত থাকিতে পারে না। কারণ, তাহাদের প্রবৃত্তি তখন এইরূপ বাদ-প্রতিবাদে পরম আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

হযরত মালিক ইব্‌ন আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "ধর্মমত লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে।" পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ধর্মমত লইয়া বাদানুবাদ করিতে মানা করিয়াছেন। কেহ কোন বিদ্‌আত কার্য প্রচলন করিলে বা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের আদেশ-নিষেধ অমান্য করিলে তাহার বাদানুবাদ না করিয়া সেই ব্যক্তিকে সত্য কথা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন; ইহাতে ফল না দর্শিলে এরূপ লোকের পশ্চাতে না লাগিয়া বরং তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেন।

চতুর্থ আপদ—ধন-সম্পদ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ করা। ধন-সম্পদ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ করা এবং ইহার জন্য বিচারক বা কোন সালিসের আশ্রয় গ্রহণ অত্যন্ত অনিষ্টকর। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কোন অজ্ঞ ব্যক্তি অপরের সহিত ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকা পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও অসন্তোষের মধ্যে থাকে।" বুযুর্গগণ বলিয়াছেন- "ধন-সম্পদের বিবাদ মন অপবিত্র করে, জীবন বিস্বাদ করিয়া তোলে এবং ধর্মভাব হ্রাস করে; অন্য কোন বিষয়ে এইরূপ হয় না।" তাহারা আরও বলেন- "কোন পরহেযগার ব্যক্তি ধন-সম্পদ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ করেন নাই; কারণ, অতিরিক্ত কথা বলিলে ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয় না এবং পরহেযগারগণ অতিরিক্ত কথা বলেন না।" ঝগড়া-বিবাদে অন্য কোন অনিষ্টি পরিলক্ষিত না হইলেও ইহা ত স্পষ্ট যে, বিবাদকালে কেহই বিপক্ষের সহিত মিষ্ট ও প্রিয় কথা বলিতে পারে না। অথচ মিষ্ট কথায় অশেষ ফযীলত রহিয়াছে। সুতরাং বিবাদকারী এই ফযীলত হইতে বঞ্চিত হয়। অতএব কাহারও সহিত যাহাতে ঝগড়া-বিবাদ না বাধে, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। ইহা সত্ত্বেও ঝগড়া বাধিয়া গেলে, ঝগড়াকালে সত্য ব্যতীত অসত্য বলিবে না, কাহারও মনে কষ্ট

দেওয়ার অভিলাষ করিবে না এবং কটুবাক্য ও অতিরিক্ত কথা হইতে বিরত থাকিবে, অন্যথা তোমার ধর্মকর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

পঞ্চম আপদ—অশ্লীল কথা বলা। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– " যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম।" তিনি অন্যত্র বলেন– "দোষখবাসী কতিপয় লোকের মুখ দিয়া পুতিগন্ধময় অপবিত্র দ্রব্যাদি নির্গত হইবে এবং উহার দুর্গন্ধে দোযখবাসীগণ অভিযোগ করিতে থাকিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে– "ইহারা কে?" তখন বলা হইবে– "ইহারা দুনিয়াতে কুৎসিত ও অশ্লীল কথা পছন্দ করিত এবং গালি-গালাজ করিত।" হযরত ইবরাহীম ইব্‌ন মাইসারা (র) বলেন– "যে ব্যক্তি অশ্লীল বাক্য বলে তাহার আকার কিয়ামতের দিন কুকুরের ন্যায় হইবে।"

অধিকাংশ অশ্লীল কথা স্ত্রীসহবাসের কুৎসিত ব্যাখ্যা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কাহাকেও এইরূপ অশ্লীল কথার সহিত বিজড়িত করিলেই তাহাকে গালি দেওয়া হইল। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতাকে গালি দেয় তাহার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।" সাহাবাগণ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন– "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, কোন ব্যক্তি এইরূপ করিবে?" তিনি বলিলেন– "অপরের মাতাপিতাকে গালি দিলে সেই ব্যক্তি আবার তাহার মাতাপিতাকে গালি দেয়; এইরূপ স্থলে সে-ই যেন স্বীয় মাতাপিতাকে গালি দিল।"

অনিবার্য অশ্লীল বাক্য প্রকাশের ধারা—সঙ্গম সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে ইঙ্গিতে বলা আবশ্যক, স্পষ্টভাবে বলিলেই অশ্লীল বাক্য হইয়া পড়ে। অন্যান্য মন্দ কথাও পরিষ্কারভাবে না বলিয়া ইঙ্গিতে বলিবে। নারীদের নাম স্পষ্টভাবে উচ্চস্বরে লওয়া উচিত নহে; বরং তাহাদিগকে মাস্তুরাত বা পর্দানশীল বলিবে। তাহাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিতে হইলে অনুচ্ছস্বরে ডাকিবে। কাহারও কোন কুৎসিত রোগ যেমন অর্শ, কুষ্ঠ ইত্যাদি হইলে রোগের নাম পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ না করিয়া বরং সাধারণভাবে 'পীড়া' বলা আবশ্যক। স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে উহাও অশ্লীল বাক্য হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠ আপদ—লা'নত করা বা অভিশাপ দেওয়া। জীবজন্তু, কাপড়-চোপড়, লোকজন অথবা অন্য কোন পদার্থের প্রতিও লা'নত করা অন্যায়। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "মুসলমান লা'নত করে না।" একদা তিনি কতিপয় সাহাবীসহ (রা) প্রবাসে ছিলেন। এমন সময় দলের জনৈকা রমণী একটি উটকে অভিসম্পাত করিল। হযরত সেই অভিশপ্ত উটটিকে দল হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ইহা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উটটি স্বেচ্ছায় বহুদিন এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু অভিশপ্ত বলিয়া কেহই ইহার নিকটবর্তী হইল না।

হযরত আবূ দারদা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "ভূমি বা কোন পদার্থকে লা'নত করিলে ইহা আল্লাহ্‌র নিকট বলিতে থাকে– 'আমাদের উভয়ের মধ্যে যে অধিক পাপী, তাহার উপর লা'নত হউক।" হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা কোন

পদার্থকে লা'নত করিলেন। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনিয়া বলিলেন– "হে আবূ বকর, সিদ্দীক হইয়াও তুমি লা'নত করিলে! ইহা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; কা'বা শরীফের প্রভুর কসম, তুমি সিদ্দীক; লা'নত করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; কা'বা শরীফের প্রভুর কসম, তুমি সিদ্দীক; লা'নত করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।" হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাত তওবা করিলেন এবং ইহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি ক্রীতদাসকে আযাদ করিলেন।

মানুষের প্রতি অভিশাপ—লোকজনের প্রতি লা'নত করা উচিত নহে। তবে সাধারণভাবে পাপীদের প্রতি লা'নত করা যাইতে পারে; যথা ঃ যালিম, কাফির, ফাসিক ও বিদআতীদের প্রতি লা'নত। কিন্তু মু'তাযিলা ও কিরামী সম্প্রদায়ের উপর লা'নত করা উচিত নহে; কেননা ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঝগড়া-বিবাদে অশান্তি ঘটিতে পারে। অতএব এই সকল সম্প্রদায়ের উপর লা'নত করা হইতে বিরত থাকা উচিত। তবে যে সকল সম্প্রদায় শরীয়তে অভিশপ্ত, উহাদিগকে অভিশাপ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শরীয়তে অভিশপ্ত কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বা কাহারও নাম লইয়া লা'নত করা যাইতে পারে না। কিন্তু যাহারা কাফিরী অবস্থায় পরলোকগমন করিয়াছে বলিয়া শরীয়তে উল্লেখ আছে, তাহাদিগকে লা'নত করা যাইতে পারে, যেমন, ফিরাউন, আবূ জেহেল প্রমুখ।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অতি অল্পসংখ্যক কাফিরের নাম লইয়া লা'নত করিয়াছেন। কারণ তিনি ওহী দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহারা মুসলমান হইবে না, বরং কাফিরী অবস্থায় পরলোকগমন করিবে। কোন য়াহূদীকে লা'নত করা সঙ্গত নহে, কেননা সে মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান হইয়া লা'নতকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইতে পারে। কেহ হয়ত এ-স্থলে প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে, কাফির যেমন মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান হইতে পারে, তদ্রূপ মুসলমানও আল্লাহ্ না করুন ঈমান নষ্ট করিয়া কাফির হইয়া পরলোকগমন করিতে পারে। এমতাবস্থায়, 'তোমার উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক' এই আশীর্বাদ বাক্য কোন মুসলমানের জন্য সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইয়া যদি কেহ বলে যে, ইহা তৎকালীন অবস্থা সাপেক্ষ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যতক্ষণ মুসলমান থাকিবে ততক্ষণ রহমত বর্ষণের দোয়া তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে, তবে কোন একজন কাফিরকে লা'নত করিলেও তৎকালীন অবস্থা সাপেক্ষ হইবে না কেন? অর্থাৎ সেই কাফিরও যতক্ষণ কাফির থাকিবে ততক্ষণ এই লা'নতের কুফল ভোগ করিবে। এইরূপ প্রতিবাদ ভ্রান্তিপূর্ণ ও অন্যায়। কারণ, কোন মুসলমানের উপর রহমত বর্ষণের দোয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাহাকে ঈমানের উপর দৃঢ়পদ রাখুন। অটল ঈমানই রহমতের ফল। এই অনুসারে ব্যক্তি বিশেষ কোন কাফিরের উপর লা'নত করার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ্ তাহাকে কাফিরীতে অবিচলিত রাখুন ও তাহাকে অনন্ত শাস্তির উপযুক্ত করিয়া লউন। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লইয়া লা'নত করা সঙ্গত নহে।

আবার কেহ যদি বলে, য়াযীদের উপর লা'নত করা উচিত; তবে আমরা বলিব, য়াযীদের নাম না লইয়া যদি বল– 'হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী বিনা তওবায় প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকিবে তাহার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হউক', এতটুকু মাত্র সঙ্গত হইতে পারে। কারণ, কাফিরী অপেক্ষা নরহত্যার অপরাধ বিষমতর নহে। আর হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর হত্যাকারী তওবা করিয়া থাকিলে তাহাকে লা'নত করা সঙ্গত নহে।

লক্ষ্য কর, ওহ্‌শী নামক এক ব্যক্তি হযরত হাম্‌যা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে শহীদ করিয়াছিল এবং তৎপর সে মুসলমান হইল। সুতরাং তাহাকে আর লা'নত করা চলে না। য়াযীদের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করিয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কেহ কেহ বলেন, য়াযীদ তাঁহাকে বধ করিবার আদেশ দিয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলেন, সে আদেশ ত দেয় নাই, বরং বধ কাজে তাহার সম্মতি ছিল। সুতরাং সন্দেহ স্থলে কাহাকেও পাপের সহিত জড়িত করা চলে না। ইহা করাও একটি বিষম পাপ। বর্তমান সময়েও অনেক বুযুর্গকে লোকে শহীদ করিয়াছে। কিন্তু কেহই জানে না যে, কাহার নির্দেশে ইহা করা হইল। এমতাবস্থায়, চারিশত বৎসর পূর্বে হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর হত্যাকান্ডের প্রকৃত ঘটনা লোকে কিরূপে অবগত হইবে? আল্লাহ্‌ তাঁহার বান্দাগণকে বেহুদা কথন এবং এইরূপ নিরর্থক তথ্য সংগ্রহের বিপদ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

কেহ সারা জীবনে শয়তানকে একবার লা'নত না করিলেও কিয়ামতের দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না– "শয়তানকে কেন লা'নত কর নাই?" কিন্তু কেহ অপরকে একবার লা'নত করিলেও প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন তজ্জন্য তাহাকে জওয়াবদিহি করিতে হইবে।

কোন একজন বুযুর্গ বলিয়াছেন– "কিয়ামত দিবস আমার আমলনামায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' কলেমা দেখা যাইবে, না কাহারও প্রতি লা'নত দেখা যাইবে, এই ভাবনায় আমি ব্যাকুল রহিয়াছি। কিন্তু এই কলেমাই যেন দেখা যায়, এই আশাই আমি করিয়া থাকি।" এক ব্যক্তি রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন– "কাহাকেও লা'নত করিও না।" বুযুর্গগণ বলিয়াছেন– "কোন মুসলমানকে লা'নত করা তাহাকে বধ করার তুল্য।" অনেকে বলেন যে, এই মর্মে হাদীসও আছে। অতএব শয়তানের প্রতি লা'নতে ব্যাপৃত থাকা অপেক্ষা আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত থাকা উত্তম। এমতাবস্থায়, কোন মানুষের প্রতি লা'নত করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কেহ অন্যকে লা'নত করিয়া তাহার ধর্ম সুদৃঢ় হইল বলিয়া মনে করিলে সে শয়তানের ধোঁকায় পতিত হইয়াছে। এইরূপ মনোভাব কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তি হইতে জন্মিয়া থাকে।

সপ্তম আপদ—অপবাদ ও অযথা প্রশংসাসূচক কবিতা। ইতঃপূর্বে সঙ্গীত সম্বন্ধে বর্ণনাকালে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, কবিতা অবৈধ নহে; কেননা রাসূলে

মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমক্ষে লোকে কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল এবং তিনি হযরত হাস্‌সান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরগণ যে সকল কবিতা লিখিত, উহার উত্তরে ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যা বিষয়ে লিখিত বা কোন মুসলমানের অপবাদ বা অযথা প্রশংসাসূচক কবিতা পাঠ করা সঙ্গত নহে। কবিতায় সাদৃশ্য বা উপমা বর্ণনাকালে কিছু মিথ্যার আবেশ থাকিলেও ইহা অবৈধ নহে; কেননা, ইহাই কবিতার ধর্ম। লোকে ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুক, কবি এই আশা করে না। সেইরূপ আরবী কবিতা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমক্ষে লোকে পাঠ করিয়াছিল।

অষ্টম আপদ—হাসিঠাট্টা ও কৌতুক করা। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বদা হাস্য-কৌতুক করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মানসিক বিষন্নতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সময় সময় সামান্য ধরনের কৌতুক করাতে দোষ নাই। কৌতুক প্রদর্শনের প্রবৃত্তিকে একটি স্থায়ী অভ্যাস ও অর্থ উপার্জনের উপায়ে পরিণত করা না হইলে এবং সত্য কথা বলা হইলে ইহাকে শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতিরিক্ত কৌতুকে মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট হয় ও অধিক হাস্য-পরিহাস জন্মে। অধিক হাস্য-পরিহাসে মানবাত্মা মলিন হইয়া পড়ে। তাহার গাম্ভীর্য ও সম্মান হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং কোন কোন সময় লোকের মন বিগড়াইয়া বিবাদ-বিসম্বাদের সূচনা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমি কৌতুক করি, কিন্তু সত্য ছাড়া কিছু বলি না।" তিনি অন্যত্র বলেন– "অপরের হাসির উদ্রেক করিবার জন্য কেহ কেহ কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহা দ্বারা সে তাহার স্বীয় মর্যাদা হইতে আকাশ হইতে পাতালের দূরত্ব অপেক্ষা অধিক নিম্নে অবতরণ করে। যাহা অধিক হাসির উদ্রেক করে তাহা মন্দ এবং মৃদু হাসি ব্যতীত অট্টহাস্য করা সঙ্গত নহে।" তিনি আরও বলেন– "আমি যাহা অবগত আছি, তাহা অবগত হইলে তোমরা অল্প হাসিতে এবং অধিক রোদন করিতে।"

এক বুযুর্গ জনৈক ব্যক্তিকে বলিলেন– "তুমি কি অবগত নও যে, অবশ্য অবশ্য একদিন দোযখের উপর দিয়া গমন করিতে হইবে? যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ـ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ـ

অর্থাৎ "তোমাদের কাহারও উহাতে অবতরণ ব্যতীত অব্যাহতি নাই। ইহা তোমাদের প্রভুর দৃঢ় ও কৃতসিদ্ধান্ত" (সূরা মরিয়ম, রুকু ৫. পারা ১৬)। সেই ব্যক্তি বলিল– "হ্যাঁ, জানি।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, দোযখ হইতে কেহ বাহির হইয়া আসিবে?" সে বলিল– "না।" তৎপর তিনি বলিলেন– "তবে মুখে হাসি দেখা যায় কেন? হাসিবার কি কারণ থাকিতে পারে?" হযরত আতায়ী সাল্‌মী (র) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত হাসেন নাই। হযরত ওহাব ইব্‌নুল

ওরদ (র) কতিপয় লোককে ঈদের দিন হাসিতে দেখিয়া বলিলেন– "যদি আল্লাহ্ এই সকল লোককে মাফ করিয়া থাকেন এবং তাহাদের রোযা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক, হাস্য করা সঙ্গত নহে। আর যদি তাহাদের রোযা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের রোদন করা উচিত, হাসিবার কোন কারণ নাই।" হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হু বলেন– "যে ব্যক্তি গোনাহ্ করে অথচ হাসে, সে দোযখে যাইয়া ক্রন্দন করিবে।" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসি (র) লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "বেহেশ্‌তে কেহ রোদন করিলে অবাক হইবে কি?" তাহারা বলিল– "হাঁ, নিশ্চয়ই অবাক হইব।" তিনি বলিলেন– "যাহারা অবগত নহে, পরকালে তাহাদের স্থান কোথায় দোযখে কি বেহেশ্‌তে অথচ দুনিয়াতে হাস্য করে, তবে ইহা বেহেশ্‌তে রোদন অপেক্ষা অধিক অবাক কাণ্ড।"

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, একদা জনৈক আরব পল্লীবাসী উষ্ট্র আরোহণে গমনকালে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সালাম দিল এবং নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিল; কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার উষ্ট্র পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ইহাতে হযরতের সঙ্গীগণের কেহ কেহ হাসিতে লাগিলেন। অবশেষে উটটি স্বীয় পৃষ্ঠ হইতে সেই ব্যক্তিকে ফেলিয়া দিল এবং তৎক্ষণাত সে মরিয়া গেল। হযরতের সঙ্গীগণ তখন বলিলেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ঐ ব্যক্তি উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" তিনি বলিলেন– "হাঁ, তোমাদের মুখ তাহার রক্তে পরিপূর্ণ হইয়াছে" অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়া তোমরা হাস্য করিতেছ। হযরত ওমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলেন– "আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কখনও হাস্য-পরিহাস করিও না। ইহাতে অসদ্ভাব জন্মে এবং মন্দকাজ সংঘটিত হয়। লোক-সংসর্গে উপবেশন করিলে কুরআন শরীফের বিষয় আলোচনা কর, ইহা না পারিলে সাধু ব্যক্তিদের জীবনী ও পুণ্য কার্যের বর্ণনা কর।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হু বলেন– "অন্যকে হাসিঠাট্টা করিলে লোকচক্ষে ঠাট্টাকারীর মানমর্যাদা থাকে না।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কৌতুক—রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমস্ত জীবনে তাঁহার মুবারক মুখ হইতে সাহাবা রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হুম মাত্র দুই তিনটি কৌতুক বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন। একদা তিনি এক বৃদ্ধাকে বলিলেন– "বৃদ্ধা বেহেশ্‌তে যাইবে না।" ইহাতে বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া তিনি বলিলেন– "হে বৃদ্ধে, নিরাশ হইও না, প্রথমে তোমাকে তরুণী বানানো হইবে, তৎপর তুমি বেহেশ্‌তে প্রবৃষ্ট হইবে।" এক রমণী রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বলিল– "আমার স্বামী আপনাকে আহবান করিতেছেন।" তিনি বলিলেন– "সেই ব্যক্তিই কি তোমার স্বামী যাহার নয়নে শুভ্রতা আছে?" রমণী বলিল– "না, আমার স্বামীর নয়ন শুভ্র নহে।" তখন তিনি বলিলেন– "নয়নে শুভ্রতাশূন্য কোন লোক নাই।" এক রমণী রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লউন।" তিনি বলিলেন– "তোমাকে উটের বাচ্চার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইব।" রমণী বলিল– "আমি উটের বাচ্চার পৃষ্ঠে আরোহণ করিব না; ইহা আমাকে ফেলিয়া দিবে।" তিনি বলিলেন– "যাহা উটের বাচ্চা নহে, এমন কোন উট নাই।" আবূ উমায়র নামে হযরত আবূ তাল্‌হা রাযিয়াল্লাহ্ আনহুর এক পুত্র ছিল। বালকটি নুগায়র নামক একটি পাখির ছানা পোষণ করিয়াছিল। বাচ্চাটি অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিলে বালক কাঁদিতেছে দেখিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন ঃ يَا اَبَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ অর্থাৎ "হে আবূ ওমায়র, নুগায়র কি হইল?"

অনেক সময় বালক ও রমণীদের সঙ্গে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তদ্রূপ কৌতুক বাক্য বলিতেন যেন তাহারা আনন্দিত হয় এবং তাঁহার প্রতাপে ভীত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন না করে। স্বীয় সহধর্মিণীগণের আনন্দ বর্ধনের উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মাঝে কৌতুক করিতেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন– "একদা আমার সপত্নী হযরত সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা আমার গৃহে আগমন করিলেন। আমি দুধ দিয়া এক বস্তু পাক করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে কিছু খাইতে বলিলাম। কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। আমি বলিলাম– 'না খাইলে তোমার মুখমণ্ডলে লেপন করিয়া দিব।' তিনি বলিলেন– 'আমি কখনও খাইব না।' আমি হস্ত প্রসারণ করত উক্ত বস্তু সামান্য তাঁহার মুখে মাখিয়া দিলাম। তখন রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের দুইজনের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পবিত্র হাটু সরাইয়া পথ করিয়া দিলেন যাহাতে তিনি (হযরত সাওদা) প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারেন। তিনিও উক্ত বস্তু আমার মুখে মাখাইয়া দিলেন। ইহাতে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাসিতে লাগিলেন।"

যাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফিয়ান (রা) অত্যন্ত কদাকার পুরুষ ছিলেন। তিনি একদা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বসিয়াছিলেন। এমন সময় তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে শোনাইয়া বলিলেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার দুই স্ত্রী আছে; প্রত্যেকেই হযরত আয়েশা (রা) অপেক্ষা রূপবতী। আপনি ইচ্ছা করিলে একজনকে তালাক দিতে পারি, যাহাতে আপনি তাহাকে বিবাহ করিয়া লইতে পারেন।" যাহ্‌হাক ইহা কৌতুকস্বরূপ বলিতেছিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা যাহ্‌হাককে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আচ্ছা বল ত, তুমি তাহাদের অপেক্ষা অধিক সুন্দর, না, তাহারা তোমা অপেক্ষা অধিক সুন্দর?" যাহ্‌যাক বলিলেন– "আমি তাহাদের অপেক্ষা অধিক সুন্দর।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রশ্ন শুনিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাসিতে লাগিলেন; কেননা যাহ্‌হাক অত্যন্ত কদাকার ছিলেন। (পর্দা সম্বন্ধে আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ঐ সকল কথাবার্তা হইয়াছিল)। সুআয়বকে খোরমা খাইতে দেখিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "তোমার চোখে বেদনা; আর তুমি খোরমা খাইতেছ?" তিনি উত্তর দিলেন– "আমি অপরদিকের মাড়ি দ্বারা খাইতেছি।"

খাওয়াত ইব্ন যুবায়র রমণীদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। একদা তিনি মক্কা শরীফের কোন পথে রমণীদের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলেন। এমন সময় রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলে তিনি খুব লজ্জিত হইলেন। হযরত (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি কি করিতেছ?" খাওয়াত বলিলেন– "আমার নিকট একটি অবাধ্য উট আছে; আমি এই স্ত্রীলোকদের দ্বারা ইহার জন্য একটি রজ্জু প্রস্তুত করাইতে চাই।" হযরত (সা) তখন তথা হইতে চলিয়া গেলেন। খাওয়াত বলেন– "তৎপর একদিন হযরত (সা) আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– 'হে খাওয়াত, ঐ উট সংযত হইয়াছে কি?' আমি লজ্জিত হইয়া নীরব রহিলাম। ইহার পর তিনি আমাকে দেখিলেই এইরূপ প্রশ্ন করিতেন। পরিশেষে, একদা তিনি এক গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পবিত্র পদযুগল এক পার্শ্বে দুলাইয়া আগমন করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– 'হে খাওয়াত, সেই অবাধ্য উটের সংবাদ কি?' আমি নিবেদন করিলাম– 'সেই মহান আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্য রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, যে-দিন আমি ঈমান আনিয়া মুসলমান হইয়াছি, সেইদিন হইতেই সে আর অবাধ্য রহে নাই।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اهْدِ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর, হে আল্লাহ্‌, আবূ আবদুল্লাহকে হিদায়ত কর।"

হযরত নো'মান আন্‌সারী রাযিয়াল্লাহু আনহু অধিক কৌতুক করিতেন। তাঁহার অভ্যাস এই ছিল যে, মদীনা শরীফের বাজারে কোন ফল আসিলে মূল্য ঠিক করিয়া ইহা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত করিয়া বলিতেন– 'উপঢৌকনস্বরূপ গ্রহণ করুন।' ফলে মালিক মূল্য চাহিলে তিনি তাহাকে হযরত (সা)-এর নিকট লইয়া যাইতেন এবং হযরত (সা)-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেন– ' তোমার ফল তিনি খাইয়াছেন, মূল্য চাহিয়া লও।" হযরত (সা) হাসিয়া মূল্য দিতেন এবং হযরত নো'মান আন্‌সারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে বলিতেন– "আচ্ছা বলত, তুমি ইহা আনয়ন করিলে কেন?" তিনি বলিতেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, আমার নিকট মূল্য ছিল না, অথচ আপনি ব্যতীত অন্য কেহ যেন উহা আহার না করে, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমগ্র জীবনে হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহ্‌ আনহুম তাঁহার যে কয়টি কৌতুক উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই উপরে বর্ণিত হইল। উহাতে অসত্যের লেশমাত্রও নাই; কোন লোকের অন্তরেও কষ্ট দেওয়া হয় নাই এবং রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

মান-মর্যাদাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। মাঝে মাঝে এইরূপ কৌতুক করা সুন্নত; কিন্তু কৌতুক অভ্যস্ত হওয়া বৈধ নহে।

নবম আপদ—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উপহাস করিয়া অন্যের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে কথা বলা বা গতিবিধি অনুযায়ী অঙ্গ-ভঙ্গিমা করত লোকের হাসির উদ্রেক করা। যাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়, সে ইহাতে দুঃখিত হইলে উহা করা হারাম। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ -

অর্থাৎ "একদল অন্য দলকে যেন উপহাস না করে, হইতে পারে যে তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম।" (সূরা হুজুরাত, রুকূ ২, পারা ২৬)। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– " কোন ব্যক্তি স্বীয় গোনাহ্‌ হইতে তওবা করিলে সেই গোনাহ্‌ উল্লেখ করিয়া যদি অপর কেহ তাহার কুৎসা করে তবে কুৎসাকারী সেই গোনাহে জড়িত হইয়া মরিবে।" কেহ হঠাৎ বাতকর্ম করিলে ইহা লইয়া উপহাস করিতে নিষেধ করিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যাহা মানুষ স্বয়ং করিয়া থাকে তজ্জন্য অপরকে উপহাস করিবে কেন?" তিনি অন্যত্র বলেন– "যে ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অন্যকে হাস্যাস্পদ করে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ তাহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবে। বেহেশতের দ্বার উন্মুক্ত করত তাহারা তাহাকে প্রবেশ করিতে বলিবে; কিন্তু সে নিকটবর্তী হইলে তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না; সে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে তাহারা আবার তাহাকে আহবান করিবে, (তাহার জন্য) দ্বিতীয় দ্বার খুলিবে; এই দুঃখ ও যাতনায় অস্থির হইয়া সে ইহাতে প্রবেশ করিতে চাহিবে; কিন্তু সে নিকটবর্তী হইলে তাহারা দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। পরিশেষে সেই ব্যক্তির অবস্থা এইরূপ হইবে যে, তাহাকে আহবান করিলেও সে আর (বেহেশতে প্রবেশের জন্য) অগ্রসর হইবে না; কারণ, সে মনে করিবে যে, সকলেই তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ঘৃণা করিতেছে।"

যদি ঠিকভাবে জানা যায় যে, যাহাকে উপহার ও হাস্যাস্পদ করা হইতেছে, সে কখনও তজ্জন্য দুঃখিত হইবে না তবে উহা হারাম নহে, বরং তখন উহাকে একপ্রকার কৌতুকস্বরূপই গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তি দুঃখিত হইলে এইরূপ কৌতুক হারাম হইবে।

দশম আপদ—মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "তিনটি এমন বিষয় আছে, যাহার একটিও কাহারও নিকট থাকিলে তাহাকে মুনাফিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যদিও সে নামায পড়ে এবং রোযা রাখে। সেই তিনটি জিনিস এই ঃ **প্রথম**– মিথ্যা কথা বলা, **দ্বিতীয়**– প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও **তৃতীয়**– আমানতে খিয়ানত অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য অপচয় করা।" তিনি অন্যত্র বলেন– "প্রতিশ্রুতি পালন করা অবশ্য কর্তব্য।" অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সঙ্গত নহে। প্রতিশ্রুতি পালন সম্পর্কে হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালামকে প্রশংসা করিয়া আল্লাহ্‌ বলেন– اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ। অর্থাৎ "প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি নিশ্চয়ই

বড় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।" হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম একদা কোন এক ব্যক্তির সহিত এক নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি যথাস্থানে যাইয়া দেখেন, সেই ব্যক্তি আগমন করে নাই। প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ঐ ব্যক্তির প্রতীক্ষায় তিনি সেই স্থানে বাইশ দিন পর্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এক সাহাবী (রা) বলেন- "রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আমি অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম; কিন্তু (পরে) ভুলিয়া গেলাম। তৃতীয় দিবসে যাইয়া দেখি তিনি তথায় অবস্থান করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন-'ওহে যুবক, তিনদিন যাবত আমি তোমার পথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি।" রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিলেন- "আমার সহিত আবার সাক্ষাত করিয়া যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।" কিছুদিন পর তিনি খায়বারের জয়লব্ধ মাল বণ্টনকালে সেই ব্যক্তি বলিল- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি আমার নিকট এক প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ আছেন।" তিনি তাহাকে বলিলেন- "তোমার যাহা চাহিবার চাহিয়া লও।" সেই ব্যক্তি আশিটি ছাগল চাহিল এবং তিনি তৎক্ষণাত তাহাকে উহা দিয়া বলিলেন-"তুমি অত্যন্ত সামান্য জিনিস চাহিলে। যে রমণীর সংবাদে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের কবর পাওয়া গিয়াছিল, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাহাকে বলিয়াছিলেন- 'তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব;' সেই রমনী তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক ও উত্তম জিনিস চাহিয়াছিল। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যখন তাহাকে বলিলেন- 'চাও, যাহা চাহিবে তাহাই দিব,' তখন সেই স্ত্রীলোক বলিল- 'আল্লাহ্ যেন পুনরায় আমাকে যৌবন দান করেন এবং আমি পরকালে যেন বেহেশ্‌তে বাস করিতে পারি।" তৎপর ঐ ছাগপ্রার্থী ব্যক্তি আরব দেশে একটি প্রবাদস্বরূপ হইল। লোকে বলিত- "অমুক ব্যক্তি ত আশি ছাগওয়ালা অপেক্ষা অধিক অল্পে পরিতুষ্ট।"

প্রতিশ্রুতির নিয়ম—অকাট্য প্রতিশ্রুতি যথাসম্ভব না দেওয়াই সঙ্গত। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাহাকেও কোন কথা দিবারকালে এইরূপ বলিতেন- "ইহা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।" প্রতিশ্রুতি দিলে আপ্রাণ চেষ্টায় ইহা রক্ষা করিবে। কিন্তু অপরিহার্য কারণে অনন্যোপায় হইয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে না পারিলে দোষ নাই। কেহ কোন স্থানে থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিলে নামাযের সময় না হওয়া পর্যন্ত তথায় তাহার অবস্থান করা কর্তব্য বলিয়া বিদ্বানগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন জিনিস কাহাকেও দান করার পর ইহা ফিরাইয়া লওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অপেক্ষা মন্দ। যে ব্যক্তি প্রদত্ত বস্তু ফিরাইয়া লয় তাহাকে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমন কুকুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যে বমি করা বস্তু পুনরায় ভক্ষণ করে।

একাদশ আপদ—মিথ্যা বলা ও মিথ্যা শপথ করা। উহা কবীরা গুনাহ্। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কপটতার দ্বারসমূহের মধ্যে মিথ্যা অন্যতম দ্বার।" তিনি বলেন-"মানুষ ক্রমাগত মিথ্যা বলিতে থাকিলে আল্লাহ্‌র নিকট তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়।" তিনি আরও বলেন- "মিথ্যা বাক্যে মানবের উপজীবিকা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।" তিনি বলেন- "বণিকগণ দুরাচার পাপী।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কেন? বাণিজ্য কি বৈধ নহে?" তিনি বলিলেন- "তাহারা শপথ করিয়া পাপী হয় এবং মিথ্যা কথা বলে, এইজন্য (তাহারা দুরাচার পাপী)।" তিনি অন্যত্র বলেন- "যে ব্যক্তি লোককে হাসাইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে তাহার জন্য আফসোস, তাহার জন্য আফ্‌সোস, তাহার জন্য আফ্‌সোস।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "এক ব্যক্তি আমাকে দণ্ডায়মান হইতে বলিল। আমি দণ্ডায়মান হইলাম। দুই ব্যক্তিকে দেখিলাম, একজন দণ্ডায়মান, অপরজন উপবিষ্ট। তৎপর দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির মুখের ভিতরে একটি লোহার আকর্ষী প্রবেশ করাইয়া তাহারা চোয়াল এইরূপে আকর্ষণ করিতে লাগিল যে, চোয়াল স্কন্ধ পর্যন্ত নামিয়া আসিল। ইহার পর অপরদিকের চোয়াল সে তদ্রূপ আকর্ষণ করিয়া নামাইল; তখন প্রথম দিকের চোয়াল স্বীয় স্থানে চলিয়া গেল। এইরূপে বারবার সে উভয়দিকের চোয়ালে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- এই ব্যক্তি কে?' সে বলিল- 'এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। কিয়ামত পর্যন্ত কবরে তাহাকে এইরূপ শাস্তি দিতে থাকিব।"

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জর্‌রাদ একদা রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "মুসলমান কি কখনও ব্যভিচার করিতে পারে?" তিনি বলিলেন- "(শয়তানের প্ররোচনায়) কখন হয়ত করিতেও পারে।" আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জর্‌রাদ পুনরায় নিবেদন করিলেন- "মুসলমান মিথ্যাও বলিতে পারে কি?" হযরত (সা) বলিলেন- "কখনই না।" ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ "তাহারাই মিথ্যা বলিয়া থাকে যাহাদের ঈমান নেই।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমের রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "একটি ছোট বালক খেলিতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম-'আস, আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব।' তখন রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার গৃহে ছিলেন। তিনি বলিলেন- 'তুমি তাহাকে কি দিবে?' আমি বলিলাম- 'খোরমা।' তিনি বলিলেন- 'কিছু না দিলে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া লেখা হইত।' তৎপর তিনি আরও বলিলেন- 'কবীরা গুনাহ্‌র মধ্যে কোন্‌গুলি সর্বাপেক্ষা ভীষণ তোমাকে জানাইয়া দিব কি? তন্মধ্যে ভীষণতমটি শিরক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোন ভাগী সাব্যস্ত করা, তৎপর মাতাপিতার আদেশ অমান্য করা।" এতক্ষণ রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, তৎপর সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন- "সাবধান, মিথ্যা কথা বলাও একটি কবীরা গুনাহ্।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'মিথ্যাবাদীর দুর্গন্ধে ফেরেশতাগণ এক মাইল দূরে চলিয়া যায়।" এইজন্যই কেহ কেহ বলিয়াছেন, কথা বলিবার সময় হাঁচি আসিলে ইহাকে সেই কথার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ হাদীস শরীফে আসিয়াছে- "ফেরেশতা হইতে 'হাঁচি' ও শয়তান হইতে 'হাই' তোলা হইয়া থাকে।" ঐ কথা মিথা হইলে ফেরেশ্‌তা উপস্থিত থাকিত না এবং হাঁচিও আসিত না। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"অপরের মিথ্যা বর্ণনা করাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।" তিনি বলেন-"যে ব্যক্তি মিথ্যা অঙ্গীকার করিয়া অপরের মাল গ্রহণ করে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌কে তাহার প্রতি রাগান্বিত দেখিতে পাইবে।" তিনি অন্যত্র বলেন- "মুসলমানের মধ্যে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থাকা সম্ভবপর; কিন্তু খিয়ানত (অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা) এবং মিথ্যা উক্তি (তাহার মধ্যে) কখনও থাকিতে পারে না।"

মাইমূন ইব্‌নে শাবীর (র) বলেন- "একদা চিঠি লিখিবার সময় একটি মিথ্যা কথা মনে পড়িল। ইহা চিঠিতে লিখিয়া দিলে বেশ সুন্দর হইত। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম যে, কিছুতেই ইহা লিখিব না। সেই সময় এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলাম- 'ঈমানদারগণকে আল্লাহ্ ইহকালে প্রতিজ্ঞায় ও ঈমানে অবিচলিত রাখিয়া থাকেন।" হযরত ইব্‌নে সাম্মাক (রা) বলেন- "মিথ্যা কথা না বলাতে আমি কোন সওয়াব পাইব না' কারণ, মিথ্যাকে আমি নিতান্ত ঘৃণা করি বলিয়াই মিথ্যা বলি না।"

মিথ্যা অবৈধ হওয়ার কারণ—মিথ্যা কথন এই জন্য হারাম যে, ইহার কুপ্রভাব অতি সত্বর হৃদয়ে বিস্তার লাভ করে, ইহার আকার ও স্বভাব বিকৃত করিয়া ফেলে এবং ফলে আত্মা মলিন হইয়া পড়ে।

স্থানবিশেষে মিথ্যা কথন সঙ্গত—মিথ্যার প্রতি অন্তরে প্রগাঢ় ঘৃণা পোষণ করিয়া শরীয়তসম্মত অপরিহার্য দরকারবশত এবং উৎকৃষ্ট কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় মিথ্যা কথন হারাম নহে। কারণ মিথ্যার প্রতি ঘৃণা থাকিলে ইহার প্রভাব অন্তরের উপর পড়িতে পারে না এবং হৃদয় বিগড়াইয়া যায় না। আবার কোন উৎকৃষ্ট কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় মিথ্যা কথনে অন্তর মলিন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে পারে না। কোন যালিমের হস্ত হইতে কোন মুসলমান পলায়ন করিলে তাহার সন্ধান অবগত থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। বরং নিতান্ত অনিবার্য হইলে এইরূপ স্থলে মিথ্যা বলাই আবশ্যক।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিন স্থানে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়াছেন; যথা ঃ-(১) জিহাদে শত্রুপক্ষ হইতে নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য লুকাইয়া রাখিতে; (২) ঝগড়ায়রত দুই দল বা ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে একপক্ষের উক্তি অপ্রীতিকর হওয়া সত্ত্বেও অপরপক্ষের নিকট প্রিয় আকারে উপস্থাপিত করিতে এবং (৩) কাহারও দুই জন সহধর্মিণী থাকিলে স্বামীকে উভয়ের নিকট 'তোমাকে আমি অধিক ভালবাসি' এইরূপ বলিতে।

কোন যালিম অন্যের ধন বা গোপনীয় বিষয় জানিতে চাহিলে ইহা গোপন রাখা বৈধ। কেহ তোমার গুনাহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি যদি ইহা অস্বীকার কর তবে কোন দোষ নাই; কারণ গুনাহ্ গোপন রাখিবার জন্য শরীয়তে আদেশ রহিয়াছে। স্ত্রীকে কোন দ্রব্য দিবার প্রতিশ্রুতি না দিলে সে কিছুতেই বশীভূত হইতেছে না, এমতাবস্থায়, সেই দ্রব্য প্রদানে স্বামী অসমর্থ হইলেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে কোন দোষ নাই। যে সকল স্থানে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে উহা উপরে বর্ণিত হইল।

বাস্তবপক্ষে, মিথ্যা কথন কখনও সঙ্গত নহে। কিন্তু সত্য বলিলে যদি এমন কোন অপ্রীতিকর বিষয় ঘটে যাহা শরীয়তে নিষিদ্ধ তবে বিচার ও বিবেচনার নিক্তিতে ওজনে করিয়া লইবে। দেখিবে যে, মিথ্যা কথনের দোষ অধিক, না সত্য কথায় শরীয়তের অপ্রিয় ঘটনা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা অল্প বলিয়া মনে হইবে তাহাই অবলম্বন করিবে। যেমন লোকজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরহ, অযথা ধনের অপব্যয়, গোপন তত্ত্ব প্রকাশ ও গুনাহ্‌র জন্য অমর্যাদা সত্য কথনের দরুন হইলে, এইরূপ স্থানসমূহে মিথ্যা বলার বিধান আছে। কারণ শরীয়তের বিধানমতে ঐ স্থানসমূহে মিথ্যা কথনে যে অনিষ্ট হইতে পারে, উল্লিখিত অপ্রীতিকর বিষয়াদি হইতে তদপেক্ষা ভীষণ অনিষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত স্থানসমূহে মিথ্যা বলার বিধানকে প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে মৃত প্রাণীর গুশ্‌ত খাওয়ার বিধানের ন্যায় বৈধ বলিয়া গণ্য করা হয়; কেননা মৃত প্রাণীর গুশ্‌ত ভক্ষণে নিরস্ত থাকা অপেক্ষা প্রাণ রক্ষা করাকে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিক দরকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উল্লিখিত স্থানসমূহ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মিথ্যা বলা বৈধ নহে। ধন, যশ, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের বড়াই এবং আত্ম-প্রশংসা করিতে যাইয়া মিথ্যা বলা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

হযরত আস্‌মা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন-"এক রমণী রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল- 'আমার স্বামী আমার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের নিমিত্ত যাহা করেন নাই ইহা আমার সপত্নীকে উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে বলা উচিত কি না?' তিনি বলিলেন-'যাহা ঘটে নাই এইরূপ বিষয় যে নিজের উপর আরোপ করে, সে এমন ব্যক্তিসদৃশ যে প্রতারণার দুপাট্টা কাপড় পরিধান করে।" এই উক্তির মর্ম এই, সেই ব্যক্তি স্বয়ং মিথ্যা বলে এবং অপরকে ভ্রান্তিতে নিপতিত করিয়া তাহাকে ইহার পুনরুক্তির মিথ্যায় জড়িত করিয়া ফেলে।

বালকদিগকে মক্তবে প্রেরণের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু প্রদানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলে কোন দোষ হইবে না। হাদীস শরীফে আসিয়াছে- "মিথ্যা কথাও লিখিত হয় এবং নির্দোষ মিথ্যাও লিখিত হয়। তৎপর (বিচারের সময়) জিজ্ঞাসা করা হইবে-'কেন মিথ্যা বলিয়াছিলে?' ইহার উত্তরে সে সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করিতে পারিলে ঐ মিথ্যা নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইবে।" ঠিকভাবে অবগত না হইয়া কাহাকেও কোন সংবাদ প্রদান করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ কেহ কোন মস্‌আলা জিজ্ঞাসা করিলে ভালরূপে

প্রকৃত সত্য অবগত না হইয়া উত্তর দেওয়া হারাম। অজ্ঞতা প্রকাশ পাইলে জ্ঞানের অহংকার ও সুখ্যাতি লাঘবের আশঙ্কায় কোন কোন লোক এইরূপ করিয়া থাকে।

কোন কোন আলিম বলেন- দানের আদেশ করত ইহার সওয়াব বর্ণনা করিতে যাইয়া মিথ্যা উক্তিকে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীস বলিয়া প্রকাশ করাতে কোন দোষ নাই, অথচ ইহাও হারাম; কেননা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আমার সহিত মিথ্যা জড়িত করিও না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার সহিত মিথ্যা জড়িত করিবে সে দোযখে স্বীয় স্থান তালাশ করিয়া লউক।"

ব্যাজবাক্য—বুযুর্গগণের ঐরূপ আবশ্যকতা দেখা দিলে তাঁহারা মিথ্যা না বলিয়া ব্যাজবাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপ বাক্যে তাঁহারা সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলেন না বটে, কিন্তু শ্রবণকারী যাহা মনে করে বক্তার কথার উদ্দেশ্য ইহা থাকে না। এইরূপ কথাকে মা'আরীয বা ব্যাজবাক্য বলে।

হযরত মুতাররাফ (র) এক আমীরের নিকট গমন করিলে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল- "আপনি এত কম আসেন কেন?" তিনি বলিলেন- "আপনার নিকট হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি শয্যা গ্রহণ করি। তৎপর আল্লাহ্ শক্তি দিলে উঠিলাম।" ইহা শ্রবণে আমীর বুঝিল, তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ ছিলেন না, অথচ তিনি মিথ্যা বলেন নাই। হযরত শা'বীকে (র) কেহ আহ্বান করিলে তিনি তাঁহার পরিচারিকাকে নির্দেশ দিতেন-"গৃহ দ্বারে একটি বৃত্ত অঙ্কন করত ইহাতে অঙ্গুলি রাখিয়া বলিও- 'এইখানে নাই।' অথবা বলিও-'মস্‌জিদে তালাশ কর।"

হযরত মুআ'য রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তহ্‌শীলের কার্য হইতে গৃহে ফিরিলে তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন-"এতদিন হযরত ওমর (রা)-এর তহ্‌শীলদারী করিয়া গৃহে ফিরিলে, আমার জন্য কি আনয়ন করিয়াছ?" তিনি বলিলেন- "প্রহরী আমার সাথে ছিল বলিয়া কিছুই আনিতে পারি না।" তিনি আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া এস্থানে 'প্রহরী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী মনে করিয়াছিলেন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তাঁহার কার্যে পাহারা দেওয়ার জন্য কোন প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। তৎক্ষণাত তাঁহার পত্নী হযরত ওমার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর গৃহে গমন করিয়া বলিলেন-"মুআ'য রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট বিশ্বস্ত আমানাতদার ছিলেন; আপনি তাঁহার কার্যে পাহারা দেওয়ার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলেন কেন?" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হযরত মুআ'য রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে আহ্বান করিয়া উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। ইহা শ্রবণে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হাসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পত্নীর জন্য কিছু প্রদান করিলেন।

নিতান্ত আবশ্যকতা দেখা দিলেই ঐরূপ ব্যাজবাক্য প্রয়োগের বিধান রহিয়াছে। আবশ্যকতা না থাকিলে সত্য হইলেও ব্যাজবাক্য প্রয়োগে কাহাকেও ধোঁকায় ফেলা

জায়েয নহে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওত্‌বা (র) বলেন- "একদা পিতার সহিত হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র)-এর নিকট গিয়াছিলাম। পিতা উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন। লোকে বলিতেছিল-'খলীফা সেই পোশাক তাঁহাকে উপহারস্বরূপ দিয়াছেন।' আমি বলিলাম-'আল্লাহ্ খলীফার কল্যাণ করুন।' পিতা বলিলেন- 'বৎস, মিথ্যা বা মিথ্যাতুল্য কথা বলিও না।" অর্থাৎ উক্ত বাক্য মিথ্যাতুল্য।

স্থানবিশেষে মিথ্যাতুল্য কথা নির্দোষ—মিথ্যাতুল্য কথা প্রয়োজনীয়তাবশত নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হয়। কৌতুকে ও অন্যের বিষণ্ন বদনে আনন্দ সঞ্চারের জন্য মিথ্যাতুল্য বাক্য প্রয়োগ বৈধ; যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন- "বৃদ্ধা বেহেশ্‌তে গমন করিবে না", "তোমাকে উটের বাচ্চার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইব" এবং "তোমার স্বামীর চোখে শুভ্রতা আছে।" কিন্তু কাহারও কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে উহা বৈধ নহে। মনে কর, এক বক্তি বলিল-"অমুক রমণী তোমার প্রতি আসক্ত।" এইরূপ মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও ধোঁকা দেওয়া সঙ্গত নহে; কারণ, ইহাতে তাহার মন ঐ রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিলে শুধু কৌতুকের উদ্দেশ্যে মিথ্যাতুল্য কথা বলাতে কোন পাপ না হইলেও কৌতুককারীকে পূর্ণ ঈমানের উন্নত সোপান হইতে অবতরণ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে পর্যন্ত মানুষ নিজের অপ্রিয় বস্তুকে অপরের জন্যও অপ্রিয় মনে না করিবে এবং মিথ্যা কৌতুক হইতে বিরত না থাকিবে সেই পর্যন্ত তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না।"

সচরাচর মিথ্যার উদাহরণ—লোকে সাধারণত বলে-"তোমাকে শতবার তালাশ করিয়াছি" এবং "শতবার তোমার গৃহে গমন করিয়াছি" এইরূপ উক্তি অবৈধ নহে। কারণ, এইরূপ স্থানে 'শত' শব্দের উদ্দেশ্য সংখ্যা নিরূপণ নহে, বরং 'বহু' অর্থ বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি অনেকবার তালাশ না করিয়া বা অনেকবার না গিয়া 'শতবার' বলিলে মিথ্যা হইবে। মানুষের এইরূপ অভ্যাসও আছে যে, কেহ অপরকে কিছু ভক্ষণ করিতে বলিলে সে বলে- "আহার করিবার আমার ইচ্ছা নাই।" কিন্তু তাহার আহারে ইচ্ছা থাকিলে সেইরূপ বলা সঙ্গত নহে।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার সহিত রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভ বিবাহ রজনীতে তিনি এক পাত্র দুগ্ধ স্ত্রীলোকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। ক্ষুধা নাই বলিয়া দুগ্ধ পানে তাঁহারা অসম্মতি জানাইলে তিনি বলিলেন- "মিথ্যা ও ক্ষুধা এক সাথে একত্র করিও না।" তাঁহারা বলিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এতটুকু বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে?" হযরত সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়িব (র)-এর চক্ষু পীড়িত হইয়াছিল। চক্ষে ময়লা দেখিয়া লোকে বলিল- "ময়লা মুছিয়া ফেলিলে কি ভাল হইত না?" তিনি বলিলেন- "চিকিৎসকের নিকট কথা দিয়াছি যে,

চক্ষে হস্ত লাগাইবে না; সুতরাং ময়লা মুছিলে আমার বাক্য মিথ্যা হইয়া যাইবে।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন- "মিথ্যা বাক্য লইয়া আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখিয়া যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ্ অবগত আছেন, ইহা এইরূপ; তবে উহাও মহাপাপ।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে কিয়ামত দিবসে সে যবের দানাতে গ্রন্থিবন্ধন করিতে আদিষ্ট হইবে।"

দ্বাদশ আপদ—গীবত বা অসাক্ষাতে অপরের নিন্দা করা। রসনা ইহাতেই অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্ যাহাদিগকে রক্ষা করেন, কেবল তাহারাই এই আপদ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। গীবত মানবাত্মার এক ভীষণ বিপদ। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন- "যে ব্যক্তি গীবত করে সে যেন স্বীয় মৃত ভ্রাতার গুশ্ত ভক্ষণ করে" (সূরা হুজুরাত, রুকু ১২, পারা ২৬)। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "গীবত হইতে দূরে থাক, কেননা গীবত ব্যভিচার হইতে মন্দ।" ব্যভিচার করিয়া অনুতাপের সহিত তওবা করিলে আল্লাহ্ মাফ করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু নিন্দিত ব্যক্তি মাফ না করিলে গীবতের পাপ মাফ হয় না। তিনি অন্যত্র বলেন- "মি'রাজের রাত্রে আমি কতকগুলি লোকের নিকট দিয়া গমনের সময় দেখিলাম তাহারা স্বীয় মুখমণ্ডলের গুশ্ত নখ দ্বারা ছিন্ন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- 'তাহারা কোন্ লোক?' উত্তর হইল, 'তাহারা গীবত করিত।"

হযরত সুলায়মান ইব্নে জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "আমি রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলাম- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যাহা আমার সহায়ক হইবে আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দান করুন।' তিনি বলিলেন- 'সৎকাজকে (ইহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) এমনকি তোমার বাল্তি হইতে অপরকে এক পেয়ালা পানি দান হইলেও, তুচ্ছ মনে করিবে না; মুসলমান ভ্রাতার সহিত প্রসন্ন বদনে মিলিবে এবং সে তোমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে নিন্দা করিবে না।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল- "যে ব্যক্তি গীবত হইতে তওবা করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, সে সকলের শেষে বেহেশ্তে যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি তওবা ব্যতীত প্রাণত্যাগ করিবে সে সর্বাগ্রে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।"

হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "একবার আমি রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত সফরে ছিলাম। দুইটি কবরের নিকট দিয়া গমনের সময় তিনি বলিলেন-'এই দুই ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করিতেছে, তন্মধ্যে একজন গীবতের অপরাধে ও অন্যজন স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পেশাব হইতে পবিত্র রাখিত না বলিয়া শাস্তি পাইতেছে।' এই বলিয়া তিনি বৃক্ষের একটি তাজা ডাল ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা করিয়া উক্ত দুই কবরের উপর পুঁতিয়া দিলেন এবং বলিলেন- 'এই ডাল শুকাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাহাদের উপর শাস্তি লঘু হইবে।"

ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া এক ব্যক্তি স্বীকার করিলে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে প্রস্তারাঘাতে বধ করিবার আদেশ দিলেন। সমবেত

লোকদের মধ্যে একজন অন্যজনকে বলিল- "কুকুরকে যেভাবে বসানো হয় তাহাকে সেভাবে বসানো হইয়াছে।" তৎপর রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সঙ্গিগণসহ গমনকালে একটি মৃত প্রাণী দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন- "এই মৃতের মাংস ভক্ষণ কর।" সঙ্গিগণ নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, মৃতের মাংস কিরূপে ভক্ষণ করিব ?" তিনি বলিলেন–"ঐ (মৃত) ভ্রাতার যে মাংস তোমরা ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা ইহা অপেক্ষা অধিক মন্দ ও পুতিগন্ধময়।" এই স্থানে তিনি গীবতকারীর সঙ্গে গীবত শ্রবণকারীকেও দোষী করিয়াছেন, কেননা শ্রবণকারীরাও পাপের অংশী হইয়া থাকে।

হযরত সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্হুম প্রসন্ন বদনে পরস্পর সাক্ষাত করিতেন এবং কেহ কাহারও গীবত করিতেন না। এইরূপ আচরণকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠতম ইবাদত বলিয়া মনে করিতেন এবং উহার বিরুদ্ধাচরণকে কপটতা বলিয়া গণ্য করিতেন।

হযরত কাতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "কবরের আযাব তিন ভাগে বিভক্ত- এক-তৃতীয়াংশ গীবত, এক-তৃতীয়াংশ অপরের বাক্যে দোষ ধরিয়া সমালোচনা এবং এক-তৃতীয়াংশ পরিধেয় বস্ত্র পেশাব দ্বারা অপবিত্র রাখা হইতে হইয়া থাকে।" একদা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম শিষ্যগণসহ চলিবারকালে পথে একটি মৃত কুকুর দেখিতে পাইলেন। ইহার দুর্গন্ধে তাঁহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি কুকুরটির মাঢ়ির গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন- "ইহার দাঁতের শুভ্রতা খুব চমৎকার" এবং তাঁহার সহচরগণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন- "কোন পদার্থ দর্শন করিলে ইহার উৎকৃষ্ট অংশ সম্পর্কে কথা বলিবে।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের সম্মুখ দিয়া একদা একটি শূকর যাইতেছিল। তিনি ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- 'নিরাপদে চলিয়া যাও।" তাঁহার শিষ্যগণ বলিলেন- "ইয়া রূহুল্লাহ্, শূকরের প্রতি আপনি এইরূপ মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন?" তিনি বলেন- "মিষ্ট বাক্য প্রয়োগে স্বীয় রসনাকে অভ্যস্ত করিতেছি।" হযরত আলী ইব্নে হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা এক ব্যক্তিকে গীবতে লিপ্ত দেখিয়া বলিলেন- "নীরব থাক, গীবতকারী নরকবাসী কুকুরের তরকারীস্বরূপ।"

গীবতের পরিচয়—যাহা শুনিলে অপ্রিয় মনে হইবে, কাহারও সম্বন্ধে তাহার অনুপস্থিতিতে এমন কোন কথা বলাকেই গীবত বলে। এইরূপ কথা নিতান্ত সত্য হইলেই গীবত বলিয়া গণ্য হয়; আর অসত্য হইলে ইহাকে মিথ্যা অপবাদ বলে। অপরের দোষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে কথা বলা হয়, ইহাই গীবত। অন্যের দেহ, বংশ, বসনভূষণ, পশু, গৃহ, ভাবভঙ্গি বা কথোপকথনে কোন দোষ বাহির করিয়া কিছু বলিলে উহাকেই গীবত বলে।

দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট লোককে লম্বা বলিলে, অথবা তদ্রূপ খর্ব, কাল বা উজ্জ্বল, কটাচক্ষু, বা টেরা প্রভৃতি বলিলে দেহ সম্বন্ধে গীবত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকে গোলাম, জোলা বা অন্য কোন হীন পেশাদারের সন্তান বলিলে তাহার বংশ সম্বন্ধে

গীবত করা হয়। কাহাকেও নিন্দুক, মিথ্যাবাদী, গর্বিত, উগ্রবক্তা, কাপুরুষ বা অলস ইত্যাদি বলিলে তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে গীবত করা হয়। যদি কাহাকেও বল যে, সে চোর, আত্মসাৎকারী, বিশ্বাসঘাতক, বেনামাযী, রুকু-সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না, কুরআন শরীফ ভুল পড়ে, বস্ত্র পবিত্র রাখে না, যাকাত আদায় করে না, হারাম ভক্ষণ করে, জিহবা সংযত রাখে না, অতিরিক্ত আহার করে, অধিক নিদ্রা যায়, স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী চলিতে পারে না ইত্যাদি, তবে তাহার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে গীবত করিলে। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি বল যে, তাহার আস্তিন শ্লথ, আঁচল দীর্ঘ, বস্ত্র মলিন ইত্যাদি, তবে তাহার বসন-ভূষণ সম্বন্ধে গীবত করা হইল।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কাহারও সম্বন্ধে (তাহারা অগোচরে) এমন কোন কথা যদি বল যাহা শ্রবণ করিলে তাহার নিকট অপ্রীতিকর বোধ হয়, তবে সেই কথা সত্য হইলেও গীবত।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন- "আমি একদা এক রমণীকে খর্বাকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "হে আয়েশা, তুমি গীবত করিলে; থুথু ফেল। আমি তৎক্ষণাত থুথু ফেলিয়া দেখিলাম ইহাতে কালবর্ণ রক্ত রহিয়াছে।"

কোন কোন লোকে বলে পাপীর পাপ কর্মের উল্লেখ করিলে গীবত হয় না; বরং তাহাদের গর্হিত কাজের জন্য তাহাদিগকে নিন্দা ও দোষারোপ করা ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের এই ধারণা অসত্য ও ভ্রান্তিমূলক। অমুক ব্যক্তি ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী বা বেনামাযী ইত্যাদি বলিয়া অপরের পাপ প্রকাশ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য। তবে বিশেষ বিশেষ কারণে এইরূপ বলা অসঙ্গত নহে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তির মর্ম এই- যাহা সম্মুখে বলিলে মনে বিরক্তি ও কষ্ট আসে, অগোচরে তাহা বলিলেই গীবত হয়। অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণে মানুষের মনে কষ্ট হইয়া থাকে। ফল কথা, যে উক্তিতে কোন উপকারিতা নাই তাহা ব্যক্ত না করাই সঙ্গত।

অঙ্গভঙ্গি ও রসনায় গীবত—শুধু রসনা দ্বারাই গীবত হয় না; বরং চক্ষু, হস্ত এবং ইঙ্গিত দ্বারাও গীবত হইয়া থাকে। সকল প্রকার গীবতই হারাম।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন- "আমি হাতের ইশারায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, অমুক রমণী খর্ব। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "হে আয়েশা, তুমি গীবত করিলে।" সেইরূপ কোন খঞ্জ বা টেরা চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির চলন ও চাহনির অনুসরণে কেহ খোড়াইয়া চলিলে বা টেরাচক্ষে চাহিলে তাহাদের গীবত করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে যদি বলা হয়, খঞ্জ ব্যক্তি এইরূপে হাটে, টেরাচক্ষু ব্যক্তি এইরূপে দর্শন করে, তবে গীবত হইবে না। আবার ঐরূপ অঙ্গভঙ্গিতে দর্শকগণ যদি বুঝিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হইতেছে, তবে উহা অবৈধ। কারণ, যে কোন

প্রকারেই হউক না কেন, নিন্দিত ব্যক্তিকে পরিচিত করাইয়া দিয়া দোষ ব্যক্ত করিলেই গীবত হয়।

অপরিপক্ক আলিম ও পরহেযগারদের গীবত—অপরিপক্ক আলিম ও দীনদার ব্যক্তিগণও গীবত করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা যে গীবত করিতেছেন উহা তাঁহারা অবগত নহেন। উদাহরণস্বরূপ ধর, এইরূপ ব্যক্তির সম্মুখে কাহারও উল্লেখ হইল। তিনি তৎক্ষণাত বলিয়া উঠিলেন- "আলহামদুলিল্লাহ, খোদা আমাদিগকে সেইরূপ কার্য হইতে রক্ষ করিয়াছেন।" দোষীর দোষ লোকের নিকট ব্যক্ত করাই তাঁহার এইরূপ উক্তির উদ্দেশ্য। আবার তিনি এইরূপও বলেন- অমুক ব্যক্তি বড় ভাগ্যবান; কিন্তু আমাদের ন্যায় সেও সংসারে লিপ্ত রহিয়াছে। এই আপদ হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারিলেই হইল।" কোন কোন সময় তাঁহারা নিজদিগকে এইরূপ তিরস্কার করেন যাহাতে পরোক্ষভাবে অপরের নিন্দা হইয়া থাকে। আবার মনে কর, তাঁহার সম্মুখে একে অন্যের নিন্দা করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন- "সুবহানাল্লাহ, কি চমৎকার।" নিন্দুককে সন্তুষ্ট করা ও ইতঃপূর্বে যাহারা ঐ নিন্দা শুনে নাই তাহাদের নিকট ইহা প্রকাশের জন্যই এইরূপ বলা হইয়া থাকে। কখনও আবার অন্যের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলেন- "আল্লাহ্ আমাদিগকে তওবা করিবার ক্ষমতা দিন।" উল্লিখিত ব্যক্তির কোন পাপ অপরকে জ্ঞাপন করাই এইরূপ উক্তির উদ্দেশ্য। এই প্রকার সমস্ত উক্তিই গীবতের মধ্য গণ্য।

কপটতাসংযুক্ত গীবত—অপরিপক্ক আলেম ও পরহেযগারদের ঐ প্রকার গীবতে কপটতাও রহিয়াছে। তদ্রূপ বাক্যে একদিকে নিজের পরহেযগারী ব্যক্ত করা হয় এবং অপরদিকে কপটতার আচ্ছাদনে গীবত লুক্কায়িত রাখিয়া প্রকাশ করা হয় যে, তিনি গীবত করেন না। ইহাতে দ্বিগুণ পাপ হইয়া থাকে, অথচ তিনি যে গীবত করিতেছেন অজ্ঞতার দরুন ইহা বুঝিতেই পারেন না। এইরূপও হইয়া থাকে যে, একে অন্যের নিন্দা করিতেছে শুনিয়া তুমি তিরস্কার করিয়া বলিলে- "চুপ কর, গীবত করিও না।" এমতাবস্থায়, গীবতের প্রতি তোমার প্রকৃত অবজ্ঞা না থাকিলে তুমি মুনাফিক হইলে। অপরপক্ষে, শ্রোতৃমণ্ডলী তোমার তিরস্কারের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে নিন্দিত ব্যক্তির দোষ আরও অধিক প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং এইরূপে তুমি নিন্দুকও হইবে।

গীবত শ্রবণে গুনাহ্—গীবত করা যেমন হারাম, ইহা শ্রবণ করাও তেমনি হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তি গীবত শ্রবণ করে সেও গীবতের পাপের অংশী হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রবণকারীর অন্তরে গীবতের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকিলে কোন দোষ নাই। একদা হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় একজন অপরজনকে বলিলেন- "অমুক ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা যায়।" তৎপর তাঁহারা রুটি খাইবার জন্য তরকারি চাহিলে রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "তোমরা উভয়েই ত তরকারি খাইয়াছ।"

তাঁহারা বলিলেন- "কি খাইয়াছি, আমরা জানি না।" তিনি বলিলেন- "তোমরা স্বীয় ভ্রাতার মাংস খাইয়াছ।" লক্ষ্য কর, 'অমুক ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা যায়' একজন বলিয়াছিলেন এবং অপরজন শ্রবণ করিয়াছিলেন অথচ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয়কেই গীবতের অপরাধী করিলেন।

গীবত শ্রবণকারীর কর্তব্য—গীবতের প্রতি প্রগাঢ় ঘৃণা জাগরূক রাখিয়া গীবতকারীকে গীবত করিতে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করা আবশ্যক। গীবতের প্রতি তোমার গভীর ঘৃণা থাকিলেও তুমি যদি তাহাকে চক্ষু বা হস্তের ইঙ্গিতে গীবত্ হইতে ক্ষান্ত থাকিতে বল, তথাপি তুমি দোষমুক্ত হইতে পারিবে না। তাহাকে স্পষ্টভাবে তাকীদের সহিত নিষেধ করিতে হইবে, যেন নিন্দিত ব্যক্তির প্রতি তোমার যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহা প্রতিপালিত হয়। হাদীস শরীফে আসিয়াছে- কোন ব্যক্তি কোন মুসলমান ভ্রাতার গীবত করিলে শ্রবণকারী সেই নিন্দিত ভ্রাতার সাহায্য না করিয়া যদি তাহাকে নিঃসহায় পরিত্যাগ করে, তবে সে যখন অভাবে পতিত হইবে তখন আল্লাহ্ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।"

আন্তরিক গীবত—রসনা দ্বারা গীবত করা যেরূপ অবৈধ তদ্রূপ মনে মনে গীবত করাও অবৈধ। অন্যের নিকট অপরের দোষ প্রকাশ করা যেরূপ অন্যায় তদ্রূপ মনে মনে পরনিন্দা করাও অন্যায়। তুমি যদি কাহাকেও না দেখিয়া না শুনিয়া ও নিঃসন্দেহরূপে অবগত না হইয়া মন্দ বলিয়া ধারণা কর, তবে তুমি তাহার আন্তরিক গীবত করিলে।

রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আল্লাহ্ মুসলমানের রক্ত, ধন ও তাহার প্রতি কুধারণা পোষণ হারাম করিয়াছেন। নিজে নিঃসন্দেহরূপে না জানিয়ে বা দুইজন ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক পুরুষের সাক্ষ্যে প্রমাণিত না হইলে অপরের প্রতি কুধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ। এইরূপ কুধারণা হইলে মনে করিবে শয়তান ইহা অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا অর্থাৎ "যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসিক খবর লইয়া আসে ভালমত তাহ্‌কীক (অনুসন্ধান) করিয়া লও।" শয়তানতুল্য ফাসিক দুষ্কৃতিকারী দুর্বৃত্ত আর কেহই নাই।

বদগুমানের অনিষ্ট হইতে অব্যাহতির উপায়—অন্যের প্রতি মনে বদগুমান (কুধারণা পোষণ) করাই হারাম। কুধারণা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার অন্তরে প্রবেশ করিলে তুমি যদি তৎপ্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ কর তবে এইরূপ কুধারণার দরুন তুমি অপরাধী হইবে না। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, কু-ধারণা হইতে মুসলমান একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। তবে (ইহা হইতে) অব্যাহতি লাভের উপায় এই যে, সেই কুধারণাকে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা না করিয়া যথাশক্তি সেই ব্যক্তিকে সৎ বলিয়া মনে করিবে।

বদগুমান প্রমাণার্থ চেষ্টার নিদর্শন—যাহার প্রতি তোমার বদগুমান হইয়াছে তৎপ্রতি যদি তোমার মন অপ্রসন্ন থাকে এবং পূর্বে তাহার সহিত তোমার যেরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ আচার-ব্যবহার ছিল, এখন যদি ইহাতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে মনে করিবে বদগুমানকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা মনে মনে চলিতেছে। অপরপক্ষে, আন্তরিক ও মৌখিকভাবে তাহার সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার চলিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ বদগুমানকে নিশ্চিত প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

নিন্দাবাদ শ্রবণে কর্তব্য—কোন ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হইতে অপরের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলেও তৎক্ষণাত ইহা অভ্রান্ত মনে করিবে না এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াও সন্দেহ করিবে না। সংবাদদাতা ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ হউক বা ফাসিক দুর্বৃত্ত হউক, কাহারও প্রতি বদগুমান করা জায়েয নহে। এমতাবস্থায়, সংবাদদাতার কথা বিশ্বাস করিতে বিলম্ব করিয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে, ঐ ব্যক্তির অবস্থা তোমার নিকট যেরূপ গোপন ছিল ও আছে, তদ্রূপ সংবাদদাতার অবস্থাও তোমার নিকট গোপন আছে। আর যদি জানিতে পার যে, সংবাদদাতার সহিত ঐ ব্যক্তির শত্রুতা আছে, তবে তাহার কথা গ্রহণ ও বিশ্বাস করিতে বিলম্ব করাই উত্তম ব্যবস্থা। সংবাদদাতা ন্যায়পরায়ণ পরম ধার্মিক হইলেও তৎপ্রতি অধিক ঝুঁকিয়া পড়া উচিত নহে।

বদগুমান দমনের উপায়- কাহারও অন্তরে অপরের প্রতি বদগুমান আসিলে তাহার সহিত পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্নে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা আবশ্যক। তাহা হইলে শয়তান ক্রুদ্ধ হইয়া আর অন্তরে বদগুমান নিক্ষেপ করিবে না এবং এইরূপে ক্রমশ অপরের প্রতি বদগুমান কমিয়া যাইবে।

নিন্দিত ব্যক্তির প্রতি উপদেশ—কাহারও দোষ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেও লোকের সম্মুখে তাহার নিন্দা করা উচিত নহে, বরং নির্জনে তাহাকে উপদেশ দিবে। কিন্তু উপদেশ দানকালেও তাহাকে অপমানিত ও লজ্জিত করিবে না; আন্তরিক সমবেদনার সহিত নম্রভাবে তাহাকে উপদেশ দিবে। তাহা হইলে একজন মুসলমান ভ্রাতার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাহাকে উপদেশ দান, এই দুইটি সৎকাজই সম্পন্ন হইল। ইহাদের পুণ্যও স্বতন্ত্রভাবে লাভ করিবে।

গীবত হইতে অব্যাহতির উপায়—গীবতের বাসনা মানবের অন্তরে একটি ভীষণ পীড়া এবং সযত্নে ইহার প্রতিষেধক ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। এই রোগের জ্ঞানমূলক ও অনুষ্ঠানমূলক এই দুই প্রকার ঔষধ আছে।

জ্ঞানমূলক ঔষধ- ইহাও আবার দুইভাগে বিভক্ত।

প্রথম—গীবতের ক্ষতি সম্পর্কে যে সকল হাদীস বর্ণিত আছে, উহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করত উহার মর্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া লওয়া এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, গীবত করার দরুন গীবতকারীর আমলনামা হইতে পুণ্যসমূহ নিন্দিত ব্যক্তির আমলনামায় স্থানান্তরিত করা হয়। এইরূপে নিন্দুকের সমস্ত পুণ্য নিঃশেষ হইয়া যায়।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আগুন যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, গীবতও তদ্রূপ মানুষের পুণ্যসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলে।" মনে কর, কাহারও পাপ অপেক্ষা একটি পুণ্য অধিক আছে, কিন্তু সে যে গীবত করিয়াছে ইহার পাপে তাহার পাপের পাল্লা ভারী হইয়া গেলে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়—স্বীয় দোষ অনুসন্ধান করিবে; স্বীয় দোষ দৃষ্টিগোচর হইলে মনে করিবে তোমার ন্যায় অপরের দোষ থাকাও অসম্ভব নহে। আর যদি নিজের দোষ দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে মনে করিবে ইহাই তোমার জঘন্যতম দোষ। অপরপক্ষে, তুমি যথার্থই নির্দোষ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকিলে, গীবত করত মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করার মত গুরুতর অপরাধে নিজকে আর কলুষিত করিও না। মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণ অপেক্ষা অধিক দোষের কার্য আর কিছুই নাই। অতএব তুমি যথার্থই নির্দোষ হইয়া থাকিলে গীবত দ্বারা নিজকে নতুনভাবে কলুষিত না করিয়া বরং যাহার অপার অনুগ্রহে তুমি নির্দোষ হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যদি নিঃসন্দেহে অবগত হও, অমুক ব্যক্তি কোন বিশেষ দোষে দুষ্ট, তবে এই ভাবিয়া গীবত হইতে বিরত হইবে যে, ইহজগতে কেহই একেবারে দোষমুক্ত নহে। আর একবার তুমি নিজের প্রতিও লক্ষ্য কর, দেখিবে শরীয়তের সূক্ষ্ম সীমারেখা হইতে স্বয়ং তুমিও বহুস্থানে পদস্খলিত হইয়াছ; উহাতে তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন। তুমিই যখন শরীয়তের সীমার উপর সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়পদ থাকিতে পার নাই, তখন অপরের পদস্খলনে তোমার বিস্ময়ের কি হেতু আছে?

অপরপক্ষে, জন্মগতভাবে কোন কোন লোকের এমন দোষ আছে যাহা পরিত্যাগ করা তাহাদের ক্ষমতাবহির্ভূত। (যেমন খঞ্জ, অন্ধ, বধির ইত্যাদি)। এইরূপ স্থলে সেই প্রকার লোকের নিন্দা করিলে প্রকারান্তরে সৃষ্টিকর্তারই নিন্দা করা হইয়া থাকে।

গীবতের কারণ ও অনুষ্ঠানমূলক ঔষধ—এ স্থলে গীবতের কারণ নির্দেশ করত উহার প্রতিকার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইবে। আটটি কারণে মানুষ গীবত করিয়া থাকে।

প্রথম কারণ—ক্রোধ। কেহ কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া সে গীবতে লিপ্ত হয়। অতএব ক্রোধ দমন করিলেই এইরূপ গীবত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজকে দোযখে নিক্ষেপ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ। ইহা নিজের প্রতি শত্রুতা ও স্বীয় অমঙ্গল কামনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ প্রকাশ্যভাবে তাহাকে আহ্বান করিয়া লইবেন এবং বলিবেন, "বেহেশতের হুরগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ কর।"

দ্বিতীয় কারণ—মানুষের সন্তোষ অর্জনের জন্য লোকে গীবত করিয়া থাকে। ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা এই, উত্তমরূপে বুঝিয়া লইবে যে, মানুষের মনতুষ্টির চেষ্টায় আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হওয়া নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতার কার্য; বরং মানুষের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হইয়াও আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় কারণ—স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে অপরের দোষ উদ্‌ঘাটন। কাহারও কোন দোষ প্রকাশিত হইলে সে অপরের দোষ উল্লেখ করিয়া স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে। মনে কর, এক ব্যক্তি হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করে বা সরকারী ধন গ্রহণ করে। সেই ব্যক্তি স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে বলেন- "অমুক অমুক ব্যক্তি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে।" নিজের দোষ হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত অপরের দোষ প্রকাশ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ। আর দেখ, পাপীদের অনুসরণ করা ত উচিত নহে। এমতাবস্থায় 'অমুক ব্যক্তি পাপ করে' এই দৃষ্টান্ত দিয়া কি লাভ হইল এবং তোমার অকর্মের সমর্থনে কি যুক্তি পাওয়া গেল? দেখ, কেহ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলে তুমি ত তাহার অনুসরণ কর না? তবে কেন তাহার অনুসরণে পাপাচরণ করিবে? তুমি স্বয়ং পাপ করিয়া একবার পাপী হইবে, আবার পরের দোষ প্রকাশ করিয়া পুনরায় পাপী হইবে কেন? অতএব অনুধাবন কর, তুমি যে লোকলজ্জার আশঙ্কায় অপরের দোষ ধরিতেছ এবং নিজের দোষ হইতে অব্যাহতির চেষ্টা করিতেছ, সেই আশঙ্কাও নিশ্চিত নহে; এই জগতে তোমার অপমান হইতেও পারে নাও হইতে পারে। কিন্তু তুমি যে গীবত করিলে, এইজন্য আল্লাহ্ যে ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা ধ্রুব সত্য; একদিন সেই ক্রোধাগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিবেই করিবে। সেই অপমান ও আপদ অত্যন্ত ভীষণ হইবে। সুতরাং স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টায় অন্যের দোষ উল্লেখ করিতে আল্লাহ্‌র নিশ্চিত ক্রোধে পতিত হওয়া কখনও সঙ্গত নহে।

চতুর্থ কারণ—আত্ম-প্রশংসা। কোন কোন লোক আত্ম-প্রশংসা করিতে চায়; কিন্তু খোলাখুলিভাবে না করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে অপর সম্মানিত লোকের নিন্দা করিতে থাকে। তেমন লোক বলিয়া থাকে- "অমুক ব্যক্তি কিছুই বুঝে না (অর্থাৎ আমি সমস্ত বুঝিয়া থাকি)।" অথবা বলে - "অমুক ব্যক্তি লোক দেখানো ইবাদত করিয়া থাকে (অর্থাৎ আমি এইরূপ করি না)।" বুদ্ধিমান লোকে এইরূপ ব্যক্তিকে মুর্খ দুর্বৃত্ত বলিয়া মনে করিবে এবং কেহই তাহাকে মহৎ ও নিষ্কলঙ্ক বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। এইরূপে অপরের দোষ-কীর্তনে অজ্ঞ লোক তাহার ভক্ত হইলেও ইহাতে তাহার কি উপকার? অসহায়, দুর্বল ও নিতান্ত অক্ষম লোকের প্রশংসা লাভের আশায় পরম পরাক্রান্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট বিরাগভাজন ও অপমানিত হওয়াতে কি লাভ?

পঞ্চম কারণ—ঈর্ষা। যাঁহারা মান-সম্ভ্রম, বিদ্যা ও ধন অর্জন করিয়া লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করত অকারণে তাঁহাদের সহিত ঝগড়া-বিবাদ লাগইয়া দেয়। সে বুঝিতে পারে না যে, সে নিজের বিরুদ্ধেই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইয়াছে। সে ইহলোকে নিজেকে মানসিক যাতনা ও হিংসানলে দগ্ধ করে এবং পরলোকে আবার গীবতের পাপানলে দগ্ধ হইতে ইচ্ছা করে। সুতরাং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি উভয় লোকে

আল্লাহ্‌র নে'আমত হইতে বঞ্চিত থাকে। ঈর্ষাজনিত গীবত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাহাদের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, আল্লাহ্ যাঁহাদিগকে সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন দান করিয়াছেন, হিংসুকের হিংসায় উহা মোটেই লাঘব হয় না, বরং ক্রমশ বাড়িয়া যায়।

ষষ্ঠ কারণ—উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ। অধিকাংশ সময় মানুষ অন্যকে কলঙ্কিত ও অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার ক্রিয়া-কলাপ লইয়া উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে মত্ত হয়। উপহাসক বুঝিতে পারে না যে, এইরূপে উপহাস করিয়া সে অপরকে লোকের নিকট যতদূর অপদস্থ করিতেছে তদপেক্ষা অধিক সে নিজে আল্লাহ্‌র নিকট অপদস্থ হইতেছে।

প্রিয় পাঠক, অনুধাবন কর, উপহাসাস্পদের পাপের বোঝা যদি কিয়ামত দিবস উপহাসকের পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিয়া গর্দভের মত তাহাকে দোযখের দিকে লইয়া যাওয়া হয়, তবে ইহজগতে উপহাসাস্পদ হওয়াই উত্তম। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিলে সে কখনও অপরকে উপহাস করিবে না। তাহা হইলে সে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপজনিত গীবত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে।

সপ্তম কারণ—অসতর্কতা। পরহেযগার ব্যক্তিগণ অপরকে পাপ করিতে দেখিয়া দুঃখিত হন এবং পাপীর দুর্গতিতে দুঃখিত হওয়াও সঙ্গত। কিন্তু তাঁহারা পাপের উল্লেখকালে পাপাচারীর নামও উচ্চারণ করিয়া ফেলেন এবং অসতর্কতাবশত লক্ষ্য করেন না যে, ইহা গীবতের মধ্যে গণ্য। এই প্রকার গীবত হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, অপরের দুর্গতিতে দুঃখিত হইলে পুণ্য হয় সত্য, কিন্তু অসতর্ক লোক অনায়াসে পুণ্য লাভ করিবে, বিদ্বেষপরায়ণ শয়তান ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার দ্বারা পাপাচারীর নামও ব্যক্ত করাইয়া ফেলে এবং এইরূপে তিনি অপরের বিপত্তিতে দুঃখিত হইয়া যে পুণ্য লাভ করিতেন ইহা গীবতের পাপে ধ্বংস হইয়া যায়।

অষ্টম কারণ—মূর্খতা। অপরকে পাপে লিপ্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলে বা বিস্ময় প্রকাশ করিলে পুণ্য হয়। কিন্তু ক্রোধ বা বিস্ময় প্রকাশকালে পাপাচারীর নাম লইলে লোকে তাহার পাপকার্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সুযোগ পায় এবং ইহাতে উক্ত পুণ্য ধ্বংস হয়। মূর্খতার দরুন মানুষ অজ্ঞাতসারে এই প্রকার গীবত করিয়া থাকে। এইরূপ গীবত হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ক্রোধ, বিস্ময় বা বিরক্তিসূচক বাক্য সাধারণভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক, পাপাচারীর নাম কখনও উল্লেখ করা সঙ্গত নহে।

বিশেষ কারণে গীবত সঙ্গত—মিথ্যা বলা যেমন হারাম গীবতও তদ্রূপ হারাম। শরীয়তসম্মত অপরিহার্য কারণ না হইলে উহা সঙ্গত ও নির্দোষ হইতে পারে না। ছয়টি স্থানে পরের দোষ ব্যক্ত করা চলে।

প্রথম স্থান—বাদশাহ বা বিচারকের নিকট বিচার প্রার্থীরূপে উৎপীড়কের উৎপীড়নের বিষয় বলা বৈধ। এইরূপ উৎপীড়কের কোন সাহায্যকারীর নিকটও উৎপীড়নের বিষয় বলাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু উৎপীড়ককে শাস্তি দিবার বা উৎপীড়িতকে সাহায্য করিবার যাহাদের কোন শক্তি নাই তাহাদের নিকট উৎপীড়নের বিষয় বলা সঙ্গত নহে। হযরত ইব্‌ন সিরীনের নিকট এক ব্যক্তি হাজ্জাজের উৎপীড়নের বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলে তিনি বলিলেন– "আল্লাহ্ হাজ্জাজ হইতে যেরূপ প্রজা নিপীড়নের নিমিত্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, তদ্রূপ তিনি তাহার নিন্দুক হইতেও তাহার নিন্দার প্রতিশোধ লইবেন।"

দ্বিতীয় স্থান—কোন স্থানে অসৎ ও অসঙ্গত কাজ চলিতেছে বা অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া উহা নিবারণ করিতে পারেন এবং দুরাচারীদিগকে দুষ্কর্ম হইতে বিরত রাখিতে সমর্থ, তেমন ব্যক্তির নিকট উহা প্রকাশ করা অসঙ্গত নহে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা হযরত তাল্‌হা বা হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট দিয়া যাইবার কালে তাঁহাকে সালাম দিলেন; কিন্তু তিনি ইহার উত্তর দেন নাই। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করেন। তিনি ঐ পক্ষের নিকট হইতে সালামের জওয়াব না দিবার কৈফিয়ত চাহিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযোগকার্যকে গীবতের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

তৃতীয় স্থান—মুফতি হইতে ফত্‌ওয়া অর্থাৎ ধর্মব্যবস্থা লওয়ার উদ্দেশ্যে কাহারও দোষযুক্ত প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করারও অনুমতি আছে; যেমন আমার সহধর্মিণী, পিতা কিংবা অমুক ব্যক্তি আমার সঙ্গে এইরূপ আচরণ করে। এইরূপ স্থানে দোষী ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করাই উত্তম ব্যবস্থা; যথা ঃ কোন ব্যক্তি তাহার স্বামী, পুত্র কিংবা অমুকের সহিত এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে, এই সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? কিন্তু এইরূপ ফত্‌ওয়া জিজ্ঞাসাকালে দোষী ব্যক্তির পরিচয় প্রদানেরও অনুমতি রহিয়াছে। তাহা হইলে মুফতী প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া সহজে উত্তর দিতে পারেন।

একদা আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন– "আবূ সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ, তিনি আমার সন্তানাদির ভরণ-পোষণের উপযোগী অর্থ প্রদান করেন না। যদি আমি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন জিনিস লইয়া খরচ করি তবে যুক্তিযুক্ত হইবে কি?" তিনি বলিলেন– "যে পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজন ন্যায়-সঙ্গতভাবে উহা গ্রহণ কর। কিন্তু কৃপণতা ও সন্তানাদির উপর অত্যাচারের কথা বলিলে গীবত হয়।" তবে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফত্‌ওয়া জিজ্ঞাসাকালে দোষ ব্যক্ত করা সঙ্গত বলিয়াছেন।

চতুর্থ স্থান—অনিষ্টকর ব্যক্তির ক্ষতি হইতে লোককে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহার দোষ ব্যক্ত করা বৈধ। মনে কর, কোন বিদ্‌আতী ব্যক্তি সমাজে শরীয়ত বহির্ভূত নতুন

নতুন ক্রিয়া-কলাপ, রীতিনীতি, চালচলন ধর্মের নামে প্রচলিত করত অমঙ্গলের উপক্রম করিতেছে, কোন চোর-ডাকাত লোকদের আস্থা লাভ করিয়া চুরি-ডাকাতির সুবিধা অন্বেষণ করিতেছে, কেহ কোন রমণীকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে বা কোন দাস-দাসী খরিদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে; এইরূপ স্থানে তুমি তাহাদের অনিষ্টকর দোষ অবগত থাকা সত্ত্বেও না বলিলে সংশ্লিষ্ট লোকগণ বিপন্ন হইতে পারে। এমতাবস্থায়, তাহাদের দোষ পরিষ্কাররূপে জানাইয়া দেওয়া উত্তম। এই সকল স্থানে দোষ প্রকাশ না করিলে প্রকারান্তরে মুসলমানদের অনিষ্ট করা হয় এবং তাহাদের প্রতি তোমার মমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সাফাই সাক্ষীর পক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা বৈধ। তদ্রূপ কাহারও সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলে পরামর্শদাতার পক্ষে ঐ ব্যক্তির দোষ ব্যক্ত করাও অসঙ্গত নহে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ফাসিকের দোষ-ত্রুটি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর, যেন লোকে তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে।" যে স্থানে ফাসিকের কার্য-কলাপে বিপদাপদের আশঙ্কা রহিয়াছে, তদ্রূপ স্থানেই এই আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। অনর্থক যেখানে সেখানে অন্যের দোষ ব্যক্ত করা বৈধ নহে।

জ্ঞানীগণ বলেন, তিন শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে অভিযোগ করিলে গীবত হয় না; যথা– (১) অত্যাচারী বাদশাহ বা শাসনকর্তা; (২) বিদ্‌আতী অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীয়ত বহির্ভূত নবপ্রথা, ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি, চালচলন ধর্মের নামে প্রচলন করে ও (৩) যে ফাসিক প্রকাশ্যে পাপকার্যে লিপ্ত থাকে। তাহারা নিজেদের দোষ গোপন করে না এবং অপরে তাহাদের দোষ ব্যক্ত করিলে তাহারা দুঃখিত হয় না বলিয়াই এরূপ ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা সঙ্গত।

পঞ্চম স্থান—কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে যাহাতে কোন দোষের আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু সেই নাম লইলে সে দুঃখ পায় না, তবে, তদ্রূপ নামে তাহাকে ডাকিলে কোন দোষ নাই; যথা ঃ– আ'মশ ('রাতকানা' একজন প্রখ্যাত আলিমের এই উপাধি ছিল), আ'রাজ (খঞ্জ' বলিয়া না ডাকিয়া অন্য কোন ব্যাজবাক্যে তাহাদিগকে আহবান করা উত্তম; যেমন– অন্ধকে 'বসীর' (দর্শক) বা চশমপুশীদা (দর্শনসংযমী) ইত্যাদি বলিবে।

ষষ্ঠ স্থান—যাহারা লোকলজ্জার ভয় না করিয়া প্রকাশ্যভাবে অসৎকর্ম ও ব্যভিচার করে এবং নিজেদের কাজকে দোষাবহ মনে করে না, তেমন লোকের দোষ বর্ণনা করা বৈধ। যেমন– দুর্বৃত্ত, নপুংসক, মদ্যপ, মাতাল ইত্যাদি।

গীবতের কাফ্‌ফারা—গীবতের পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় এই– (১) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা; ইহাতে তাঁহার নিকট নিন্দুক গীবত করিয়া যে অভিযোগের পাত্র হইয়াছে, সেই অন্যায় হইতে সে পরিত্রাণ পাইতে পারে, এবং (২) নিন্দিত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা; ইহাতে নিন্দুক নিন্দিত

ব্যক্তির প্রতি যে অবিচার করিয়াছে, ইহার দায়িত্ব হইতে সে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, (দুনিয়াতে) যাহার মান-মর্যাদা বা অর্থের হানি করা হইয়াছে, কিয়ামত দিবস আগমনের পূর্বেই তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া লওয়া উচিত। সেইদিন ধন-দৌলত, স্বর্ণ-রৌপ্য কোনই কাজে লাগিবে না। তখন অনিষ্টের বিনিময়ে অত্যাচারীর পুণ্য অত্যাচারিতকে দেওয়া হইবে। অত্যাচারীর আমলনামায় কোন পুণ্য না থাকিলে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপ তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হা এক রমণীকে বলিলেন– "তুমি বড় বাচাল।' রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "হে আয়েশা, তুমি গীবত করিলে; ঐ রমণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, নিন্দিত ব্যক্তির পাপ মোচনের জন্য নিন্দুককে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করাই যথেষ্ট এবং নিন্দিত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা ভিক্ষার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু হাদীসের অন্যান্য উক্তি হইতে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। নিন্দিত ব্যক্তির পরলোকগমন করিয়া থাকিলে তাহার মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা আবশ্যক। সে জীবিত থাকিলে লজ্জিত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবে এবং সবিনয়ে বলিবে– "আমি মিথ্যা বলিয়াছি, অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" এতদ্‌সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করিলে প্রশংসা ও উত্তম ব্যবহারে তাহার মনস্তুষ্টি বিধানে তৎপর হইবে। ইহাতে সে ক্ষমা না করিলে বুঝিবে যে, ইহা তাহার ন্যায্য দাবী। ক্ষমা করা না করা তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যাহা করিয়াছ উহা পুণ্যরূপে তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইবে এবং কিয়ামতের দিন নিন্দার বিনিময়ে নিন্দিত ব্যক্তিকে উহা প্রদান করা হইবে। কিন্তু নিন্দুককে ক্ষমা করিয়া দেওয়াই নিন্দিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম।

পূর্ববর্তী কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নিন্দুককে ক্ষমা করেন নাই এবং বলেন, তাঁহাদের আমলনামায় উহার চেয়ে উত্তম কোন পুণ্য নাই। কিন্তু নিন্দুককে ক্ষমা করিয়া দিলেই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্য পাওয়া যাইবে। এক ব্যক্তি হযরত হাসান বস্‌রীর (র) নিন্দা করিয়াছিল। তিনি এক থালা খোরমা উপহারস্বরূপ তাহাকে এই বলিয়া পাঠাইলেন– "শুনিলাম আপনি স্বীয় ইবাদত আমার জন্য উপহার পাঠাইয়াছেন; প্রতিদানের আমার আশা ছিল; কিন্তু পূর্ণ প্রতিদানে অক্ষম বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি।"

নিন্দিত ব্যক্তিকে যাহা বলা হইয়াছে ক্ষমা প্রার্থনাকালে তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলে ক্ষমা সঙ্গত হয় না। কেননা, অপর লোক কি বলিয়াছে না বলিয়াছে, উহা অবগত না হইলে কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হওয়াই সঙ্গত নহে; এমতাবস্থায়, সে ক্ষমা করিবে কিরূপে?

ত্রয়োদশ আপদ—ভ্রূকুটি করা ও একজনের কথা বিকৃত করিয়া মিথ্যা জোর দিয়া অপরজনের কানে লাগানো। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ

অর্থাৎ "যাহারা বিদ্রূপ করে কানে কানে কথা লাগাইয়া বেড়ায় (তাহাদের কথা বিশ্বাস করিও না।)"

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ অর্থাৎ "নিরতিশয় অনিষ্ট রহিয়াছে– প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে অসাক্ষাতে দোষ প্রকাশ করে (কানকথা লাগায়)" حَمَّالَةَ الْحَطَبِ "যে কাঠের বোঝা বহন করিয়া আনে" অর্থাৎ অগোচরে নিন্দোক্তি করে, লোককথা কানে কানে লাগাইয়া ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করে (সে অতি শীঘ্র দোযখে প্রবেশ করিবে)। এই সকল আয়াতে চুগোলখোরী সম্বন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "চুগোলখোর (অর্থাৎ যে ব্যক্তি একজনের কথা অপ্রিয়ভাবে অপরজনের কানে লাগায়) বেহেশতে যাইবে না।" তিনি বলেন– "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিকৃষ্ট জানাইয়া দিতেছি– যে ব্যক্তি একজনের কথা বিকৃত করিয়া অন্যজনের কানে দেয়, মিথ্যা যোজনা করিয়া বলে এবং মানুষকে ক্রুদ্ধ ও বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলে, সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট।" তিনি বলেন– "আল্লাহ্ বেহেশ্‌ত সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 'বল।' ইহা বলিল– 'যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করিবে সে-ই ভাগ্যবান।' আল্লাহ্ বলিলেন– 'আমার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ করিয়া বলিতেছি, আট প্রকার মানুষকে তোমার দিকে যাইতে দিব না। (তাহারা হইতেছে) (১) মদ্যপায়ী; (২) অবিরত ব্যভিচারী; (৩) চুগলখোর; (৪) দায়্যুস (অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়াও তাহাকে প্রতিরোধ করে না।); (৫) গায়িকা-নর্তকী; (৬) দুর্বৃত্ত ব্যভিচারী নপুংসক; (৭) আত্মীয়তা ছেদনকারী এবং (৮) যে ব্যক্তি বলে আমি আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ যে, অমুক কাজ করিব, অথচ ইহা করে না।"

হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা গেল। হযরত মূসা আলায়হিস সালাম বহুবার প্রান্তরে গিয়া সমবেতভাবে বারিবর্ষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বৃষ্টিপাত হইল না। পরে ওহী অবতীর্ণ হইল– "তোমাদের মধ্যে একজন চুগোলখোর রহিয়াছে, এইজন্য তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিব না।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম নিবেদন করিলেন– "হে খোদা! সে কোন্ ব্যক্তি? আমি তাহাকে বাহির করিয়া দিব।" উত্তর আসিল– "আমি চুগোলখোরকে মন্দ জানি; আর স্বয়ং চুগোলখোরী করিব?" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– "চোগলখোরী হইতে তওবা কর।" সকলেই তওবা করিল এবং অবিলম্বে বৃষ্টিপাত হইল।

কথিত আছে, এক ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞলোকের অন্বেষণে সাত শত ক্রোশ পথ চলার পর একজন হাকীমকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– (১) " কোন পদার্থ আকাশ অপেক্ষা বিস্তৃত? (২) কোন্ প্রদার্থ পৃথিবী অপেক্ষা গুরুভার? (৩) কোন্ পদার্থ প্রস্তর অপেক্ষা কঠিন? (৪) কোন্ প্রদার্থ আগুন অপেক্ষা গরম? (৫) কোন্ পদার্থ বরফ অপেক্ষা ঠাণ্ডা? (৬) কে সমুদ্র অপেক্ষা ধনবান? (৭) কোন্ ব্যক্তি অনাথ সন্তান অপেক্ষা হীন

ও নিঃসহায়?" হাকীম বলিলেন– (১) "সত্য আকাশ অপেক্ষা বিস্তৃত; (২) নিষ্পাপের উপর মিথ্যাপবাদ পৃথিবী অপেক্ষা গুরুভার; (৩) কাফিরের অন্তর প্রস্তর অপেক্ষা কঠিন, (৪) হিংসা আগুন অপেক্ষা গরম; (৫) যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের অভাব মোচন করে না, তাহার মন বরফ অপেক্ষা ঠাণ্ডা; (৬) অল্পে পরিতুষ্ট ব্যক্তির হৃদয় সমুদ্র অপেক্ষা ধনবান; (৭) যাহাকে চুগোলখোর বলিয়া লোকে চিনিয়াছে, সে অনাথ সন্তান অপেক্ষা হীন ও নিঃসহায়।"

চুগোলখোরীর পরিচয়—একের কথা অপরের কানে লাগানোই শুধু চুগোলখোরী নহে, বরং অপরের পীড়াদায়ক প্রতিটি বাক্য ও কর্মকথা, ইঙ্গিত বা লেখনী যে কোন প্রকারেই প্রকাশ করা হউক না কেন, চুগোলখোরীর মধ্যে গণ্য। যে গোপন রহস্য প্রকাশ করিলে অপরে দুঃখিত হয়, তাহা প্রকাশ করা অসঙ্গত। কিন্তু কেহ কাহারও ধনহানির গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে ইহা প্রকাশ করা বৈধ। তদ্রূপ কেহ কোন মুসলমানের অনিষ্টের গোপন পরিকল্পনা করিয়া থাকিলে ইহা প্রকাশ করাও বৈধ।

চুগোলখোরী শ্রবণকারীর কর্তব্য—কেহ যদি তোমাকে জানায় যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকের এইরূপ কথা বলিতেছে, তোমার বিরুদ্ধে এইরূপ কাজ করিতেছে বা এবংবিধ কোন কথা বলিতেছে, এমতাবস্থায়, তোমার ছয়টি কর্তব্য রহিয়াছে; যথা– (১) সংবাদদাতার কথা বিশ্বাস করিবে না। কারণ, চুগোলখোর ফাসিক এবং ফাসিকের কথা শুনিতে আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন। (২) সংবাদদাতাকে উপদেশ দিবে এবং তাহাকে চুগোলখোরী করিতে নিষেধ করিবে; কারণ অসৎকর্মে প্রতিরোধ অবশ্য কর্তব্য। (৩) আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে সংবাদদাতাকে শত্রু মনে করিবে; কেননা, চুগোলখোরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যায় না। (৪) কাহারও প্রতি কু-ধারণা পোষণ করিবে না; কারণ কু-ধারণা পোষণ করা হারাম। (৫) সংবাদদাতার কথার সত্যতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করিবে না; কারণ, আল্লাহ্ উহা নিষেধ করিয়াছেন (৬) 'যাহা নিজের জন্য অপ্রিয় মনে কর, তাহা অপরের জন্যও অপ্রিয় মনে করিবে' এই উপদেশ পালনার্থ তাহার চুগোলখোরীর বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না, গোপন রাখিবে। এই ছয়টি নির্দেশ পালন অবশ্য কর্তব্য।

হযরত ওমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি চুগোলখোরী করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন– "তুমি মিথ্যা বলিয়া থাকিলে তুমি ফাসিক লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا অর্থাৎ 'যদি তোমার নিকট কোন ফাসিক লোক খবর লইয়া আসে ভালমতে তাহকীক (অনুসন্ধান) করিয়া লও।' আর তুমি সত্য বলিয়া থাকিলে তুমি চুগোলখোরদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন– هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ অর্থাৎ 'যাহারা বিদ্রূপ করে, কানে-কানে কথা লাগাইয়া বেড়ায় তাহাদের কথা বিশ্বাস করিও না।' সুতরাং তোমার ইচ্ছা হইলে তওবা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব।" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি তওবা করিল।

এক ব্যক্তি একজন হাকীমকে বলিল– "অমুক ব্যক্তি আপনার সম্বন্ধে এইরূপ বলিল।" হাকীম বলিলেন– "বহুদিন পর তুমি আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছ। কিন্তু তুমি তিনটি ক্ষতি করিয়া গেলে– (১) একজন ভ্রাতার প্রতি আমার মন বিগড়াইলে, (২) আমার প্রশান্ত হৃদয়কে ব্যাকুল করিলে এবং (৩) আমার নিকট তোমাকে ফাসিক বলিয়া পরিচয় দিলে।" একদা খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক প্রখ্যাত আলিম জহ্‌রীর সহিত বসিয়া ছিলেন। তখন খলীফা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি কি আমার সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছ?" সে অস্বীকার করিলে তিনি বলিলেন– "একজন ন্যায়-পরায়ণ বিশ্বস্ত পুরুষ সংবাদ দিয়াছে।" তখন জহ্‌রী বলিলেন– "হে আমীরুল মুমিনীন, চুগোলখোর ন্যায়-পরায়ণ হয় না।" খলীফা জহ্‌রীর কথা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে স্বচ্ছন্দে তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেন– "যে ব্যক্তি অপরের কথা তোমার নিকট বলে, সে অবশ্যই তোমার কথাও অপরের নিকট বলিবে। এইরূপ লোক হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, তাহাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করা আবশ্যক। কারণ, গীবত, খেয়ানত, কৃত্রিমতা, হিংসা, সত্যের সহিত মিথ্যার সংযোজন, কপটতা, প্রতারণা ইত্যাদি তাহারই কর্ম। আর তাহার খেয়ানতের দরুনই এই সমস্ত অসৎ কর্মে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। বুযুর্গগণ বলেন– "অকপটতা সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। কিন্তু চুগোলখোর এত দুর্বৃত্ত যে, তাহার অকপটতাও কেহ পছন্দ করে না।" হযরত মুস্‌আব ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন– "আমার মতে চুগোলখোরী করা অপেক্ষা চুগোলখোরের কথা শ্রবণ করা অধিকতর দূষণীয়; কেননা, চুগোলখোরীর উদ্দেশ্য অন্যকে বিরাগভাজন করিয়া তোলা। চুগোলখোরের কথা শ্রবণ করিলে এই উদ্দেশ্য সফল হয় এবং ইহাতে যেন চুগোলখোরকে চুগোলখোরীর অনুমতি দেওয়া হয়।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "চুগোলখোর হারামযাদা।"

চুগোলখোর ও কলহপ্রিয় লোকের অনিষ্টকারিতা অপরিসীম। তাহাদের দরুন বহু খুন-খারাবী হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি স্বীয় গোলাম বিক্রয় করিতে যাইয়া বলিল– "সে একজনের কথা অপরজনের কানে লাগায় এবং এইরূপে অশান্তির সৃষ্টি করে; এতদ্ব্যতীত তাহার অপর কোন দোষ নাই।" এই দোষ উপেক্ষা করত এক ব্যক্তি গোলামটি ক্রয় করিয়া গৃহে নিয়া গেল। এক দিন গোলাম গৃহকর্ত্রীকে গোপনে বলিল– "আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসেন না, তিনি এক দাসী ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহার কণ্ঠের উপর হইতে যদি কয়েকটি চুল ক্ষুর দিয়া কাটিয়া আনিতে পারেন, তবে এমন মন্ত্র পড়িয়া দিব যে, তিনি আপনার প্রতি আশিক হইয়া পড়িবেন।" অপরদিকে, গোলাম কর্তাকে বলিল– "আপনার স্ত্রী পর-পুরুষের প্রতি আসক্ত। তিনি আপনাকে হত্যার চেষ্টায় রহিয়াছেন। রজনীতে ঘুমের ভান করিয়া শুইয়া থাকিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

রজনী আগমনে গৃহকর্তা শয্যা গ্রহণ করিল। গৃহস্বামিনী একটি ক্ষুর লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং স্বামীর দাড়ীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিল। ইহা দেখিয়া স্বামীর দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, স্ত্রী তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। সুতরাং তৎক্ষণাত সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ফেলিল। সংবাদ শুনিয়া গৃহস্বামিনীর আত্মীয়-স্বজন আসিয়া গৃহস্বামীকে হত্যা করিল। এইরূপে আরও বহু হত্যাকান্ড সংঘটিত হইল।

চতুর্দশ আপদ—পরস্পর শত্রুদের মধ্যে দ্বিমুখী হওয়া। এমতাবস্থায়, প্রত্যেককেই এইরূপ কথা বলিতে হয় যাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট থাকে; একের কথা বিকৃত ও অপ্রিয় করত অপরের কানে লাগাইতে হয় এবং প্রত্যেকের নিকটই প্রকাশ করিতে হয়– "আমি তোমারই অন্তরঙ্গ বন্ধু।" এইরূপ দ্বিমুখী হওয়া চুগোলখোরী অপেক্ষা মন্দ। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "ইহকালে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী হইবে, পরকালে তাহার দুই রসনা হইবে।" তিনি আরও বলেন– "দ্বিমুখী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে নিকৃষ্ট।"

যে ব্যক্তি পরস্পর শত্রুদের মধ্যে বন্ধুভাবে থাকিতে চায় তাহার কর্তব্য এই– (১) একজনের নিকট হইতে শোনা কথা অন্যের নিকট না বলিয়া চুপ থাক; (২) প্রকাশ্যে মুখের উপর বলিয়া দেওয়া; অথবা, (৩) অসাক্ষাতে অসত্য না বলা; সাক্ষাতে এক কথা, অসাক্ষাতে অন্য কথা বলিলে মুনাফিক হইতে হয়; (৪) একের কথা কখনও অন্যের নিকট না বলা এবং (৫) 'আমি তোমার বন্ধু' ইহা প্রত্যেকের নিকট না বলা।

হযরত ইব্‌ন ওমর রাযিয়াল্লাহ্ আনহুর নিকট লোকে নিবেদন করিল– "আমরা আমীরদের নিকট যাইয়া এমন কথা বলিয়া থাকি যাহা তথা হইতে বাহির হইলে আর বলি না।" তিনি বলিলেন– "রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামের যমানায় আমরা এইরূপ ব্যবহারকে কপটতা বলিয়া জানিতাম। যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে আমীরদের নিকট গমন করে এবং তথায় এমন কথা রচনা করে যাহা সে তাহাদের অগোচরে বলে না, সে মুনাফিক। অবশ্য শরীয়তসম্মত অপরিহার্য কারণে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অত্যাচারী আমীরের নিকট সেইরূপ কিছু বলার বিধান আছে।"

পঞ্চদশ আপদ—প্রশংসা করা ও ইহাতে অতিরিক্ত করা। রসনার এই আপদে ছয় প্রকার অনিষ্ট রহিয়াছে। তন্মধ্যে চারিটি অনিষ্ট প্রশংসাকারীর ও দুইটি প্রশংসিতের।

প্রশংসাকারীর অনিষ্ট ঃ প্রথম অনিষ্ট– অতিরিক্ত প্রশংসা করা এবং ইহা করিতে যাইয়া কিছু মিথ্যার সংযোজন করা। হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি লোকের অতিরিক্ত প্রশংসা করে, পরকালে তাহার রসনা এত দীর্ঘ হইবে যে, ইহা মাটিতে ছেঁচড়াইবে এবং তাহার পা তাহার রসনার উপর যাইয়া পড়িবে ও সে আছাড় খাইয়া পতিত হইবে।

দ্বিতীয় অনিষ্ট—অতিরিক্ত প্রশংসা করিতে গেলে কপটতা দেখা দেয়। প্রশংসাকারী প্রশংসিত ব্যক্তিকে বলে– "আমি তোমাকে ভালবাসি।" কিন্তু তাহার অন্তরে সেই ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা নাও থাকিতে পারে।

তৃতীয় অনিষ্ট—প্রশংসাকালে এইরূপ গুণের কথা উল্লেখ করা হয় যাহা প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে আছে কিনা প্রশংসাকারী নিজেই তাহা যথার্থরূপে অবগত নহে। প্রশংসাকালে বলা হইয়া থাকে– "আপনি পুণ্যবান, পরহেযগার ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ আলিম ইত্যাদি।" কিন্তু প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে হয়ত অনেক ত্রুটি রহিয়াছে অথবা সেই গুণগুলি পূর্ণমাত্রায় নাই।

এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে অপরের প্রশংসা করিল। তিনি বলিলেন– "আফসোস, তুমি তাহাকে হত্যা করিলে!" তৎপর তিনি আবার বলিলেন– "কাহারও প্রশংসা করা প্রয়োজন হইলে বলিবে– 'তাহাকে আমি এইরূপ বলিয়া মনে করি।' আল্লাহ্‌র নিকট তাহার কোন দোষ থাকিলে ইহা হইতে তাহাকে নির্দোষ করিতেছি না (অর্থাৎ ভালমন্দ) পবিত্র-অপবিত্র আল্লাহ্ই জানেন।" তোমার কথা ঠিক হইয়া থাকিলে ঐ ব্যক্তির হিসাব আল্লাহ্‌র হাতে।"

চতুর্থ অনিষ্ট—তুমি যাহার প্রশংসা করিতেছ, সে হয়ত যালিম। তোমার প্রশংসায় সে আনন্দিত হইতে পারে, অথচ যালিমকে আনন্দিত করা সঙ্গত নহে। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি ফাসিকের প্রশংসা করে, আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।"

প্রশংসিতের অনিষ্ট—প্রশংসিত ব্যক্তির দ্বিবিধ অনিষ্টের কারণ রহিয়াছে।

প্রথম—অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শ্রবণ করিলে মানুষের হৃদয়ের অহঙ্কার ও আত্মগর্ব আসে। একদা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চাবুক হস্তে বসিয়া ছিলেন। তখন 'হারূত' নামক এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। এক ব্যক্তি আগন্তুকের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিলেন– "তিনি রাবীয়া গোত্রের নেতা।" হারূত আসন গ্রহণ করিলে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করিলেন। হারূত নিবেদন করিলেন– "ইয়া আমীরুল মুমিনীন, আমার কি অপরাধ?" তিনি বলিলেন– "এই ব্যক্তি কি বলিল, তুমি শুন নাই?" হারূত বলিলেন– "হাঁ, শুনিয়াছি।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন– "ইহাতে তোমার অন্তরে অহঙ্কার আসিতে পারে বলিয়া আমার আশঙ্কা হইল। আমি তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিতে চাহিলাম।"

দ্বিতীয়—উপযুক্ততা ও বিদ্যার প্রশংসা করিলে প্রশংসিত ব্যক্তি মনে মনে বলিবে– "আমি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছি।" সুতরাং অধিকতর উন্নতির জন্য সে আর পরিশ্রম করিবে না এবং এইরূপে তাহার ভবিষ্যত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। এইজন্যই এক ব্যক্তিকে প্রশংসা করা হইতেছে শুনিয়া রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–

"আফসোস, তুমি তাহাকে হত্যা করিলে।" ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রশংসিত ব্যক্তি ইহা শুনিলে ভবিষ্যত উন্নতির চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "সম্মুখে কাহাকেও প্রশংসা করা অপেক্ষা (হত্যা করার উদ্দেশ্যে) তীক্ষ্ণ ছুরি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করা বরং ভাল।" হযরত যিয়াদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন– "স্বীয় প্রশংসা শুনিয়া যে ব্যক্তি আত্মপ্রসাদ লাভ করে, শয়তান আসিয়া তাহাকে তাহার মর্যাদা হইতে নামাইয়া দেয়। কিন্তু মুমিন নিজকে চিনে বলিয়া নিজের প্রশংসা শুনিলে বিনত হয়।"

পাত্র বিশেষে প্রশংসার বিধান—যেখানে উল্লিখিত ছয়টি আপদের আশঙ্কা নাই, এমন স্থানে প্রশংসা করা ভাল। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের প্রশংসা করিয়াছেন। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি বলেন– "হে ওমর, আল্লাহ্ আমাকে রাসূল করিয়া না পাঠাইলে তোমাকেই পাঠাইতেন।" তিনি আরও বলেন– "সমস্ত বিশ্ববাসীর ঈমান একত্র করিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঈমানের সঙ্গে ওজন করিলে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঈমান অধিক হইবে।" স্বীয় সাহাবাগণের এইরূপ উচ্চ প্রশংসা করার কারণ এই যে, তিনি অবগত ছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের কোনই অনিষ্ট হইবে না।

আত্মপ্রশংসা অসঙ্গত—আত্মপ্রশংসা মন্দ ও ঘৃণ্য। আল্লাহ্ ইহা নিষেধ করিয়া বলেন ঃ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ "অনন্তর তোমরা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র বলিও না।"

ব্যক্তি বিশেষে আত্মপ্রশংসা সঙ্গত—মানবজাতির পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত হইলে লোকে যেন তাঁহার অনুসরণ করে, এই উদ্দেশ্যে স্বীয় অবস্থা প্রকাশ করাতে কোন দোষ নাই; যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমি আদম সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই জন্য আমি গর্ব করি না, বরং যে আল্লাহ্ আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, তাঁহার গৌরব করিয়া থাকি।" জগতবাসী যেন তাঁহার অনুসরণ করে, এই জন্যই তিনি এই কথা বলিয়াছেন। হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম বলিয়াছিলেন–

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ "সমগ্র রাজ্যের ধনভাণ্ডারের উপর আমাকে নিযুক্ত কর। আমি অবশ্যই জ্ঞানবান রক্ষক।"

প্রশংসিত ব্যক্তির কর্তব্য—প্রশংসিত ব্যক্তির অন্তরে অহঙ্কার ও গর্ব স্থান পাওয়া উচিত নহে। পরিণাম চিন্তায়ই তাহার ব্যাকুল থাকা আবশ্যক। পরিণামে কাহার অবস্থা কিরূপ হইবে, কেহই বলিতে পারে না। যে ব্যক্তি দোযখ হইতে রক্ষা পাইবে না, কুকুর এবং শূকরও তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'আমি দোযখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি' ইহা কেহই বলিতে পারে না। প্রশংসিত ব্যক্তির আরও অনুধাবন করা আবশ্যক যে,

তাহার গোপনীয় অবস্থা জানিতে পারিলে কেহই তাহার প্রশংসা করিত না। অতএব, আল্লাহ্ যে তাহার গোপনীয় দোষসমূহ লুক্কায়িত রাখিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। লোকমুখে স্বীয় প্রশংসা শুনিলে ইহাতে ঘৃণা প্রকাশ করা আবশ্যক এবং অন্তরেও প্রগাঢ় ঘৃণা পোষণ করা কর্তব্য। লোকে এক বুযুর্গকে প্রশংসা করিলে তিনি বলিলেন– "হে খোদা, লোকে আমার অবস্থা জানে না, তুমি আমার প্রকৃত অবস্থা অবগত আছ।" অপর এক বুযুর্গ লোকমুখে স্বীয় প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন– "হে খোদা, তাহারা প্রশংসা করিয়া আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিতেছে, অথচ প্রশংসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি। তুমি সাক্ষী থাক, তাহাদের শত্রুতার দরুন আমি তোমার নৈকট্য প্রার্থনা করিতেছি।"

লোকে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশংসা করিলে তিনি বলিলেন– "হে খোদা, আমার সম্বন্ধে লোকে যাহা বলিতেছে, এইজন্য আমাকে দায়ী করিও না এবং তাহারা অজ্ঞাতসারে আমার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ক্ষমা কর। আর তাহারা আমাকে যেরূপ ধারণা করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আমাকে উৎকৃষ্ট কর।" এক ব্যক্তি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভালবাসিত না; অথচ কপটভাবে তাঁহার প্রশংসা করিত। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– "তুমি রসনায় যাহা বলিতেছ, আমি তদপেক্ষা নীচ এবং অন্তরে তুমি যেভাব পোষণ কর তদপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ।"

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং উহা হইতে পরিত্রাণের উপায়

ক্রোধ সীমা ছাড়াইয়া প্রবল হইয়া উঠিলে জঘণ্য হইয়া থাকে। অগ্নি ক্রোধের মূল এবং অন্তরের উপর ইহার প্রভাব। শয়তানের সহিত ক্রোধের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে স্বয়ং বলিয়াছে-

خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ অর্থাৎ "তুমি আমাকে অগ্নি হইতে সৃজন করিয়াছ এবং তাহাকে (আদমকে) মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছ।" আগুন সর্বক্ষণ গতিশীল ও চঞ্চল; আর মাটি ধীর ও শান্ত। ক্রোধান্ধ ব্যক্তির সহিত হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া শয়তানের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

হযরত ইব্‌নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র ক্রোধ হইতে আমাকে দূরে রাখিতে পারে, এরূপ কোন কাজ আছে?" তিনি বলিলেন- "তাহা এই যে, তুমি ক্রুদ্ধ হইবে না।" তিনি আবার নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে এরূপ একটি সংক্ষিপ্ত কাজের কথা বলিয়া দিন যাহাতে আমি উত্তম পরিণামের আশা করিতে পারি।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "স্বেচ্ছায় ক্রুদ্ধ হইও না।" তিনি বারবার একই প্রশ্ন করিতেছিলেন এবং রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বারই ঐ উত্তর দিতেছিলেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "সির্কা যেরূপ মধু ধ্বংস করে, ক্রোধ তদ্রূপ ঈমান ধ্বংস করে।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম হযরত ইয়াহ্ইয়া আলায়হিস্ সালামকে বলিলেন- "ক্রুদ্ধ হইও না।" তিনি বলিলেন- "ইহা সম্ভবপর নহে; কেননা, আমি মানুষ।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলিলেন-'ধন জমা করিও না।" তিনি বলিলে-'হাঁ, ইহা সম্ভবপর।"

ক্রোধ দমনের ফযীলত—ক্রোধের মূলোচ্ছেদ মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু ক্রোধ দমন করা নিতান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ অর্থাৎ "এবং ক্রোধ সংবরণকারী ও মানবের মার্জনাকারীকে (আল্লাহ্ ভালবাসেন)।" যাহারা ক্রোধ দমন করিতে পারে এই আয়াতে আল্লাহ্ তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে আল্লাহ্ তাহার উপর হইতে স্বীয় আযাব বিদূরিত করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালনে স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করে, তিনি তাহার ত্রুটি মাফ করেন এবং যে ব্যক্তি রসনা সংযত রাখে আল্লাহ্ তাহার গোপনীয় দোষ লুক্কায়িত রাখেন।" তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহার অন্তর সন্তোষ দ্বারা ভরপুর করিয়া দিবেন।" তিনি বলেন- "দোযখের একটি দ্বার আছে; এই দ্বার দিয়া শরীয়ত বিরুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশকারী ব্যতীত আর কেহই প্রবেশ করিবে না।" তিনি বলেন- "লোক চুমুকে যাহা পান করে, উহার মধ্যে ক্রোধ পান (সংবরণ) অপেক্ষা আর কোন বস্তু পানই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় নহে। যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ্ তাহার অন্তর ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন।"

হযরত ফুযায়ল ইব্‌নে আইয়ায (র), হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) এবং আরও কতিপয় বুযুর্গ একবাক্যে বলেন- "ক্রোধের সময় সহিষ্ণুতা এবং লোভের সময় ধৈর্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজ আর কিছুই নাই।" এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র)-কে কটু কথা বলিল। তিনি মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন- "আমাকে তুমি ক্রুদ্ধ করত শয়তান কর্তৃক আমাকে স্বীয় মর্যাদা হইতে নামাইয়া লইতে চাহিতেছ? ক্ষমতা ও প্রভুত্বের গর্বে আজ আমি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইলে কল্য কিয়ামত দিবস তুমি আমা হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, ইহা কখনও হইতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি নীরব রহিলেন। একজন নবী আলায়হিস্ সালাম লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "এমন কেহ আছে কি, যে আমার উপদেশসমূহ পালন করিবে ও প্রতিজ্ঞা করিবে যে, কখনও ক্রুদ্ধ হইবে না এবং আমার তিরোধানের পর আমার প্রতিনিধি হইয়া থাকিতে ও বেহেশ্‌তে আমার সমান মর্যাদা পাইতে আশা করে?" এক ব্যক্তি স্বীকার করিলেন এবং ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তিনি এই ব্যক্তি দ্বারা আরও দুইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া লইলেন। অনন্তর সেই ব্যক্তি দৃঢ়তার সহিত স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করত উক্ত নবী আলায়হিস্ সালামের প্রতিনিধি হইলেন এবং জগতে 'যুলকুফ্‌ল্' অর্থাৎ দায়িত্ব পালক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

ক্রোধ ও লোভ সৃষ্টির কারণ—প্রয়োজনের সময় অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মানব হৃদয়ে ক্রোধ সৃজন করিয়াছেন, যেন কোন অনিষ্টের কারণ তাহার সম্মুখীন হইলে ক্রোধ তৎক্ষণাত ইহা বিদূরিত করিতে পারে। লোভ সৃজনেও এই একই উদ্দেশ্য রহিয়াছে। ইহাও অস্ত্রের ন্যায় মানুষের কাজে আসিবে এবং মঙ্গলজনক বস্তু তাহার দিকে আকর্ষণ করিবে, উহাই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। এই দুই প্রবৃত্তি মানবজীবনে অপরিহার্য। কিন্তু উহা সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি পাইলে তাহার সমূহ অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

অতি ক্রোধ বুদ্ধি-বিনাশক—ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিয়া বাড়িয়া গেলে মানব হৃদয়ে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে। ইহার ধোঁয়া মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া দিলে বুদ্ধি ও নিপুণতার কার্যালয় অন্ধকারাবৃত্ত হইয়া যায়। বুদ্ধি তখন অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং ফলে, মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। গুহা ধুমে পরিপূর্ণ হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে যেমন কিছুই নয়ন- গোচর হয় না, ক্রোধের সময় মস্তিষ্ক কুঠরীর অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ক্রোধের এইরূপ আধিক্য নিতান্ত জঘণ্য। ক্রোধের সময় মানব হিতাহিত নির্ণয়ে অক্ষম হয় বলিয়াই বুযুর্গগণ ইহাকে 'গোলে আক্‌ল' অর্থাৎ বুদ্ধি-বিনাশক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অত্যল্প ক্রোধ ক্ষতিকর—ক্রোধ সীমা ছাড়াইয়া অত্যন্ত কমিয়া গেলেও ক্ষতিকর। কারণ, ক্রোধই মানুষকে অন্যায় ও গর্হিত কর্মের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে এবং জগতে ধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কপটতা ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে মুসলমানের অন্তরে প্রেরণা যোগায়। আল্লাহ্ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ "কাফির ও মুনাফিকদের সহিত জিহাদ কর এবং তাহাদের উপর কর্কশ ব্যবহার কর।" সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ অর্থাৎ "তাহারা কাফিরদের উপর বড় কঠিন।" এই সমস্ত ক্রোধের অবশ্যম্ভাবী ফল।

ক্রোধের মধ্যম অবস্থা কাম্য—উল্লিখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয়, ক্রোধের আধিক্য ও অত্যল্পতা কাম্য নহে; বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ধর্মবুদ্ধির অধীন ইহার সাম্যভাবাপন্ন অবস্থাই কাম্য। কেহ কেহ মনে করেন, ক্রোধের মূলোৎপাটন রিয়াযতের উদ্দেশ্য। ইহা ভুল ধারণা। কারণ, ক্রোধ মানবের অপরিহার্য অস্ত্রস্বরূপ এবং তাহার জীবদ্দশায় লোভের ন্যায় ক্রোধের মূলোচ্ছেদও অসম্ভব। তবে কোন বিশেষ ধর্ম বা ভাবে মানব তন্ময় হইলে ক্রোধের আত্মগোপন সম্ভবপর এবং তখনই সে মনে করে ক্রোধের মূলোৎপাটন হইয়াছে।

ক্রোধ উত্তেজিত হওয়ার কারণ—কি কারণে ক্রোধ উত্তেজিত হয় এবং কোন্ অবস্থায় গুপ্ত থাকে, উহা বুঝিয়া লওয়া দরকার। মনে কর, এক ব্যক্তির কোন বিশেষ একটি জিনিসের নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু অপরে ইহা ছিনাইয়া লইতে চাহিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। আর যে দ্রব্যের তাহার কোন দরকার নাই, যেমন কাহারও একটি কুকুর আছে এবং ইহা তাহার কোন উপকারেও আসে না, এরূপ স্থলে ইহা যদি কেহ অপহরণ করে বা মারিয়া ফেলে, তবে হয়ত কুকুরের মালিক ক্রুদ্ধ হইবে না। অপরপক্ষে আহার্য সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরবাড়ী, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি ব্যতীত মানুষ কখনও চলিতে পারে না। এমতাবস্থায়,

এবং অন্ন-বস্ত্র ছিনাইয়া লইলে ক্রোধ অবশ্যই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। যাহার যত অধিক অভাব তাহার ক্রোধ তত অধিক এবং সে সেই পরিমাণে অসহায় ও দুঃখিত। মানুষ যে পরিমাণে স্বীয় অভাব ও আবশ্যকতা বর্জন করিবে সেই পরিমাণে সে আজাদী লাভ করিবে। আর যে পরিমাণে অভাব ও আবশ্যকতা বৃদ্ধি পাইবে, সেই পরিমাণে সে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে। মানব সাধনার ফলে এত পরিমাণে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে যে, সে তখন জীবন ধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদির অভাব অনুভব করে। এই সময় মান-মর্যাদা ও ধনের অভাব তাহার মোটেই অনুভব হয় না। জগতের নানাবিধ অতিরিক্ত পদার্থের অভাব হইতেও সে তখন নিষ্কৃতি লাভ করে। সুতরাং মান-মর্যাদার হানি এবং ধন-দৌলত ও অতিরিক্ত দ্রব্যাদি হস্তগত না হওয়া বা অপহৃত হওয়ার নিমিত্ত তাহার অন্তরে তখন আর ক্রোধ উত্তেজিত হইয়া ওঠে না; ইহা তখন স্বতই লয়প্রাপ্ত হয়।

সম্মান লাভের প্রত্যাশী নহে, এমন ব্যক্তির অগ্রে অগ্রে কেহ পথ চলিলে বা সভাস্থলে তাহার অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসিলে ইহাতে তাহার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হয় না। ক্রোধোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিলে মানুষে মানুষে বিরাট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। যাহাতে একের ক্রোধের সঞ্চার হয় অপরে ইহাতে লজ্জায় মাথা হেট করে। অধিকাংশ স্থানে মান-মর্যাদা ও ধন-দৌলত লইয়াই ক্রোধ উত্তেজিত হইয়া উঠে। নিতান্ত ঘৃণ্য ও তুচ্ছ ব্যাপার অবলম্বনেও কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হয়। দাবা ও চৌসরক্রীড়া, কবুতর খেলা বা মদ্যপান প্রভৃতি নিকৃষ্ট ও জঘন্য কর্মে অভস্ত লোকের এই সকল অপকর্মে কোন ত্রুটি ধরিলে তাহার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। কেহ যদি এই প্রকৃতির লোককে বলে- "তুমি দাবা খেলায় তত দক্ষতা লাভ কর নাই, তুমি বেশী মদ পান করিতে অক্ষম, তবে সে ক্রুদ্ধ হয়। মান-সম্ভ্রম, ধন-দৌলত বা অন্যান্য ঘৃণ্য ও তুচ্ছ ব্যাপার অবলম্বনে যে সমস্ত ক্রোধের উৎপত্তি হয়, রিয়াযত দ্বারা মানুষ তৎসমুদয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অবলম্বনে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয় মানুষ ইহা হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে না এবং এই প্রকার ক্রোধের মূলোচ্ছেদ সঙ্গতও নহে।

স্থলবিশেষে ক্রোধ বাঞ্ছনীয়—মানব জীবনে নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদির অপচয় ও অপহরণজনিত ক্রোধ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে স্থানে ক্রোধ মঙ্গলজনক সে স্থানে যেন মানুষ ক্রোধের উত্তেজনায় উন্মত্ত দিশাহারা না হয় এবং ধর্ম-বুদ্ধির বশীভূত থাকে, এইজন্য তাহার সাবধান হওয়া কর্তব্য। সাধনা দ্বারা মানুষ এই প্রকার ক্রোধের আজ্ঞাধীন করিতে সমর্থ হয়। ইহার মূলোৎপাটন অসম্ভব ও অসঙ্গত। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে ক্রোধশূন্য ছিলেন না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আমি তোমাদের মত মানুষ; তোমরা যেরূপ ক্রোধ কর আমিও তদ্রূপ ক্রোধ করি। যদি আমি কাহাকেও

অভিশাপ দেই, কটুবাক্য বলি বা আঘাত করি, তবে হে খোদা, আমার সেই কাজকে তাহার উপর তোমার রহমতের হেতু করিয়া লও।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আছ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তখন নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি ক্রুদ্ধ অবস্থায় যাহা বলিলেন উহাও আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি।" তিনি বলেন- "ইহাও লিখিয়া লও, যে আল্লাহ্ আমাকে সত্য রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ, আমি ক্রুদ্ধ হইলেও সত্য ব্যতীত কোন কথা আমার মুখ হইতে বাহির হয় না।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই কথা বলেন নাই যে, তাঁহার ক্রোধ ছিল না; বরং তাঁহারও ক্রোধ ছিল, কিন্তু ইহা সত্য ও ন্যায়-বিচারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই, তিনি ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

একদা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা ক্রুদ্ধ হইলেন দেখিয়া রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "হে আয়েশা, তোমার শয়তান আসিয়াছে।" তিনি নিবেদন করিলেন- "ইয় রাসূলাল্লাহ্, আপনার কি শয়তান নাই?" উত্তরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "হাঁ, আছে; তবে আল্লাহ্ তাহার উপর আমাকে বিজয়ী করিয়াছেন, সে আমার বশীভূত হইয়া রহিয়াছে; সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে সে আদেশ করে না।" এস্থলেও তিনি ইহা বলেন নাই যে, তাঁহার ক্রোধ প্রবৃত্তি ছিল না।

তাওহীদ প্রভাবে গুপ্ত ক্রোধ—মানব হৃদয় হইতে ক্রোধের মূলোচ্ছেদ সম্ভবপর না হইলেও অবস্থাবিশেষে ইহা গুপ্ত থাকে। অল্প বা অধিক সময়ের জন্যই হউক, কাহারও হৃদয়ে তাওহীদ ভাব (আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস) প্রবল হইয়া তাহাকে তন্ময় করিয়া ফেলিলে সেই ব্যক্তি তখন যাহা কিছু সংঘটিত হইতে দেখে, উহা একমাত্র আল্লাহ্‌র দিক হইতেই সংঘটিত হইতেছে দেখিতে পায়। তেমন ব্যক্তির হৃদয়ে ক্রোধ অদৃশ্যভাবে থাকে এবং মোটেও উত্তেজিত হইয়া উঠে না। যেমন মনে কর, একে অপরের উপর পাথর নিক্ষেপ করিল। আহত ব্যক্তির অন্তরে ক্রোধ অদৃশ্যভাবে থাকিলেও সে কিছুতেই পাথরের উপর ক্রুদ্ধ হয় না। কারণ, সে জানে, জড় পাথরের কোন দোষ নাই; বরং পাথর নিক্ষেপকারীই অপরাধী। তদ্রূপ বিচার অপরাধীকে হত্যার আদেশ কলম দ্বারা লিখিলেও দণ্ডিত ব্যক্তি কলমের উপর ক্রুদ্ধ হয় না। কারণ, কলমের সাহায্যে দণ্ডাদেশ লিখিত হইলেও সে জানে যে, ইহা লেখকের আজ্ঞাধীন এবং তাহার স্বাধীন প্রবর্তনশক্তিতেই কলম পরিচালিত হইয়াছে ও ইহার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। তদ্রূপ, যাহর হৃদয়ে তাওহীদ ভাব প্রবল হইয়া তাহাকে তন্ময় করিয়া ফেলিয়াছে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই জানে যে, সৃষ্টির মাধ্যমে যে কাজ সম্পন্ন হয়, ইহাতে সেই প্রাণীর কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই।

মানবের কয়েকটি বৃত্তির সমন্বয় ও সম্মিলিত চেষ্টায় কার্য সম্পন্ন হয়। ইহারা পরস্পর অধীনতার পাশে আবদ্ধ। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, হস্তপদাদি সঞ্চালনেই কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু হস্তপদাদি সঞ্চালন শক্তির অধীন। শক্তি হস্তপদাদি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যে দিকে চালায় ইহারা সেইদিকে চলিলেও এই ব্যাপারে শক্তি স্বাধীন নহে। শক্তি ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছা আবার মানবের আজ্ঞাধীন নহে। তাহার মনঃপুত হউক বা না হউক, ইচ্ছাকে তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইচ্ছার সহিত শক্তির সংযোগ ঘটিলে হস্তপদাদি সঞ্চালনে কার্য আবশ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত পাথর নিক্ষেপ কার্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, নিক্ষেপকারীর ইচ্ছানুসারে শক্তির সংযোগ হওয়াতেই হস্তপদাদি সঞ্চালনে পাথরটি ঐ ব্যক্তির উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং উহার আঘাত হইত ব্যক্তি বেদনা অনুভব করিয়াছিল। পাথরটি স্বেচ্ছায় নিজ স্বাধীন ক্ষমতায় তাহাকে আঘাত করে নাই এবং এইজন্যই ইহার উপর কেহই ক্রুদ্ধ হয় না।

আবার মনে কর, একমাত্র একটি ছাগলের দুগ্ধ দ্বারাই এক ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করে। এমতাবস্থায়, ছাগলটি মরিয়া গেলে তাহার দুঃখ হয়, কিন্তু কাহারও উপর সে ক্ষুব্ধ হয় না। আবার ছাগলটিকে কেহ বধ করিয়া ফেলিলেও তাওহীদভাবে তন্ময় ব্যক্তির পক্ষে তাহার উপর ক্রুদ্ধ না হওয়াই সঙ্গত। কারণ, তাওহীদের তন্ময়ভাব যাহাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে, নিখিল বিশ্বের সকল কার্য কেবল আল্লাহ্‌র দিক হইতে সম্পন্ন হইতেছে সে দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তি উক্ত পাথর নিক্ষেপকারী ও ছাগলবধকারী উভয়কেই বিশ্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক পরিচালিত দেখিতে পাইয়া তাহাদের উপর কুপিত হইতে পারে না। কিন্তু তাওহীদের তন্ময়ভাব সর্বক্ষণ প্রবল থাকে না; বরং বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় ইহা নিমিষেই বিলীন হইয়া যায়। তখন দৈহিক প্রকৃতির দাবি-দাওয়া এবং আন্তরিক প্রবৃত্তির প্রভাবে জাগতিক পূর্বসংস্কার আবার তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। অধিকাংশ কামিল ব্যক্তির অন্তরে কোন কোন সময় এরূপ তাওহীদভাব আসে। তাহাদের অন্তর হইতে যে ক্রোধের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা নহে; বরং সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে যে কাজ সম্পন্ন হইতেছে, ইহাতে সেই জীবের কোন স্বাধীন প্রবর্তনশক্তি নাই, এই বিশ্বাসে তাহাদের হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হয় না। তেমন ব্যক্তির প্রতি কেহ প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেও তাহার অন্তরে ক্রোধ জাগিয়া উঠে না।

গুরুতর কাজের চাপে লুক্কায়িত ক্রোধ—যাহাকে তাওহীদ ভাবাবেশ তন্ময় করে নাই, এমন ব্যক্তিও কোন গুরুতর কাজে নিবিষ্ট থাকিলে তাহার হৃদয়েও ক্রোধ জাগিয়া উঠে না; বরং লুক্কায়িত থাকে। হযরত সালমান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে এক ব্যক্তি গালি দিল। তিনি তাহাকে বলিলেন- কিয়ামতের দিন আমার পাপের পাল্লা ভারী হইলে তুমি যাহা বলিতেছ আমি তদপেক্ষা মন্দ, কিন্তু পাপের পাল্লা হাল্‌কা

হইলে তোমার কথায় আমার কি ভয়?" হযরত রাবী' ইব্‌নে খায়সাম (র)-কে কেহ গালি দিলে তিনি বলিলেন- "বেহেশ্‌ত ও আমার মধ্যে এক দুর্গম গিরিপথ রহিয়াছে। আমি ইহা অতিক্রমে ব্যাপৃত আছি। অতিক্রম করিতে পারিলে আমি তোমার গালিকে ভয় করি না; কিন্তু অতিক্রম করিতে না পারিলে আমার দুর্দশার তুলনায় তোমার গালি অত্যন্ত কম।" এই দুই মহামনীষী পরকালের চিন্তায় এমন বিভোর ছিলেন যে, অপরের গালিতেও তাঁহাদের ক্রোধ জাগে নাই।

হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে এক ব্যক্তি গালি দিলে তিনি তাহাকে বলিলেন- "আমার অবস্থার যেটুকু তোমার অজ্ঞাত তাহা তুমি যাহা বলিতেছ তদপেক্ষা অধিক।" স্বীয় দোষ-ত্রুটি পর্যবেক্ষণে তিনি এত অধিক ব্যাপৃত ছিলেন যে, অপরের গালি শুনিয়াও তাঁহার ক্রোধ জন্মে নাই। হযরত মালিক ইব্‌নে দীনার (র)-কে এক রমণী কপট ধার্মিক বলিয়া সম্বোধন করিল। তিনি সেই রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "হে পুণ্যবতী, তুমি ভিন্ন আর কেহই আমাকে চিনিতে পারে নাই।" হযরত শা'বী (র)-কে এক ব্যক্তি নিন্দা করিতেছিল। তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন- "তুমি সত্য বলিয়া থাকিলে আল্লাহ্ যেন আমাকে মাফ করেন; আর তুমি মিথ্যা বলিয়া থাকিলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে মাফ করেন।" এই সকল দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কোন গুরুতর কাজ বা চিন্তায় মগ্ন থাকিলে ক্রোধ বশীভূত ও লুক্কায়িত থাকে।

আবার কেহ যদি বিশ্বাস করে, যে ব্যক্তি ক্রোধ করে না, আল্লাহ্ তাহাকে ভালবাসেন, তবে তাঁহার ভালবাসা লাভের লালসায় উত্তেজনা প্রবল কারণ দেখা দিলেও সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয় না। যেমন মনে কর, কেহ কোন রমণীর প্রতি প্রেমাসক্ত; কিন্তু সেই রমণীর সন্তান তাহাকে গালি দেয়। এমতাবস্থায়, যদি সে জানে যে, উক্ত সন্তানের গালি সহ্য করিলে প্রেমাস্পদ তাহাকে ভালবাসিবে, তবে সেই রমণীর প্রতি আসক্তি তাহাকে এইরূপ তন্ময় করিয়া তোলে যে সে তাহার সন্তান প্রদত্ত দুঃখ-কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করে এবং উক্ত সন্তানের কোনরূপ দুর্ব্যবহার তাহার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার করে না।

ক্রোধ দমনের উপায় বর্ণিত হইল। তন্মধ্যে যে কোনটি অবলম্বনে ক্রোধকে মারিয়া ফেলা আবশ্যক। অসম্ভব হইলে ইহাকে এত দুর্বল করিয়া ফেলিবে যেন উহা অবাধ্য না হয় এবং ধর্ম-বুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ না করে।

ক্রোধ বিনাশক ব্যবস্থা—ক্রোধ দমনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন ও সাধনা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, ক্রোধেই অধিকাংশ মানুষকে দোযখে লইয়া যায় এবং ইহা হইতেই জগতে অশান্তি, কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হয়। ক্রোধ দমনের দুইটি উপায় আছে। **প্রথম**- ক্রোধ বহিষ্কারক উপায়। ইহা জোলাপের মত ক্রোধরূপ ব্যাধির জড় ও

মূল অন্তর হইতে বাহির করিয়া দেয়। **দ্বিতীয়**- ক্রোধ উপশমমূলক উপায়। ইহা 'শিকাবীন' নামক অম্লরস ও মধু বা চিনি মিশ্রিত পানীয় সদৃশ। ইহা ব্যাধির তীব্র দোষসমূহ উপশম করে ও উগ্র স্বভাবকে সাম্যভাবাপন্ন করিয়া তোলে।

ক্রোধ বহিষ্কারক উপায়—সর্বাগ্রে ক্রোধ সঞ্চারের কারণ নির্ণয় করিবে এবং তৎপর ইহার মূলোচ্ছেদ করিবে। ইহাই ক্রোধ বহিষ্কারক উপায়। পাঁচটি কারণে ক্রোধের সঞ্চার হয়; যথা ঃ (১) অহঙ্কার, (২) ওজ্‌ব অর্থাৎ নিজে নিজকে উত্তম ও গুণবান বলিয়া মনে করা, (৩) কৌতুক, (৪) তিরস্কার এবং (৫) ধনলিপ্সা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা।

ক্রোধ-বহিষ্কারক উপায়ের প্রথম ধাপ—অহঙ্কার ক্রোধ সঞ্চারের অন্যতম প্রধান কারণ। অহঙ্কারী ব্যক্তি কথাবার্তা ও কাজকর্মের অপরের নিকট হইতে প্রত্যাশিত সম্মান না পাইলেই ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। অতএব বিনয়ী ব্যবহারে অহঙ্কার চূর্ণ করিতে হইবে। তোমার হৃদয়ে অহঙ্কার দেখা দিলে চিন্তা করিবে, তুমি আল্লাহ্‌র একটি নগণ্য দাসমাত্র; দাসের পক্ষে অহঙ্কার শোভা পায় না। আরও বুঝিবে যে, সৎস্বভাবেই দাসত্ব হইয়া থাকে; অহঙ্কার অসৎস্বভাবের অন্তর্গত। সুতরাং অহঙ্কার দাসত্বের দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায়। বিনয় ব্যতীত অন্য কিছুতেই অহঙ্কার বিনাশ করা যায় না।

ক্রোধ-বহিষ্কারক উপায়ের দ্বিতীয় ধাপ--ক্রোধ সঞ্চারের দ্বিতীয় কারণ খোদপছন্দী বা নিজে নিজকে উত্তম ও গুণবান বলিয়া মনে করা। ইহা বিদূরিত করিতে হইলে স্বীয় পরিচয় লাভ করিবে। অহঙ্কার ও খোদপছন্দী দূর করিবার উপায় যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

ক্রোধ-বহিষ্কারক উপায়ের তৃতীয় ধাপ—ক্রোধ সঞ্চারের তৃতীয় কারণ কৌতুক। কাহাকেও কৌতুক করিলে অধিকাংশ সময় সেই ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। সুতরাং এইরূপ অপকর্মে সময়ের অপচয় না করিয়া বরং আখিরাতের সম্বল সংগ্রহ কার্যে ও সৎস্বভাব অর্জনে নিজকে ব্যাপৃত রাখিবে এবং কৌতুক হইতে বিরত থাকিবে। কৌতুকের ন্যায় উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও ক্রোধ জন্মে। তুমি কাহাকেও উপহাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলে সে-ও তোমাকে তদ্রূপ করিবে। এইরূপে তোমার নিজের সম্মান নিজেই নষ্ট করিবে। অতএব এইরূপ কৌতুক, উপহাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হইতে নিরস্ত থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ক্রোধ-বহিষ্কারক উপায়ের চতুর্থ ধাপ—কাহাকেও তিরস্কার করিলে তিরস্কারকারী ও তিরস্কৃত ব্যক্তি এই উভয়ের হৃদয়েই ক্রোধের উদ্রেক হয়। ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় এই মনে করিবে, নিজে দোষমুক্ত না হইয়া অপরের দোষ ধরিয়া তিরস্কার করা শোভা পায় না। অপরপক্ষে, দোষমুক্ত ব্যক্তিই বা অপরকে

তিরস্কার করিয়া নিজেকে কলঙ্কিত করিবে কেন? অতএব তিরস্কার করা কাহারও পক্ষে সঙ্গত নহে।

ক্রোধ বহিষ্কারক উপায়ের পঞ্চম ধাপ—যদিও সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে অধিকাংশ স্থলেই মানবের ধন, প্রভুত্ব ও মান-সম্ভ্রমের দরকার হইয়া পড়ে, তথাপি ধন-লিপ্সা ও প্রভুত্বপ্রিয়তাই ক্রোধ উৎপত্তির অন্যতম কারণ। কৃপণের নিকট হইতে এক কপর্দক গ্রহণ করিলেও সে ক্রুদ্ধ হয়, আর অতি লোভীর নিকট হইতে এক গ্রাস অন্ন লইলেও সে ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব কামনা মন্দ স্বভাবের অন্তর্গত এবং ক্রোধের মূল কারণ। ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব কামনা দমনের জ্ঞানমূলক ও অনুষ্ঠানমূলক উপায় রহিয়াছে।

জ্ঞানমূলক উপায়—ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব কামনার আপদ, কদর্যতা এবং ইহ-পরকালে ইহাদের অনিষ্ট সাধন সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করত ইহাদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণার উদ্রেক করিবে।

অনুষ্ঠানমূলক উপায়—উক্ত প্রবৃত্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে; ইহারা যে বিষয়ে তোমাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করে, ইহা হইতে তুমি বিরত থাকিবে। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে যে শুধু ধনাসক্তি ও প্রভুত্বপ্রিয়তা নিবৃত্ত হয় তাহাই নহে, বরং ইহা সকল প্রকার কুস্বভাব নিবারণের উপায়। 'রিয়াযত' বিষয় বর্ণনাকালে প্রথম অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

ক্রোধান্ধ ব্যক্তির সংসর্গে ক্রোধ সঞ্চার—মানব অন্তরে ক্রোধ বদ্ধমূল হওয়ার অপর একটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। যাহারা ক্রোধকে মহিমা ও বীরত্বের কারণ বলিয়া মনে করে এবং ইহাতে গর্ব অনুভব করে, এইরূপ ক্রোধান্ধ লোকের সংসর্গে যাহারা প্রতিপালিত হয় তাহাদের অন্তরে ক্রোধরূপ ব্যাধি সংক্রামিত হয় এবং পরিশেষে ইহা তাহাদিগকে চির রুগ্ন করিয়া ফেলে। ক্রোধান্ধ ব্যক্তিগণ ক্রোধের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলে- "অমুক সাধু পুরুষ এক কথায় এক ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, অমুকের জানমাল ধ্বংস করিয়াছেন, কাহার সাধ্য যে, তাঁহার কথার প্রতিবাদ করে। সিংহপুরুষ বটে, যে কেহ তাঁহার রোষে পতিত হইয়াছে সেই ধ্বংস হইয়াছে। সিংহপুরুষ এইরূপই হইয়া থাকেন; কাহাকেও ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াকে তাঁহারা অপমান, অক্ষমতা ও অনুপযুক্ততার কারণ বলিয়া মনে করেন।" ক্রোধান্ধ ব্যক্তিগণের মুখে ক্রোধের এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাদের নব সঙ্গিগণের অন্তরেও পরিশেষে ক্রোধ বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

ক্রোধ কুকুরের স্বভাব। কিন্তু ক্রোধান্ধগণ ইহাকে বীরত্ব ও বাহাদুরির কারণ বলিয়া মনে করে। মানবের প্রশংসনীয় গুণাবলী, যাহা পয়গম্বরগণের স্বভাব, যেমন সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, ক্ষমা প্রভৃতিকে তাহার অনুপযুক্ততা ও কাপুরুষতার লক্ষণ বলিয়া

থাকে। ইহাই শয়তানের কাজ। সে প্রতারণা দ্বারা প্রশংসনীয় গুণের কুৎস রটনা করত মানুষকে সৎস্বভাব অর্জনে বিরত রাখে এবং জঘণ্য দোষের গুণকীর্তন করত অসৎস্বভাবের দিকে তাহাকে আহ্বান করে। জ্ঞানীগণ জানেন, ক্রোধের সহিত বীরত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহা হইলে অবলা নারী, অসহায় শিশু, দুর্বল বৃদ্ধ এবং রুগ্ন ব্যক্তির কখনও ক্রোধের সঞ্চার হইত না। কিন্তু ইহা অবিদিত নহে যে, তাহারা তাড়াতাড়ি উত্তেজিত হইয়া থাকে। ক্রোধ বিজয়ীগণের ন্যায় বীরপুরুষ আর নাই। নবী ও কামিল দরবেশগণই সেই বীরত্বের অধিকারী। পাহলোয়ান, তুর্কী সিপাহীগণ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি প্রাণীর হিংস্র বলে বলীয়ান হইলেও ক্রোধ দমন ক্ষেত্রে তাহাদের কোনই বীরত্ব নাই।

প্রিয় পাঠক, এখন ভাবিয়া দেখ, নবী ও দরবেশগণের গুণে ভূষিত হওয়া তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয়, না নির্বোধ অজ্ঞদের ন্যায় হওয়া সঙ্গত।

ক্রোধ-উপশমমূলক উপায়—ক্রোধের মূল কারণসমূহ উৎপাটনের জন্য উল্লিখিত ব্যবস্থা জোলাপ সদৃশ। উহা অবলম্বনেও ক্রোধের মূলোৎপাটন করিতে না পারিলে ক্রোধ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেই তৎক্ষণাত শান্ত করা আবশ্যক। এইজন্য এক প্রকার মবরাম্ল শরবত তাহাকে পান করিতে হইবে। ইহা নম্রতার মাধুর্য ও সহিষ্ণুতার অম্লত্বের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর ইলম ও আমলের সহযোগে একই মাজন প্রস্তুত করিলে, ইহা সকল কুস্বভাবের মহৌষধ হইয়া থাকে।

ক্রোধ-প্রতিষেধকরূপে ইলম—ক্রোধের অনিষ্টকারিতা ও ইহা নিবারণের সওয়াব সম্পর্কে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের উক্তিসমূহ বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে। ইহাই ক্রোধ প্রতিষেধক জ্ঞানমূলক উপায়। এইরূপ কতিপয় উক্তি উপরে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর ভাবিবে, অন্যের উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা রহিয়াছে, এই তুলনায় তোমার উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা অনন্ত ও অসীম। তুমি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া অপরের কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিবে? আল্লাহ্‌ত তোমার ক্ষতি অনায়াসে অতি সহজে করিতে পারেন। অদ্য তুমি কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র ক্রোধ হইতে তুমি কিরূপে রক্ষা পাইবে?

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ভৃত্যকে কোন কাজ উপলক্ষে পাঠাইলেন। ভৃত্য অত্যন্ত বিলম্বে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন- "শেষ বিচার দিবস না থাকিলে আমি তোমাকে প্রহার করিতাম।" ইহা বলিবার পরই তিনি নিজেকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন- "তোমার কাজটি যেরূপে সম্পন্ন করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, ঠিক সেইরূপে সম্পন্ন হইয়াছে; তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী হয় নাই, ইহাই কি তোমার ক্রোধের কারণ? তাহা হইলে ত আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ঝগড়া করা হইল!"

প্রিয় পাঠক, উল্লিখিত পারলৌকিক কারণেও ক্রোধ দমন না হইলে স্বয়ং সাংসারিক যুক্তি অবলম্বনে মনে মনে চিন্তা করিবে; তুমি উত্তেজিত হইলে প্রতিপক্ষও উত্তেজিত হইয়া তোমা হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে। শত্রুকে অবহেলা করা সমীচীন নহে। আরও মনে কর, কোন দাস বা দাসী ঠিকভাবে কর্তব্য পালন করে না, আবার কখন কখনও পলায়ন করে। ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলে সে ছলনা ও প্রতারণা করিতে পারে। আর ক্রোধের সময় মানুষ কিরূপ জঘণ্য মূর্তি ধারণ করে, ইহাও একবার স্মরণ কর। তখন তাহার বাহ্য আকার পরিবর্তিত হইয়া কুশ্রী ও কদর্য হইয়া পড়ে। সেই মূর্তি দর্শনে মনে হয় যেন, উত্তেজিত ব্যাঘ্র কোন জন্তুকে আক্রমণের উপক্রম করিয়াছে। ক্রোধের সময় মানুষের বাহ্য আকারে যেরূপ পরিবর্তন দেখা যায়, তাহার আন্তরিক অবস্থারও তদ্রূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। তখন মনে হয় যেন তাহার ভিতরে আগুন জ্বলিতেছে। ক্রোধের সময় সে ক্ষুধিত কুকুরের ন্যায় হইয়া থাকে।

কেহ ক্রোধ দমন করিতে চাহিলে অধিকাংশ সময় শয়তান তাহাকে প্ররোচণা দিয়া বলে- "ক্রোধ দমন করিলে তোমার দুর্বলতা প্রকাশ পাইবে, অপমান হইবে, প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইবে এবং লোকচক্ষে তুমি হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।" তখন শয়তানকে এইরূপ উত্তর দিয়া নিরস্ত করিবে- "নবীগণের (আ) সৎস্বভাব অর্জন এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভে সমর্থ হইলে যে সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়, সংসারে তদপেক্ষা অধিক সম্মানের আর কিছুই হইতে পারে না। কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হওয়ার ফলে কল্য কিয়ামতের দিন হেয় ও তুচ্ছ হওয়া অপেক্ষা অদ্য ক্ষণস্থায়ী সংসারে হেয় ও তুচ্ছ হওয়া আমার পক্ষে উত্তম।"

ক্রোধ প্রতিষেধক জ্ঞানমূলক উপায় বর্ণনা করিতে যাইয়া উপরে কতিপয় উপমার অবতারণা করা হইল। তদ্রূপ আরও দৃষ্টান্ত তোমরা নিজে নিজেই বুঝিয়া লইবে।

ক্রোধ প্রতিষেধক আমল- ক্রোধের সময় বলিবে-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অর্থাৎ "বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" তুমি দণ্ডায়মান থাকিলে বসিয়া পড়িবে, আর বসিয়া থাকিলে শয়ন করিবে। ইহা সুন্নত। ইহাতেও ক্রোধ দমন না হইলে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওযু করিবে। কেননা, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "ক্রোধ আগুন হইতে জন্মে, পানিতে ইহা দমন হয়।" হাদীস শরীফে উক্ত আছে- "(ক্রোধের সময়) কপাল মাটিতে রাখিয়া সিজদা করিবে এবং মনে করিবে যে, তুমি মাটি হইতে সৃষ্ট, আল্লাহ্‌র নগণ্য দাস।

(মাটি হইতে সৃষ্ট দাসকে মাটির ন্যায় সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক)। এইরূপ দাসের পক্ষে ক্রোধ শোভা পায় না।"

একদা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু ক্রুদ্ধ হইলে নাকে দিবার জন্য পানি চাহিয়া বলিলেন- "ক্রোধ শয়তান হইতে আসে, নাকে পানি দিলে চলিয়া যায়।" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা এক ব্যক্তিকে বলিলেন- "ইয়া ইব্‌নাল হামরা"। অর্থাৎ হে লোহিত জননীর পুত্র। এইরূপ আহ্বানে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, ঐ ব্যক্তি দাসীর পুত্র। তৎপর রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "হে আবূ যর, আমি শুনিলাম, তুমি অদ্য এক ব্যক্তিকে তাহার মাতার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া দোষারোপ করিয়াছ। হে আবূ যর, জানিয়া রাখ, পরহেযগারীতে অধিক না হইলে তুমি কোন কৃষ্ণ বা লোহিত মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নও।" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু ইহা শুনিয়া ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। সেই ব্যক্তি সহাস্য বদনে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সালাম দিলেন।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা ক্রুদ্ধ হইলে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার নাসিকা মুবারক ধারণপূর্বক বলিতেন- "হে আয়েশা, বল-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ـ اِغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُّضِلاَّتِ الْفِتَنِ ـ

অর্থাৎ "হে খোদা, আমার নবী মুহাম্মদ (সা) এবং প্রভূ, আমার গোনাহ্ মা'ফ কর, অন্তরের ক্রোধ দূর করিয়া দাও এবং আমাকে পথ-ভ্রান্তির বিপদাপদ হইতে রক্ষা কর।" ক্রোধের সময় এই দোয়া পাঠ করাও সুন্নত।

অপ্রিয় বাক্য শ্রবণকারীর কর্তব্য—কাহারও অত্যাচার বা অপ্রিয় বাক্যের উত্তর না দিয়া নীরব থাকাই উত্তম। কিন্তু এইরূপ স্থলে নীরব থাকা ওয়াজিব নহে। কিন্তু প্রত্যেক কথার জওয়াব দিবারও অনুমতি নাই। গালির পরিবর্তে গালি দেওয়া এবং গীবতের পরিবর্তে গীবত করা জায়েয নহে। কেননা, এই সমস্ত কারণে শরীয়তের শাস্তি বিধান অপরাধীর উপর ওয়াজিব হইয়া পড়ে। কিন্তু কটু বাক্যের উত্তরে এমন কটুবাক্য বলার অনুমতি আছে যাহাতে মিথ্যার লেশমাত্রও নাই। ইহা কেছাছ সদৃশ্য। (অপরাধ প্রবণতা নিবারণের উদ্দেশ্যে তুল্য পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ ও যথাবিহিত শাস্তির বিধানকে কেছাছ বলে)।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে দোষ তোমার মধ্যে আছে ইহার উল্লেখ করিয়া তোমাকে কেহ গালি দিলে তাহার দোষ উল্লেখ করত উত্তর

দিও না।" কিন্তু এই হাদীসের নির্দেশ অনুসারে গালি বা ব্যভিচার সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ না হইলে ঐ ব্যক্তির উত্তর না দিয়া বিরত থাকা ওয়াজিব নহে। ইহার প্রমাণ এই যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-

اَلْمُسْتَبَانُ مَاقَالاَ فَعَلَى الْبَادِىْ حَتّٰى يَعْتَدِىَ الْمَظْلُوْمُ ـ

অর্থাৎ "পরস্পর ঝগড়ার সময় যাহা বলা হইয়া থাকে ইহার পাপ অত্যাচারিত ব্যক্তি সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত আরম্ভকারীর উপর থাকে।"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন- "রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে অধিক ভালবাসেন এবং আমার প্রতি তাঁহার আসক্তি অত্যধিক বলিয়া আমার সপত্নীগণ হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিয়া বলিয়া পাঠান যেন তিনি সকলকে তুল্যরূপে ভালবাসেন। হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা আসিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন। তিনি জাগ্রত হইলে হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা তাঁহাকে নিবেদন জানাইলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবার বলিলেন- 'আমি আয়েশাকে অত্যন্ত ভালবাসি, তোমরাও তাহাকে তদ্রূপ ভালবাস।' হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার সপত্নীদিগকে সমস্ত কথা জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। আমার অপর সপত্নী হযরত যয়নব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে সকলে মিলিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহাকে হযরত আমার সমান ভালবাসিতেন বলিয়া তিনি দাবি করিতেন। তিনি (হযরত যয়নব) আসিয়াই অপ্রিয় বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন- 'আবূ বকরের কন্যা এইরূপ, আবূ বকরের কন্যা ঐরূপ।' আমি চুপ ছিলাম। তৎপর রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিবার জন্য আমাকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি লাভ করিয়া আমিও ঐ প্রকার অপ্রিয় বাক্যে জওয়াব দিতে লাগিলাম। জওয়াব দিতে আমার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। অনন্তর তিনি (হযরত যয়নব) পরাজিত হইলেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন বলিলেন- "হে যয়নব, তিনিই আবূ বকরের কন্যা।" অর্থাৎ তর্ক-বিতর্কে তুমি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না।

উল্লিখিত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা না হইয়া সত্য হইলে অপ্রিয় কথায় উত্তর দিবার অনুমতি আছে; যেমন- হে নির্বোধ, হে জাহিল, লজ্জা কর, নীরব থাক, প্রভৃতি। এইরূপ বাক্য কটু হইলেও অসত্য নহে। কারণ, কেহই একেবারে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাশূন্য হইতে পারে না। কিন্তু অশ্লীল কথা যেন রসনা হইতে বাহির না হয় তজ্জন্য ক্রোধের সময় বিশেষ প্রয়োজন হইলে এমন কথা বলিবার অভ্যাস করিবে যাহা নিতান্ত জঘন্য নহে; যেমন হতভাগ্য, অপদার্থ, অসভ্য, গাধা ইত্যাদি।

তবে ঝগড়া-বিবাদকালে উত্তর দিলে ন্যায়ের গণ্ডির ভিতর থাকা নিতান্ত দুষ্কর। এইজন্য উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে লাগিল। কিন্তু তিনি নীরব ছিলেন। তিনি অবশেষে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলে রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হযরত আবূ বকর (রা) নিবেদন করিলেন– "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এতক্ষণ ত আপনি বসিয়া ছিলেন, কিন্তু আমি উত্তর দিতে আরম্ভ করিতেই আপনি গাত্রোত্থান করিলেন?" তিনি বলিলেন– "তুমি নীরব থাকা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তোমার পক্ষ হইতে জওয়াব দিতেছিল। (তুমি জওয়াব দিতে আরম্ভ করিলে) শয়তান আগমন করিল। শয়তানের সহিত উপবেশন করাকে আমি ঘৃণা করি।"রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আল্লাহ্ বিভিন্ন ধাতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। কতক লোক এরূপ যে, তাহারা বিলম্বে ক্রুদ্ধ হয় ও বিলম্বে শান্ত হয়, কতক লোক ইহার বিপরীত, তাড়াতাড়ি ক্ষুদ্ধ হয় এবং তাড়াতাড়ি শান্ত হয়। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে বিলম্বে ক্ষুদ্ধ হয় এবং তাড়াতাড়ি শান্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যে তাড়াতাড়ি ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু বিলম্বে শান্ত হইয়া থাকে।"

গুপ্ত ক্রোধের আপদ—ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সততার বশবর্তী হইয়া বিরাগভাজন ব্যক্তিকে ক্ষমা করত ক্রোধ দমন করিলে তুমি পরম ভাগ্যবান। কিন্তু ক্ষমতার কারণে বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্রোধ চাপা রাখিলে ইহা তোমার অন্তরে বিকৃত হইয়া দ্বেষ-বিদ্বেষের সৃষ্টি করিবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– اَلْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُوْدٍ। অর্থাৎ "মুমিন কখনও বিদ্বেষপরায়ণ হইতে পারে না।" দ্বেষ-বিদ্বেষ ক্রোধের পুত্রস্বরূপ। দ্বেষ-বিদ্বেষ হইতে আবার আট প্রকার ধর্ম ধ্বংসকর মনোভাব জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগকে ক্রোধের পৌত্র বলা যাইতে পারে।

বিদ্বেষজাত মনোভাব—বিদ্বেষজাত মনোভাব আট প্রকার। প্রথম– ঈর্ষা। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি সুখে যাতনা ও দুঃখে আনন্দ পায়। দ্বিতীয়– শামাতাত অর্থাৎ অপরের দুঃখ ও বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা। (ঈর্ষার মত ইহা আন্তরিক লুক্কায়িত ভাব নহে; ইহা কথাবার্তায় ও ক্রিয়াকলাপে প্রকাশিত হয়)। তৃতীয়– বিমুখতা অর্থাৎ বিরাগভাজন ব্যক্তির প্রতি অপ্রসন্ন থাকা। তাহার সহিত কথা না বলা; এমন কি সালামের জওয়াবও না দেওয়া। চতুর্থ– অবজ্ঞা। ইহাতে মানুষ বিরাগভাজন ব্যক্তিকে হেয় ও তুচ্ছ বলিয়া মনে করে। পঞ্চম– বিরাগভাজন ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা বাহিরে প্রকাশ পায় এবং লোক বিরাগভাজন ব্যক্তির কুৎসা, নিন্দা ও গুপ্ত দোষ প্রকাশে পঞ্চমুখ হয় এবং তৎপ্রতি নানারূপ মিথ্যা ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। ষষ্ঠ– বিরাগভাজন ব্যক্তির দোষ বিদ্বেষ-পরায়ণ ব্যক্তি লোকসমাজে প্রকাশ করে, ইহা

লইয়া সমালোচনা করে এবং তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। **সপ্তম**– বিরাগভাজন ব্যক্তির প্রাপ্য আদায় ও তাহার নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধে অবহেলা দেখা দেয়; তাহার সহিত আত্মীয়তা ছেদন করা হয় এবং তাহার কোন হক নষ্ট হইয়া থাকিলে ইহা প্রত্যর্পণ করা হয় না বা ক্ষমাও চাওয়া হয় না। **অষ্টম**– বিরাগভাজন ব্যক্তিকে যাতনা প্রদান, এমন কি সুযোগ পাইলে তাহাকে হত্যার বাসনা বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির অন্তরে জাগিয়া উঠে এবং সে অপরকেও তাহার বিরুদ্ধে তদ্রূপ কার্যে উত্তেজিত করিয়া তোলে।

ক্রোধজনিত মানসিক পরিবর্তন—ক্রোধের ফলে বিরাগভাজন ব্যক্তির প্রতি সাধু এবং নিষ্পাপ ব্যক্তিরও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। বিরাগভাজন ব্যক্তির উপকার, কাজকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা ও তাহার সহিত নম্র ব্যবহার আর পূর্বের ন্যায় করা হয় না। এমন কি তাহার সহিত একত্রে উপবেশন করত আল্লাহ্‌র যিকির এবং তাহার কল্যাণের জন্য দোয়া করিতেও মন লাগে না। এই সকল কারণে ক্রোধের বশীভূত হইলে সাধু পুরুষদেরও মরতবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাদের বিস্তর ক্ষতি সাধিত হয়।

হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মিস্‌তাহ্ নাম জনৈক নিকট-আত্মীয়পোষ্য ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদে যোগদান করিলে হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার ভরণ-পোষণ রহিত করিয়া শপথ করেন যে, তাঁহাকে আর কখনও জীবিকা প্রদান করিবেন না। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا يَأْتَلِ اُوْلُوْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اِلٰى قَوْلِهٖ اَنْ يَّغْفِرِ اللّٰهُ لَكُمْ -

অর্থাৎ "এবং যেন শপথ না করে তোমাদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই বিষয়ে যে, দিবে না স্বজন ও দরিদ্র এবং আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগী লোকদিগকে এবং উচিত যে, ক্ষমা করে ও দোষ ছাড়িয়া দেয়। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন ইহা কি তোমরা চাও না?" (সূরা নূর, রুকু ৩, পারা ১৮)। ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "আল্লাহ্‌র শপথ, আমি অবশ্যই ইহা ভালবাসি।" তৎপর তিনি আবার মিস্‌তাহ্‌র ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন।

বিদ্বেষের তারতম্য অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ—বিদ্বেষভাবের তারতম্য অনুসারে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

প্রথম শ্রেণী—সিদ্দীকগণ। তাঁহাদের মনে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ জাগরিত হইলে কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমে তাঁহারা ইহার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিরাগভাজন ব্যক্তির উপকার করেন এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতার সহিত তাহার সঙ্গে মিলিত হন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—পরহেযগারগণ। তাঁহারা বিরাগভাজন ব্যক্তির ইষ্ট ও অনিষ্ট কিছুই করেন না। অর্থাৎ বিদ্বেষভাব তাঁহাদের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।

তৃতীয় শ্রেণী—ফাসিক যালিম। তাহারা বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

ক্ষমার ফযীলত—কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তুমি তাহার উপকার কর। ইহাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রকৃষ্টতম উপায়। ইহা সম্ভবপর না হইলে অন্ততঃপক্ষে তাহাকে ক্ষমা কর, কেননা, ক্ষমার ফযীলত অত্যন্ত বেশী।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "তিনটি বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি; (উহা এই যে) (১) সদ্‌কা দিলে ধন কমে না, তোমরা সদ্‌কা দাও। (২) যে ব্যক্তি অপরের অপরাধ মা'ফ করে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাহাকে অধিক মর্যাদা দান করিবেন। (৩) যে ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য দরিদ্রতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন– "যাহারা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অন্যায় করিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই; কিন্তু আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কেহ অন্যায় করিলে তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা থাকিত না। তাঁহার ইচ্ছাধীন কার্যের মধ্যে যাহা মানবজাতির জন্য অধিক সহজ দেখিতেন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কখনও তিনি পাপকার্য অবলম্বন করিতেন না।"

হযরত আকাবা ইব্‌ন আমের রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন– 'সংসারী লোক ও আখিরাতের পথিক, উভয়ের জন্য যে-ভাব উত্তম, তাহা তোমাকে জানাইয়া দিতেছি। তোমার সহিত কেহ সম্বন্ধ কর্তন করিতে চাহিলে তুমি তাহার সঙ্গে মিলিত হও; তোমাকে কেহ বঞ্চিত করিলে তুমি তাহাকে দান কর।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলেন– ' হে আল্লাহ্, তোমার বান্দাগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমার অধিক প্রিয়?' উত্তর হইল– 'শাস্তি দানের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি শত্রুকে মা'ফ করে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি অত্যাচারীর উপর অভিশাপ দিল সে তাহার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিল।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কুরায়শ জাতিকে পরাজিত করিয়া পবিত্র মক্কা শরীফ দখল করিলে কুরায়শগণ তাঁহার প্রতি নিজেদের অবিচার, অত্যাচার স্মরণ করিয়া নিতান্ত ভীত ও জীবনে নিরাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু রাসূলে

মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কা'বা শরীফের দ্বারদেশে স্বীয় পবিত্র হস্ত স্থাপনপূর্বক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– "আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়; তাঁহার শরীক নাই। তিনি অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করিলেন ও স্বীয় বান্দাগণকে জয়ী করিলেন এবং স্বীয় দুশ্‌মনদিগকে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিলেন। (হে কুরায়শগণ) অদ্য তোমরা কী দেখিতেছ এবং কী বলিতেছ?" কুরায়শগণ একবাক্যে নিবেদন করিল– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আজ সকল ক্ষমতাই আপনার করতলগত, ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত আমাদের আর কী বলিবার আছে? আমরা আপনার দয়াপ্রার্থী।" তাহাদের কথা শুনিয়া রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "আমার ভাই ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম স্বীয় ভ্রাতাগণের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন আমিও তাহাই বলিতেছি ঃ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ "আজ তোমাদের উপর ভৎসনা করিবার কিছুই নাই।" ইহা বলিয়া তিনি কুরায়শদিগকে জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করিলেন।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "কিয়ামতের দিন সমস্ত লোক উত্থিত হইলে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে– 'যাহাদের পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে, তাহারা উঠ।' কয়েক সহস্র লোক উঠিবে এবং বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবে। কারণ, তাহারা (দুনিয়াতে) আল্লাহ্‌র বান্দাদের অপরাধ মা'ফ করিয়া দিত।" হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ কর, তাহা হইলে প্রচুর অবসর পাইবে। আবার অবসরকালে প্রতিশোধ গ্রহণের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও (শত্রুকে) ক্ষমা কর।"

খলীফা হিশামের (র) নিকট এক অপরাধীকে আনয়ন করা হইলে প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সে স্বীয় দোষ প্রক্ষালনের উদ্দেশ্যে যুক্তি-প্রমাণাদি প্রদর্শন করিতে লাগিল। খলীফা বলিলেন– "তুমি আমার সম্মুখে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিতে আরম্ভ করিলে?" অপরাধী কুরআন শরীফের এই আয়াত আবৃত্তি করিল ঃ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا অর্থাৎ "হাশরের মাঠে (আল্লাহ্‌র সম্মুখে) সমস্ত প্রাণী আনয়ন করা হইবে; তাহারা নিজ নিজ জীবনের জন্য তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিবে।" সে আরও বলিল– "কিয়ামত দিবস মহাবিচারক আল্লাহ্‌র সম্মুখে জবাবদিহিকালে ত বান্দা প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিতে পারিবে; এমতাবস্থায়, আমি আপনার সম্মুখে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিতে পারিব না কেন?" খলীফা হিশাম (র) বলিলেন– "বেশ এস, কি বলিতে চাও বল।"

হযরত ইব্‌ন মাস্‌উদ রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হুর একটি দ্রব্য চোরে লইয়া গেল। সমবেত লোকগণ চোরকে অভিশাপ দিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে অভিশাপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন– "হে খোদা, চোর কোন অভাবের তাড়নায় দ্রব্যটি চুরি করিয়া

থাকিলে তাহার মঙ্গল কর; কিন্তু পাপ কার্যে সাহস বর্ধন নিমিত্ত চুরি করিয়া থাকিলে ইহাই যেন তাহার শেষ পাপ বলিয়া লিখিত হয়।" অর্থাৎ তৎপর যেন সেই ব্যক্তি আর পাপ না করে।

হযরত ফুযায়ল (র) বলেন– "চোরে এক ব্যক্তির ধন চুরি করিয়া লইয়া গেল। কা'বা শরীফ তওয়াফকালে দেখিতে পাইলাম, তিনি কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম– 'হে মহাত্মন! আপনি কি অপহৃত ধনের জন্য কাঁদিতেছেন?' তিনি বলিলেন– 'না, বরং আমি যেন দেখিতেছি, হাশরের মাঠে ঐ ব্যক্তি আমার সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কিন্তু সে ঐ চুরি কার্যের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিতেছে না। এইজন্য দুঃখিত হইয়া আমি কাঁদিতেছি।" খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নিকট কতিপয় যুদ্ধবন্দীকে আনয়ন করা হইল। তখন একজন বুযুর্গ তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– "তুমি যাহা চাহিলে, আল্লাহ্ তোমাকে তাহা দান করিয়াছেন, অর্থাৎ তোমাকে বিজয়ী করিয়াছেন। এখন আল্লাহ্ যাহা চাহেন, তাহা তুমি দাও, অর্থাৎ তাহাদিগকে ক্ষমা কর।" ইহা শুনিয়া খলীফা সকল বন্দীকে মা'ফ করিয়া দিলেন। ইন্‌জীল কিতাবে আছে– 'যে-ব্যক্তি নিজ নির্যাতকের অপরাধ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে তাহার নিকট শয়তান পরাজিত হয়।" অর্থাৎ শয়তান তাহাকে পাপকর্মে প্ররোচিত করিতে সমর্থ হয় না।

মোটকথা, ক্রোধভাজন ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া উচিত এবং প্রত্যেক কাজে নম্রতা অবলম্বন করা কর্তব্য। তাহা হইলে মানব-মনে ক্রোধের সঞ্চার হইতে পারে না।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যাহাকে আল্লাহ্ নম্রতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান করিয়াছেন। আর যাহাকে তিনি নম্রতাগুণে বঞ্চিত করিয়াছেন, সে ইহ-পরকালের মঙ্গল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।" তিনি অন্যত্র বলেন– "আল্লাহ্ সদয় সহনশীল এবং সদয় সহনশীল ব্যক্তিকে তিনি ভালবাসেন। তিনি সদয় সহনশীলতার জন্য যাহা দান করেন, কঠোরতা প্রদর্শন করিলে তাহা দান করেন না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে বলেন– "প্রত্যেক কাজে নম্রতার দিকে দৃষ্টি রাখিবে; কেননা নম্রতাযোগে যে কাজ করা হয় তাহা সম্পন্ন হয়, আর যে কাজে নম্রতা থাকে না তাহা নষ্ট হয়।"

ঈর্ষা ও ইহার আপদ—ক্রোধ হইতে বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষ হইতে ঈর্ষা জন্মে। ঈর্ষা নিতান্ত অনিষ্টকর দোষসমূহের অন্যতম।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আগুন যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বালাইয়া দেয়, ঈর্ষাও তদ্রূপ নেকীসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলে।" তিনি আরও বলেন– "কেহই তিনটি বিষয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না; (উহা এই) (১) বদগুমান (কুধারণা), (২) ঈর্ষা ও (৩) মন্দ ফাল (অর্থাৎ শুভাশুভ লক্ষণ-বিচার, যেমন শূণ্য কলসী, শিয়াল-কুকুরের ডাক, হাঁচি, টিকটিকি প্রভৃতিকে কুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করা)। আমি তোমাদিগকে উহার প্রতিষেধক জানাইয়া দিতেছি; (তোমাদের মনে কাহারও সম্বন্ধে) বদগুমান হইলে মনে মনে ইহার সত্যতা অনুসন্ধানে লিপ্ত হইও না এবং অন্তরে ইহা পুষিয়া রাখিও না। মন্দ ফাল দেখিলে বিশ্বাস করিও না। ঈর্ষার উদ্রেক হইলে ইহার বশীভূত হইয়া হস্ত ও রসনা সঞ্চালন করিও না।" তিনি আরও বলেন– "হে মুসলমানগণ, যে বস্তু তোমাদের অগ্রগামী বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছে, তাহা তোমাদের মধ্যে উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। উহা ঈর্ষা ও শত্রুতা। যে আল্লাহ্‌র হাতে মুহাম্মদের (সা) প্রাণ, তাঁহার শপথ, ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না; আর তোমরা যে পর্যন্ত পরস্পরকে ভালবাসিবে না সেই পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হইতে পারিবে না। আর ভালবাসা কি উপায়ে লাভ করা যায়, তোমাদিগকে জানাইয়া দিতেছি– তোমরা পরস্পরকে প্রকাশ্যে সালাম দিতে থাক।"

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এক ব্যক্তিকে আরশের ছায়াতলে দেখিয়া মনে করিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র নিকট উচ্চ মরতবার অধিকারী। তাঁহার সেই মরতবা লাভের ইচ্ছা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– "হে খোদা, এই ব্যক্তি কে এবং তাঁহার নাম কি?" আল্লাহ্ তাঁহার নাম ব্যক্ত না করিয়া তাঁহার কার্যকলাপের সংবাদ দিয়া বলিলেন– "এই ব্যক্তি কখনও ঈর্ষা করে নাই, মাতাপিতার নাফরমানি করে নাই এবং একের কথা অপরের কানে লাগায় নাই।" হযরত যাকারিয়্যা আলায়হিস্ সালাম বলেন যে, আল্লাহ্ বলেন– "ঈর্ষী ব্যক্তি আমার নিআমতের শত্রু এবং আমার বিধানের উপর বিরক্ত ও আমার বান্দাগণের মধ্যে আমি যেভাবে (আমার নিআমত) বন্টন করিয়া দিয়াছি, সে উহা পছন্দ করে না।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "ছয় প্রকার পাপের ফলে ছয় শ্রেণীর লোক বিনা বিচারে দোযখে যাইবে; (তাহা এই) (১) শাসনকর্তা– অত্যাচারের জন্য; (২) আরববাসী– অন্যায় পক্ষপাতিত্বের জন্য; (৩) ধনবান ব্যক্তি– অহঙ্কারের জন্য; (৪) বণিক– খিয়ানত অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাতের জন্য; (৫) গ্রাম্য গঁওয়ার লোক– অজ্ঞানতা ও মূর্খতার জন্য এবং (৬) আলিম ব্যক্তি– ঈর্ষার জন্য।" হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "একদা আমরা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলিলেন– 'বেহেশতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত একজন এখন আসিতেছে।' আন্‌সার সম্প্রদায়ের

অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাম হস্তে পাদুকা ঝুলিতেছিল এবং তাঁহার দাঁড়ি হইতে ফোঁটা-ফোঁটা ওযুর পানি পড়িতেছিল। দ্বিতীয় দিনও হযরত (সা) এই কথাই বলিলেন, আর ঐ ব্যক্তিই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমাগত তিন দিবস এরূপ ঘটনাই ঘটিল। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস সেই আনসারীর কার্য-কলাপ কিরূপ, জানিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন। তিনি তাঁহার গৃহে যাইয়া বলিলেন– 'আমি আমার পিতার সহিত ঝগড়া করিয়াছি। আপনার গৃহে তিন রাত্রি থাকিতে ইচ্ছা করি।' তিনি বলিলেন– 'আচ্ছা বেশ, তিনি (হযরত আবদুল্লাহ) ক্রমাগত তিন রজনী তাঁহার সংসর্গে অবস্থান করত তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করিলেন। যখনই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইত তখনই তিনি আল্লাহ্‌র যিকির করিতেন; এতদভিন্ন তাঁহার অন্য কোন বিশেষ আমল (কাজ) তিনি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি (হযরত আবদুল্লাহ্) বলিলেন– 'আমি স্বীয় পিতার সহিত ঝগড়া করি নাই; কিন্তু রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আপনার সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন (সুসংবাদ দিলেন), এইজন্য আপনার ক্রিয়া-কলাপ জানিতে আসিয়াছিলাম।' তিনি (আনসারী) বলিলেন– 'আপনি যাহা দেখিলেন তদ্ব্যতীত আমার আর কোন কার্য-কলাপ নাই।' হযরত আবদুল্লাহ (রা) চলিয়া যাইতে লাগিলে তাঁহাকে ডাকিয়া তিনি (আনসারী) বলিলেন– 'আরও একটি কথা আছে, আমি কাহারও সৌভাগ্যে ঈর্ষা করি নাই।' তিনি (হযরত আবদুল্লাহ) বলিলেন– 'তজ্জন্যই আপনার এই মরতবা।"

হযরত আওন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) এক বাদশাহকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন– "কখনও অহঙ্কার করিও না, কারণ অহঙ্কারেই সর্বপ্রথম পাপ হইয়াছিল; অহঙ্কারের জন্যই শয়তান হযরত আদম আলায়হিস সালামকে সিজদা করে নাই। লোভ হইতে দূরে থাক; কেননা, লোভই হযরত আদম আলায়হিস সালামকে বেহেশ্‌ত হইতে বাহির করিয়াছিল। কখনও ঈর্ষা করিও না; কারণ ঈর্ষার জন্যই সর্বপ্রথম খুন হইয়াছিল; ইহারই প্রভাবে হযরত আদম আলায়হিস সালামের পুত্র স্বীয় ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিল। আর হযরত সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের জীবন-চরিত্র আলোচনা, আল্লাহ্‌র প্রশংসাবলী বর্ণনা বা নক্ষত্ররাজির প্রসঙ্গ হইলে নীরবে শ্রবণ কর, কথা বলিও না।"

হযরত বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন– "এক ব্যক্তি প্রত্যেকদিন এক বাদশাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিত– 'সাধু ব্যক্তির সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, দুর্বৃত্তকে তাহার কার্যফলের উপর ছাড়িয়া দাও। কারণ, তাহার কু-কর্মই তাহাকে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করিবে।' এই নীতিবাক্যের জন্য বাদশাহ তাহাকে ভালবাসিতেন। এক ব্যক্তি তৎপ্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া বাদশাহকে জানাইল– 'ইহার প্রমাণ কি?' সে বলিল– 'আপনি তাহাকে নিকটে আহবান করিয়া দেখুন, দুর্গন্ধ যাহাতে নাসিকায় প্রবেশ না

করে তজ্জন্য সে হাত দ্বারা নাসিকা ঢাকিয়া রাখিবে।' অপরদিকে এই ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি ঐ লোকটিকে স্বীয় গৃহে লইয়া যাইয়া কাঁচা রসুন মিশ্রিত খাদ্য অধিক পরিমাণে ভোজন করাইল। তৎপরই বাদশাহ তাহাকে নিকটে আহবান করিলেন। বাদশাহ্‌র নাসিকায় যাহাতে রসুনের দুর্গন্ধ প্রবেশ না করে তজ্জন্য সে হাত দ্বারা স্বীয় মুখ ঢাকিয়া রাখিল। বাদশাহ বুঝিলেন, ঐ ব্যক্তি সত্যই বলিয়াছে। বাদশাহর অভ্যাস ছিল যে, মহাপুরস্কার প্রদানের আদেশ ব্যতীত অন্য কিছুই স্বহস্তে লিখিতেন না। ঐ ব্যক্তির প্রতি বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বহস্তে আদেশপত্র লিখিলেন– 'পত্রবাহকের শিরচ্ছেদ করিয়া তাহার চর্মে ভূষি ভর্তি করত আমার নিকট প্রেরণ কর।' আদেশপত্রটি বাদশাহ নিজ হস্তে খামে পুরিয়া মোহর আঁটিয়া সেই ব্যক্তি মারফত তাঁহার এক কর্মচারীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সেই ব্যক্তি আদেশপত্র হস্তে দরবার হইতে বহির্গত হইলে ঐ ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল– 'ইহা কি?' সে বলিল– 'মহাপুরস্কারের আদেশপত্র।' ঐ ঈর্ষী ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে তৎপর আদেশপত্রটি লইয়া গেল। সে ইহা ঐ কর্মচারীর হস্তে দিবামাত্র তিনি তাহাকে বলিলেন– 'ইহাতে তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার চর্মে ভূষি ভর্তিপূর্বক বাদশাহ্‌র নিকট প্রেরণের আদেশ রহিয়াছে।' সে বলিল– 'সুবহানাল্লাহ্, এই আদেশ ত অপর এক ব্যক্তির উপর প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্বাস না হয় বাদশাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।' কর্মচারী বলিলেন– 'ইহাই বাদশাহ্‌র আদেশ, পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব কেন?' অনন্তর কর্মচারী সেই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। সেই ব্যক্তি পূর্ববৎ বাদশাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পরদিন সেই নীতিবাক্য উচ্চারণ করিল। বাদশাহ বিস্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– 'ঐ পত্র কি করিলে?' সে বলিল– 'অমুক ব্যক্তি আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গেল।' বাদশাহ বলিলেন– 'ঐ ব্যক্তি ত আমার নিকট বলিয়াছিল তুমি এইরূপ কথা বলিয়াছ।' সে উত্তর দিল– 'আমি কখনও সেইরূপ কথা বলি নাই।' বাদশাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন– 'আচ্ছা, তাহা হইলে সেই দিন তুমি মুখ ও নাসিকা হস্ত দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে কেন?' সে বলিল– 'সেই ব্যক্তি আমাকে কাঁচা রসুন খাওয়াইয়া ছিল।' বাদশাহ বলিলেন– 'তুমি যে প্রত্যহ বল– 'দুর্বৃত্তের কর্মই তাহার শাস্তিদাতা' ইহা সত্যে পরিণত হইল।"

হযরত ইব্‌ন সীরান (র) বলেন– "পার্থিব উন্নতিতে আমি কাহাকেও ঈর্ষা করি নাই। কারণ, সেই ব্যক্তি বেহেশ্‌তী হইয়া থাকিলে বেহেশ্‌তের নিআমতের তুলনায় দুনিয়া নিতান্ত তুচ্ছ। আর সেই ব্যক্তি দোযখী হইয়া থাকিলে তথায় আগুনে জ্বলিবে; দুনিয়ার সুখ-সম্পদে তাহার কি লাভ?" হযরত হাসান বস্‌রীকে (র) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল– "মুসলমান কি ঈর্ষা করে?" তিনি বলিলেন– "হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালামের পুত্রগণের উপাখ্যান কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? তবে যাহা আচরণে

প্রকাশ পায় না তেমন ঈর্ষা কোন ক্ষতি করে না।" হযরত আবূ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "যে ব্যক্তি অধিক মৃত্যু চিন্তা করে সে না আনন্দিত হয়, না ঈর্ষা করে।"

ঈর্ষার পরিচয়—অপরের সুখ-সম্পদ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া মনে কষ্ট অনুভব করা এবং তাহার সেই সুখ-সম্পদ দূর হওয়ার কামনাকে ঈর্ষা বলে। ঈর্ষা হারাম। হাদীসের বিভিন্ন উক্তি, আল্লাহ্র কার্য ও বিধানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির অসন্তোষ প্রকাশ এবং অপরের সুখ-সম্পদে তাহার ঈর্ষা উদ্রেকের জঘন্য ও ক্ষতিকর মনোভাব ঈর্ষা হারাম হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে সম্পদ তুমি লাভ করিতে পার নাই, অপরের ভাগ্যে ঘটিয়াছে দেখিয়া তাহা লোপ হউক, তোমার এই মনোভাবকে জঘন্য ও কদর্য ব্যতীত আর কী বলা যাইতে পারে?

পারলৌকিক কার্যে প্রতিযোগিতা মঙ্গলজনক—অপরের সম্পদ লাভে যদি তুমি অসন্তুষ্ট না হও এবং ইহা নষ্ট হওয়ার কামনাও না কর, অথচ তুমি সেইরূপ সম্পদ পাইতে চাও, তবে তোমার এই প্রকার মনোভাবকে গিব্‌তা (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) এবং মুনাফাসা (প্রতিযোগিতা) বলে। পারলৌকিক কার্যে উহা উত্তম, বরং অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

অর্থাৎ "আর লালসাকারিগণের পক্ষে এইরূপ জিনিসের প্রতি লালসা করা উচিত।" আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ "তোমরা আপন প্রভুর ক্ষমার দিকে ধাবিত হও।" অর্থাৎ "দৌড়িয়া চল, একজন অপরজন অপেক্ষা অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "দুইটি স্থলে ঈর্ষা হইয়া থাকে। প্রথম- আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে ধন ও জ্ঞান উভয়ই দান করিয়াছেন, সে স্বীয় ধন জ্ঞান অনুসারে সদ্ব্যবহার করে; অপর ব্যক্তিকে তিনি ধন ব্যতীত শুধু জ্ঞান দান করিয়াছেন, তেমন ব্যক্তি যদি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া বলে- "আল্লাহ্ আমাকেও ধন দান করিলে আমিও তাহার ন্যায় (সৎকার্যে) ব্যয় করিতাম" তাহা হইলে এই দুই ব্যক্তিই সমান সওয়াব পাইবে। আর কেহ যদি পাপকার্যে ধন অপচয় করে এবং অপর ব্যক্তি (ইহা দেখিয়া) বলে- 'আমার ধন থাকিলে আমিও তদ্রূপ (পাপ কার্যে) অপচয় করিতাম', তাহা হইলে এই দুই ব্যক্তিই সমান পাপী হইবে।" এই হাদীসে প্রথমোক্ত স্থলে প্রথম ব্যক্তির ধন-দৌলতের সমান দ্বিতীয় ব্যক্তির ধন লাভের ইচ্ছাকে 'মুনাফাসাত' না বলিয়া 'হাসাদই' বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রথম ব্যক্তির

ধন-দৌলত লাভে দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে বিরক্তি, অসন্তোষ ও সেই ধন বিলুপ্তির কামনা নাই। বিরক্তি কোন স্থলেই জায়েয নহে।

কুকর্ম সহায়ক সম্পদের বিনাশ-কামনা সঙ্গত—কাহারও সম্পদ বিলোপের কামনা সঙ্গত নহে; কিন্তু যে সম্পদ দুরাচার ও অত্যাচারীর হস্তগত হইলে তাহাদের অপকর্ম ও অত্যাচারের কারণ হয়, উহার বিলোপ কামনা জায়েয। বাস্তবপক্ষে, ইহা সম্পদ বিলোপের কামনা নহে, বরং অপকর্ম ও অত্যাচারের প্রতিরোধ কামনামাত্র। কিন্তু দুরাচার ও অত্যাচারীর সম্পদ বিনাশের কামনা বাস্তবপক্ষে তাহাদের অপকর্ম ও অত্যাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হইল কিনা ইহা বুঝিবার উপায় এই- তাহারা তওবা করিয়া অপকর্ম ও অত্যাচার হইতে নিরস্ত হইলে তাহাদের সম্পদ বিলোপের কামনা তোমাদের অন্তরে যদি না থাকে, তবে মনে করিবে, ইহা পাপকর্ম প্রতিরোধের জন্যই ছিল। কিন্তু তখনও তোমাদের অন্তরে তাহাদের সম্পদ বিলোপের কামনা থাকিলে বুঝিবে, ইহা ঈর্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সম্পদের অসমতায় ঈর্ষার উৎপত্তি—এ স্থলে একটি সুক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করা হইতেছে। মনে কর, আল্লাহ্ কাহাকেও কোন বিশেষ সম্পদ দান করিলেন। অপর ব্যক্তিও এইরূপ সম্পদের জন্য লালায়িত হইল, কিন্তু কিছুতেই সে ইহা লাভ করিতে পারিল না। এমতাবস্থায়, সম্পদের অসমতা দেখিয়াই তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। তখন সম্পদশালীর সম্পদ বিনাশ হইয়া অসমতা বিদূরীত হইলে তাহার মনঃকষ্ট দূর হইতে পারে। অপরের সম্পদ দেখিলেই মানব মনে ইহার অভিলাষ হয়। কিন্তু ইহা অর্জনে অসমর্থ হইয়া অপরের সম্পদ বিনাশের কামনা করাই ক্ষতিকর বলা চলে না। কিন্তু এইরূপ সম্পদ প্রত্যাশী ব্যক্তি সম্পদশালীর বিষয়ে অবাধ ক্ষমতা পাইলেও সে ইহা বিনাশ না করিলে বা ছিনাইয়া না লইলে মনে করিবে, তাহার হৃদয়ে ঈর্ষা নাই। এমতাবস্থায়, অপরের সমান সম্পদ লাভের কামনা অন্তরে থাকিলেই সে আল্লাহ্র বিচারে দায়ী হইবে না।

ঈর্ষা দমনের উপায়—ঈর্ষা অন্তরের কঠিন ব্যাধি। ইহার জ্ঞানমূলক ও অনুষ্ঠানমূলক ঔষধ রহিয়াছে।

জ্ঞানমূলক ঔষধ—ঈর্ষার অপকারিতা উপলব্ধি করা। ঈর্ষার ফলে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির ইহ-পরকালের ক্ষতি হইয়া থাকে; কিন্তু বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির কোনই ক্ষতি হয় না, বরং ইহ-পরকালের তাহার লাভ হইয়া থাকে।

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির ক্ষতি—আল্লাহ্র বিধানে মানবের উপর অহরহ নিআমত বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি অপরের সম্পদ দেখিয়া সর্বদা মনঃকষ্টে ও দুঃখে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে থাকে। সে স্বীয় শত্রুকে যেরূপ দুঃখ ও মনঃকষ্টে জর্জরিত দেখিতে চাহিয়াছিল সে নিজেই তদ্রূপ দুঃখ যন্ত্রণায় কালাতিপাত করে।

ঈর্ষার যন্ত্রণার ন্যায় আর কোন যন্ত্রণাই নাই। অতএব অপরের অমঙ্গল কামনায় নিজকে দুঃখে ও মনস্তাপে জর্জরিত করা অপেক্ষা নির্বোধের কাজ আর কি হইতে পারে? অপরের ঈর্ষাতে বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির কোনই ক্ষতি হয় না। কারণ, আল্লাহ্ যাহার অদৃষ্টে যে-সম্পদ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে, পরিমাণে ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি ও সময়ের দিকে আর অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই সংঘটিত হইবে না। কেননা, সৃষ্টির প্রারম্ভে যে অদৃষ্টলিপি বিধিবদ্ধ হইয়াছে তদনুসারেই মানুষ সম্পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া সম্পদ লাভের কারণস্বরূপ শুভলক্ষণ ও নক্ষত্ররাজির উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে, অদৃষ্ট অপরিবর্তনশীল।

একজন নবী (আ) এক সম্রাজ্ঞীর শাসন-উৎপীড়নে অসহ্য হইয়া তাহার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ জানাইলেন। ইহার উত্তরে ওহী অবতীর্ণ হইল ঃ فَرَّ مِنْ قُدَّامِهَا حَتّٰى تَنْقَضِىَ اَيَّامُهَا অর্থাৎ "অদৃষ্টলিপি পরিবর্তিত হইবে না। এই সম্রাজ্ঞীর রাজত্বকাল আরও বাকী আছে; তুমি ইচ্ছা করিলে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পার।" অপর একজন নবী (আ) বিপদাপদে জর্জরিত হইয়া উহা মোচনের জন্য আল্লাহ্র নিকট বহু প্রার্থনা ও রোদন করিলেন। তৎপর এই মর্মে ওহী অবতীর্ণ হইল— " যে দিবস আমি যমীনের সহিত আসমানের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছি, সেই দিবস উহাও তোমার অদৃষ্টে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তোমার জন্য পূর্ব বিধান রহিত করিয়া আবার নতুন বিধান লিপিবদ্ধ করিতে বল কি?"

ফলকথা এই, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির ইচ্ছার প্রভাবেই বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির সম্পদ বিদূরিত হয় না। তাহা হইলে ইহার ক্ষতি প্রকারান্তরে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির উপরই আবার ঘুরিয়া আসিবে এবং তাহার স্বীয় সম্পদও বিলুপ্ত হইবে। যেমন মনে কর, তুমি কাহারও সম্পদ দেখিয়া ঈর্ষা করিলে এবং ইহাতে তাহার সম্পদ নষ্ট হইল, এখন তোমার সম্পদ দর্শনেও ত অপর কেহ ঈর্ষা করিতে পারে? এমতাবস্থায়, তোমার সম্পদও বিলুপ্ত হওয়া উচিত। আবার দেখ, ঈর্ষাতে বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট হইলে কাফিরদের ঈর্ষার ফলে মুসলমানগণ ঈমানরূপ পারলৌকিক অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইত। কিন্তু ইহা হয় নাই। কাফিরদের কামনা সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ

অর্থাৎ "আহ্লে কিতাবের কেহ কেহ তোমাদিগকে বিপথগামী করিয়া দিতে অন্তরের সহিত কামনা করে।" (সূরা আল ইমরান, রুকূ ৭. পারা ৩)।

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির ইহজগতে ভীষণ মনঃকষ্ট এবং পরজগতে ভয়ানক ক্ষতি হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে যাহা উত্তম বিবেচনা করিতেছেন তাহাই পূর্ণ কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। বিশ্ব-কারখানায় তাঁহার যে কৌশল জীবন্তভাবে

প্রচলিত থাকিয়া অহরহ কাজ করিয়া যাইতেছে, তিনি ভিন্ন উহার গুপ্ত রহস্য বুঝিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কিন্তু ঈর্ষী ব্যক্তি এই মঙ্গলজনক বিধানের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাঁহার বন্টন-নীতিও সে মানিয়া লইতে পারে না। সুতরাং এই অসন্তুষ্টি ও অসম্মতির দরুণ আগুন তাহার হৃদয়ে সর্বদা জ্বলিতে থাকে। তাওহীদের আমানতে মুমিনকে সম্মানিত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, আল্লাহ্র বিধানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা অপেক্ষা অধিক খিয়ানত এই আমানতে আর কি হইতে পারে? শয়তান মুসলমানের চিরশত্রু, মুসলমানের অমঙ্গল কামনাই তাহার একমাত্র কাজ। ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া এক মুসলমান অপর মুসলমানের অমঙ্গল করিলে সে শয়তানের কাজে শরীক হইল। মুসলমানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির লাভ—ঈর্ষী ব্যক্তি দুঃখকষ্টে নিপতিত থাকুক, বিদ্বেষভাজন ব্যক্তি ইহা কামনা করিতে পারে। ঈর্ষার ন্যায় কষ্টদায়ক আর কিছুই নাই। সুতরাং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা মানসিক যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করে বলিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি একাধারে যালিম ও মযলুম, বরং তাহার ন্যায় মযলুম আর কেহই নাই। বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে সে যালিম; আর সেই ঈর্ষার ফলে সে নিজেই দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয় বলিয়া সে মযলুম। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদে বা সে ঈর্ষা হইতে মুক্তি পাইয়াছে জানিলে বিদ্বেষভাজন ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া থাকে। কারণ, সম্পদে অপরে তাহাকে ঈর্ষা করুক এবং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি দুঃখকষ্টে নিপীড়িত হউক, ইহাই সে কামনা করিয়া থাকে।

বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির পারলৌকিক লাভের দিকে লক্ষ্য কর। সে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা অত্যাচারিত। ঈর্ষার বশীভূত হইয়া কেহ কাহারও নিন্দা করিলে, অপ্রিয় কথা বলিলে এবং কাজ-কারবারের কোন ক্ষতি করিলে ঈর্ষী ব্যক্তির আমলনামা হইতে সওয়াব লইয়া বিদ্বেষভাজন ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে। আর তাহার সওয়াব না থাকিলে বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির পাপ ঈর্ষী ব্যক্তির স্কন্ধে চাপানো হইবে। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির পার্থিব সম্পদের বিলোপ কামনা করে। কিন্তু ইহাতে তাহার সম্পদ বিলোপ হয় না, বরং তাহার পারলৌকিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অপরপক্ষে, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ঈর্ষার দরুণ ইহকালে ভীষণ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করে, আর পারলৌকিক আযাবের উপকরণস্বরূপ তাহার পাপরাশি পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি নিজকে স্বীয় বন্ধু ও বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির শত্রু বলিয়া মনে করে, কিন্তু বাস্তবপক্ষে সে স্বীয় শত্রু এবং বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির বন্ধু। কেননা, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোকে নিজেকে দুঃখকষ্টে জর্জরিত করিয়া রাখে এবং পরলোকে তাহাকে কঠিন শাস্তির উপযোগী করিয়া তোলে। আলিম ও পরহেযগার ধনবানগণ সৎকর্মে ধন ব্যয় করিতেছে দেখিয়া কেহ তাহাদিগকে আন্তরিক ভালবাসিলে সে স্বয়ং গুণী ও সৎকর্মী না হইলেও সওয়াব পাইবে। কিন্তু মানবের পরম শত্রু শয়তান ইহা সহ্য

করিবে কিরূপে? অতএব, সে লোককে ঈর্ষার বশীভূত করিয়া তাহার সওয়াব নষ্ট করত পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। আলিম ও দীনদার সৎকর্মী লোকদিগকে ভালবাসা সওয়াব লাভের সহজ উপায়। যে ব্যক্তি তাহাদিগকে ভালবাসিবে কিয়ামতের দিন সে তাহাদের সঙ্গেই অবস্থান করিবে। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি নিজে আলিম বা ইলম শিক্ষার্থী অথবা আলিম ও ইলম শিক্ষার্থীদিগকে ভালবাসে, সেই সওয়াবের অধিকারী; কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি সওয়াব লাভের এই ত্রিবিধ উপায় হইতেই বঞ্চিত।

ঈর্ষাপরায়ণ লোকের অবস্থা নিতান্ত নির্বোধ ব্যক্তিসদৃশ। মনে কর, এক নির্বোধ অপরের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রস্তর বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির দেহে না লাগিয়া ঘুরিয়া আসিয়া নিক্ষেপকারীর ডান চক্ষুর উপর পতিত হইল এবং তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া আবার খুব জোরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। এবারও প্রস্তরটি ফিরিয়া আসিয়া তাহার অপর চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল। সে আবার ততোধিক জোরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিল, ইহা ফিরিয়া আসিয়া তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এইরূপে বারবার প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি স্বীয় দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিল। বিদ্বেষভাজন ব্যক্তি অক্ষত দেহে নিরাপদে থাকিয়া প্রস্তর নিক্ষেপকারীর দুরাবস্থা দর্শনে হাসিতে লাগিল। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরও ঠিক এইরূপ দুরাবস্থা ঘটিকা থাকে। শয়তান তাহার এই দুর্গতি দেখিয়া উপহাস করিতে থাকে।

ঈর্ষা হইতে উল্লিখিত আপদসমূহ দেখা দেয়। তদুপরি ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া কেহ অপরের নিন্দা করিলে, মিথ্যা বলিলে বা সত্য কথা অস্বীকার করিলে, তাহার উপর বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির দাবী অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে এবং মহাবিচারের দিনে তাহার আমলনামা হইতে সেই পরিমাণে সওয়াব বিদ্বেষভাজন ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে। অতএব ঈর্ষার যে সকল ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইল উহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারিলে বুদ্ধিমান মানুষ হলাহল বিবেচনায় ইহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এই সকল বোধকেই ঈর্ষা ব্যাধির জ্ঞানমূলক ঔষধ বলে।

অনুষ্ঠানমূলক ঔষধ—কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টায় মন হইতে ঈর্ষার কারণগুলি বাহির করিতে হইবে। ক্রোধের বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে, অহঙ্কার, ওজব অর্থাৎ নিজেকে নিজে ভাল মনে করা, শত্রুতা, প্রভুত্ব ও সম্মান কামনা, ধনলিপ্সা ইত্যাদি ঈর্ষার মূল কারণ। অতএব, এই কুপ্রবৃত্তিসমূহ হৃদয় হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলিবে। এই প্রকার কার্যকে জোলাপ বা বহিষ্কারক ঔষধ বলে। ইহা ব্যবহারের মাধ্যমে ঈর্ষার মূলসমূহ উৎপাটন করিয়া ফেলিলে মনে ঈর্ষা স্থান পাইবে না। অন্তরে ঈর্ষার ভাব উদ্ভব হইলে বিরুদ্ধাচরণে ইহার প্রতিরোধ করিবে। ইহা কাহাকেও তিরস্কার করিতে বলিলে তাহার প্রশংসা করিবে, অহঙ্কার করিতে আদেশ করিলে নম্রতা দেখাইবে,

কাহারও সম্পদ বিনাশের চেষ্টায় তৎপর হইতে বলিলে বা কাহারও সঙ্গে শত্রুতা করিবার উস্কানি দিলে বন্ধুভাবে তাহার সাহায্য করিবে।

অগোচরে বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির প্রশংসা কীর্তন ও তাহার কার্যে সহায়তা তুল্য উপকারী ঈর্ষার প্রতিষেধক আর কিছুই নাই। এইরূপে অসাক্ষাতে কাহারও প্রশংসা ও সাহায্য করিলে সেই ব্যক্তির অন্তর আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিবে। সেই আনন্দের ছায়া তোমার অন্তরে যাইয়া পড়িবে এবং ইহাতে তোমার হৃদয়ও আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে ঈর্ষা আর কখনও অন্তরে জাগিবে না এবং শত্রুতাও তিরোহিত হইবে; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ -

অর্থাৎ "তুমি পাপকে সেই স্বভাব দ্বারা দূর কর যাহা অতি উত্তম। (এইরূপ করিলে) পরে তোমার ও যাহার (যে ব্যক্তির) মধ্যে শত্রুতা আছে, অকস্মাৎ যেন সে (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া যাইবে।" (সূরা হামীম সিজ্দা, রুকু ৫, পারা ২৪)।

ঈর্ষা পোষণে শয়তানের প্ররোচণা- উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী সদ্ব্যবহারে শত্রুতা বিনাশের চেষ্টা করিলে শয়তান নানাপ্রকার প্ররোচণা দিতে থাকিবে। সে বলিবে- "শত্রুর সহিত নম্র ব্যবহার এবং তাহার প্রশংসা করিলে সে তোমাকে দুর্বল মনে করিবে।" আল্লাহ্র আদেশ তুমি শ্রবণ করিলে এবং শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কেও তোমাকে জানাইয়া দেওয়া হইল। এখন তোমার স্বাধীন ক্ষমতা অনুসারে তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।

উপরে যে ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া হইল উহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী; কিন্তু খুব তিক্ত। যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে এবং ঈর্ষাই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি ধ্বংসের মূল, সেই ব্যক্তিই এইরূপ তিক্ততা সহ্য করিতে সমর্থ হয়। তিক্ততা ও কষ্ট সহ্য করিতে হয় না, এমন ঔষধ নাই। অতএব সুমিষ্ট ঔষধের আশা পরিত্যাগ করত তিক্ত ঔষধই সেবন করিতে হইবে; অন্যথায় ক্রমান্বয়ে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ততোধিক কষ্টে জীবন ধ্বংস করিবে।

ঈর্ষার ক্ষতি হইতে অব্যাহতির উপায়—অশেষ সাধনা দ্বারাও তোমার অন্তর হইতে শত্রু-মিত্রের প্রভেদ জ্ঞান একেবারে বিনাশ করিতে পারিবে না; উভয়ের সম্পদ ও বিপদে তোমার অন্তরে পার্থক্য উপলব্ধি করিবে। তোমার হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবেই শত্রুর সম্পদে কিছুটা ভার বোধ হইবে। এই স্বভাবগত মনোভাব পরিবর্তন করা

মানব-ক্ষমতার বহির্ভূত। কিন্তু দুইটি কাজ তাহার ক্ষমতাধীন রহিয়াছে; যথা ঃ (১) শত্রুর প্রতি স্বাভাবিক বিরক্তি বাক্যে ও কর্মে কখনও প্রকাশ না করা এবং (২) জ্ঞান ও বুদ্ধির বিচারে সেই স্বাভাবিক মনোভাবের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। সেই মনোভাব নিতান্ত জঘন্য এবং মন হইতে উহা বিলুপ্ত হউক, একান্তভাবে এই কামনা করা। এই দ্বিবিধ কাজ করিতে পারিলে স্বাভাবিক ঈর্ষার মনোভাবের জন্য আল্লাহ্‌র বিচারে কেহই দায়ী হইবে না।

কেহ কেহ বলেন- ঈর্ষার ভাব বাক্যে ও কর্মে প্রকাশ না করাই যথেষ্ট। ইহার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ না করিলেও আল্লাহ্‌র বিচারে দায়ী হইবে না। এই অভিমত ঠিক নহে। ঈর্ষার প্রতি ঘৃণা না রাখিলে আল্লাহ্‌র বিচারে দায়ী হইতে হইবে। কারণ, ঈর্ষা হারাম। ইহা হৃদয়ের কাজ, দেহের কাজ নহে। কেহ যদি কোন মুসলমানের দুঃখ কামনা করে এবং তাহার আনন্দে দুঃখিত হয়, তবে সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র বিচারে দায়ী হইবে। কিন্তু সেই ভাবের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করত ইহা গুপ্ত রাখিলে সে ঈর্ষার আপদ হইতে অব্যাহতি পাইবে।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে, অসীম সাধনায়ও মানব-হৃদয় হইতে শত্রু-মিত্রের প্রভেদ জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু তাওহীদভাবে প্রবল হইয়া যাঁহাকে একেবারে তন্ময় করিয়া ফেলিয়াছে, যিনি ইহার প্রভাবে সকল মানুষকে আল্লাহ্‌র গোলামরূপে দেখিতে পান এবং সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ একমাত্র আল্লাহ্ হইতেই সমাধা হইতে দর্শন করেন, কেবল এইরূপ ব্যক্তিই শত্রু-মিত্রের প্রভেদ জ্ঞান ভুলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ উন্নত মনোভাব নিতান্ত বিরল; বিদ্যুতের ন্যায় চমকিয়া নিমিষেই মিলাইয়া যায়; দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়

সংসারাসক্তি ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়

সংসারাসক্তি—সংসার সকল দোষের আকর ও সংসারাক্তি সমস্ত পাপের মূল। সংসার আল্লাহ্‌র শত্রু, আল্লাহ্ প্রেমিকদের শত্রু এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদিগের শত্রু। সুতরাং ইহা অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত আর কি হইতে পারে!

পথ চলারকালে সংসারাসক্তি পরকালের যাত্রীদের পথের সম্বল ও সদগুণরাজি ছিনাইয়া লইয়া যায় এবং তজ্জন্য তাহারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। এইজন্যই সংসার আল্লাহ্‌র শত্রু। সংসার নানারূপ রমণীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আল্লাহ্ প্রেমিকদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং ইহার প্রতারণা ও প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে এইজন্যই সংসার আল্লাহ্ প্রেমিকদের শত্রু। সংসার আল্লাহ্‌র শত্রু এবং যাহারা নিতান্ত সংসারাসক্ত তাহারও আল্লাহ্‌র শত্রু। সংসার ইহার বন্ধুগণকে নানারূপ ছলে কৌশলে স্বীয় প্রেমফাঁদে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। কিন্তু তাহারা ইহার প্রেমে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলে ইহা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং তাহাদের শত্রুদের নিকট যাইয়া ধরা দেয়।

সংসারের ধোঁকাবাজি—সংসার কুলটা রমণীর ন্যায় একজনকে পরিত্যাগ করিয়া অপরজনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইতে চায়। কঠোর পরিশ্রমে ও অতি কষ্টে মানুষ সংসার অর্জন করিয়া থাকে; তৎপর অনতি বিলম্বেই সে ইহার বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করে এবং পরকালে আল্লাহ্‌র প্রচণ্ড ক্রোধ ও ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত হয়। দুনিয়ার ফাঁদ হইতে কেহই নিস্তার পায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার প্রতারণা ও আপদসমূহ সমক্যরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাকে বর্জন করিয়াছে, কেবল তেমন ব্যক্তিই ইহার প্রবঞ্চনা হইতে নিস্তার পাইতে পারে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "দুনিয়া বর্জন কর, ইহা হারূত ও মারূত (ফেরেশতাদ্বয়) অপেক্ষা অধিক যাদুকর।"

সংসারাসক্তি বর্জনে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান—মূল গ্রন্থের ভূমিকায় তৃতীয় অধ্যায়ে দুনিয়ার পরিচয়, আপদ ও প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। কুরআন শরীফের বহু আয়াতে দুনিয়ার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। মানবকে দুনিয়ার

প্রলোভন হইতে ফিরাইয়া পরকালের দিকে আহ্বানের উদ্দেশ্যে এবং মানবজাতিকে ইহার প্রবঞ্চনা ও আপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিলে যাহাতে তাহারা উহা বর্জন করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে আল্লাহ্ অগণিত পয়গম্বর ও অসংখ্য আসমানী কিতাব প্রেরণ করিয়াছেন। এস্থলে দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কে কতিপয় হাদীস বর্ণিত হইতেছে।

হাদীসে দুনিয়ার নিন্দা—একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি মৃত ছাগলের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় স্বীয় সহচরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- "দেখ, এই মৃত প্রাণীটি এত ঘৃণিত যে, ইহার দিকে কেহ দৃষ্টিপাতও করে না। যে আল্লাহ্‌র হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ তাঁহার শপথ, আল্লাহ্‌র নিকট সংসার ইহা অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত। আল্লাহ্‌র নিকট সংসার মশক-পালকের তুল্য হইলে কোন কাফির পান করিবার জন্য এক অঞ্জলী পানিও পাইত না।" তিনি বলেন- "সংসার অভিশপ্ত এবং সংসারে যাহা কিছু আছে তাহাও অভিশপ্ত, কিন্তু যাহা আল্লাহ্‌র জন্য আছে (তাহা প্রশংসিত)।" তিনি বলেন- "সংসারাসক্তি সকল পাপের অগ্রগামী সরদার।" তিনি আরও বলেন- "যে ব্যক্তি পরকালকে ভালবাসে সে সংসারের অনিষ্ট করে। অতএব অস্থায়ী বস্তু বর্জনপূর্বক স্থায়ী বস্তু গ্রহণ কর।" অর্থাৎ সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরকাল অবলম্বন কর।

হযরত যায়েদ ইব্‌নে আকরাম বলেন- "আমি হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর সহিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহাকে মধুমিশ্রিত পানি দিল। তিনি ইহা মুখ পর্যন্ত উত্তোলনপূর্বক সরাইয়া লইলেন এবং এত তুমুল রোদন করিতে লাগিলেন যে, ইহাতে আমরাও রোদন করিলাম। তিনি কতক্ষণ চুপ থাকিয়া আবার রোদন করিতে লাগিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও সাহস হইল না। তিনি রোদনে বিরত হইলে লোকে নিবেদন করিল- 'হে রাসূলাল্লাহ্‌র খলীফা, আপনার রোদনের কারণ কি?' তিনি বলিলেন- 'একদা আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বসিয়া ছিলাম। এমন সময় দেখিতে পাইলাম তিনি স্বীয় পবিত্র হস্তে তাঁহার নিকট হইতে যেন কোন কিছু দূরে সরাইয়া দিতেছেন, অথচ কোন জিনিসই তথায় দেখা যাইতেছিল না। আমি নিবেদন করিলাম- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইহা কি?' হযরত (সা) বলিলেন- 'ইহা দুনিয়া। সে নিজেকে আমার নিকট সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিল, আমি ইহাকে তাড়াইয়া দিলাম। সে আবার আসিয়া বলিল- 'আপনি ত আমা হইতে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু আপনার পরে যাহারা থাকিবে তাহারা আমার হাত হইতে রক্ষা পাইবে না।' ইহা বলিয়া তিনি হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন- 'এখন আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, দুনিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আল্লাহ্ এমন কোন পদার্থ সৃষ্টি করেন নাই, যাহা তাঁহার নিকট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শত্রু। দুনিয়াকে সৃষ্টি করা অবধি তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই।" তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে গৃহ বলিয়া মনে করিবে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে গৃহহীন; যে দুনিয়ার ধনকে ধন মনে করিবে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে ধনহীন এবং যে দুনিয়াতে আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিবে সে প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধিহীন। যাহার জ্ঞান নাই সে-ই ইহার জন্য অপরকে ঈর্ষা করে; যাহার ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) নাই, সে ইহার অন্বেষণ করে।" তিনি বলেন- "প্রত্যুষে শয্যাত্যাগকালে যাহার অধিক শক্তি সংসারের দিকে নিয়োজিত থাকে সে কখনও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা তাহার জন্য দোযখ নির্ধারিত এবং তাহার হৃদয়ে চারিটি বস্তু অবশ্যই থাকিবে। **প্রথম**- অসীম দুঃখ যাহা কখনও নিঃশেষ হয় না; **দ্বিতীয়**- অপার কর্মব্যস্ততা যাহা হইতে সে কখনও অবকাশ পায় না; **তৃতীয়**- অনন্ত দৈন্য যাহা কাটাইয়া সে কখনও ধনবান হইতে পারে না; **চতুর্থ**- অফুরন্ত আশা যাহার কোন সীমা নাই।"

হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'তুমি কি চাও যে, দুনিয়া কি পদার্থ, ইহা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করি?' ইহা বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন এবং এক ভাগাড়ের দিকে আমাকে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে মানুষ, ছাগল ইত্যাদির মস্তকাস্থি, ছিন্ন বস্ত্রাদি ও মানুষের মলমূত্র স্তূপীকৃত ছিল। তিন বলিলেন- 'হে আবূ হুরায়রা, তোমাদের মস্তকের ন্যায় তাহাদের মস্তকও লোভ-লালসায় পূর্ণ ছিল। এখন চামড়া মাংস স্খলিত হইয়া শুধু হাড় পড়িয়া রহিয়াছে, উহাও অনতিবিলম্বে মাটিতে মিশিয়া যাইবে। এইসব মলমূত্র নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রী ছিল। উহা বহু চেষ্টায় সংগ্রহও করা হইয়াছিল, এখন এমন ঘৃণিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, লোকে উহা দেখামাত্র পলায়ন করে। আর এই সকল ছিন্ন বস্ত্র তাহাদের দেহের উপর বহু মূল্য বসন-ভূষণরূপে গর্বভরে সঞ্চালিত হইত, এখন ছিন্ন নেকড়ারূপে বাতাসে উড়িতেছে। আর এই সমস্ত তাহাদের অশ্বাদি, বাহন ও পালিত প্রাণীর হাড়। এককালে তাহারা এই সমস্ত বাহনে আরোহণপূর্বক গর্বভরে দুনিয়ার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই সকলই দুনিয়া। দুনিয়ার এই অবস্থা দর্শনে কেহ রোদন করিতে চাহিলে বল, সে রোদন করুক। কারণ, ইহা রোদনেরই স্থান।' ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই রোদন করিতে লাগিল। তৎপর হযরত (সা) আবার বলিলেন- 'দুনিয়া সৃজন করা অবধি ইহা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলিতেছে। আল্লাহ্ ইহার প্রতি আর দৃষ্টিপাতও করেন নাই। কিয়ামতের দিন দুনিয়া নিবেদন করিবে- 'হে খোদা, আপনার নিকৃষ্ট দাসগণকে

আমার হস্তে সমর্পণ করুন।' আল্লাহ্ বলিবেন- 'হে অপদার্থ, নীরব থাক্। ঐ জগতে ত আমি পছন্দই করি নাই যে, তোকে কেহ লাভ করুক, এখন কিরূপে ইহা করিতে পারি?"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কতক লোক কিয়ামতের দিন সমাগত হইবে; তাহাদের সৎকাজ 'থামা' পাহাড়ের সমান হইবে অথচ তাহাদিগকে দোযখে পাঠান হইবে।" উপস্থিত লেকে নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তাহারা কি নামাযী লোক হইবে?" তিনি বলিলেন- "হাঁ, তাহারা নামাযী, রোযাদার, রজনীতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদতকারী; কিন্তু দুনিয়ার বিষয়াদিতে নিমজ্জিত থাকার দরুন (তাহাদিগকে দোযখে পাঠান হইবে)।" একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমকে বলিলেন, "এমন ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে অন্ধ এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে দৃষ্টিশক্তি পাইবার আশা করে? অবগত হও, দুনিয়াকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালবাসে ও যত বেশী আশা হৃদয়ে পোষণ করে তাহার অন্তর আল্লাহ্ সেই পরিমাণে অন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি সংসার বিরাগী এবং অতি সামান্য আশা রাখে, আল্লাহ্ স্বয়ং বিনা উস্তাদে তাঁহাকে মহা ইল্‌ম শিক্ষা দেন এবং কোন পথপ্রদর্শকের মধ্যস্থতা ব্যতীত তিনি স্বয়ং তাহাকে সুপথ প্রদর্শন করেন।"

হযরত আবূ উবায়দাহ্ ইব্‌নে যাররাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা বাহ্‌রাইন রাজ্য হইতে বহু ধন মদীনা শরীফে রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ফজরের নামাযে আন্‌সারগণ অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হইলেন। নামাযান্তে তাঁহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইলে মৃদুহাস্যে তিনি বলিলেন- "তোমরা বোধ হয় ধন আগমনের কথা শুনিয়াছ?" তাঁহারা বলিলেন- "হাঁ।" তৎপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনা ঘটিবে, যাহাতে তোমরা আনন্দিত হইবে; (অর্থাৎ ধন বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু ইহা স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে)। তোমাদের দরিদ্রতা দর্শনে আমার ভয় হয় না। কিন্তু এই বিষয়ে আমি ভয় পাইতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সংসারে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করেন, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতিকে তিনি ধন-সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন, আর তোমরা এই ধন-সম্পদ লইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাও, যেমন তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন- "কোন প্রকারেই দুনিয়ার চিন্তায় লিপ্ত হইও না।" প্রিয় পাঠক, সতর্ক হও, যে দুনিয়া সম্বন্ধে চিন্তা

করিতে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, ইহাকে ভালবাসা ও ইহার অর্জনে তৎপর হওয়া কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের একটি উটনী ছিল, ইহার নাম ছিল 'আযবা'। ইহা সর্বপেক্ষা দ্রুতগামী ছিল। একদা পল্লীবাসী এক ব্যক্তি একটি উট আনিল এবং 'আযবা'র সহিত ইহার দৌড় করানো হইল। ইহাতে ঐ (ব্যক্তির) উট জয়ী হইল। মুসলমান ইহা দেখিয়া দুঃখিত হইলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "আল্লাহ্ দুনিয়াতে এমন কিছুকেই সম্মানিত করেন না যাহাকে তিনি (পরকালে) অপমানিত করিবেন না।" (এই হাদীসের মর্ম এই- আল্লাহ্ যাহাদিগকে দুনিয়াতে সম্মানিত করেন তাহাদের সকলকেই আখিরাতে তিনি অপমানিত করিবেন, তাহা নহে, বরং বেঈমানকে দুনিয়াতে সম্মানিত করিলে আখিরাতে তিনি তাহাকে অপমানিত করিবেন)।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "তৎপর দুনিয়া তোমাদের উপর প্রসন্ন হইবে, কিন্তু ইহা তোমাদের ধর্ম এইরূপে খাইয়া ফেলিবে, যেমন আগুন শুষ্ক কাষ্ঠ ভস্ম করিয়া ফেলে।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন- "দুনিয়াকে খোদা বানাইও না। তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে গোলামে পরিণত করিবে। ধন এইভাবে রাখিবে যেন, অপচয়ের আশঙ্কা না থাকে এবং এমন লোকের নিকট ইহা গচ্ছিত রাখিবে, যে ইহা নষ্ট না করে। কারণ, পার্থিব ধন আপদশূণ্য নহে। কিন্তু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রক্ষিত ধন নিরাপদে থাকিবে।" তিনি আরও বলেন- "দুনিয়া ও আখিরাত পরস্পর বিপরীত; ইহাদের একটিকে তুমি যে পরিমাণে সন্তুষ্ট করিবে অপরটি সেই পরিমাণে অসন্তুষ্ট হইবে।"

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাঁহার সহচরদিগকে বলেন- "তোমাদের সম্মুখে আমি দুনিয়াকে মৃত্তিকার সঙ্গে মিশাইয়া দিলাম, তোমরা আবার গ্রহণ করিও না। কারণ, ইহার এক অপবিত্রতা এই, ইহাতে আল্লাহ্‌র নাফরমানি হইয়া থাকে এবং অপর অপবিত্রতা এই, ইহা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আখিরাতে (বেহেশ্‌তে) পৌঁছিতে পারিবে না। অতএব তোমরা লোকালয়ে থাকিও না, দুনিয়ার আবাদী স্থান হইতে বাহিরে চলিয়া যাও। তোমরা ইহাও জানিয়া রাখ যে, অধিক সংসারাসক্তি এবং লোভ সমস্ত পাপের অগ্রগামী সরদার ও ইহারই ফল অসীম দুঃখ।" তিনি আরও বলেন- "আগুন ও পানি যেমন একত্র থাকিতে পারে না, সেইরূপ দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতি ভালবাসা একই হৃদয়ে একত্র হইতে পারে না, লোকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- "আপনি বাসগৃহ নির্মাণ করেন না কেন?" তিনি বলিলেন- "অন্যের পুরাতন ঘরই আমার জন্য যথেষ্ট।"

একদা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি, বিদ্যুৎ-বজ্রপাতে নিপতিত হইয়া আশ্রয়স্থলের অন্বেষণে এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করিতেছিলেন, এমন সময় অনতিদূরে একটি তাঁবু দেখিয়া তথায় গমন করিলেন। কিন্তু ইহাতে এক রমণীকে দেখিতে পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তৎপর এক পর্বতগুহার দিকে তিনি অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তথায় এক ব্যাঘ্র দেখিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং নিবেদন করিলেন- "হে খোদা, তোমার সৃষ্ট সকল প্রাণীর জন্য আশ্রয়স্থল রহিয়াছে। কিন্তু আমার জন্য কোন স্থান রাখ নাই।" তৎক্ষণাত ওহী অবতীর্ণ হইল- "আমার রহমতের গৃহ (অর্থাৎ বেহেশ্‌ত) তোমার আশ্রয়স্থল। বেহেশ্‌তে একশত হুরের সঙ্গে তোমার বিবাহ করাইয়া দিব; তাহাদিগকে আমি আমার পবিত্র হস্তে সৃষ্টি করিয়াছি। তোমার বিবাহ উৎসব চারি হাজার বৎসর পর্যন্ত থাকিবে। ইহার প্রত্যেকটি দিন দুনিয়ার কয়েক জীবনকালের সমান হইবে। ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করিতে আদেশ করিব- 'হে পরহেযগার সংসার বিরাগীগণ, সকলে ঈসার (আ) বিবাহ-উৎসবে যোগদান কর। তাহারাও সকলেই উপস্থিত হইবে।"

একদা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম স্বীয় সাথিগণসহ এক শহর দিয়া যাইতেছিলেন। সেই স্থানের সমস্ত লোককে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন- "হে বন্ধুগণ, এই সমস্ত লোক আল্লাহ্‌র গযবে প্রাণ হারাইয়াছে, অন্যথা তাহারা কবরস্থ থাকিত।" তাঁহার সঙ্গিগণ বলিলেন- "কি কারণে তাহার প্রাণ হারাইল আমরা জানিতে চাই।" রাত্রিকালে ঈসা আলায়হিস্ সালাম এক উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া বলিলেন- "হে শহরবাসীগণ।" মৃতগণের একজন উত্তর দিল لَبَّيْكَ يَا رُوْحَ اللهِ। অর্থাৎ "হে রূহাল্লাহ্ (হযরত ঈসা আ), আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "তোমাদের এরূপ অবস্থা কেন?" সেই ব্যক্তি বলিল- "এক রাত্রে আমরা সুখে-শান্তিতে ছিলাম। প্রত্যূষে দেখিলাম, আমরা দোযখে আছি।" হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন- "ইহার কারণ কি?" সে নিবেদন করিল- "কারণ আমরা দুনিয়াকে ভালবাসিতাম এবং পাপীদের অনুগত থাকিতাম।" হযরত বলিলেন- "কি প্রকারে তোমরা দুনিয়াকে ভালবাসিতে?" সে বলিল- "শিশু যেমন স্বীয় জননীকে ভালবাসে (আমরা সেইরূপ দুনিয়াকে ভালবাসিতাম।) দুনিয়া লাভ করিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম, আবার হারাইলে দুঃখিত হইতাম।" হযরত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- "(তুমি ছাড়া) অপর কেহ উত্তর দেয় নাই কেন?" সে বলিল- "তাহাদের প্রত্যেকের মুখেই আগুনের লাগাম রহিয়াছে।" হযরত বলিলেন- "তাহা হইলে তুমি কিরূপে উত্তর দিতেছ?" সে নিবেদন করিল- "আমি তাহাদের সহিত থাকিতাম কিন্তু

তাহাদের কাজে যোগদান করিতাম না। শাস্তি অবতীর্ণ হইলে থাকিতাম কিন্তু তাহাদের কাজে যোগদানস করিতাম না। শাস্তি অবতীর্ণ হইলে আমিও ইহাতে পতিত হইলাম এবং আমি এখন দোযখের এক পার্শ্বে আছি। মুক্তি পাইব, না দোযখে নিক্ষিপ্ত হইব, বলিতে পারি না।" তৎপর ঈসা আলায়হিস্ সালাম স্বীয় সহচরগণকে বলিলেন- "হে ভ্রাতৃগণ, দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে যদি খারী লবণের সঙ্গে যবের রুটি ভক্ষণ করিতে হয়, চট পরিধান করিতে হয় এবং অশ্বাদি বাহনের পৃষ্ঠে রাত্রি যাপন করিতে হয়, তবুও উহা উত্তম।"

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন- "অন্যান্য লোকজন যেমন দুনিয়ার সুখ পাইলে আখিরাতের সামান্য অংশ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তোমরা আখিরাতের সুখের সহিত দুনিয়ার সামান্য অংশ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাক।" তিনি আরও বলেন- "নীচ প্রকৃতির লোকে পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়া অর্জন করে; কিন্তু দুনিয়া অর্জনে বিরত হইলেই ততোধিক পূণ্য হইত।" একদা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম তাঁহার সিংহাসনে আরোহণপূর্বক ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার খেদমতের জন্য মানুষ, জিন, নরনারী সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছিল। বনী ইসরাঈল বংশীয় 'ওব্বাদ' নামক এক আবিদের নিকট দিয়া যাইবার কালে তিনি হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে বলিলেন- "হে দাউদ-তনয়, আল্লাহ্ আপনাকে বিশাল রাজত্ব প্রদান করিয়াছেন।" হযরত (আ) বলিলেন- "মুসলমানের আমলনামার একটি তাস্‌বীহ আমার এই রাজত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ তাস্‌বীহ চিরস্থায়ী থাকিবে, আর এই রাজত্ব বিলুপ্ত হইবে।"

হাদীস শরীফে উক্ত আছে- হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বেহেশ্‌তে গন্দম খাইলে তাঁহার বাহ্যের বেগ হইল। তিনি বাহ্যের স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। আল্লাহ্ তাঁহার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠাইলেন। ফেরেশতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "আপনি কি অন্বেষণ করিতেছেন?" তিনি বলিলেন- "আমার উদরে যাহা আছে তাহা ফেলিবার স্থান অন্বেষণ করিতেছি।" ফেরেশ্‌তা বলিলেন- "আল্লাহ্ গন্দম ব্যতীত বেহেশ্‌তের কোন বস্তু আহারে এইরূপ তাসীর (কার্যকারিতা) রাখেন নাই। আপনি ইহা কোথায় ফেলিবেন, আরশ বা কুরসির উপর অথবা নদীতে বা বৃক্ষতলে ইহা ফেলা যাইবে না; এইরূপ অপবিত্র পদার্থ ফেলিবার স্থান দুনিয়া ব্যতীত আর কোথাও নাই; আপনি তথায় গমন করুন।" হাদীস শরীফে উক্ত আছে, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "আপনার এত দীর্ঘ জীবনে দুনিয়াকে আপনি কিরপ পাইলেন?" তিনি বলিলেন- "দুনিয়া যেন একটি দুই দ্বারবিশিষ্ট গৃহ, ইহার এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর দ্বার দিয়া বাহির

হইয়া আসিলাম।" লোকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করিল- "আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষাদান করুন যাহাতে আমরা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হইতে পারি।" তিনি বলিলেন- "দুনিয়াকে শত্রু বলিয়া গণ্য কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে আল্লাহ্ ভালবাসিবেন।"

দুনিয়া সম্বন্ধে সাহাবা ও বুযুর্গগণের উক্তি—দুনিার জঘণ্যতা সম্বন্ধে ঐরূপ আরও বহু হাদীস রহিয়াছে। এখন সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্হুম ও বুযুর্গগণের কতিপয় উক্তি উল্লেখ করা হইতেছে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "যে ব্যক্তি এই কাজগুলি করিয়াছে, বেহেশ্ত অন্বেষণ ও দোযখ হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে" তাহার পক্ষে আর কিছুই করিবার নাই ঃ (১) আল্লাহ্র জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার আদেশ-নিষেধ ঠিকভাবে পালন করিয়াছ, (২) শয়তানকে চিনিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, (৩) সত্যকে চিনিয়া দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছে, (৪) অসত্যকে বুঝিয়া বর্জন করিয়াছে, (৫) দুনিয়াকে চিনিতে পারিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, (৬) আখিরাতকে চিনিয়া ইহার অন্বেষণে তৎপর রহিয়াছে।"

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন- "আল্লাহ্ তোমাকে যে পদার্থ দুনিয়াতে দান করিয়াছেন, তোমার পূর্বেও ইহা হয়ত তিনি অন্য কাহাকেও দিয়াছিলেন এবং তোমার পরে অপর কাহাকেও আবার দিবেন। এমতাবস্থায় ইহার প্রতি আসক্ত হইতেছ কেন? সকাল-সন্ধ্যায় দুই মুষ্ঠি অন্ন ব্যতীত সংসারে আর কোন পদার্থের অংশ তোমার অদৃষ্টে নাই। ইহার জন্য নিজকে ধ্বংস করিও না। সংসারে একেবারে রোযা রাখ, আর পরকালে যাইয়া ইফতার কর। কারণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা দুনিয়ার মূলধন এবং (হাভিয়া) নামক দোযখ ইহার মুনাফা।"

এক ব্যক্তি হযরত আবূ হাযেম রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে জিজ্ঞাসা করিল- "আমি দুনিয়ার প্রতি বড় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি; কি করিলে আমার মন হইতে এই আসক্তি বিদূরিত হইবে।" তিনি বলিলেন- "যাহা কিছু অর্জন কর, হালাল উপায়ে অর্জন কর এবং যথার্থ স্থানে ব্যয় কর। (তাহা হইলে) দুনিয়ার সহিত তোমার যতটুকু ভালবাসা থাকিবে ইহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না।" ইহার তাৎপর্য এই যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন ঐ নির্দেশানুসারে চলিলে দুনিয়া স্বয়ং তাহার প্রতি বিরাগভাজন হইয়া যাইবে এবং তাঁহার নিকট দুনিয়া মন্দ বলিয়া বোধ হইবে। হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে মুআয রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "সংসার শয়তানের দোকান। তাহার দোকান হইতে কিছুই লইও না, অন্যথা অন্যায়ভাবে তোমার পিছনে লাগিবে।"

হযরত ফুযায়ল (র) বলেন- "অস্থায়ী সংসার যদি স্বর্গের হইত আর চিরস্থায়ী পরকাল মাটির হইত, তবে চিরস্থায়ী মাটিকে অস্থায়ী স্বর্গ অপেক্ষা অধিক ভালবাসা বুদ্ধিমানের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভবপর যে, তোমরা চিরস্থায়ী স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অস্থায়ী মাটি অবলম্বন করিতেছ।" হযরত আবূ হাযেম (র) বলেন- "দুনিয়া বর্জন কর। আমি শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইবে তাহাকে হাশরের মাঠে দণ্ডায়মান করাইয়া তাহার মাথার উপর হইতে ঘোষণা করা হইবে, 'আল্লাহ্ যে পদার্থকে ঘৃণা করেন, এই ব্যক্তি সেই পদার্থকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানে ভালবাসিত।"

হযরত ইব্নে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "দুনিয়াবাসী অতিথিস্বরূপ এবং যাহা কিছু তাহার নিকট আছে উহা ধার দেওয়া বস্তু। অতিথির পরিণাম প্রস্থান এবং ধার দেওয়া বস্তুর পরিণতি ফিরাইয়া লওয়া।" মহাত্মা লুকমান হাকিম নিজ পুত্রকে উপদেশ দিলেন- " হে বৎস, আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া বিক্রয় কর; তবে উভয় জগত হইতেই উপকার পাইবে। আর দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত বিক্রয় করিও না; অন্যথা উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" হযরত আবূ উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- " আল্লাহ্ রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করিলে শয়তানের সৈন্য-সামন্ত তাহার নিকট গিয়া বলিল- ' এমন রাসূল আল্লাহ্ পাঠাইলেন, এখন আমরা কি করিব?' শয়তান তাহাদিগকে জিজ্ঞাস করিল- 'আচ্ছা বলত, মানুষ দুনিয়াকে ভালবাসে কি?" তাহারা বলিল- 'হাঁ।' শয়তান বলিল- 'উদ্বিগ্ন হইও না। তাহারা মূর্তিপূজা না করে, না করুক; সংসারাসক্তিতে আমি তাহাদিগকে এইরূপ করিব যে, তাহারা যাহা গ্রহণ করিবে, অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিবে; যাহা দিবে, অন্যায়ভাবে দিবে; যাহা সঞ্চয় করিবে, অন্যায়ভাবে সঞ্চয় করিবে; আর সকল পাপ এই ত্রিবিধ কার্যের অধীনে (স্বতঃই সংঘটিত হইবে)।"

হযরত ফুযায়ল (র) বলেন- "যদি আল্লাহ্ সমস্ত দুনিয়া আমার জন্য হালাল করিতেন এবং যচ্ছোক্রমে উপভোগের জন্য আমাকে দান করিতেন এবং আমার নিকট হইতে ইহার হিসাবও গ্রহণ না করিতেন, তবুও আমি দুনিয়াকে এরূপ ঘৃণা করিতাম যেমন তোমরা মৃত প্রাণীকে ঘৃণা করিয়া থাক। হযরত আবূ ওবায়দাহ ইব্ন যার্রাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হু সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু তথায় গমন করিয়া তাঁহার গৃহে একটি তরবারি, একখানি ঢাল এবং একটি রেহেল (কুরআন শরীফ উপরে রাখিয়া পড়ার জন্য কাষ্ঠাধার) ব্যতীত আর কোন বস্তুই দেখিতে পাইলেন না। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-

"প্রয়োজনীয় বস্তু আপনি গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই কেন?" হযরত আবূ ওবায়দাহ্ ইব্‌নে যার্‌রাহ (র) বলিলেন- "যেখানে যাইতেছি (অর্থাৎ কবরে) সেখানে উহাই যথেষ্ট।"

হযরত হাসান বসরী (র) একবার হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীযের (র) নিকট এক সংক্ষিপ্ত পত্রে ইহা ব্যতীত আর কিছুই লিখিলেন না- "যাহার মৃত্যু সর্বশেষে হইবে তাহার মৃত্যুর সময় সমাগত মনে কর।" (অর্থাৎ তখন পার্থিব কোন জিনিসের আবশ্যকতা থাকিবে না)। তিনি উত্তরে লিখিলেন- "যে কালে দুনিয়া সৃজন করা হয় নাই, সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিল, আমার সম্বন্ধে সেই কালই আছে; আপনি এউরূপ মনে করুন।" (অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোন জিনিস সৃজন করা হয় নাই যাহা আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে।) একজন বুযুর্গ বলেন- "যে ব্যক্তি মৃত্যুকে সত্য জানে তাহার আনন্দ প্রকাশ আশ্চর্যের বিষয়। যে ব্যক্তি দোযখকে সত্য জানে তাহার হাস্য বিস্ময়ের ব্যাপার। যে ব্যক্তি নিজেই দেখিতেছে যে, দুনিয়া কাহারও নিকট স্থায়ী হয় না, তাহার পক্ষে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া আশ্চর্যের কথা। যে ব্যক্তি তাক্‌দীরকে সত্য জানে, তাহার পক্ষে জীবিকা অর্জনে নিবিষ্ট হওয়া আশ্চর্যের বিষয়।"

হযরত দাঊদ তায়ী (র) বলেন- "তওবা ও ইবাদত কার্যে তোমরা ক্রমশ শৈথিল্য করিয়া আসিতেছ আর সত্যবাদিতাকে তোমরা অকর্মণ্য করিয়া দিতেছ' তদ্দরুন তোমরা উহার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইতেছ এবং অপরে উহা দ্বারা লাভবান হইতেছে।" হযরত আবূ হাযেম (র) বলেন- "এরূপ কোন বস্তু সংসারে নাই যাহার জন্য তুমি আনন্দিত হইতে পার। অবিমিশ্র আনন্দ ত আল্লাহ্ সংসারে সৃষ্টিই করেন নাই।" হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেন- মৃত্যুর সময়ে সংসার হইতে প্রস্থানের কালে তিনটি আক্ষেপ প্রত্যেকের গলা চাপিয়া ধরিবে; যথা ঃ (১) যাহা সে সঞ্চয় করিয়াছে তাহা কখনও সে তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতে পারে নাই; (২) যত আশা ছিল তাহা পূর্ণ হইল না; (৩) পরলোক পথের পাথেয় যথাযোগ্যরূপে সঞ্চয় করা হইল না।"

হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মুনকাদির (র) বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি আজীবন প্রত্যেক দিন রোযা রাখে, সারা রাত্রি নামায পড়ে, হজ্জ ও জিহাদ করে এবং সকল হারাম বিষয় হইতে নিরস্ত থাকে, তথাপি দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইলে কিয়ামতের দিন তাহার সম্বন্ধে বলা হইবে- 'আল্লাহ্ যে বস্তুকে ঘৃণিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ব্যক্তি সেই বস্তুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভালবাসিয়াছিল।' বল ত তখন এইরূপ ধার্মিক তপস্বীর অবস্থা কেমন হইবে? এখন ভাবিয়া দেখ আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে দুনিয়াকে ভালবাসে না এবং তদুপরি অগণিত পাপ, এমন কি

ফরয কার্যে পর্যন্ত ত্রুটি করিতেছে না? তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে?" বুযুর্গগণ বলিয়াছেন- "দুনিয়া একটি বিধ্বস্ত পান্থশালাস্বরূপ এবং যে দুনিয়া অন্বেষণে নিবিষ্ট, তাহার হৃদয় তদপেক্ষা বিধ্বস্ত। আর বেহেশ্‌ত একটি সুশোভিত ও সমৃদ্ধ আবাসস্থল এবং যে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত অন্বেষণে নিবিষ্ট তাহার হৃদয় তদপেক্ষা সুশোভিত ও সমৃদ্ধ।"

হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "তুমি স্বপ্নাবস্থায় রৌপ্য মুদ্রা পাইতে ভালবাস, না জাগ্রতাবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা পাইতে ভালবাস?" সেই ব্যক্তি বলিল- "জাগ্রতাবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা পাইতে ভালবাসি।" তিনি বলিলেন- "তুমি মিথ্যা বলিতেছ; কারণ সংসার স্বপ্ন এবং আখিরাত জাগ্রতাবস্থা, আর সংসার অর্জনেই তুমি অধিক লালায়িত।" হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মুআয (র) বলেন- "যে ব্যক্তি দুনিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই সে নিজেই দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে, কবরে গমনের পূর্বেই সে কবরকে সমৃদ্ধ করিয়া লইতে পারে এবং আল্লাহ্‌র দীদার লাভের পূর্বেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া লইতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বুদ্ধিমান।" তিনি আরও বলেন- "দুনিয়া এত অশুভ যে, ইহার শুধু কামনাই মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে ভুলাইয়া রাখে। এমতাবস্থায়, দুনিয়া লাভ করিলে যে কি ভীষণ দুর্গতি ঘটে, তাহা কি বলিব।" হযরত বকর ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (র) বলেন- "যে ব্যক্তি পার্থিব সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করত নিজেকে অবকাশ দিবার কামনা করে, সে এমন ব্যক্তি সদৃশ যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে পরিতৃপ্ত করিয়া নির্বাপিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে শুষ্ক কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করিতে থাকে।

হযরত আলী কাররামাল্লাহ্ অজহাহু বলেন- "ছয়টি বস্তুই দুনিয়া; যথা ঃ (১) ভোজন, (২) পান, (৩) পোশাক, (৪) আঘ্রাণ, (৫) যানবাহন এবং (৬) বিবাহ। আহার্য বস্তুর মধ্যে মধু উৎকৃষ্ট, সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী ইহা সমানভাবে রহিয়াছে। পোশাকের মধ্যে রেশমী বস্তু উৎকৃষ্ট, ইহা রেশম পোকার মুখ নিঃসৃত লালা হইতে জন্মে। আঘ্রাণের বস্তুর মধ্যে কস্তুরী উৎকৃষ্ট, ইহা হরিণের রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। যানবাহনের মধ্যে ঘোড়া সর্বশ্রেষ্ঠ, মানুষ ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করে। কামনার বস্তুসমূহের মধ্যে কামিনী সর্বশ্রেষ্ঠ, কামিনী-সম্ভোগ ইহার শেষ পরিণতি। যাহা নারীকে বিভূষিত করে (অর্থাৎ সদগুণরাজি) উহাই তাহার মধ্যে উত্তম; কিন্তু তাহার মধ্যে যাহা জঘণ্যতম (অর্থাৎ কামবাসনা চরিতার্থ করিবার উপকরণ) তোমরা অন্বেষণ করিয়া থাক।"

হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র) বলেন- "হে মুসলমানগণ, আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা অবিশ্বাস করিলে তোমরা কাফির হইবে; আবার বিশ্বাস করিয়া ইহাকে অতি সহজ মনে করিলে তোমাদের

নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইবে। স্মরণ রাখ, আল্লাহ্ তোমাদিগকে চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু পার্থক্য এতটুকু যে, তোমাদিগকে তিনি এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে লইয়া যাইবেন।"

দুনিয়ার জঘণ্যতার প্রকৃত পরিচয়- দুনিয়ার জঘণ্যতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ভূমিকায় (অর্থাৎ দর্শন খণ্ডে) বলা হইয়াছে। এখন দুইখানা হাদীসের প্রকৃত মর্ম অবগত হওয়া উচিত। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "দুনিয়া ও যাহা কিছু দুনিয়াতে আছে তৎসমুদয়ই অভিশপ্ত; কিন্তু তন্মধ্যে যাহা আল্লাহ্‌র জন্য আছে (তাহা উৎকৃষ্ট)।" সুতরাং কোনগুলি আল্লাহ্‌র জন্য ও অভিশপ্ত নহে এবং তৎসমুদয় ব্যতীত কোনগুলি অভিশপ্ত যাহাদের ভালবাসা সমস্ত পাপের অগ্রগামী সরদার, উহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

পার্থিব পদার্থের প্রকারভেদ—পার্থিব বস্তু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী—এই শ্রেণীর বস্তুর ভিতর-বাহির সর্বতোভাবে দুনিয়া। উহা কখনও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হইতে পারে না। কারণ, উহার সমস্তই পাপ, আর পাপ সৎ উদ্দেশ্যে করিলেও পাপই থাকে। আমোদ-প্রমোদকে নির্দোষ বলিয়া মনে করিলেও উহা অভিশপ্ত দুনিয়ারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আমোদ-প্রমোদ হইতে অহঙ্কার ও গাফলত (উদাসীনতা, প্রমোদ, মোহ) জন্মে এবং অহঙ্কার ও গাফলত সমস্ত পাপের আকর।

দ্বিতীয় শ্রেণী—বাহ্য দৃশ্যে এই শ্রেণীর কাজগুলিকে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নিয়তের দোষে উহা দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ইহাও আবার তিনি ভাগে বিভক্ত, যথা ঃ (১) যিকির বা ধ্যান, (২) আল্লাহ্‌র যিকির এবং (৩) প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ। এই সমস্ত কাজ আখিরাত এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার জন্য হইয়া থাকিলেও নিয়তের দোষে দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে; যেমন মনে কর, যিকির যদি জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে হয় এবং জ্ঞান যদি ধন, প্রভুত্ব ও মান-মর্যাদা লাভ করিয়া লোকজনের ভক্তি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে; যিকিরের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, মানুষ তাহাকে সাধু লোক বলিযা সম্মান প্রদর্শন করিবে; প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, লোকে তাহাকে পরহেযগার, সংসারবিরাগী, সাধু পুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করিবে, তবে এই ত্রিবিধ কাজই দুনিয়ার অন্তর্গত হইয়া ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হইবে। কিন্তু তখনও এই কাজগুলি আকারে প্রকারে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বলিয়াই মনে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর কার্যসমূহকে বাহ্য আকৃতি-প্রকৃতিতে মানবের দৈহিক দাবি-দাওয়া মিটানোর উদ্দেশ্যে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাধু সঙ্কল্পের দরুন উহাও আল্লাহ্‌র জন্য হইয়া যাইতে পারে, তখন উহাকে আর দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

যেমন মনে কর, ইবাদতে শক্তি লাভের নিমিত্ত যদি পানাহার করা হয়, সন্তান-সন্ততি হইলে মানবজাতি রক্ষা পাইবে এবং আল্লাহ্‌র দীন জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবে, এই উদ্দেশ্যে যদি বিবাহ করা হয় এবং ইবাদতকার্যে অবকাশ লাভের আশায় ও অন্যের গলগ্রহ না হওয়ার জন্য যদি পরিমিত ধনার্জন করা হয়, তবে উহাকে যথার্থই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হইয়াছে বলা হইবে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও বাহাদুরির উদ্দেশ্যে ধনার্জন করে সে আল্লাহ্‌কে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ দেখিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের গলগ্রহ না হওয়ার জন্য ধনার্জন করে, কিয়ামত-দিবস তাহার মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে।"

অতএব যে কার্য মানবের দৈহিক দাবি দাওয়া চরিতার্থের জন্য করা হয় এবং যাহাতে পরলোকের কোনই আবশ্যকতাই নাই, উহাই দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যে কার্য দেহের জন্য করা হয়, অথচ পরকালের কার্যের মধ্যেও উহার আবশ্যকতা আছে, তেমন কার্য যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে, তবে উহা দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; যেমন, হজ্জে গমনের বাহন- পশুর খাদ্যকেও হাজীর পথখরচের মধ্যে গণ্য করা হয়।

দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত বস্তুসমূহকে 'হাওয়া' নামে অভিহিত করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى - فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

"এবং (যে-ব্যক্তি) আত্মাকে 'হাওয়া' (কুপ্রবৃত্তি) হইতে দমিত রাখিয়াছে অবশ্যই বেহেশ্‌ত তাহার বাসস্থান" (সূরা নাযিয়াত, রুকূ ২, পারা ৩০)।

অন্যত্র আল্লাহ্ দুনিয়াকে পাঁচ প্রকার পদার্থে বিভক্ত করিয়া বলেন ঃ

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ -

অর্থাৎ "অবশ্যই দুনিয়ার জেন্দেগানী ইহাই; যথা ঃ খেলাধুলা-কৌতুকানন্দ ও কাম্য বস্তুর সুখাস্বাদ এবং সৌষ্ঠব বর্ধন এবং নিজেদের মধ্যে অহঙ্কার ও বাহাদুরি প্রদর্শন এবং ধন ও জনের বৃদ্ধি কামনা।" (সূরা হাদীদ, রুকূ ৩, পারা ২৭) আল্লাহ্ আর একটি আয়াতে পাঁচটি দ্রব্য একত্র করিয়া বলেন ঃ

زُيِّنَ لِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ - ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

অর্থাৎ "লোকের জন্য নারীদের সহিত কামপ্রবৃত্তির ভালবাসা, সন্তানের ভালবাসা, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ-রৌপ্য ভান্ডারের ভালবাসা এবং চিহ্নিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্যক্ষেত্রের ভালবাসা শোভন করা হইয়াছে; এই সকলই পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক বস্তু" (সূরা আল ইমরান, রুকূ ২, পারা ৩)।

উল্লিখিত বস্তুসমূহের মধ্যে যাহা পরকালের কার্যে আবশ্যক উহাকে পরকালের মধ্যেই গণ্য করা হয়। কিন্তু এইজন্য মানবের জীবন ধারণের নিমিত্ত যতটুকু আরাম ও আনন্দের নিতান্ত আবশ্যক উহা অপেক্ষা অধিক আরাম ও আনন্দকে কখনও পরকালের মধ্যে ধরা যাইতে পারে না।

পার্থিব বস্তু অর্জনের পর্যায়—পার্থিব বস্তু অর্জনের তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়- জীবন ধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করা। দ্বিতীয় পর্যায়- সৌষ্ঠব বর্ধনের জন্য প্রথম পর্যায় অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্জন করা। তৃতীয় পর্যায়- অতিরিক্ত সৌষ্ঠব বর্ধন, অহঙ্কার ও বাহাদুরির উদ্দেশ্যে অর্জন করা। ইহার কোন সীমা নাই; যত বাড়াইবে ততই বাড়িয়া চলিবে।

জীবনধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বেহেশ্তী। আর যে অতিরিক্ত সৌষ্ঠব বর্ধন, অহঙ্কার ও বাহাদুরিতে লিপ্ত সে-ই দোযখে নিপতিত হইয়াছে। আত্মগর্ব ও বাহাদুরিরও কোন সীমা নাই। প্রথম (অভাব মোচন) ও তৃতীয় (বাহাদুরি প্রদর্শন) পর্যায়ের দুইটি প্রান্ত আছে; একটি প্রান্ত অভাবের সন্নিকট ও অপরটি বাহাদুরির নিকটবর্তী। এই দুইটি প্রান্তের মধ্যস্থলে আবশ্যকতারও দুইটি ধাপ আছে এবং গভীরভাবে চিন্তা করিলেই মানুষ ইহা বুঝিতে পারে। আবশ্যকতার কোন পরিসীমা নাই। আবশ্যকতা মিটাইতে গেলেই ক্রমে ক্রমে আবশ্যকতার মাত্রা বাড়িয়া উঠে এবং যাহা নিষ্প্রয়োজন তাহাও আবশ্যকতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপেই মানুষ পরকালে হিসাব প্রদানের আশঙ্কায় নিপতিত হয়, এই জন্যই দরবেশ ও পরহেযগার ব্যক্তিগণ শুধু নিতান্ত অভাব মোচন করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকেন।

আদর্শরূপে হযরত উওয়াইস করনী (রা)—হযরত উওয়াইস্ করনী রাযিয়াল্লাহু আন্হু অল্পে তুষ্টি বিষয়ে জগতের অগ্রণী নেতা ও চিরজীবন্ত আদর্শ। দুনিয়াকে তিনি তাঁহার জন্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে উন্মাদ বলিত। তাঁহার জীবনে কখন কখন এমন হইত যে, পাড়া-প্রতিবেশিগণ ক্রমাগত দুই-এক বৎসর তাঁহার দেখা পাইত না এবং তিনি কোথায় থাকিতেন, ইহাও তাহারা জানিত না। ফজরের নামাযের আযানের সময় তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, আর ইশার নামাযান্তে গৃহে ফিরিতেন। রাস্তা হইতে খোরমার বীচি আহরণ করিয়া

তিনি আহার করিতেন। কোন দিন আহারের পরিমিত খোরমা সংগ্রহ করিতে পারিলে উহার বীচি গরীব-দুঃখীদিগকে দান করিয়া দিতেন। কোন দিন আবার খোরমার বীচি খরিদ করত উহা দ্বারা ইফতার করিতেন। নেক্ড়া ও ছিন্নবস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া ধৌত করত পরিধানের বস্ত্র সেলাই করিয়া লইতেন। পাগল মনে করিয়া ছোট ছোট বালকেরা তাঁহাকে পাথর ছুড়িয়া মারিত। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন- "হে বালকগণ, ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ কর যেন রক্তপাত হইয়া ওযু নষ্ট না হয়, অন্যথা আমার নামাযের ব্যাঘাত ঘটিবে।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত তাঁহার কখনও সাক্ষাত ঘটে নাই। কিন্তু হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে নিজের পোশাক প্রদানের জন্য হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে ওফাতের সময় নির্দেশ দিয়া যান।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু একদা মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশকালে ইরাকের কতক লোককে সমবেত দেখিয়া তাহাদিগকে দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহারা দন্ডায়মান হইলে তিনি বলিলেন- "কুফার অধিবাসিগণ উপবেশন কর।" তাহারা বসিয়া পড়িল। তৎপর তিনি আবার বলিলেন- "করনের অধিবাসী ব্যতীত আর সকলেই বস।" সকলেই বসিয়া পড়িল। মাত্র এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিল। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "তুমি কি করনের অধিবাসী?" সেই ব্যক্তি বলিল- "হাঁ।" তিনি তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- "তুমি কি উওয়াইস করনীকে চিন?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "হাঁ, তাহাকে চিনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে সে এত নির্বোধ, উন্মাদ ও দীনহীন যে, আপনার পক্ষে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করা শোভা পায় না" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাহার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন- 'আমি রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, রবীয়া ও মুযের সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার সমসংখ্যক লোক তাঁহার সুপারিশে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে, এইজন্য আমি তাঁহার অন্বেষণ করিতেছি।" আরব দেশে এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অত্যধিক ছিল, তজ্জন্য অগণিত বুঝাইতে হইলে তথায় ঐরূপ তুলনার রীতি প্রচলিত ছিল।"

হযরত হরম ইব্ন হায়্যান বলেন- "আমি হযরত উওয়াইস করনী (রা) সম্বন্ধে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর মুখে ঐরূপ প্রশংসা শুনিয়া কুফায় গমন করিলাম এবং তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম তিনি ফোরাত নদীতে ওযু ও বস্ত্র ধৌত করিতেছেন। যেরূপ নিদর্শনাবলী পূর্বে শুনিয়াছিলাম

তদনুসারে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সালাম বলিলাম। সালামের উত্তর দিয়া তিনি আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মুসাফাহার উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিতে চাহিলাম।

কিন্তু তিনি হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন। আমি বলিলাম رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا اُوَيْسُ وَغَفَرَلَكَ অর্থাৎ "হে উওয়াইস, আল্লাহ্ আপনাকে দয়া ও ক্ষমা করুন। আপনি কেমন আছেন?" তাঁহার দীনাবস্থা দর্শনে তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ ও দয়াবশত আমি অধৈর্য হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন ঃ حَيَّاكَ اللّٰهُ يَاهَرَمَ بْنَ حَيَّانَ অর্থাৎ "হে প্রিয় ভ্রাত, হরম ইব্ন হায়্যান, আল্লাহ্ তোমাকে জীবন দান করুন; তুমি কেমন আছ? কে তোমাকে আমার ঠিকানা ও পরিচয় বলিয়া দিল?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- "আমার ও আমার পিতার নাম আপনি কিরূপে জানিলেন? কখনও ত আমাকে আপনি দেখেন নাই।" তিনি উত্তর দিলেন- نَبَّأَنِى الْعَلِمُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ "যাঁহার জ্ঞানের অগোচরে কিছুই নাই, তিনি আমাকে জানাইয়াছেন।' আর তোমার আত্মাকে আমার আত্মা চিনিয়াছে। কারণ, মুসলমানগণের পরস্পরের আত্মায় বন্ধুত্ব রহিয়াছে যদিও একজনের সহিত অপরজনের সাক্ষাত না ঘটে।"

আমি নিবেদন করিলাম- 'রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন বাণী আমাকে শুনাইয়া দিন, যেন ইহা আমার নিকট স্মারক হইয়া থাকে।' উত্তরে তিনি বলিলেন- "আমার দেহ ও প্রাণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য উৎসর্গ হউক। আমি তাঁহার দর্শন লাভ করি নাই, তাঁহার হাদীস অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। আমি রাবী (হাদীস-বর্ণনাকারী) মুহাদ্দিস (হাদীস-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ), মুফ্তী (ধর্ম-ব্যবস্থা দাতা) এবং উপদেষ্টা হইতে চাই না। এরূপ গুরুতর কাজে আমি নিবিষ্ট আছি যে, অপর কোন কাজে মনোনিবেশ করার অবকাশ আমার নাই।' আবার আমি নিবেদন করিলাম- 'কুরআন শরীফের কোন আয়াত পাঠ করুন। আপনার মুখ হইতে কিছু শ্রবণ করিবার আমার প্রবল বাসনা রহিয়াছে; আমার মঙ্গলের জন্য দোআ করুন এবং আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন, আল্লাহ্র জন্য আপনাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি।' ফোরাত নদীর তীরেই তখন তিনি আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ। অর্থাৎ "বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি" এবং ইহা বলিয়াই তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তৎপর তিনি বলিলেন- 'আমার প্রভুর কথা সত্য। খাঁটি সত্য। তিনি বলেন-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ـ مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থাৎ "এবং আস্মান ও যমীন এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে (উহা) আমি খেল্-তামাশার জন্য সৃষ্টি করি নাই। সত্য ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য আমি (তৎসমুদয়) সৃষ্টি করি নাই। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক (উহা) বুঝে না....'নিশ্চয় তিনি প্রবল, দয়ালু" (সূরা দুখান, রুকু ২, পারা ২৫)। এই পর্যন্ত আবৃত্তি করত তিনি এমন চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, আমার মনে হইল, তিনি বেহুশ হইয়া পড়িয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পর তিনি বলিলেন- 'হে হায়্যান তনয়, তোমার পিতা পরলোক গমন করিয়াছে, অনতিবিলম্বে তুমিও পরলোকগমন করিবে, বেহেশত বা দোযখে যাইতে হইবে। তোমার দাদা হযরত আদম আলায়হিস সালাম পরলোকগমন করিয়াছেন। হযরত হাওয়া আলায়হাস্ সালাম মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম প্রস্থান করিয়াছেন; হযরত মূসা কালীমুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম পরলোকগমন করিয়াছেন। হযরত দাঊদ খলীফাতুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম প্রস্থান করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করিয়াছেন, তাঁহার খলীফা আবূ বকর রাযিয়াল্লাহ্ আন্হুও প্রস্থান করিয়াছেন, আর আমার প্রিয় ভাই এবং বন্ধু ওমর রাযিয়াল্লাহ্ আনহুও চলিয়া গেলেন; হায় ওমর! হায় ওমর!"

আমি বলিলাম- 'হে উওয়াইস, আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া বর্ষণ করুন, হযরত ওমর ত পরলোকগমন করেন নাই।' তিনি বলিলেন- 'আমার আল্লাহ্ আমাকে খবর দিলেন যে, ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু পরলোকগমন করিয়াছেন।' তৎপর তিনি বলিলেন- 'আমি এবং তুমি মৃতদের অন্তর্গত।' তখন তিনি রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিলেন এবং সামান্য দোয়া করিলেন। তৎপর তিনি আবার বলিলেন- 'উপদেশ চাহিলে শোন, আল্লাহ্র কিতাব ও সৎলোকদের পথ অবলম্বন করিয়া চলিও। মৃত্যুর স্মরণ হইতে এক মুহূর্তও গাফিল থাকিও না। স্বীয় কওমের নিকট যখন প্রত্যাগমন করিবে, তখন তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিও। মানবজাতিকে উপদেশ দানে নিরস্ত থাকিবে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুকূলে থাকিও। ইহার বাহিরে একপদও সরিয়া যাইও না। অন্যথা ধর্মহীন লোকদের ন্যায় দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।' তিনি আবার বলিলেন- 'হে ইব্ন হায়্যান, তুমিও আমাকে আর দেখিবে না, আমিও তোমাকে আর দেখিতে পাইব না। প্রার্থনা যোগে তুমি আমাকে স্মরণ করিও এবং তোমার কথা স্মরণ হইলে আমিও তোমার জন্য

দোয়া করিব। তুমি এখন এইদিকে গমন কর; আমি ঐদিকে গমন করি।' বাসনা ছিল, আরও কিছুকাল তাঁহার সঙ্গ করি, তাহা তিনি দিলেন না, বরং তিনি নিজেও কাঁদিলেন এবং আমাকেও কাঁদাইলেন। তাঁহার পশ্চাতে আমি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলাম; তিনি এক সঙ্কীর্ণ পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ইহার পর তাঁহার আর কোন সংবাদ পাই নাই।"

পথের সন্ধান—দৃঢ় বিশ্বাস কর, যাঁহারা দুনিয়ার আপদসমূহ সম্যকরূপে চিনিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন ধারণ প্রণালী ও স্বভাব-চরিত্র হযরত উওয়াইস করনী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর ন্যায় ঐরূপই হইয়া থাকে। উহাই আম্বিয়া (আ) ও ওলিগণের (র) অবলম্বিত পথ। এই পথে যাঁহারা অনুগমন করেন বাস্তবপক্ষে তাঁহারাই দরবেশ, পরহেযগার ও পরিণামদর্শী। তুমি এই উন্নত সোপানে উপনীত হইতে না পারিলে ন্যূনকল্পে নিতান্ত আবশ্যক অভাব পূর্ণ করিয়াই বিরত হও। আমোদ-প্রমোদ এবং বিলাসিতার পথ কখনও অবলম্বন করিও না; অন্যথা পরকালে কঠোরতম বিপদে নিপতিত হইবে।

দুনিয়ার অবস্থা বর্ণনা এতটুকুই যথেষ্ট মনে করি। এতদ্ব্যতীত অত্র গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মালের মহব্বত, ধনাসক্তির প্রতিকার ও কৃপণতার বিপদসমূহ

ধনাসক্তি, কৃপণতা এবং দানশীলতা

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, দুনিয়া বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। ইহার এক শাখা ধন-সম্পদ এবং অপর শাখা সম্মান ও প্রভুত্ব। ইহা ছাড়া দুনিয়ার আরও বহু শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ধনাসক্তি যত অনিষ্টকর এইরূপ অনিষ্টকর আর কোনটিই নহে। মহাপ্রভু আল্লাহ্ ইহাকে 'আকাবা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন তিনি বলেন– فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا الخ "পরে সে গিরিসংকট অতিক্রম করিল না এবং তুমি কি জান যে, গিরিসংকট কি? (তাহা হইল) কোন গোলাম আযাদ করা বা ক্ষুধাময় দিনে পিতৃহীন আত্মীয়কে কিংবা যে দরিদ্র মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহাকে খাদ্য দান করা" (সূরা বালাদ, ১ রুকূ, ৩০ পারা)। ধনাসক্তি ছিন্ন করত পর দুঃখ মোচনে অর্থ ব্যয় করা বড় দুষ্কর; এই জন্যই ইহাকে কঠিন গিরিসংকট (অর্থাৎ অতি কঠিন কর্তব্য) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ধনের আবশ্যকতা ও ইহার আধিক্যের কুফল,

ধন ব্যতীত মানব জীবন ধারণ করিতে পারে না। কারণ ইহাই তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরকালের পাথেয় অর্জনের উপকরণ। আহার, পোশাক ও বাসস্থান মানব জীবনের অপরিহার্য বস্তু এবং ধনের বিনিময়েই এই সমস্ত লাভ করা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ বস্তুর অভাবে মানুষ ধৈর্যহীন হইয়া পড়ে। আবার অতিরিক্ত ধনার্জনও বিপদশূন্য নহে এবং সম্পূর্ণরূপে নির্ধন হইলেও অভাবের তাড়নায় মানুষের পক্ষে কাফির হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে অতিরিক্ত ধন লাভে ধনী হইলেও মানব হৃদয়ে গর্ব এবং অহংকার দেখা দেওয়ার ভয় রহিয়াছে।

দরিদ্রের দ্বিবিধ অবস্থা—দরিদ্রের অবস্থা দ্বিবিধ। **প্রথম**– লোভ ও **দ্বিতীয়**– অল্পে তুষ্টি। অল্পে তুষ্টি সৎ-স্বভাবের অন্তর্গত। লোভী ব্যক্তির অবস্থাও দুই প্রকার। **প্রথম**– অন্যের দ্রব্যে লোভ করা ও **দ্বিতীয়**– স্বীয় পরিশ্রমে ধনার্জন করা। স্বীয় অর্জিত ধনে জীবিকা নির্বাহ করা প্রশংসনীয়।

ধনীর দ্বিবিধ অবস্থা—ধনীগণও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। **প্রথম**– কৃপণ ও **দ্বিতীয়**– দানশীল। কৃপণতা অত্যন্ত জঘণ্য দোষ। ধন ব্যয়েরও দুইটি অবস্থা রহিয়াছে। **প্রথম**– অপচয় ও **দ্বিতীয়**– মিতব্যয়। অপচয় নিতান্ত মন্দ। এই সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া সকলের

পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য; কারণ ধনের উপকারিতা ও অপকারিতা উভয়ই রহিয়াছে। এইজন্য প্রত্যেকের পক্ষেই ইহার জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন যাহাতে সে অনিষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে এবং উপকারী অবস্থায় ইহা অর্জনে সমর্থ হয়।

ধনাসক্তির কদর্যতা– আল্লাহ্ বলেন–

لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ .... هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

"তোমাদের ধন ও তোমাদের সন্তানাদি যেন আল্লাহ্র স্মরণ হইতে তোমাদিগকে ভুলাইয়া না রাখে এবং যাহারা ইহা করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকুন, ২ রুকূ, ২৮ পারা) রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "বৃষ্টি যেমন সবুজ তৃণরাজি জন্মায় ধনাসক্তি এবং প্রভুত্ব-প্রিয়তা তদ্রূপ মানব অন্তরে কপটতা জন্মাইয়া থাকে।" তিনি আরও বলেন– "ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা মুসলমানের ধর্মের যেরূপ বিনাশ সাধন করিয়া থাকে দুইটি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র ছাগলের পালে এত অধিক বিনাশ সাধন করিতে পারে না।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আপনার উম্মতের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি নিকৃষ্ট?" তিনি বলিলেন– "ধনী ব্যক্তি।" তিনি আরও বলেন– "আমার (তিরোধানের) পর এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে; তাহারা নানা প্রকার সুস্বাধু খাদ্য ভক্ষণ করিবে, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, সুন্দরী রমণী রাখিবে এবং বহুমূল্য অশ্বে আরোহণ করিবে; অল্পে তাহারা পুরিতুষ্ট হইবে না, তাহাদের প্রতিটি কর্ম দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই হইবে। আমি, মুহাম্মদ, তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি– 'তোমাদের সন্তানাদির মধ্যে কেহ সেই সম্প্রদায়ের সাক্ষাত লাভ করিলে সে যেন তাহাদিগকে সালাম না দেয়, তাহাদের রুগ্ন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য যেন গমন না করে, তাহাদের জানাযায় যেন হাত না লাগায় এবং তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে যেন সম্মান প্রদর্শন না করে। এই উপদেশ যে অমান্য করিবে সে যেন ইসলামের বিনাশ সাধনে তাহাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হইবে।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়াদারদের হাতেই থাকিতে দাও; কেননা অভাব মোচন হইতে পারে ইহার অধিক সম্পদ যে ব্যক্তি অর্জন করে, ইহা তাহার ধ্বংসের কারণ হইবে, অথচ সে ইহা বুঝিতে পারিবে না।" তিনি অন্যত্র বলেন– "লোকে সর্বদা দাবী করিতে থাকে– 'আমার ধন, আমার ধন।' অনুধাবন কর, ইহা ব্যতীত তোমার কি আছে যে, তুমি যাহা আহার কর তাহা নষ্ট করিয়া দাও, যাহা পরিধান কর তাহা অকেজো করিয়া ফেল, যাহা দান কর তাহা চিরস্থায়ী থাকে।" এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল– "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, ইহার কি কারণ যে, আমি মরণের সম্বল সংগ্রহ করিতে পারি নাই।?" তিনি বলিলেন– "তোমার ধন আছে কি?" সেই ব্যক্তি বলিল– "হাঁ, আছে।" তিনি বলিলেন– "ইহা তোমার পূর্বে পাঠাইয়া দাও।" অর্থাৎ ধন

দীন-দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দাও; কারণ, মানব মন ধনে আবদ্ধ থাকে। দুনিয়াতে ধন সঞ্চয় করিলে সেও দুনিয়াতে থাকিতে চায়; আর দান-খয়রাতে ধন পরলোক পাঠাইয়া দিলে সে নিজেও পরলোকে যাইতে উদগ্রীব হইয়া উঠে।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "মানুষের তিন প্রকার বন্ধু আছে। এক (প্রকার বন্ধু) মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধুত্ব রক্ষা করে, দ্বিতীয়, কবরের দ্বার পর্যন্ত তাহার সঙ্গে চলে এবং তৃতীয়, কিয়ামত পর্যন্ত তাহার সঙ্গে থাকে। যে বন্ধু মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধুত্ব রক্ষা করে, ইহা ধন; যে কবরের দ্বার পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে চলে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন এবং যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহার সঙ্গে থাকে, ইহা তাহার আ'মাল (অর্থাৎ কর্মফল)।" তিনি আরও বলেন– "মানুষ পরলোকগমন করিলে লোকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে (পরকালের জন্য) অগ্রে কি (সৎকর্ম) প্রেরণ করিয়াছে।" তিনি আরও বলেন– "জমিদারী ও দুনিয়া অর্জন করিও না; অন্যথায় তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবে।"

হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে তাঁহার সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– "পানির উপর দিয়া আপনি হাঁটিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু আমরা পারি না; ইহার কারণ কি?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– "তোমাদের অন্তরে কি স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রতি আসক্তি নাই?" তাহারা নিবেদন করিলেন– "হ্যাঁ, আছে।" তিনি বলিলেন– "আমি উহাকে মৃত্তিকাতুল্য মনে করিয়া থাকি।"

ধনাসক্তির জঘণ্যতা সম্পর্কে বুযুর্গগণের উক্তি—এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হুর প্রতি অত্যাচার করিলে তিনি নিবেদন করিলেন–

"হে খোদা, এই ব্যক্তিকে (অত্যাচারীকে) দীর্ঘায়ু ও প্রচুর ধন দান কর।" তিনি ইহাকে নিকৃষ্ট দোয়া বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কারণ সেই ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও প্রচুর ধন লাভ করিলে অহংকার ও পরকালের প্রতি অমনোযোগিতায় স্বতঃই বিনষ্ট ও ধ্বংস হইয়া যাইবে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু একটি রৌপ্য মুদ্রা হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন– "তুই এমন পদার্থ যে, তুই যেই পর্যন্ত আমার হাত হইতে চলিয়া না যাইবি, সেই পর্যন্ত আমি উপকার পাইব না।" হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– "আল্লাহ্র শপথ, যে ব্যক্তি ধনাসক্ত হইবে আল্লাহ্ তাহাকে হেয় ও অপমানিত করিবেন।" বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রস্তুত হইলে শয়তান একটি মুদ্রা লইয়া তাহার নয়নে স্পর্শ করাইয়া বলিল– "যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আসক্ত হইবে, বাস্তবপক্ষে সে আমার গোলাম।" হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন মুয়ায রাযিআল্লাহ্ আন্হু বলেন– "ধনসম্পদ বিচ্ছুতুল্য। যে পর্যন্ত ইহার বিষের প্রতিষেধক সম্বন্ধে অবগত না হইবে সেই পর্যন্ত ইহা স্পর্শ করিও না। অন্যথায় ইহার বিষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "ইহার প্রতিষেধক কি?" তিনি বলিলেন– "হালাল (বৈধ) উপায়ে ধনার্জন করা ও শরীয়তের নির্দেশানুসারে যথাস্থানে ব্যয় করা।"

হযরত ওমর ইব্‌ন আব্দুল আযিয রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে সালমা ইব্‌ন আবদুল মালিক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন– "হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এইরূপ কাজ করিলেন যাহা কেহ কখনও করে নাই; আপনার তেরজন পুত্র, তাঁহাদের জন্য আপনি এক কপর্দকও রাখিয়া গেলেন না।" তিনি বলিলেন– "আমাকে একটু উঠাইয়া বসাও।" তাঁহাকে তুলিয়া বসাইলে তিনি বলিলেন– "মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর; আমি ত তাহাদের ধন অপরকে প্রদান করি নাই বা অপরের ধন তাহাদিগকে দেই নাই। আমার পুত্রগণ হয়ত উপযুক্ত ও আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ হইবে বা অনুপযুক্ত হইবে। যে উপযুক্ত হইবে তাহার জন্য ত আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আর যে অনুপযুক্ত হইবে সে যে কোন বিপদেই আক্রান্ত হউক না কেন, তাহার জন্য আমার কোন ভাবনা নাই।" হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুয়ায রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–

"ধনী ব্যক্তি মৃত্যুকালে দুইটি বিপদের সম্মুখীন হইবে; এইরূপ বিপদে আর কেহই পতিত হইবে না। প্রথম– তাহার সমস্ত ধন তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইবে এবং দ্বিতীয়– সমস্ত ধনের হিসাব তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে।"

ধনের উপকারিতা ও ইহার কারণ

প্রথম কারণ—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, কতিপয় কারণে ইহাকে ভাল বলা যাইতে পারে। ধনে মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আল্লাহ্ ইহাকে 'খায়র' অর্থাৎ ভাল বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন; যেমন তিনি বলেন– اِنْ تَـرَكَ خَـيْـرَانِ الْوَصِيَّةُ الاية "ওসিয়ত করিয়া যদি মঙ্গল (ধন) রাখিয়া যায়।' (সূরা বকর, ২২ রুকূ, ২ পারা।) রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "সৎলোকের জন্য ধন ভাল বস্তু।" তিনি আরও বলেন– كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا অর্থাৎ "দরিদ্রতায় মানুষের কাফির হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।"

অভাবগ্রস্তকে শয়তানের প্ররোচনা—কোন অন্নহীন দরিদ্র অপরকে অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী দেখিতে পাইলে শয়তান তখন তাহাকে পথভ্রান্ত করিতে তৎপর হয় এবং তাহার অন্তরে এইরূপ প্ররোচনা দিতে থাকে– 'আল্লাহ্‌র অবিচার দেখ। তিনি পাপিষ্ঠ দুরাচারকে এত ধন দান করিয়াছেন যে, সে ইহার পরিমাণ পর্যন্ত করিতে পারে না। আর তোমার ন্যায় অসহায় দরিদ্রকে তিনি অনশনে মারিতেছেন; তোমাকে একটি মুদ্রাও দান করেন নাই। তোমার অভাব ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি অবগত না থাকিলে তাহার জ্ঞানে অপূর্ণতা রহিয়াছে। আর তিনি এই সম্বন্ধে অবগত এবং দানে সমর্থ হইয়াও তোমার অভাব মোচনার্থ ধন-সম্পদ দান না করিলে তাঁহার দান ও দয়ায় অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। আর যদি মনে কর যে, পরকালে ইহার প্রতিফল দিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি তোমাকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছেন, তবে অনুধাবন কর, ইহকালে কষ্টে নিপতিত না করিয়াও ত তিনি তোমাকে পরকালে অনন্ত সুখ দান করিতে পারিতেন। এমতাবস্থায়, তিনি তোমার অভাব মোচন করিতেছেন না কেন? আর ইহকালে কষ্ট ভোগ ব্যতীত তিনি কাহাকেও পরকালে সুখ দানে অক্ষম হইলে তাঁহার ক্ষমতা অপূর্ণ।" সুতরাং এবং বিধ প্ররোচনার ফলে আল্লাহ্ পরম দয়ালু, দানশীল ও উদার, তাঁহার অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার সম্পদে ভরপুর; কিন্তু কোন্ শুভ উদ্দেশ্যে প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি নিখিল বিশ্বকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত রাখিতেছেন, এই কথাগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করা দুষ্কর।

অদৃষ্টের গূঢ় রহস্য সকলের নিকটই গোপনীয় রহিয়াছে। কিন্তু শয়তান এই সুযোগে মানবের অন্তরে অদৃষ্ট সম্পর্কে নানারূপ কুমন্ত্রণা উপস্থাপিত করার অবকাশ পায় এবং তাহাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ভাগ্যলিপির প্রতি ক্রুদ্ধ করিয়া তোলে। তখন দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত মানব আকাশ ও কালকে গালি দিতে আরম্ভ করে এবং বলে– "আকাশ নির্বোধ ও কাল উলটা হইয়া পড়িয়াছে; ইহারা অপদার্থ ও দুরাচারকে সম্পদশালী করিতেছে এবং নিখিল বিশ্বকে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত রাখিতেছে।" এইরূপ ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে যে, আকাশ ও কাল আল্লাহ্‌র ক্ষমতাধীন; আর সে যদি ইহা অস্বীকার করে তবে তাহাকে কাফির হইতে হয়। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– لاَ تَسُبُّو الدَّهْرَفَانَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ "তোমরা কালকে মন্দ বলিও না; কারণ আল্লাহ্‌ই কাল।" এই হাদীসের মর্ম এই যে, যাহাকে তোমরা স্বীয় ক্রিয়া-কলাপের কারণ বলিয়া মনে কর এবং যাহাকে 'কাল' নামে অভিহিত কর বাস্তবিক পক্ষে উহা (কাল নহে, বরং) খোদা। এমতাবস্থায়, দরিদ্রতাই বেঈমান হওয়ার হেতু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যাহার ঈমান খুব দৃঢ় ও প্রবল এবং যে দরিদ্রতায় নিপীড়িত হইয়াও আল্লাহ্‌র উপর অসন্তুষ্ট হয় না ও ইহাতেই তাহার মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করে, দরিদ্রতা এমন ব্যক্তির ঈমান নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু সাধারণত মানুষ এত দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয় না। সুতরাং অভাব মোচনের পরিমিত ধনার্জন করা উত্তম। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ধনকে ভাল বস্তুর মধ্যে গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয় কারণ—পরকালের সৌভাগ্য বুযুর্গগণের পরম লক্ষ্য। কিন্তু তিন প্রকার সম্পদ ব্যতীত এই সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। প্রথম প্রকার, আত্মার সহিত বিজড়িত; যেমন– জ্ঞান ও সৎস্বভাব। দ্বিতীয় প্রকার, দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট; যথা– স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। তৃতীয় প্রকার, মন ও দেহের বাহিরে অবস্থিত। ইহা নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ; আর ইহা হইল ধন। ধনের মধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্য নিকৃষ্ট। ধনে কিন্তু সাক্ষাতভাবে কোন উপকারিতা নাই। তবে ইহা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের উপকরণ মাত্র। কারণ, উহার বিনিময়ে অন্ন-বস্ত্র সংগৃহীত হয়। দেহ রক্ষার জন্য অন্ন-বস্ত্র অপরিহার্য। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সমূহ ধারণের নিমিত্ত দেহের আবশ্যক। আবার বুদ্ধি ও লজ্জা সংরক্ষণের জন্য

ইন্দ্রিয়সমূহ যন্ত্রস্বরূপ। অপিচ হৃদয়ে উজ্জ্বল প্রদীপরূপে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যেই বুদ্ধির আবির্ভাব। আত্মা উক্ত প্রদীপের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র দর্শন ও যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে পারে। আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচয়ই সৌভাগ্যের বীজ। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক বস্তুরই চরম লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্। তিনি যেমন আদি, তেমনি অন্ত। আর বিশ্বের সকল পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহার অস্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে সে আল্লাহ্‌র পথে চলিবার জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক সেই পরিমাণ ধন পাইয়া সন্তুষ্ট থাকে এবং তদতিরিক্ত ধন হলাহল বিষ জ্ঞানে বর্জন করে। পার্থিব সম্পদ সৎলোকের জন্য ভাল এবং এই কারণেই রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "হে আল্লাহ্, মুহাম্মদের পরিজনের জীবিকা পরিমিতরূপে দান করিও।" তিনি সম্যকরূপে অবগত ছিলেন যে, অতিরিক্ত ধন লাভ করিলে মানুষ ধ্বংস ও পথভ্রষ্ট হইয়া যায় এবং নিতান্ত অভাব মোচনের পরিমিত ধন না পাইলেও তাহার ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ইহাও তাহার ধ্বংসের কারণ হয়। এইজন্যই হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উক্তরূপ দোয়া করিয়াছিলেন। অতএব যে ব্যক্তি এই বিষয়ে অবগত হইয়াছে সে কখনও ধনাসক্ত হয় না। কারণ, কেহ কোন পদার্থকে কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপকরণস্বরূপ অবলম্বন করিলে সে কখনও এই উপকরণের প্রতি আসক্ত হয় না; বরং সে বাস্তবপক্ষে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই উদ্‌গ্রীব ও তৎপর থাকে। (খোদা-প্রাপ্তিই মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে ধন অন্যতম নিকৃষ্ট উপকরণ মাত্র।)

রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "স্বর্ণ-রৌপ্যের অনুরক্ত দাস অন্ধ হইয়া থাকে।" যে ব্যক্তি যে পদার্থের অনুসরণ করে সে তাহারই দাস এবং অনুসৃত পদার্থটি তাহার পূজনীয় হইয়া পড়ে। এই জন্যই হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম বলেন– وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ "আর আমাকে ও আমার সন্তানগণকে মূর্তিপূজা হইতে নিবৃত্ত রাখ।" (সূরা ইবরাহীম রুকূ ৬, ১৩ পারা)। বুযুর্গগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'মূর্তি' শব্দ ধনস্বরূপ স্বর্ণ-রৌপ্য অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন; কারণ সমস্ত লোক ধনেই নিবিষ্ট রহিয়াছে এবং নবীগণের (আ) মরতবা এত উচ্চ যে, তাঁহাদের দ্বারা মূর্তিপূজার আশঙ্কা মোটেই নাই। (কাজেই উল্লিখিত আয়াতে 'মূর্তি' অর্থে ধন বুঝাই সমীচীন'।)

ধনের উপকারিতা

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, ধন সর্প সদৃশ; ইহাতে বিষ ও বিষবিনাশক উপকরণ উভয়ই রহিয়াছে। বিষ হইতে বিষনাশক উপকরণ পৃথক না করিলে ধনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইবে না। এইজন্য ইহার উপকারিতা ও অপকারিতা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হইতেছে। ধনে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকারিতা

রহিয়াছে। ধনের পার্থিব উপকারিতা সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছে; সুতরাং ইহা বর্ণনার আবশ্যকতা নাই।

ধনের পারলৌকিক উপকারিতা– ইহা তিন প্রকার।

প্রথম উপকারিতা—ইবাদত কার্যে বা ইবাদতের প্রস্তুতি কার্যে নিজের জন্য ব্যয় করা। হজ্জ, জিহাদ ও এবং বিবিধ কার্যে যে অর্থ ব্যয় হয়, ইহা প্রকৃত ইবাদতেই ব্যয়িত হইল বলিয়া গণ্য হয়। ইবাদতের জন্য অবকাশ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে নিতান্ত আবশ্যক অন্ন-বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি সংগ্রহে পরিমিতরূপে যে অর্থ ব্যয় হয়, ইহাও প্রকৃত ইবাদতেই পরিগণিত। অপরপক্ষে, যাহার নিতান্ত অভাব মোচনের পরিমিত ধন নাই, সে দিবারাত্র ইহার অন্বেষণেই ব্যাপৃত থাকিবে; সুতরাং সে ইবাদতের প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র যিকির ও ধ্যান হইতে বঞ্চিত থাকে। অতএব, ইবাদতের জন্য অবকাশ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে অভাব মোচন হইতে পারে, এই পরিমাণ ধনার্জন করাও প্রকৃত ইবাদত। ইহা ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহাকে পার্থিব বলা চলে না।

এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংকল্পের পরিবর্তনে ধনের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। পারলৌকিক কার্যে অবসর লাভের উদ্দেশ্যে অভাব মোচনের পরিমিত ধন পরকালের পাথেয় এবং সম্বলস্বরূপ। তবে যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন আছে কেবল তেমন ব্যক্তিই ইহার মর্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। কারণ, উপজীবিকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া ধর্ম-পথে চলার পক্ষে কতটুকু সহায়ক সে-ই ইহা অবগত আছে।

দ্বিতীয় উপকারিতা—দান। ইহা চারি প্রকার। **প্রথম**- সদকা। ইহ-পরকালে ইহার পুণ্য অত্যন্ত বেশী। কারণ, ইহাতে গরীব-দুঃখীদের দোয়ার বরকত লাভ হয় এবং দানের সাহসিকতার প্রতিক্রিয়া দাতার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থহীন লোক এই কল্যাণ লাভে বঞ্চিত থাকে। **দ্বিতীয়**- সৌজন্য ও দয়া প্রদর্শন, ধর্মবন্ধুদের সহিত সদ্ব্যবহার, উপহার ও উপঢৌকনাদি প্রদান, তাহাদের শোকে-দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন এবং জনসাধারণের প্রতি যে কর্তব্য রহিয়াছে ইহা সম্পন্ন করা উহার অন্তর্ভুক্ত। তাহারা ধনবান হইলেও তাহাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তুমি যদি প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহাদিগকে উপঢৌকনাদি প্রদান কর, তবে মহাকল্যাণ লাভ করিবে এবং এইরূপে তুমি বদান্যতারূপ সৎস্বভাব অর্জন করিবে। বদান্যতা একটি মহৎ গুণ। যথাস্থানে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইবে। **তৃতীয়**- স্বীয় সম্মান রক্ষার্থে দান। কবি ও অতি লোভী ব্যক্তিদিগকে দান ইহার অন্তর্গত। কিছু না পাইলে এইরূপ লোকেরা অপরের কুৎসা ও নিন্দাবাদ করিতে থাকে। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "লোকের নিন্দা হইতে স্বীয় সম্মান রক্ষার্থ যাহা (ব্যয়িত হয়) তাহা সদকার

মধ্যে পরিগণিত।" ইহার কারণ এই যে, অর্থপ্রদানে দুরাচারিদিগকে কুবাক্য প্রয়োগ ও নিন্দাবাদ হইতে নিরস্ত রাখা যাইতে পারে এবং দাতার মনের প্রশান্ত ভাব এবং শান্তিও অক্ষুণ্ন থাকে। কিছু দান করত তাহাদিগকে বশীভূত না করিলে তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারে, এইরূপে তখন শত্রুতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ধন ব্যতীত এইরূপ আপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় না। **চতুর্থ-** অপরের দ্বারা সাধারণ কাজগুলি করাইয়া লইবার জন্য পারিশ্রমিক প্রদান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি তাহার সমস্ত কর্ম স্বীয় হস্তেই সম্পন্ন করিতে চায়, তাহার জীবনের বহুমূল্য সময় তুচ্ছ কাজেই অপচয় হইয়া যায়। আল্লাহ্‌র যিকির ও ধ্যান করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। ইহা একের পক্ষ হইতে অপরে সমাধা করিতে পারে না। কিন্তু একের ক্রয়-বিক্রয়, বস্ত্রাদি ধৌত করা ইত্যাদি অপরে সম্পন্ন করিতে পারে। অতএব, যাহা অপরের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর এমন কাজে স্বয়ং লিপ্ত না হইয়া নিজে আরও উচ্চতর কাজ-যিকির-ফিকিরে নিরত থাকিবে। অন্যথায়, পরকালে উক্তরূপ তুচ্ছকাজে সময় অপচয়ের দরুন তোমাকে ভীষণ পরিতাপ করিতে হইবে। কারণ, জীবন নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, মৃত্যু সন্নিকটে, পরকালের পথ অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ইহার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাথেয় আবশ্যক। মানুষের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস এক একটি অমূল্য রত্ন। সুতরাং যে সমুদয় কাজ অপরের দ্বারা করাইয়া লওয়া সম্ভবপর ইহাতে স্বয়ং লিপ্ত না হইয়া বরং পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কার্যে তাহার নিবিষ্ট থাকা উচিত। আর ঐ সকল কাজ অপরে দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লওয়া আবশ্যক। তবে ধন ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। শ্রমিকদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলেই উক্তরূপ পরিশ্রমের কাজ হইতে সে অব্যাহতি পাইতে পারে; কেননা অর্থের লোভেই তাহারা অপরের কাজ করিয়া থাকে।

নিজের সমুদয় কাজ স্বীয় হস্তেই সম্পন্ন করা পুণ্য কাজ বটে। কিন্তু যাহারা শারীরিক ইবাদতে লিপ্ত ইহা তাহাদের কাজ, যাহারা উচ্চ শ্রেণীর মানসিক ইবাদতে নিবিষ্ট ইহা তাহাদের কাজ নহে। তবে যে সকল কামিল ব্যক্তি উচ্চ শ্রেণীর মানসিক যিকির-ফিকিরের যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্যান্য সমদুয় কাজ অপরের সম্পন্ন করা উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা শারীরিক ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানসিক ইবাদতে নিজেদের সম্পূর্ণ সময় নিয়োগ করিবার অবকাশ পাইতে পারেন।

তৃতীয় উপকারিতা—সদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ যে কার্যে অবিরাম পুণ্য হইতে থাকে, এইরূপ স্থানে ব্যয় করা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা ব্যক্তি বিশেষের জন্য দান নহে; বরং জনসাধারণের মঙ্গলজনক কার্যে ধন ব্যয় করা, যেমন- পুল, পান্থশালা, মসজিদ, হাসপাতাল নির্মাণ, গরীব-দুঃখীদের জন্য ধন-সম্পদ ওয়াক্‌ফকরণ ইত্যাদি। এই প্রকার কাজগুলি যতদিন বর্তমান ও প্রচলিত থাকে, ততদিন দাতা উহার পুণ্য পাইতে থাকে। এইরূপ সদকায়ে জারিয়ার কাজও ধন ব্যতীত হইতে পারে না।

ধনের পার্থিব উপকারিতা—পারলৌকিক কার্যে ধনের উপকারিতা উপরে বর্ণিত হইল। ইহার পার্থিব উপকারিতা সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছে। ধনের কারণেই মানুষ সমাজে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহার জন্যই লোকে তাহার গলগ্রহ হইয়া থাকে। ধন লাভ করিলেই মানুষ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে পারে। ইহার কল্যাণেই বহু ধর্ম-ভ্রাতাকে বন্ধুরূপে পাওয়া যায় এবং ধনবান ব্যক্তি সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে ও কেহই তখন তাহাকে হেয় বলিয়া ঘৃণা করে না। ধনের এবং বিদ আরও বহু উপকারিতা আছে।

ধনের অপকারিতা

ধন হইতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বহু আপদ দেখা দেয়। পারলৌকিক আপদসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। **প্রথম-** ধন মানুষকে দুষ্কর্ম ও পাপাচারে ক্ষমতাবান করিয়া তোলে এবং তাহার মন তখন পাপের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে দরিদ্রতা মানুষকে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক রাখিবার প্রধান সহায়। ধন লাভে পাপাচারে সক্ষম হইলে মানুষ ইহাতে লিপ্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধৈর্যধারণপূর্বক পাপ কার্য হইতে বিরত থাকা তখন তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। **দ্বিতীয়-** মনে কর, ধর্ম বিষয়ে কেহ নিতান্ত অটল ও সুদৃঢ় এবং পাপ কর্ম হইতে সে আত্মরক্ষাও করিতে পারে। কিন্তু বৈধ দ্রব্যাদি উপভোগ ও নির্দোষ ভোগবিলাস হইতে ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি কিরূপে নিজেকে রক্ষা করিবে? এমন কে আছে যে, সসাগরা বিশ্বের রাজত্ব লাভ করিয়াও হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের ন্যায় যবের রুটি ভক্ষণ ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া জীবন অতিবাহিত করে? মানুষ ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হইলেই দেহ উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং উহা ব্যতীত সে আর চলিতে পারে না। পার্থিক ভোগ-বিলাসের সম্বলস্বরূপ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলে দুনিয়া তাহার নিকট তখন পরম রমণীয় বেহেশ্‌তের ন্যায় বোধ হয় এবং মৃত্যুকে সে ঘৃণা করে। ভোগ-বিলাসের উপকরণাদি বৈধ উপায়ে অর্জন করাও সর্বদা সম্ভপর নহে। এমতাবস্থায়, সে সন্দেহযুক্ত ধন লাভে বাধ্য হয় এবং ধনার্জনের নিমিত্ত তাহাকে সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে মানুষ খোশামুদপ্রিয় হইয়া উঠে এবং মিথ্যা ও কপটতায় জড়িত হইয়া পড়ে। সরকারী কর্মচারীদের অনুগ্রহ ও নৈকট্য লাভ হইলে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সর্বদা ভীত সচেষ্ট থাকিতে হয়। তখন আবার আর এক বিপদ আসিয়া দেখা দেয়। রাজ কর্মচারীদের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিকে অপর লোকে ঈর্ষা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা সেই ব্যক্তির শত্রু হইয়া পড়ে এবং তাহাকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকে। সেও তখন প্রতিশোধ গ্রহণে প্রস্তুত হয় এবং তাহাদের প্রতি তাহার হিংসা ও শত্রুতার উদ্রেক হয়। এখন ভাবিয়া দেখ, নির্দোষ ভোগ-বিলাসের অভ্যাস কিরূপে পাপ টানিয়া

আনে। কারণ, ইহা হইতেই মিথ্যা, গীবত (অগোচরে পরনিন্দা), পরের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি অন্তর ও রসনাপ্রসূত সমস্ত পাপাচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাই সংসারাসক্তি, সকল পাপের মূল। অর্থাৎ পাপের শাখা-প্রশাখা এই মূল শিকড় হইতেই অঙ্কুরিত হয়; বরং এই আপদ একটি, দুইটি বা শতটি নহে, বরং এই আপদ অসংখ্য ও অগণিত। বাস্তবপক্ষে এই পাপসমুদ্র দোযখের ন্যায় অতল ও অসীম।

তৃতীয়- ধনরক্ষার্থে মনোযোগহেতু আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ধ্যানে ব্যাঘাত। ধনের এই প্রকার অপকারিতা হইতে কেহই অব্যাহতি পায় না; তবে আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন, তেমন ব্যক্তিই এই আপদ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি সকল পাপকর্ম, এমন কি নির্দোষ ভোগবিলাস হইতেও বিরত থাকিতে পারে, সন্দেহজনক বিষয় হইতে দূরে সরিয়া থাকে, হালাল মাল অর্জন করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায়ই ইহা ব্যয় করে, তেমন নিষ্কলঙ্ক পরহেযগার ব্যক্তিকেও ধনরক্ষার্থ মনোযোগ দিতে হয় এবং ইহা তাহাকে আল্লাহ্‌র যিকির ও ধ্যান হইতে নিরস্ত রাখে। অথচ আল্লাহ্‌র যিকিরে তন্ময় হইয়া যাওয়া ও তাঁহার প্রেমে বিভোর থাকাই সকল ইবাদতের সার; এইরূপ উন্নত অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত দুনিয়া হইতে বেপরোয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার মন পার্থিব সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত, কেবল তেমন ব্যক্তিই এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারে।

আবার কোন ধনবান ব্যক্তির ভূসম্পত্তি বা জমিদারী থাকিলে তাহাকে ইহার বাসিন্দাদের অভিযোগাদি শ্রবণ, রাজস্ব প্রদান এবং প্রজাদের নিকট হইতে হিসাবাদি গ্রহণের চিন্তায় লাগিয়া থাকিতে হয়। ধনী ব্যক্তি ব্যবসায়ী হইলে অংশীদের অভিযোগ শ্রবণ, তাহাদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ, বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ পর্যটন এবং লাভজনক ব্যবসায়ের অনুসন্ধানের তাহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কেহ গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু পালন করিলে তাহার অবস্থাও তদ্রূপই হইয়া থাকে। ধন মাটির নীচে প্রোথিত রাখিয়া আবশ্যক মত কিছু কিছু ব্যয় করাতে ঝঞ্ঝাট সবচেয়ে কম। তথাপি সর্বদা ইহার রক্ষণাবেক্ষণে রত থাকিতে হয়। পাছে কেহ গ্রাস করিয়া ফেলে বা লোভের বশবর্তী হইয়া এই গুপ্ত ধন সম্পর্কে কেহ অবগত হয়, এই আশঙ্কা সর্বদাই লাগিয়া থাকে। মোটের উপর সংসারাসক্ত লোকের চিন্তা-ভাবনার কোন পরিসীমা নাই। দুনিয়াদার হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত থাকার বাসনা করা, আর পানিতে প্রবেশ করিয়া ভিজিবে না বলিয়া মনে করা, একই কথা।

অপরিমিত ধন বিষতুল্য—ধনের অপকারিতা ও উপকারিতা উপরে বর্ণিত হইল। ইহা হইতে বুদ্ধিমানগণ বুঝিতে পারিয়াছে যে, নিতান্ত অভাব মোচন হইতে পারে এই পরিমিত ধন উপকারী এবং ইহার অতিরিক্ত বিষতুল্য। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য আবশ্যক পরিমাণ উপজীবিকাই প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি সংক্ষেপে বলিয়াছেন- "যে ব্যক্তি অভাব

মোচনের পরিমাণের অধিক ধন গ্রহণ করে, সে নিজের বিনাশ ও ধ্বংসের উপকরণ সংগ্রহ করে।" তবে অভাব মোচনের উপযোগী ধন না রাখিয়া সমস্তই বিতরণ করিয়া দেওয়া শরীয়তে মকরূহ অর্থাৎ ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; যেমন আল্লাহ্ বলেন- وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا "আর হাত একেবারে খুলিয়া দিও না (অর্থাৎ অমিতব্যয়ী হইও না), তাহা হইলে তিরস্কৃত ও রিক্ত হস্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ৩ রুকূ, ১৫ পারা)।

লোভের আপদ ও অল্পে তুষ্টির কল্যাণ

লোভের আপদ—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, লোভেও মন্দ স্বভাবের অন্তর্গত। লোভের বশীভূত হইলে মানুষকে ইহলোকে অপমানিত ও পরলোকে লজ্জিত হইতে হয়। আবার লোভ চরিতার্থ না হইলে ইহা হইতে বহুবিধ জঘন্য স্বভাব উদ্ভব হইয়া থাকে। কারণ, কেহ অপরের নিকট কোন কিছুর প্রত্যাশী হইলে সে তাহার খোশামুদে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে সে মুনাফিক হইয়া পড়ে; তদুপরি অপরের মন আকর্ষণের জন্য সে নিজের সাধুতা প্রদর্শন ও লোক দেখানো ইবাদত করিতে থাকে। যাহারা নিকট কিছু প্রত্যাশা করা হয়, সে প্রত্যাশাকারীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলে ও তাহার প্রতি অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলে সে এই অপমান অম্লানবদনে সহ্য করে। জন্মগতভাবেই মানুষ লোভী, সে স্বীয় সম্পদে পরিতুষ্ট হয় না। অতএব অল্পে তুষ্ট না হইলে সে কখনও লোভ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "স্বর্ণে পরিপূর্ণ দুইটি মাঠ পাইলেও মানুষ অপর একটির প্রত্যাশা করিবে। মৃত্তিকা ব্যতীত আর কোন দ্রব্যই মানব হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তাহার তওবা কবুল করিয়া থাকেন।" তিনি আরও বলেন- "মানুষের সব কিছুই বৃদ্ধি (হ্রাসপ্রাপ্ত) হইতে থাকে, কিন্তু দুইটি বিষয় যৌবন লাভ করিতে (বৃদ্ধি পাইতে) থাকে; প্রথম দীর্ঘকাল বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা ও দ্বিতীয় ধনাসক্তি।"

অল্পে তুষ্টির ফযীলত—রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আল্লাহ্ যাহাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও অভাব মোচনের উপযোগী ধন দিয়াছেন এবং সে উহাতে পরিতুষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি পুণ্যবান ও সৌভাগ্যশালী।" তিনি বলেন- "জিবরাঈল আমার অন্তরে ঢালিয়া দিলেন, 'জীবিকা নিঃশেষ না হইলে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।' (অতএব) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শান্তির সহিত ধীরে ধীরে জীবিকা অন্বেষণ কর।" অর্থাৎ ইহাতে বাড়াবাড়ি করিও না এবং লোভের বশবর্তী হইয়া সীমা অতিক্রম করিও না। তিনি বলেন- "সন্দেহযুক্ত ধন পরিত্যাগ করিলে আবিদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে; আল্লাহ্‌র দানে সন্তুষ্ট থাকিলে

তুমি কৃতজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিগণিত হইবে এবং নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর অপরের জন্য তাহাই পছন্দ করিলে তুমি (পূর্ণ) মু'মিন হইতে পারিবে।"

হযরত আওফ ইব্‌নে মালিক আশজায়ী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "আমরা আট নয় জন লোক রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, (এমন সময়) তিনি বলিলেন– 'তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট বায়'আত কর (অর্থাৎ আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ কর।)' আমরা নিবেদন করিলাম- 'আমরা কি একবার শপথ করি নাই?' তিনি আবার বলিলেন- 'তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট শপথ কর।' আমরা হস্ত প্রসারণ করত নিবেদন করিলাম- 'কোন্ কথার উপর শপথ করিব?' তিনি বলিলেন- আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড় এবং আল্লাহ্ যে আদেশ দেন ইহা শ্রবণ কর ও তদনুসারে কাজ কর। আর তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন- 'কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু চাহিও না।" এই উপদেশ শ্রবণের পর তাঁহাদের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহারা কাহারও নিকট হইতে কিছু চাহিতেন না, এমন কি কাহারও হস্ত হইতে চাবুক পড়িয়া গেলেও ইহা তুলিয়া দিবার জন্য তাঁহারা কাহাকেও বলিতেন না।

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলেন- "হে বিশ্বপ্রভু, তোমার বান্দাগণের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা ধনবান?" আল্লাহ্ বলিলেন- "আমি যাহা দান করি ইহাতেই যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে সে-ই ধনবান।' তিনি আবার নিবেদন করিলেন- "ন্যায়বিচারক কে?" আল্লাহ্ বলিলেন- " যে ব্যক্তি নিজ সম্বন্ধে সুবিচার করে।" হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (রা) শুষ্ক রুটি পানিতে ভিজাইয়া আহার করিতেন এবং বলিতেন- " যে ব্যক্তি ইহাতে পরিতৃপ্ত থাকে সে পরমুখাপেক্ষী হয় না।" হযরত ইবনে মাসউদ রাযীয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "প্রত্যহ এক ফেরেশতা ঘোষণা করে- ' হে আদম সন্তান, অধিক অমনোযোগিতাজনক, আনন্দদায়ক প্রচুর ধন অপেক্ষা তোমার অভাব মোচনের উপযোগী অল্প ধন উৎকৃষ্ট।" হযরত সমীত ইবনে উজলান (রা) বলেন- "তোমার উদর অর্ধ হাতের অধিক নহে; আচ্ছা, কেন তোমাকে ইহা দোযখে লইয়া যায়?"

হাদীসে কুদসীতে উক্ত হইয়াছে- "আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আদম সন্তান, আমি তোমাকে সমস্ত জগত দান করিলেও তুমি এই পরিমাণই ভক্ষণ করিতে পারিবে যদ্দ্বারা তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। এমতাবস্থায় আমি যদি তোমাকে ক্ষুধা নিবৃত্তি করার উপযোগী সম্পদ দান করি এবং অতিরিক্ত সম্পদের হিসাবের ঝামেলা অপরের উপর অর্পণ করি, তবে ইহার অধিক তোমার আর কি উপকার করিব?" কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন- 'লিপ্সু ও লোভী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক মানসিক যাতনা আর কেহই সহ্য করে না; অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক শান্তি কেহই লাভ করে না।" ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি

অপেক্ষা অধিক মনঃকষ্ট আর কেহই পায় না, সংসারবিরাগী অপেক্ষা অধিক ভারশূন্য আর কেহই নহে এবং যে আলিম ইলম অনুযায়ী কাজ করে না তাহার অপেক্ষা অধিক লজ্জিত আর কেহই হইবে না। হযরত সাম্মাক (রা) বলেন- " লোভ তোমার গলার ফাঁস ও পায়ের শৃঙ্খলস্বরূপ। গলার ফাঁস কাটিয়া ফেল, তাহা হইলে পায়ের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইবে।"

লোভ-লালসা দমনের উপায়—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ সহিষ্ণুতার তিক্ততা, ইল্‌মের মিষ্টতা ও আমলের কষ্টের মিশ্রণে যে মিক্‌চার প্রস্তুত হয় ইহাই লোভ-লালসার মহৌষধ। বস্তুত সকল আন্তরিক রোগের ঔষধ এই সমস্ত উপকরণ ও উপাদানেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাঁচ প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা লোভ-লালসা রোগের চিকিৎসা করিতে হয়।

প্রথম ব্যবস্থা—আমল বা অনুষ্ঠান। এই আমলের অর্থ হইল ব্যয় সঙ্কোচ করা এবং মোটা বস্ত্র ও ব্যঞ্জনহীন অন্নে পরিতুষ্ট থাকা। কোন কোন সময় ডাল, তারকারিও আহার করা যাইতে পারে; কেননা এইরূপ অন্ন ও মোটা বস্ত্র অনায়াসেই লাভ হইতে পারে। কিন্তু জাঁক-জমকের সহিত ব্যয় বৃদ্ধি করিলে অল্পে তুষ্টি সম্ভবপর হয় না। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "মিতব্যয়ী ব্যক্তি কখনও পরমুখাপেক্ষী হয় না।" তিনি বলেন- "তিনটি বিষয়ে মানবের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রথম- প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্‌কে ভয় করা; দ্বিতীয়- ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় পরিমিত ব্যয় করা; তৃতীয়- আনন্দের সময় ন্যায়বিচার পরিহার না করা।" এক ব্যক্তি দেখিল, হযরত আবূ দারদা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু খোরমার বীচি আহরণ করিতেছেন। তখন তিনি বলিতেছিলেন- "সহজ ও সরলভাবে জীবনযাপনের প্রতি লক্ষ্য রাখা বুদ্ধি ও ইল্‌মের পরিচায়ক।" তিনি অন্যত্র বলেন- " যে ব্যক্তি পরিমিত ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাহাকে পরমুখাপেক্ষা করেন না এবং যে ব্যক্তি অতিরিক্ত খরচ করে, সে অভাবগ্রস্ত থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে তিনি তাহাকে ভালবাসেন।" তিনি আরও বলেন- "ভূত-ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া ধীরস্থিরভাবে ব্যয় করা উপজীবিকার অর্ধাংশ।"

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—ভবিষ্যত উপজীবিকার চিন্তা না করা। এক দিনের উপজীবিকা পাইলে পর দিবসের আর চিন্তা করিও না। কেননা, শয়তান তোমাকে প্ররোচণা দিয়া বলিবে- "সম্ভবত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে এবং হয়ত আগামীকল্য কিছুই মিলিবে না। অদ্যই প্রাণপণ চেষ্টায় জীবিকার অর্জনে ব্যাপৃত হও এবং যে স্থান হইতেই হউক না কেন ভবিষ্যতের জন্য অর্জন করিয়া রাখ।" এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আল্লাহ্ বলেন- اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ "শয়তান তোমাদিগকে দরিদ্রতার ভয় প্রদর্শন করে এবং কুকর্মের আদেশ করে" (সূরা বাকারা, ৩৭ রুকূ, ৩ পারা)। শয়তান মানুষকে আগামীকল্যের অভাবের চিন্তায় ব্যাকুল করিয়া এবং

তাহাকে ফকীরের বেশ ধারণ করাইয়া উপহাস করিতে চায়। অথচ মানবজীবন এত অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী যে, হয়ত আগামীকল্যের মুখ দেখা তাহার ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে। আর অদ্য তুমি লোভের বশীভূত হইয়া যেরূপ মনঃকষ্টে জর্জরিত হইতেছ আগামীকল্য জীবিত থাকিলেও তোমাকে এত অধিক যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। মানুষ যদি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া লয় যে, লোভ-লালসার দরুন জীবিকা মিলে না, বরং আল্লাহ্র বিধানে ইহা নির্ধারিত আছে এবং স্বতঃই ইহা আসিয়া জুটিবে, তবে সে লোভের আপদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে বিষণ্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন- "অধিক কষ্ট করিও না। আল্লাহ্ যাহা অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই ঘটিবে এবং সর্বাবস্থায় তোমার রিযিক তুমি পাইবে।" অনেক সময় দেখা যায় যে, মানুষের রিযিক এমন স্থান হইতে জুটে যে স্থানের কল্পনাও সে করে নাই। আল্লাহ্ বলেন-

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا - وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, তিনি তাহার জন্য মুক্তির পথ করিয়া দিবেন এবং তিনি তাহাকে এমন স্থান হইতে জীবিকা দান করিবেন যে, সে কল্পনাও করিত না" (সূরা তালাক, ১ রুকু, ২৮ পারা)। হযরত আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "পরহেযগার হও; পরহেযগার ব্যক্তি কখনও অনাহারে প্রাণত্যাগ করে না।" অর্থাৎ আল্লাহ্ লোককে পরহেযগারের প্রতি এইরূপ উদার করিয়া তুলেন যে, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরহেযগারের নিকট প্রচুর ধন লইয়া যায়। হযরত আবূ হাযিম রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "সমুদয় বস্তু দুইভাগে বিভক্ত। আমার (অদৃষ্টে নির্ধারিত) জীবিকা সর্বাবস্থায় আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিবে। আর বিশ্ববাসীর মিলিত চেষ্টায়ও অপরের জীবিকা আমার নিকট পৌঁছিবে না। এমতাবস্থায়, জীবিকা অন্বেষণে ব্যাকুল হওয়া অনাবশ্যক ও নিষ্ফল।"

তৃতীয় ব্যবস্থা—অপরের নিকট যাঞ্ঝা না করিয়া ধৈর্যধারণ করিয়া থাকা। মানুষ লোভের বশীভূত না হইয়া ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে অভাবের তাড়নায় সে দুঃখ পাইবে সত্য, কিন্তু ধৈর্যহীন হইয়া লোভী হইলে তাহাকে অপমানিত ও দুঃখিত উভয়ই হইতে হইবে। কারণ, লোভের দরুন লোকে তাহাকে তিরস্কার করিবে এবং সে পরকালের শাস্তির আশঙ্কায় নিপতিত থাকিবে। অপরপক্ষে অভাবের সময় ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে পরকালে সে সওয়াবেরও ভাগী হইবে এবং ইহজগতে লোকেও তাহার প্রশংসা করিবে। অতএব অভাব-অনটনের ক্ষণিক তাড়নায় লোভের বশবর্তী হইয়া ইহজগতে লোকের ঘৃণা ও তিরস্কারের বোঝা বহন করত পরকালের শাস্তিতে নিপতিত হওয়া অপেক্ষা ইহকালে লোকের প্রশংসা ও সম্মানের পাত্র হইয়া পরকালে

সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "পরের মুখাপেক্ষী না হওয়াতেই মুসলমানদের সম্মান নিহিত আছে।" হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু বলেন- "তুমি যাহার মুখাপেক্ষী বস্তুত তুমি তাহার কয়েদী এবং যে তোমার মুখাপেক্ষী তুম তাহার প্রভু। অন্যথায় তোমরা উভয়েই সমান।"

চতুর্থ ব্যবস্থা—লোভের কারণ অনুসন্ধানপূর্বক ফেরেশতার গুণ অর্জনের চেষ্টা করা। মানুষের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, কি উদ্দেশ্যে তাহার হৃদয়ে লোভ জন্মে। উদর পূর্ণ করিবার জন্য যদি লোভ হইয়া থাকে তবে ভাবিয়া দেখ গরু, গর্দভ ইত্যাদি জন্তুও তো তাহা অপেক্ষা অধিক উদর পূর্ণ করিয়া আহার করে। কামবাসনা চরিতার্থের জন্য যদি লোব জন্মে তবে চিন্তা করিয়া দেখ, শুকর ও ভল্লুক তদপেক্ষা অধিক কামুক। আর যদি শান-শওকত ও নানা রঙ্গের বিচিত্র বসনভূষণের লোভ হইয়া থাকে তবে দেখ, অধিকাংশ য়াহূদী ও খৃষ্টান এই বিষয়ে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপরপক্ষে লোভ দমন করত অল্পে পরিতুষ্ট হইলে মানুষ আওলিয়া ও আম্বিয়াগণের গুণে গুনান্বিত হইয়া উঠে। অতএব নরাকৃতি হিংস্র পশু হওয়া অপেক্ষা ফেরেশতা-প্রকৃতির মানুষ হওয়া বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

পঞ্চম ব্যবস্থা—ধনের আপদ ও অনিষ্টকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা। সংসারে অধিক ধন হইলে বিপদের আশঙ্কা ও ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পরলোকে ধনী ব্যক্তি দীনহীন কাঙ্গাল অপেক্ষা পাঁচশত বৎসর পরে বেহেশ্তে গমন করিবে। সর্বদা নিজ অপেক্ষা নিঃস্ব দরিদ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; তাহা হইলে তোমার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল দেখিয়া আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিবে। কখনও তোমা অপেক্ষা ধনীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাকে যে সম্পদ দান করিয়াছেন, ইহা তোমার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা দরিদ্র তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর।" শয়তান সর্বদা প্ররোচণা দিতে থাকে- "অমুক অমুক লোক কত ধনবান! তুমি কেন অল্পে পরিতুষ্ট থাকিবে?" তুমি অবৈধ ও সন্দেহযুক্ত ধন বর্জন করিলে শয়তান বলে- "অমুক আলিম ত অবৈধ ও সন্দেহযুক্ত ধন বর্জন করে না; তুমিই-বা ইহা কেন বর্জন করিবে?" সাংসারিক বিষয়ে শয়তান সর্বদা এইরূপ প্ররোচণাই দিতে থাকে এবং ঐ প্রকার লোকদের দৃষ্টান্ত তোমার সম্মুখে উপস্থাপিত করে যাহারা পার্থিব বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অগ্রণী ও পারলৌকিক বিষয়ে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পারলৌকিক বিষয়ে সর্বদা বুযুর্গদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে; তাহা হইলে তুমি নিজকে চিনিতে পারিবে এবং বুঝিতে পারিবে যে, তুমি তাঁহাদের অপেক্ষা কত নীচ। আর পার্থিব বিষয়াদিতে নিঃস্ব দরিদ্রগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে যেন তুমি নিজকে ধনী বলিয়া মনে করিতে পার।

দানশীলতার ফযীলত ও সওয়াব

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, দরিদ্রের কর্তব্য লোভের বশীভূত না হইয়া অল্পে তুষ্টির পথ অবলম্বন করা; আর ধনীর উচিত কৃপণতা বর্জন করত দানশীলতার পথ অবলম্বন করা।

হাদীসে দানশীলতার ফযীলত—রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "সাখাওয়াত (দানশীলতা) বেহেশতের একটি বৃক্ষস্বরূপ। ইহার শাখাসমূহ দুনিয়াতে ঝুলিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি দানশীল সে ইহার একটি শাখা ধরিয়া লয় এবং এই শাখা তাহাকে বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। আর বুখল (কৃপণতা) দোযখের একটি বৃক্ষস্বরূপ। যে ব্যক্তি ইহার কোন শাখা ধরিয়া লয়, সে দোযখে যাইয়া উপস্থিত হয়।" তিনি বলেন- "দুইটি গুণ আল্লাহ্ অত্যন্ত ভালবাসেন- একটি দানশীলতা ও অপরটি সৎস্বভাব।" তিনি বলেন- "দুইটি প্রকৃতি আল্লাহ্ ঘৃণা করেন- একটি কৃপণতা অপরটি অসৎস্বভাব।" তিনি বলেন- "দানশীল ও সৎস্বভাবী হয় না, এমন কোন ওলী আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন নাই।" তিনি আরও বলেন- "দানশীল ব্যক্তির ত্রুটি মার্জনীয়; কারণ সে দুঃখকষ্টে নিপতিত হইলে আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।"

এক জিহাদে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কতকগুলি লোককে বন্দী করিলেন এবং একজন ব্যতীত সকলকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি সকলকে হত্যা করিলেন; কিন্তু একই ধর্ম, একই অপরাধ ও একই খোদা হাওয়া সত্ত্বেও এই ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন না কেন?" উত্তর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "জিবরাঈল আলায়হিস সালাম আসিয়া জানাইলেন যে, এই ব্যক্তি দানশীল এবং তজ্জন্য তাহাকে হত্যা করিতে নিষেধ করিলেন।" তিনি আরও বলেন- "দানশীল ব্যক্তির অন্ন (রোগের) ঔষধ এবং কৃপণের অন্ন হুবহু রোগ।" তিনি বলেন- "দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্, বেহেশত ও লোকদের নিকটবর্তী এবং দোযখ হইতে দূরবর্তী। আর কৃপণ আল্লাহ্ হইতে দূরে, বেহেশত হইতে দূরে, লোকদের হইতে দূরে; কিন্তু দোযখের নিকটবর্তী। আল্লাহ্ দানশীল মূর্খ ব্যক্তিকে কৃপণ আবিদ অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। (আন্তরিক) রোগসমূহের মধ্যে কৃপণতা জঘন্যতম রোগ।" তিনি অন্যত্র বলেন- "আমার উম্মতের আবদালগণ নামায রোযার কল্যাণে বেহেশতে যাইবে না, বরং দানশীলতা, হৃদয়ের পবিত্রতা, সদুপদেশ ও সৃষ্টির প্রতি তাহাদের মমতার জন্য বেহেশতে প্রবেশ করিবে।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ হযরত মূসা আলায়হিস সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ করিলেন- "সামিরীকে হত্যা করিও না;

কারণ সে দানশীল।" (সামিরী স্বর্ণ নির্মিত গোবৎসকে প্রভু বলিয়া ঘোষণা করে এবং ইহাকে সিজদা করিতে নির্দেশ দেয়। অসংখ্য বনী ইসরাঈল তাহার প্ররোচণায় উক্ত গোবৎসকে সিজদা করিয়া ঈমান হারায়)।

বুযুর্গগণের উক্তিতে দানশীলতার ফযীলত—হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন- "দুনিয়া তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলে তোমার নিকট সম্পদ আসিতেই থাকিবে; কাজেই নিশ্চিন্ত মনে সৎ কাজে ব্যয় কর। আর দুনিয়া তোমার প্রতি বিমুখ হইলে সম্পদ ত থাকিবেই না; কাজেই আল্লাহ্‌র পথে মুক্ত হস্তে খরচ কর।"

দানশীলতার উদাহরণ—এক ব্যক্তি হযরত ঈমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে স্বীয় আর্থিক দুরবস্থা লিখিয়া জানাইল। তিনি কাগজটি হাতে লইয়াই বলিলেন- "তোমার অভাব মোচন হইয়াছে।"(অর্থাৎ তিনি তাহাকে অভাব মোচনের পরিমিত অর্থ দানের আদেশ দিলেন)। লোকে জিজ্ঞাসা করিল- "আপনি কাগজটি পাঠ করিলেন না কেন? তিনি বলিলেন- "আমি ভয় করিতেছিলাম যে, যদি অপরের নিকট প্রার্থনাজনিত অপমানের সহিত তাহাকে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখি, তবে আমাকে আল্লাহ্‌র নিকট জওয়াবদিহি করিতে হইবে।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার পরিচারিকা হযরত উম্মে যাবরাহ (রা) হইতে হযরত মুহম্মদ ইব্‌নে মুন্‌কাদির রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার নিকট দুই থলি রৌপ্যমুদ্রা ও এক লক্ষ আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেন। তিনি তৎক্ষণাত উহা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তৎপর সন্ধ্যাকালে তাঁহার উক্ত পরিচারিকাকে ইফতারের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিবার আদেশ দিলে পরিচারিকা গৃহে গুশত ছিল না বলিয়া রুটি ও জয়তুন তৈল উপস্থিত করত নিবেদন করিলেন- "বিবি সাহেবা, আপনি সব ধন বিতরণ করিয়া দিলেন; আপনার পরিচারিকাগণের জন্য সামান্য গুশ্‌ত খরিদের উদ্দেশ্যে একটি দেরেম দিলে কোন ক্ষতি ছিল কি?" তিনি বলিলেন- "হাঁ, তখন স্মরণ করাইয়া দিলে আনাইয়া দিতাম।"

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এক সময় মদীনা শরীফে আগমন করিলে হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে নিষেধ করিলেন। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) প্রস্থানকালে হযরত হাসান (রা) পশ্চাদানুসরণ করিয়া তাহাকে জানাইলেন যে, তিনি ঋণগ্রস্ত। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) একটি উট পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, সেই উষ্ট্রপৃষ্ঠে আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা আছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) তৎক্ষণাত ঋণ পরিশোধের জন্য সমস্ত ধনসহ উটটি হযরত ইমাম হাসানকে (রা) দান করিলেন। হযরত আবূল হাসান মাদায়েনী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- একবার হযরত ইমাম হাসান, হযরত ইমাম হুসাইন ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জা'ফর

রাযিয়াল্লাহু আন্হুম হজ্জে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের খাদ্যবাহী উট পশ্চাতে রহিয়া গেল। একস্থানে ক্ষুৎপিপাসা খুব প্রবল হইয়া উঠিলে তাঁহারা এক বৃদ্ধার সমীপে উপস্থিত হইয়া কিছু পানীয় দ্রব্য চাহিলেন। বৃদ্ধার একটিমাত্র ছাগ ছিল। সে ইহা দোহন করিয়া তাহাদিগকে দুগ্ধপান করিতে দিল। তাঁহারা সকলেই পান করিলেন। তৎপর তাঁহারা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "আহারের কিছু আছে কি?" বৃদ্ধা বলিল- "হাঁ, এই ছাগটিই যবেহ্ করিয়া ইহার গুশ্ত আহার করুন।" তাঁহারা ছাগটি যবেহ্ করিয়া ইহার গুশ্ত আহার করিলেন এবং বলিলেন- "আমরা কুরায়শ বংশীয় লোক। আমরা এই সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে আমাদের নিকট আসিও। আমরা ইহার প্রতিদান দিব।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলে বৃদ্ধার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল- "যাহাদিগকে চিনও না এমন অপরিচিত লোকদিগকে আমার একমাত্র সম্বল ছাগটি পর্যন্ত খাওয়াইয়া দিলে?" ঘটনাচক্রে এই বৃদ্ধা ও তাহার স্বামী যথাসর্বস্ব হারাইয়া দেউলিয়া হইয়া পড়িল এবং মজুরী করিবার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে চলিয়া গেল। হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আন্হু বৃদ্ধাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাহাকে এক হাজার ছাগল ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। এইরূপে হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্হুও বৃদ্ধাকে এক হাজার ছাগল এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করত স্বীয় পরিচারকের সহিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আন্হুমার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও দুই হাজার ছাগল দান করিয়া বলিলেন- "তুমি প্রথমে আমার নিকট আসিলে এত অধিক পরিমাণে দান করিতাম যে, উক্ত দুই মহাত্মা তোমাকে এত দান করিতে পারিতেন না।" অতঃপর বৃদ্ধা চারি হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও চারি হাজার ছাগল লইয়া স্বীয় স্বামীর নিকট চলিয়া গেল।

হযরত আবূ সাঈদ খরগোশী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- 'মিশরে মুহ্তাসিব নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। সে দরিদ্রগণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া দিত। এক নিঃসম্বল দরিদ্রের গৃহে একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে সে মুহ্তাসিবের নিকট আগমন করিল। মুহ্তাসিব তাহাকে সঙ্গে লইয়া বহু লোকের নিকট তাহার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিল; কিন্তু কেহই কিছু দিল না। অবশেষে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া এক কবরের পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং তথায় উপবেশন করত ঐ কবরবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল- "ওহে পরলোকগত ব্যক্তি, আপনার উপর আল্লাহ্র দয়া বর্ষণ করুন। আপনি দীন-দরিদ্রদের দুঃখ দূর করিতেন এবং তাহাদের অভাব মোচন করিতেন। আমি আজ এই ব্যক্তির সদ্যপ্রসূত সন্তানের জন্য বহু লোকের নিকট সাহায্য চাহিলাম; কিন্তু কেহই কিছু দিল না।" ইহা বলিয়া মুহ্তাসিব উঠিয়া বসিল। তাহার নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে ইহা দ্বিখণ্ড করত এক খণ্ড এই দরিদ্রকে দিয়া বলিল- "ঋণস্বরূপ ইহা তোমাকে দিতেছি, অর্থ হইলে

পরিশোধ করিও।" ঐ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ইহা তাহার শিশু সন্তানের জন্য ব্যয় করিল। মুহ্তাসিব ঐ মৃত ব্যক্তিকে মধ্যরাত্রিতে স্বপ্নে দেখিল; তিনি বলিতেছিলেন- "তোমরাই এই ধনের অধিকারী; উহা গ্রহণ কর।" তাহারা বলিল, "সুবহানাল্লাহ্, মৃত ব্যক্তি তো দান করিলেন, আর আমরা জীবিত থাকিয়া কৃপণতা করিব?"

মুহ্তাসিব পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ঐ দরিদ্র ব্যক্তির নিকট গমন করিল। সে একটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া দ্বিখণ্ডিত করিল এবং একটি খণ্ড দ্বারা তাহার ঋণ পরিশোধপূর্বক মুহ্তাসিবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল- "অবশিষ্টগুলি লইয়া যাইয়া অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিন। আমার অর্ধ স্বর্ণমুদ্রারই আবশ্যক ছিল।" হযরত আবূ সাঈদ খরগোশী (রা) বলেন- "তাহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম দানশীল ও উত্তম, ইহা বুঝা দুষ্কর।" তিনি আরও বলেন- "আমি যখন মিশরে গেলাম তখন উক্ত মৃত ব্যক্তির বাড়ী অনুসন্ধান করিলাম। দেখিতে পাইলাম তাহার পুত্রগণের বদনমণ্ডলে সৌভাগ্যের নিদর্শনাবলী উদ্ভাসিত রহিয়াছে। তখন আমার এই আয়াতটি স্মরণ হইল وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا "তাহাদের উভয়ের পিতা সৎ ছিলেন।"

পরলোকগমনের পর দানশীলতার বরকত—প্রিয় পাঠক, পরলোকগমনের পরও দানশীলতার বরকত এবং ইহার নিদর্শনাবলী অবশিষ্ট থাকে শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিও না। অনুধাবন কর, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম স্বীয় গৃহে অতিথি রাখিতেন; ইহার ফলে অদ্যাবধি তাঁহার পবিত্র সমাধিস্থলে উহার বরকত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

একদা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু রোদন করিতেছিলেন। লোকে নিবেদন করিল- "হে আমীরুল মুমিনীন, রোদন করিতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন- "এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে চলিল, আমার গৃহে কোন অতিথি আসে নাই (এইজন্য আমি রোদন করিতেছি)।" এক ব্যক্তি তাহার জনৈক বন্ধুকে বলিল- "আমি চারিশত দেরেমের ঋণগ্রস্ত।" ইহা শোনামাত্রই সে তাহাকে চারিশত দেরেম দান করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ইহাতে তাহার স্ত্রী বলিল- "দান করত রোদন করিতে হইলে দান করিলে কেন?" সেই ব্যক্তি বলিল, -"রে বোকা, আমি তাহার অবস্থা সম্বন্ধে খবর লই নাই বলিয়া আমার নিকট তাহাকে চাহিতে হইতেছে, এইজন্য আমি রোদন করিতেছি।"

কৃপণতার জঘন্যতা—আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ যাহাকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে মুক্তি পাইয়াছে" (সূরা- হাশর, ১ রুকু, ২৮ পারা)।

আল্লাহ্ আরও বলেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الاية

অর্থাৎ "কখনই এইরূপ কল্পনাও করিও না যে, যাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদে কৃপণতা করে তাহারা ভাল করে। বরং ইহা তাহাদের জন্য নিতান্ত মন্দ। যে বস্তুতে তাহারা কৃপণতা করে শীঘ্রই সেই বস্তুর জিঞ্জির প্রস্তুত করত তাহাদের গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কৃপণতা হইতে দূরে থাক; কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী কওম কৃপণতার দরুণই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কৃপণতা তাহাদিগকে নরহত্যা কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল, অনন্তর তাহারা নরহত্যা করিল ও হারামকে হালাল মনে করিয়া লইল।" তিনি বলেন- "তিনটি বিষয় বিনাশকারী; প্রথম- কৃপণতা, যখন ইহার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া অনুসরণ করা হয়; দ্বিতীয়-অলীক কামনা যদি ইহার পশ্চাদনুসরণ করা হয়; তৃতীয়- নিজকে নিজে ভাল মনে করা।" হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া একটি উটের মূল্য চাহিল; তিনি দিয়া দিলেন। তাহারা বাহিরে যাইয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর সম্মুখে শুকরিয়া আদায় করিল! হযরত ওমর (রা) ইহা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জানাইলেন। হযরত (সা) বলিলেন- 'অমুক ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা অধিক লইয়া গেল, অথচ শুকরিয়া আদায় করিল না' অতঃপর তিনি আরও বলিলেন- 'তোমাদের মধ্যে কেহ আসিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া আমার নিকট হইতে যারা কিছু গ্রহণ করে, ইহা অগ্নিস্বরূপ।' হযরত ওমর (রা) নিবেদন করিলেন- 'অগ্নি হইলে আপনি দেন কেন?' তিনি বলিলেন- 'কারণ সে কাকুতি-মিনতি করে এবং আল্লাহ্ ইহা পছন্দ করেন না যে, আমি কৃপণতা করি ও দানে বিরত থাকি।"

একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কা'বা শরীফ তওয়াফ করিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি কা'বা শরীফের কড়া ধরিয়া বলিতেছিল- "হে দয়াময় আল্লাহ্, এই পবিত্র গৃহের বরকতে আমার গোনাহ্ মাফ কর।" তিনি ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- "তোমার গোনাহ্ কি প্রকার?" সেই ব্যক্তি বলিল- "আমার গোনাহ্ এত বড় যে আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।" তিনি বলিলেন- "তোমার গোনাহ্ বড়, না পৃথিবী বড়?" সেই ব্যক্তি বলিল- "আমার গোনাহ্ ইহা অপেক্ষা বহুগুণে বড়।" তিনি বলিলেন- "তোমার গোনাহ বড়, না আল্লাহ্ স্বয়ং বড়।" সেই ব্যক্তি বলিল- "স্বয়ং আল্লাহ্ ত সর্বাপেক্ষা বড়।" হযরত (সা) বলিলেন- "আচ্ছা, তোমার গোনাহ্ কিরূপ বর্ণনা কর।" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "আমি অতুল

ঐশ্বর্যের অধিকারী; কিন্তু দূর হইতে কোন অভাবগ্রস্তকে আসিতে দেখিলে আমার মনে হয় যেন আগুন আসিতেছে যাহাতে আমি জ্বলিয়া যাইব।" হযরত (সা) বলিলেন- "তুমি আমা হইতে দূরে থাক, যেন স্বীয় অগ্নিতে আমাকেও জ্বালাইয়া না ফেল। সেই আল্লাহ্র শপথ যিনি আমাকে সত্য পথে প্রেরণ করিয়াছেন, যদি তুমি সহস্র বৎসর রুক্ন্ ও মাকামের মধ্যবর্তী স্থানে (ইহা কা'বা শরীফে বিশেষ মরতবার স্থান) নামায পড়, এত রোদন কর যে তোমার অশ্রুতে নদী প্রবাহিত হইতে থাকে এবং বৃক্ষ জন্মে, আর তুমি কৃপণতার অপরাধে অপরাধী হইয়া পরলোকগমন কর, তবে তোমার স্থান দোযখ ব্যতীত আর কোথাও হইবে না। তোমার সতর্ক হওয়া আবশ্যক, কৃপণতা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত এবং কুফরীর পরিণাম অগ্নি। আফ্সোস, তুমি আল্লাহ্র বাণী শুন নাই? তিনি বলেন-

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ

'আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে যে, সে নিজের ক্ষতি সাধন করে।' (সূরা মুহাম্মদ, ৪ রুকূ; ২৬ পারা।) তিনি আরও বলেন-

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ যাহাকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে-ই মুক্তি পাইয়াছে।"

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "প্রত্যহ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য দুই জন ফেরেশ্তা নিযুক্ত করা হয় এবং তাহারা বলেন- ' হে আল্লাহ্, যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহার ধন ধ্বংস করিয়া দাও; আর যে ব্যক্তি (সৎকাজে) ব্যয় করে তাহাকে ইহার বিনিময়ে আরও দান কর।" হযরত ইমাম আবূ হানিফা রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- "কৃপণকে আমি পরহেযগার বলিয়া গ্রহণ করিব না। কারণ, কৃপণতার দরুন সে স্বীয় প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক লাভ করিবার অন্বেষণে থাকে।" হযরত ইয়াহ্ইয়া আলায়হিস সালাম শয়তানকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- "কোন্ ব্যক্তি তোর বড় শত্রু? আর কোন্ ব্যক্তি তোর অধিক প্রিয়পাত্র?" শয়তান বলিল- "সংসার বিরাগী কৃপণকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। কারণ, সে অতি কঠোর পরিশ্রমে আল্লাহ্র ইবাদত করে; কিন্তু কৃপণতা তাহার সমস্ত ইবাদত ধ্বংস করিয়া ফেলে। আর পাপাচারী দানশীল ব্যক্তিকে আমি বড় শত্রু বলিয়া মনে করি। কারণ সে খুব আমোদ-প্রমোদ করে এবং শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, দানশীলতার কারণে আল্লাহ্ হয়তো কোন সময় ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এবং সে তওবা করিয়া সৎপথে ফিরিয়া আসিতে পারে।"

নিজে অভাব বরণ করত পরের অভাব মোচন

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, নিজে অভাব বরণ করত পরের অভাব মোচন করাকে ঈছার বলে; ইহা দানশীলতা হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য অপরকে প্রদান করাই দানশীলতা। যে দ্রব্যে নিজের আবশ্যকতা রহিয়াছে ইহা অপরকে দান করা যেমন দানশীলতার চরমোৎকর্ষ, তদ্রূপ স্বয়ং নিজের আবশ্যক কার্যেও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া, এমন কি নিজে পীড়িত হইলেও ঔষধ পথ্যাদিতে খরচ না করিয়া অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া অভাব মোচনের আশা করা, কৃপণতার পরাকাষ্ঠা।

ঈছারের বড় ফযীলত রহিয়াছে। এই জন্যই আল্লাহ্ আনসারগণের ঈছারের প্রশংসা করিয়া বলেন–

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"তাহারা নিজের উপর অপরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে যদিও তাহাদের অভাব হয়।" (সূরা হাশ্‌র, ১ রুকূ, ২৮ পারা।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি তাহার নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে দান করে, আল্লাহ্ তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।" হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন– "রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহে আমরা কেহই কোন সময় ক্রমাগত তিন দিনও তৃপ্তির সহিত ভোজন করি নাই। আর আমরা (তৃপ্তির সহিত) ভোজন করিতেও পারিতাম না; কারণ আমাদের আবশ্যকতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমরা সমস্ত বিতরণ করিয়া দিতাম।"

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এক অতিথি আসিল; কিন্তু সেই দিন তাঁহার গৃহে খাদ্যদ্রব্য কিছুই ছিল না। এমন সময় জনৈক আনসারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু আসিয়া উক্ত অতিথিকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। তাহার গৃহেও আহার্য দ্রব্য অতি অল্পই ছিল। তিনি অতিথির সম্মুখে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য উপস্থাপিত করত প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন এবং আহারের ভান করিয়া মিছামিছি হাতমুখ নাড়িতে লাগিলেন যেন অতিথি মনে করে যে, তিনিও তাহার সহিত আহারে প্রবৃত্ত আছেন। পর দিবস রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উক্ত আনসারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– "তুমি ঐ অতিথির প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার ও ঈছার করিয়াছ, আল্লাহ্ ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিয়াছেন এবং এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

হযরত মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলেন–" হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আমাকে প্রদর্শন কর।"

আল্লাহ্ বলিলেন– "হে মূসা, উহা দর্শন করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। তবে মুহাম্মদের (সা) উন্নত মর্যাদার মধ্য হইতে একটি তোমাকে দেখাইব।" তৎপর একটি সোপান দেখাইলে সেই মহত্ত্ব ও দীপ্তিতে হযরত মূসা আলায়হিস সালাম অভিভূত হইয়া পড়ার উপক্রম হইলেন। অনন্তর হযরত মূসা আলায়হিস সালাম নিবেদন করিলেন– "হে খোদা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মর্যাদার এত উন্নত সোপান কিরূপে লাভ করিলেন?" প্রত্যাদেশ হইল– "ঈছারের কারণে।" আল্লাহ্ আরও বলিলেন– "হে মূসা, যে ব্যক্তি সমস্ত জীবনে একবারও ঈছার করে; তাহার নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ করিতে আমি লজ্জাবোধ করি। তাহার বাসস্থান বেহেশ্‌ত। সে যথায় ইচ্ছা তথায় থাকিতে পারিবে।"

একবার ভ্রমণকালে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর রাযিয়াল্লাহ্ আন্‌হু এক খোরমা বাগানে উপস্থিত হইলেন। এক কৃষ্ণকায় হাবশী গোলাম সেই বাগানে প্রহরীরূপে নিযুক্ত ছিল। তাহার জন্য তিনটি রুটি আনয়ন করা হইল; এমন সময় তথায় একটি কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। গোলাম একটি রুটি উঠাইয়া লইয়া কুকুরটির সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। কুকুরটি ইহা খাইয়া ফেলিল। গোলাম একে একে অপর দুইটি রুটিও কুকুরটির সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া দিল এবং ইহা এইগুলিও উদরস্থ করিয়া লইল। ইহা দেখিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "প্রত্যহ তুমি কি পরিমাণ আহার পাইয়া থাক?" সে বলিল– "অদ্যের ন্যায় তিনটি রুটি।" তিনি বলিলেন– "তুমি সবগুলি রুটি কুকুরকে দিলে কেন?" সে বলিল– "এই স্থানে কোন কুকুর নাই। আমি ভাবিলাম কোন দূরবর্তী স্থান হইতে ইহা আসিয়াছে। অতএব ক্ষুধিত অবস্থায় ইহা চলিয়া যাইবে, উহা আমার মনঃপুত হইল না।" তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– "আচ্ছা তুমি অদ্য কি আহার করিবে?" সে বলিল– "অদ্য অনাহারে ছবর করিয়া থাকিব।" তিনি বলিলেন– "সুবহানাল্লাহ্, লোকে ত আমাকে দানশীল বলিয়া মনে করে, কিন্তু দানশীলতা বিষয়ে এই হাবশী গোলাম ত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" অনন্তর হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) উক্ত গোলামটিকে খরিদ করত মুক্ত করিয়া দিলেন এবং খোরমার বাগানটিও ক্রয় করিয়া তাহাকে দান করিলেন।

কাফিরগণ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তাহারা রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে এই আভাস পাইয়া এক রজনীতে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিছানায় শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কাফিরগণ আক্রমণ করিতে আসিলে তিনিই হযরতের পরিবর্তে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন। এমন সময় আল্লাহ্ হযরত জিব্‌রাঈল (আ) ও হযরত মীকাঈল (আ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– "আমি তোমাদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছি এবং একজনকে অপরজন অপেক্ষা দীর্ঘায়ু করিয়াছি। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে অপরের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে?"

কিন্তু তাহারা উভয়েই দীর্ঘ পরমায়ু প্রার্থনা করিল। অনন্তর আল্লাহ্ বলিলেন– "তোমরা আলীর ন্যায় কার্য করিতে পারিলে না কেন? আমি মুহাম্মদের (সা) সহিত তাহার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছি। সে স্বীয় জীবন আমার প্রিয় বন্ধু ও রাসূলের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে এবং স্বীয় ভ্রাতার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এখন তোমরা উভয়ে যাইয়া তাহাকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা কর।" তাঁহারা তৎক্ষণাত হযরত আলীর (রা) নিকট আগমন করিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার শিয়রে ও হযরত মীকাঈল (আ) তাঁহার পদপ্রান্তে দন্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন– "সাবাস! হে আবূ তালেব তনয়, আনন্দিত হউন। আপনার বিষয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদের সম্মুখে গর্ব করিতেছেন। আর তিনি এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ الاية

'লোকের মধ্যে এমন লোক আছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বীয় জীবন দান করে।" (সূরা বকর, ২৫ রুকূ, ২ পারা।)

হযরত হাসান ইন্তাকী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি শ্রেষ্ঠ বুযুর্গগণের অন্যতম ছিলেন। একদা তাঁহার বন্ধুবর্গ হইতে ত্রিশের অধিক লোক তাঁহার গৃহে সমবেত হইলেন। সকলের আহারের উপযোগী রুটি তখন তাঁহার গৃহে ছিল না। সুতরাং রুটিসমূহ টুকরা টুকরা করিয়া সকলের সম্মুখে পরিবেশনপূর্বক গৃহের প্রদীপ সরাইয়া নেওয়া হইল। সকলেই আহারের নিমিত্ত উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পর প্রদীপটি আনয়ন করা হইলে দেখা গেল রুটির টুকরাসমূহ সকলের সম্মুখেই পূর্ববৎ রহিয়াছে। নিজে ভক্ষণ না করিয়া অপরকে দিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেহই ভক্ষণ করেন নাই। হযরত হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন– "তাবুকের যুদ্ধে বহু মুসলমান শহীদ হন। তন্মধ্যে আমার চাচাত ভাইও ছিলেন। পানি লইয়া আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তাঁহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম– 'হে ভ্রাত, পানি পান করিবেন কি?' তিনি বলিলেন– 'হাঁ, পান করিব।' এমন সময় তাঁহার পার্শ্ববর্তী অপর এক আহত ব্যক্তি 'আহা' করিয়া উঠিলেন। (ইহা শুনিয়া) আমার ভ্রাতা তাঁহার নিকট পানি লইয়া যাইতে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন। আমি যাইয়া দেখিলাম তিনি হযরত হেশাম ইব্ন আস (রা)। তিনিও তখন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁহাকে পানি পান করিতে বলিলাম। এমন সময় অপর এক ব্যক্তি 'আহা' বলিয়া চীৎকার করিল। হযরত হেশাম (রা) বলিলেন– 'প্রথমে ঐ ব্যক্তিকে পানি দাও।' তাঁহার নিকট আমি যাইতে না যাইতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপর আমি হযরত হেশামের (রা) নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম তিনিও ইন্তিকাল করিয়াছেন। অনন্তর আমার ভ্রাতার নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম তাঁহারও প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।"

বুযুর্গদের উক্তি এই যে, হযরত বিশ্রে হাফী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি ব্যতীত অপর কেহই যে অবস্থায় দুনিয়াতে আসিয়াছে অবিকল সেই অবস্থায় পরলোকগমন করিতে পারে নাই। হযরত বিশ্রে হাফীর (রা) অন্তিমকালে একজন ফকীর আসিয়া কিছু প্রার্থনা করিল। পরিধানের জামাটি ব্যতীত তখন তাঁহার আর কিছুই ছিল না। তিনি তৎক্ষণাত জামাটি খুলিয়া ফকীরকে দান করিলেন। তৎপর তিনি অপরের নিকট হইতে একটি জামা ধার লইয়া পরিধানপূর্বক ইন্তিকাল করিলেন।

দানশীলতা এবং কৃপণতার সীমা

দাতা এবং কৃপণের প্রকৃত পরিচয়

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, দুনিয়াতে প্রত্যেকেই নিজেকে দাতা বলিয়া মনে করে; অথচ অপর লোকের নিকট হয়ত সে কৃপণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই জন্যই কৃপণতার প্রকৃত পরিচয় লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ ইহা অন্তরের একটি কুৎসিত রোগ। রোগ-নির্ধারণ করিতে পারিলেই চিকিৎসা সহজ হইয়া উঠে। যে যাহা চায় তাহাই দান করিতে পারে, এইরূপ লোক কেহই নাই। অন্যে যাহা চায় তাহা দিতে অক্ষম হইলেই যদি কৃপণ হইতে হয়, তবে দুনিয়ার সকল লোকই কৃপণ বলিয়া অভিহিত হইবে।

কৃপণের পরিচয়—এই সম্পর্কে বুযুর্গগণের বহু উক্তি রহিয়াছে। অধিকাংশের অভিমত এই যে, শরীয়তের বিধান মতে যাহার উপর যে দ্রব্য দান করা ওয়াজিব, সে তাহা না দিলেই তাহাকে কৃপণ বলিয়া গণ্য করা হইবে। কিন্তু এই অভিমত ঠিক নহে। আমাদের মতে রুটি এবং গুশত বিক্রেতা ওজনে সামান্য কম দিলে যে ব্যক্তি উহা ফেরত দেয় তাহাকেই কৃপণ বলে। তদ্রূপ স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণ-পোষণের জন্য নির্ধারিত খরচের অতিরিক্ত যে কিছুই দেয় না সেও কৃপণ। কেহ খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে লইয়া খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় কোন ফকীর আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে না দিয়া খাদ্যদ্রব্য ঢাকিয়া রাখাও কৃপণতা; কারণ কৃপণ ব্যক্তি যাহা দিতে সমর্থ তাহা প্রদান করা হইতে বিরত থাকাকেই শরীয়তে কৃপণতার সীমা নির্ধারিত হইয়াছে; যেমন আল্লাহ্ বলেন–

اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ

"যদি তিনি তোমাদের নিকট উহা (সেই ধনসমূহ) চাহেন, অনন্তর তোমাদের সমুদয় ধন লইয়া লন তবে তোমরা কৃপণতা করিতে থাকিবে এবং তোমাদের অসৎ

সংকল্প (কৃপণতা) প্রকাশ হইয়া যাইবে।" (সূরা মুহাম্মদ, ৪ রুকূ, ২৬ পারা।) সুতরাং সমুদয় ধন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। অতএব অভ্রান্ত অভিমত এই যে, দেওয়ার যোগ্য বস্তু না দেওয়াকেই কৃপণতা বলে।

দাতার পরিচয়—ধন সৃষ্টির পশ্চাতে আল্লাহ্‌র এক গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। অতএব তাহার মঙ্গলময় বিধান মতে যখন দান করা উচিত তখন দানে বিরত থাকাই কৃপণতা। শরীয়ত ও মনুষ্যত্ব যাহা দিবার নির্দেশ দান করে তাহাই দিতে হইবে। শরীয়ত মতে যাহা দান করা ওয়াজিব তাহা নির্ধারিত আছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মর্যাদা রক্ষার্থ দানের সীমা ব্যক্তি বিশেষের অবস্থা ও ধনের পরিমাণ অনুসারে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ অনেক বিষয় আছে যাহা ধনীদের অভ্যাসানুসারে কুৎসিত বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু দরিদ্রের দৃষ্টিতে উহা মন্দ নহে। আত্মীয়-স্বজনের জন্য যাহা নিন্দনীয় অপরের জন্য তাহা দূষণীয় নহে। বন্ধুদের সহিত ব্যবহারে যাহা কুৎসিত তাহা সম্পর্কহীন অপরিচিত ব্যক্তিদের সহিত ব্যবহারে কুৎসিত নহে। অতিথি আপ্যায়নে যাহা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা মন্দ নহে। বৃদ্ধের নিকট যাহা জঘণ্য, যুবকের নিকট তাহা জঘণ্য নহে। আবার পুরুষদের নিকট যাহা মন্দ, নারীগণের নিকট তাহা মন্দ নহে। কোন সময় ধন সঞ্চয় করা বাঞ্ছনীয় হইলেও যখন ব্যয় করিবার তদপেক্ষা অধিক আবশ্যকতা দেখা দেয়, তখন ব্যয় না করা কৃপণতার মধ্যে গণ্য। কিন্তু যখন সঞ্চয় করা আবশ্যক তখন ব্যয় করাকে অপচয় বলে। আর কৃপণতা ও অপচয় উভয়টিই দূষণীয়। কোন অতিথি আগমন করিলে তাহার খাতির ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা অর্থ ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ধনের যাকাত দিলে আর অতিথি সৎকার করিতে হইবে না বলিয়া মনে করা অতি কুৎসতি কর্ম। কাহারও অতিরিক্ত ধন থাকা সত্ত্বেও তাহার পাড়া-প্রতিবেশী অনাহারে থাকিলে সেই ব্যক্তি কৃপণের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়ত ও মনুষ্যত্বের দাবী অনুসারে অত্যাবশ্যক খরচাদি করার পরও প্রচুর ধন অবশিষ্ট থাকিলে সওয়াব লাভের আশায় অতিরিক্ত দান-খয়রাত করা কর্তব্য। অপরপক্ষে আকস্মিক বিপদাপদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখাও আবশ্যক। কিন্তু ধন সঞ্চয় কার্যকে পরকালের সওয়াবের উপর প্রাধান্য দেওয়া বুযুর্গগণের দৃষ্টিতে কৃপণতার মধ্যে গণ্য। তবে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে ইহা কৃপণতা নহে, কারণ, তাহাদের দৃষ্টি অধিকাংশ সময় দুনিয়ার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। মোটের উপর সঞ্চয় ও দান উভয়টিই ব্যক্তি বিশেষের অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হইতে থাকে।

দানশীলতা ও কৃপণতার সীমা—শরীয়ত ও মনুষ্যত্বের নির্দেশ অনুসারে যাহা ওয়াজিব তাহা দান করিলেই কৃপণতা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তবে ইহার অতিরিক্ত দান না করিলে কেহই দানশীলতার মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। তৎপর যে যত অধিক দান করিবে সে তত অধিক দানশীলতার মর্যাদা লাভ করিবে এবং সেই

পরিমাণে তাহার সওয়াবও বৃদ্ধি পাইবে। দানকার্য সহজসাধ্য না হইয়া ইহাতে মনঃকষ্ট হইলে এইরূপ দাতাকে দানশীল বলা চলে না। আর কেহ ধন্যবাদ এবং প্রশংসা পাওয়ার আশায় দান করিলে সেও দানশীলতার মর্যাদা পাইবে না।

প্রকৃত দানশীল—বাস্তব পক্ষে যিনি বিনা স্বার্থে দান করেন, তিনিই প্রকৃত দানশীল। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত এইরূপ দানশীল হওয়া আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে যে ব্যক্তি একমাত্র পারলৌকিক সওয়াবের আকাংখায় দান করে তাহাকেই আমরা রূপকভাবে দানশীল বলিব; কেননা সে পার্থিব কোন বিনিময় চায় না। ইহাই দুনিয়ার দানশীলতা। অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রেমে আসক্ত হইয়া, এমন কি পারলৌকিক সওয়াবের আশা না করিয়া বিনা দ্বিধায় হৃষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় জীবন বিসর্জন দিতে পারে, তাহাকেই ধর্ম-পথে দানশীল বলে। কারণ, কোন দ্রব্যের লালসায় দান করিলে ইহাই দানের বিনিময় হইয়া পড়ে এবং তখনই দানশীলতা বিনষ্ট হইয়া যায়।

কৃপণতা হইতে অব্যাহতির উপায়—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, জ্ঞানমূলক ও অনুষ্ঠানমূলক উপায়ে কৃপণতা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

কৃপণতা বিনাশক জ্ঞানমূলক উপায়—প্রথমে কৃপণতার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে, কেননা রোগের কারণ অবগত না হইলে ইহার চিকিৎসা করা চলে না। প্রবৃত্তি যাহা চায় তৎপ্রতিই আকৃষ্ট হওয়া কৃপণতার প্রথম কারণ; কেননা ধন ব্যতীত মানুষের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ হইতে পারে না। দীর্ঘ পরমায়ুর কামনা কৃপণতার অপর কারণ; কেননা কৃপণ ব্যক্তি যদি জানে যে, সে এক মাস বা এক বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকিবে না তবে তাহার পক্ষে ধন ব্যয় করা সহজসাধ্য হয়। কৃপণতার তৃতীয় কারণ সন্তান-সন্ততি। স্বয়ং দীর্ঘ জীবনের আশা করিলে মানুষ যেমন কৃপণ হইয়া পড়ে, তাহার সন্তান-সন্ততি থাকিলে সুখ-স্বচ্ছন্দে তাহাদের জীবন যাপনের উপায় করিয়া দিতে যাইয়া মানুষ ততোধিক কৃপণ হইয়া উঠে। কারণ, স্বীয় সন্তান-সন্ততির স্থায়িত্বকে লোকে নিজের স্থায়িত্ব বলিয়াই বিবেচনা করে। এই জন্যই রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "সন্তান-সন্ততি মানুষের কৃপণতা, কাপুরুষতা ও অজ্ঞতার কারণ হইয়া থাকে।"

আবার কোন কোন সময় ধনাসক্তির দরুন মানব হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। কখন কখন আবার ধনাশক্তি লোভ-লালসা চরিতার্থের জন্য হয় না; বরং স্বয়ং ধনের প্রতিই মানুষ আসক্ত হইয়া পড়ে। (এমতাবস্থায়, কৃপণ ব্যক্তি সমস্ত জীবন একমাত্র ধন সঞ্চয়েই ব্যাপৃত থাকে।) সঞ্চিত ধন-সম্পত্তির আয় তাহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য যথেষ্ট; তথাপি কৃপণ ব্যক্তি পীড়িত হইলে চিকিৎসার জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করে না। আর সে যাকাতও দেয় না এবং সমস্ত ধন মাটির নীচে প্রোথিত করিয়া

রাখে। অথচ সে জানে যে, একদিন অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া তাহার জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া দিবে এবং তাহার সঞ্চিত ধনও তাহার শত্রুদের হস্তগত হইবে। কিন্তু তবুও কৃপণতা তাহাকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হইতে বিরত রাখে। যে ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সে অত্যন্ত কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত, তাহার আরোগ্য লাভের আশা দুরাশামাত্র।

কৃপণতার কারণসমূহ অবহিত হওয়ার পর ইহা বিনাশের উপায় অবলম্বন কর। অল্পে তুষ্ট থাক এবং ধৈর্যধারণপূর্বক অভিলাষিত বস্তুর কামনা পরিহার কর। তাহা হইলে তুমি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যে, ধনের প্রতি তোমার কোন লক্ষ্যই থাকিবে না। দীর্ঘ পরমায়ুর কামনাজনিত কৃপণতা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে মৃত্যু চিন্তা অধিক কর। একবার অনুধাবন কর তোমারই মত কত মানুষ পরকাল সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিল; অতর্কিতভাবে মৃত্যু আসিয়া তাহাদের জীবনের যবনিকাপাত করিল এবং অপরিসীম দুঃখ-যাতনা ব্যতীত পরকালের সম্বল আর কিছুই তাহারা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিল না। আর শত্রুগণ তাহাদের মৃত্যুতে মৌখিক শোক প্রকাশ করত তাহাদের ধনসম্পদ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইল। তোমার সন্তান-সন্ততির অভাব-অনটন হইতে অব্যাহতির উদ্দেশ্যেও তাহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার চলিবার উপায় করিবার জন্য যদি তুমি কৃপণতা অবলম্বন করিয়া থাক, তবে বুঝিয়া লও, যে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই তাহাদের জীবিকার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং একমাত্র তাঁহার উপরই ভরসা কর। তাহাদের অদৃষ্টে দরিদ্রতা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে তোমার কৃপণতায় তাহারা সম্পদশালী হইতে পারিবে না। তুমি অগাধ ধন রাখিয়া গেলেও তাহারা ইহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে। আর তাহাদের অদৃষ্টে ধন থাকিলে যে কোন স্থান হইতেও হউক না কেন, ইহা স্বতঃই তাহাদের হস্তে আসিয়া সংগৃহীত হইবে। এইরূপ বহু ধনীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাদের পিতৃপুরুষদের এক কপর্দকও লাভ করে নাই। অপরপক্ষে, এমন লোকও বিরল নহে, যে অতুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও যথাসর্বস্ব বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে দীনহীন পথের ভিখারী সাজিয়াছে।

প্রিয় পাঠক, দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর, সন্তান-সন্তুতি আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ হইলে আল্লাহ্‌ই তাহাদের অভাব মোচন করিবেন। আর সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নাফরমান হইলে দীনহীন দরিদ্র হওয়াই তাহাদের পক্ষে যুক্ত সঙ্গত; তাহা হইলে পাপকার্যে ধনের অপচয় হইবে না। তৎপর দানশীলতার প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা সম্বন্ধে যে সকল হাদীস রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ কর এবং বুঝিয়া লও যে, কৃপণ যত বড় আবিদই হউক না কেন, তাহার স্থান দোযখ ব্যতীত আর কোথাও নাই। সৎকার্যে ধন ব্যয় করত মানুষ নিজকে দোযখের অগ্নি ও আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা করিবে, এতদ্ব্যতীত ধনের আর কি উপকারিতা আছে? কৃপণের অবস্থার

প্রতিও একবার অনুধাবন কর। লোকচক্ষে সে মন্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; সকলেই তাহাকে স্বীয় শত্রু বলিয়া গণ্য করে এবং তাহার দুর্নাম রটনা করে। ভালরূপে স্মরণ রাখ, কৃপণতা করিলে লোক তোমাকেও মন্দ বলিয়া জানিবে এবং তাহাদের দৃষ্টিতে তুমি হেয় হইয়া পড়িবে।

কৃপণতা বিনাশক অনুষ্ঠানমূলক উপায়—উল্লিখিত কথাসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করিলে যদি বুঝিতে পার যে, কৃপণতা রোগে ঐ ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এবং ধন খরচের বাসনা হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই অনুষ্ঠানমূলক উপায় অবলম্বন করিবে। দানের কথা মনে হওয়া মাত্রই দান করিতে আরম্ভ করিবে। হযরত আবুল হাসান আবু সাবহা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি একদা পায়খানার ভিতর হইতে স্বীয় শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন– "আমার পিরহানটি লও এবং অমুক ফকীরকে দান কর।" শিষ্য নিবেদন করিল– "হে শায়খ, পায়খানা হইতে বাহির হইয়াও ত আপনি এই আদেশ দিতে পারিতেন? এই সময় পর্যন্ত আপনি ধৈর্যধারণ করিয়া রহিলেন না কেন?" তিনি বলিলেন– "মনে অন্য ভাব উদয় হইয়া আমাকে এই দান কার্য হইতে বিরত রাখে কিনা আমার এই আশঙ্কা হইয়াছিল।" মোটের উপর ধন খরচ না করিলে কৃপণতা বিদূরিত হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলে প্রেমাসক্তির যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না তদ্রূপ বিতরণপূর্বক ধন হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলে ধানসক্তি হইতে মুক্তি পাওয়াও সম্ভবপর নহে। কৃপণতাবশত ধন সঞ্চয় করা অপেক্ষা ধনাসক্তি হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে ইহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা বহুগুণে ভাল।

কৃপণতা অপসারণের কৌশল—কৃপণতা অপসারণের একটি সূক্ষ্ম কৌশল ও নির্দোষ উপায় এই যে, তুমি নিজকে যশোলুব্ধ করিয়া তুলিবে এবং মনে মনে নিজকে বলিবে–"খুব দান করিতে থাক, তাহা হইলে লোকে তোমাকে দানশীল বলিয়া মনে করিবে এবং তোমার যশ কীর্তন করিবে।" এইরূপে সম্মান লিপ্সাকে ধন লিপ্সার উপর চাপাইয়া দিবে। এই কৌশলে ধন লিপ্সা অপসারিত হইলে তখন রিয়া দূর করিবার উপায় অবলম্বন করিবে। শিশুকে মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইবার কৌশলের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে; যেমন– শিশু একটু বড় হইয়া উঠিলে মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে এমন বস্তুর আস্বাদনে লাগানো হয় যাহাতে সে আনন্দ পায় ও মাতৃস্তন ভুলিয়া থাকে। মানব হৃদয়ে যে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি জন্মে উহা দমনের একটি অতি সুন্দর উপায় এই যে, একটি কুপ্রবৃত্তির উপর অপর একটি কুপ্রবৃত্তি চাপাইয়া দিবে। এইরূপে একটির প্রভাবে অপরটি বিলুপ্ত হইবে। একটি উপমা দ্বারা ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে। মনে কর, বস্ত্রে রক্তের দাগ লাগিয়াছে এবং পানি দ্বারা ধৌত করিলে ইহা উঠিতেছে না। এমতাবস্থায়, বস্ত্রটি পেশাব দ্বারা ধৌত করিলে ইহার ক্ষার জাতীয় পদার্থের কারণে বস্ত্রের দাগ উঠিয়া যাইতে পারে। আর বস্ত্রটি

তখন পানি দ্বারা ধৌত করিয়া লইলেই পাক হইয়া যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা তখনই ফলপ্রদ হইবে যখন রিয়া তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হয় না।

যদিও কৃপণতা এবং সম্মান লিপ্সা মানব-প্রকৃতির সহিত জড়িত রহিয়াছে, কিন্তু জানিয়া রাখ, মানব-প্রকৃতির অলিগলি আবর্জনা পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় স্থানও আছে, আবার পুষ্পোদ্যানও আছে। কৃপণতা এই আবর্জনা পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় স্থান, আর দানশীলতা পুষ্পোদ্যান। রিয়া ও সুনামের লালসায় দান করা হারাম নহে; কারণ, শুধু ইবাদত কার্যেই রিয়া হারাম। অতএব নিজ দোষ চাপিয়া রাখার জন্য কৃপণের পক্ষে ইহা বলা শোভা পায় না যে, অমুক ব্যক্তি রিয়া বশত দান করিয়া থাকে। কেননা, পুষ্পোদ্যানে থাকা যেমন আবর্জনা পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় স্থানে থাকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তদ্রূপ কৃপণতার দরুণ দান হইতে বিরত থাকা অপেক্ষা রিয়ার বশীভূত হইয়া দান করা উৎকৃষ্ট। উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা কৃপণতা অপসারণের উপায়, অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টে হইলেও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে দান করত ইহার অভ্যাস করিয়া লইতে হইবে।

মুরীদের কৃপণতা দূরীকরণে পীরের ব্যবস্থা—কোন কোন কামিল পীর স্বীয় মুরীদগণের কৃপণতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই উপায় অবলম্বন করিতেন যে, তাঁহার প্রত্যেক মুরীদকে অবস্থানের জন্য পৃথক পৃথক নির্জন কক্ষ নির্ধারিত করিয়া দিতেন, যেন সেই নির্ধারিভ কক্ষের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। মুরীদের মন কক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে তাহাকে অন্য কক্ষে স্থানান্তরিত করিয়া অপরকে তাহার কক্ষ দেওয়া হইত। মুরীদকে সুন্দর জুতা পরিধান করিতে দেখিয়া পীর যদি বুঝিতেন যে, উহা তাহার নিকট উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে তবে সেই জুতা অপরকে দান করিবার আদেশ করিতেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার স্বীয় পাদুকা মুবারকে নতুন ফিতা লাগাইলেন। নামাযের সময় এই ফিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইলে তিনি বলিলেন—"সেই পুরাতন ফিতা আনয়ন কর।" তৎপর হযরত (সা) নুতন ফিতাটি খুলিয়া পাদুকাতে ঐ পুরাতন ফিতা লাগাইয়া লইলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই কার্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই ধনাসক্তি দূর করিবার উপায়। কারণ, কোন বস্তু হইতে শারীরিক বিচ্ছেদ না ঘটিলে ইহার ভালবাসা অন্তর হইতে লোপ পায় না। দরিদ্রের হস্তে ধন নাই বলিয়াই তাহার অন্তর প্রশস্ত ও উদার। কিন্তু আবার তাহার হস্তে কিছু ধন সঞ্চিত হইলেই সে কৃপণ হইয়া পড়ে। মানুষের হাতে যে বস্তু নাই উহার প্রতি তাহার হৃদয়ও উদাসীন থাকে।

একটি কাহিনী—এক ব্যক্তি কোন বাদশাহ্‌কে একটি ফিরোজা রত্নখচিত মূল্যবান পেয়ালা উপহারস্বরূপ প্রদান করিল। ইহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ও অতুলনীয় ছিল। বাদশাহ্‌র দরবারে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন—"এই পেয়ালা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ?" তিনি বলিলেন—"আমি দেখিতেছি, এই পেয়ালা পরিণামে আপনাকে দুঃখ দিবে অথবা অভাবে ফেলিবে। ইহা হস্তগত হওয়ার পূর্বে আপনি এই উভয় অবস্থা হইতে নিশ্চিত ছিলেন।" বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, কিরূপে ইহা ঘটিবে ?" জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন—"ইহা ভাঙ্গিয়া গেলে আপনি দুঃখ পাইবেন, কেননা ইহা অতুলনীয়। আর ইহা চোরে অপহরণ করিলে আপনি ইহার অভাব অনুভব করিবেন।" ঘটনাচক্রে পেয়ালাটি একদিন ভাঙ্গিয়া গেল। বাদশাহ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন— "সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সত্যই বলিয়াছিলেন।"

ধনরূপ বিষের মন্ত্র

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, ধনকে সর্পের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কেননা উপরের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারিয়াছ যে, সর্পের ন্যায় ধনে বিষ ও ইহার প্রতিষেধক উভয়ই রহিয়াছে। যে ব্যক্তি মন্ত্র না শিখিয়া সাপ ধরিতে যায় সে-ই নিজকে ধ্বংস করিবে। ধন যে সম্পূর্ণরূপে মন্দ তাহা নহে, ইহাতে কতিপয় উপকারিতাও রহিয়াছে। এইজন্যই হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ প্রমুখ সাহাবা (রা) ধনবান ছিলেন। ধনবান হওয়া দূষণীয় নহে। কিন্তু কোন বালক সাপুড়িয়াকে সাপ ধরিয়া পেটরায় রাখিতে দেখিয়া যদি মনে করে যে, সর্পের স্নিগ্ধতা ও ইহার স্পর্শসুখ লাভের উদ্দেশ্যেই সাপুড়িয়া সাপ ধরিতেছে এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সেই বালকও সাপ ধরিবার দুঃসাহস করে, তবে বিষধর সর্প-দংশনে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। ধনরূপ বিষের পাঁচটি মন্ত্র আছে।

প্রথম মন্ত্র—আল্লাহ্ কর্তৃক ধন সৃজনের কারণ অবগত হওয়া। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আহার, পোশাক ও আবাসের জন্য ধনের প্রয়োজন। মানবদেহ রক্ষার্থে এই সকল বস্তু অপরিহার্য এবং ইন্দ্রিয় ধারণার্থ দেহের আবশ্যক। বুদ্ধি সংরক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। বুদ্ধিকে আবার হৃদয়ের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে যেন হৃদয় তদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভে সমর্থ হয়। ইহা সম্যকরূপে অবগত হইলে মানব কেবল অভাব মোচন-উপযোগী ধন উপার্জনে মনোনিবেশ করিবে এবং সৎকার্যে পরিমিতভাবে ব্যয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে।

দ্বিতীয় মন্ত্র—ধনাগমনের পন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা, যেন উপার্জিত ধন হারাম ও সন্দেহযুক্ত এবং মানবোচিতভাবের পরিপন্থী না হয়; যেমন- ঘুষ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং হাম্মামখানার উপার্জিত ধন গ্রহণ ইত্যাদি।

তৃতীয় মন্ত্র—প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় না করা। স্বীয় অভাব মোচন ও ধর্ম-পথে ব্যয়ের জন্য যাহা আবশ্যক তদতিরিক্ত ধন অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য বলিয়া মনে

করিবে। কোন অভাবগ্রস্থ লোক আগমন করিলে তদতিরিক্ত ধন তাহাকে দান করিয়া দিবে, সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না। নিজের প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তোমার যথাসর্বস্ব অপরের অভাব মোচনের জন্য দান করিতে যদি অক্ষম হও, তবে ব্যয়ের উপযোগী স্থানে অবশ্যই ব্যয় করিবে।

চতুর্থ মন্ত্র—মিতব্যয়িতা। পরিমিত ব্যয় করিবে, কখনও অপব্যয় করিবে না। অল্পে পরিতুষ্ট থাকিবে এবং সৎকার্যে ব্যয় করিবে। কেননা, অন্যায়ভাবে উপার্জন যেমন অবৈধ, অন্যায়ভাবে খরচও তদ্রূপ অবৈধ।

পঞ্চম মন্ত্র—বিশুদ্ধ সংকল্প। উপার্জন, ব্যয় ও সঞ্চয় করিতে নিয়ত ঠিক রাখিবে। শুধু ইবাদতকার্যে অবকাশ ও সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে ধনার্জন করিবে। যে ধন তুমি অর্জন কর তাহা যেন একমাত্র দুনিয়ার প্রতি তোমার ঘৃণা ও তোমার বৈরাগ্য ভাবের জন্যই হয়। তাহা হইলে দুনিয়ার চিন্তা হইতে তোমার মনকে পবিত্র ও মুক্ত রাখিয়া তুমি আল্লাহ্র যিকিরে মনোনিবেশ করিতে পারিবে। আর যাহা তুমি সঞ্চয় কর তাহা কেবলমাত্র ধর্মপথে ব্যয়, ধর্মকার্যে অবকাশ ও সুযোগ লাভ এবং ভবিষ্যতে কোন কঠিন সঞ্চিত ধন ব্যয়ের জন্য সর্বদা উপযুক্ত সময় ও স্থানে প্রতিরক্ষায় থাকিবে। উপযুক্ত সময় ও স্থান দেখিলেই ইহা ধরিয়া রাখিয়া ব্যয় করিয়া ফেলিবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য করিলে ধনে মানুষের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। তখন ধন বিষতুল্য হয় না; বরং এমতাবস্থায় ইহাকে বিষের প্রতিষেধকস্বরূপ গণ্য করা হয়। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হযরত আলী করারামাল্লাহু অজহাহু বলেন—"কোন ব্যক্তি সমস্ত জগতের ধন লাভ করিয়া সংসারে অদ্বিতীয় ধনী হইলেও সে সংসারবিরাগী (যদি তাহার ধনলাভ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে), আর যে ব্যক্তি সমস্ত জগত পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইহা করা হয় নাই, তবে সে ব্যক্তি সংসারবিরাগী নহে।" তোমার মনকে সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদত ও পরকালের দিকে নিবিষ্ট রাখিবে। তাহা হইলে তোমার সমস্ত গতিবিধি, কাজ-কারবার এমন কি আহার, পায়খানায় যাতায়াত ইত্যাদি কার্য ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং এই সকল কার্যে সওয়াবও লাভ করিবে, কারণ, ধর্ম-পথে চলিতে হইলে এই সমস্তেরও আবশ্যকতা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষের যাবতীয় কার্য ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, একমাত্র বিশুদ্ধ সংকল্পের উপরই নির্ভর করে।

অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় না করাই উত্তম—অধিকাংশ লোকই সংকল্প বিশুদ্ধ করিতে পারে না এবং উল্লিখিত বিষমন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। আর কেহ কেহ জ্ঞাত থাকিলেও উহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে না। সুতরাং যথাসম্ভব ধন হইতে দূরে সরিয়া থাকাই উত্তম ব্যবস্থা। কারণ, অতিরিক্ত ধন ব্যক্তিবিশেষকে গর্বিত ও আল্লাহ্র স্মরণ হইতে অন্যমনস্ক করিতে না পারিলেও ইহার দরুন সে পরকালে উচ্চ মর্যাদা

লাভে বঞ্চিত থাকে। ইহা তাহার পক্ষে অপরিসীম ক্ষতি। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আন্হু অতুল ধন-সম্পদ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহা দেখিয়া জনৈক সাহাবী (রা) বলেন—"প্রচুর ধন-সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার ভয় হইতেছে।" ইহা শুনিয়া হযরত কা'ব আহ্বার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন—"সুব্হানাল্লাহ্, তোমরা ভয় কর কেন ? তিনি বৈধ উপায়ে ধন অর্জন করিয়াছেন এবং সঠিকভাবে উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট সম্পত্তিও বৈধভাবে অর্জিত। এমতাবস্থায়, তাঁহার জন্য ভয় কি ?" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উটের একটি হাড় হস্তে গৃহের বাহির হইলেন এবং প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে হযরত কা'ব আহ্বারকে (রা) অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পালাইয়া গিয়া হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আন্হুর গৃহে আশ্রয় লইলেন। হযরত আবূ যরও (রা) তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরত কা'ব আহ্বারকে (রা) সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে য়াহূদী তনয়, তুমি বলিতেছ হযরত আবদুর রহমান যে ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন উহাতে কি ক্ষতি ? একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম ওহুদ পর্বতের দিকে গমন করিতেছিলেন; আমি তাঁহার সহিত ছিলাম। তিনি বলিলেন- 'হে আবূ যর।' আমি উত্তর দিলাম- 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি।' তিনি বলিলেন- 'যে ব্যক্তি ডানে-বামে, অগ্র-পশ্চাতে ধন বিতরণ করিয়া দেয় এবং সৎকার্যে ব্যয় করে, এমন লোক ব্যতীত সকল ধনী ব্যক্তির মর্যাদাই পরকালে সর্বাপেক্ষা কম হইবে এবং তাহারা সর্বশেষে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে। হে আবূ যর, আমি পছন্দ করি না যে, আমার কয়েকটি ওহূদ পর্বত পরিমিত ধন হউক, আর আল্লাহ্র রাস্তায় আমি ব্যয় করি এবং আমার পরলোকগমনের সময় দুই কিরাত (প্রায় ছয় পয়সা) পরিমিত ধন অবশিষ্ট থাকুক।' রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন এই কথা বলিয়াছেন তখন হে য়াহূদীর সন্তান, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য নহে।" উপস্থিত সকলেই হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহ্ আন্হুর কথাগুলি শুনিলেন' কিন্তু কেহই কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না।

এক দিনের ঘটনা। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আন্হুর তেজারতী উষ্ট্রদল পণ্যসম্ভার লইয়া য়ামন হইতে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করিলে মদীনাতে ধুমধাম পড়িয়া গেল। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকে ঐ উষ্ট্রদলের আগমনবার্তা জানাইল। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন- "রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বাণী সত্যে পরিণত হইল।" ইহা শ্রবণে কৌতূহলী হইয়া হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ তৎক্ষণাৎ হযরত আয়েশার (রা) নিকট গমনপূর্বক নিবেদন করিলেন- "হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কি বলিয়াছিলেন?" তিনি উত্তরে

বলিলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন- 'আমাকে বেহেশ্ত দেখানো হইল। দেখিলাম, আমার সাহাবাগণের মধ্যে যাহারা দরিদ্র তাহারা দৌড়াইয়া বেহেশ্তে প্রবেশ করিতেছে। আর আবদুর রহমান ইবনে আওফকে ব্যতীত আমার ধনী সাহাবাদের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সে হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে বেহেশতের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিল।" ইহা শুনিয়া হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলিলেন- "আল্লাহ্ যেন আমাকে ঐ দরিদ্র সাহাবাগণের সহিত বেহেশ্তে প্রবেশের সৌভাগ্য দান করেন, এই উদ্দেশ্যে আমার সমস্ত উট উহাদের পৃষ্ঠের পণ্যসম্ভারসহ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিয়া দিলাম এবং গোলামদিগকে মুক্ত করিলাম।" একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবদুর রহমান ইব্নে আওফকে (রা) লক্ষ্য করিয়া বলেন-"আমার উম্মতের সকল ধনীর মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে; কিন্তু বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে।"

কিয়ামতে ধনী ব্যক্তির হিসাব-নিকাশ—একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী (রা) বলেন- "প্রত্যহ যদি বৈধ উপায়ে আমার সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপার্জিত হয় এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ইহা ব্যয় করিতে পারি, অথচ ইহার দরুন নামাযের জামা'আত হইতে আমাকে বঞ্চিত থাকিতে না হয়, তথাপি এইরূপ উপার্জন আমি পছন্দ করি না।" লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন- 'হে বান্দা, তুমি কোথা হইতে অর্জন করিয়াছ এবং কোথায় খরচ করিয়াছ।' এই প্রশ্নের উত্তর ও হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন- 'কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে, যে অবৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করিয়া অবৈধ কার্যে অপচয় করিত। তাহাকে দোযখে পাঠানো হইবে। তৎপর অপর এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে। সে বৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করিয়া অবৈধ কার্যে ব্যয় করিত। তাহাকেও দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহার পর তৃতীয় এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে। সে অবৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করিয়া বৈধ কার্যে ব্যয় করিত। তাহাকেও দোযখে পাঠানো হইবে। অনন্তর চতুর্থ এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে। সে বৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করিয়া বৈধ কার্যে ব্যয় করিত। তাহাকেও দোযখে পাঠানো হইবে। অনন্তর চতুর্থ এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে। সে বৈধ উপায়ে ধন অর্জন করিয়া বৈধ কার্যেই ব্যয় করিত। তাহাকে থামাইতে আদেশ করা হইবে। কারণ, সে হয়ত ধন উপার্জনে লিপ্ত থাকিয়া পবিত্রতা সাধনে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়াছে বা যথারীতি রুকু ও সিজদা সম্পন্ন করে নাই বা যথাসময়ে নামায আদায় করে নাই। (এই সকল বিষয়ে তাহার নিকট হইতে তন্ন তন্ন করিয়া হিসাব গ্রহণ করা হইবে।) সেই ব্যক্তি নিবেদন করিবে- 'হে খোদা, আমি বৈধ উপায়ে ধন অর্জন করিয়া উপযুক্ত স্থানে ন্যায্যভাবে ব্যয় করিয়াছি, কোন ফরয কার্য সমাধানে কোন ত্রুটি করি নাই এবং ধন-সম্পদের কারণে কখনও গর্ব করি

নাই।' (সে এই সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাহাকে বলা হইবে, থাম) তুমি হয়ত বহু মূল্য ঘোড়া রাখিয়াছ এবং উত্তম বসন-ভূষণ পরিধান করিয়াছ ও গর্বভরে বিচরণ করিয়াছ। সেই ব্যক্তি নিবেদন করিবে-'হে খোদা, ধন লাভ করিয়া আমি কখনও আত্মগর্ব প্রকাশ করি নাই।' তখন তাহাকে বলা হইবে-'হয়ত তুমি কোন য়াতীম, দরিদ্র, প্রতিবেশী বা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির প্রতি তোমার কর্তব্য যথাযথ পালন কর নাই।' সেই ব্যক্তি নিবেদন করিবে- 'হে খোদা, আমি বৈধ উপায়ে ধন উপার্জন করিয়া হক পথে ব্যয় করিয়াছি। আর কোন ফরয কার্যেও আমার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় নাই।' এমন সময় বহু লোক আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবে এবং নিবেদন করিবে- 'হে খোদা, আমাদের মধ্যে এই ব্যক্তিকে আপনি ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলেন, সে আমাদের হক ঠিকভাবে আদায় করিয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করুন।' তৎপর তাহাকে প্রত্যেকের হক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। যদি উহাতেও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হইয়া থাকে তবে তাহাকে আদেশ করা হইবে- দাঁড়াও এবং বল, আমি তোমাকে যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলাম, উহার কি শুকরিয়া আদায় করিয়াছ?' কিয়ামতের দিন ধনী ব্যক্তিকে এবং বিধ প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করা হইবে। হক পথে আয়-ব্যয় করিলে ধনলাভের জন্য কোন শাস্তির বিধান না থাকিলেও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়াদিরও হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া কোন বুযুর্গ সম্পদশালী হইতে সম্মত হন নাই।

দরিদ্রতার মহান আদর্শ—দরিদ্রতা অবলম্বন করাই যে উত্তম, বিশ্ববাসীকে ইহা বুঝাইবার জন্যই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাস দরবারে হাযির হইবার আমার অবাধ অধিকার ছিল। একদা তিনি আমাকে বলিলেন- 'ফাতিমা (রা) পীড়িত; চল তাঁহাকে দেখিয়া আসি।' আমরা তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে হযরত (সা) দ্বারে করাঘাতপূর্বক বলিলেন- "আসসালামু আলায়কুম, আমরা গৃহে প্রবেশ করিব কি? হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্হা নিবেদন করিলেন- 'আসুন।' হযরত (সা) বলিলেন- 'আমার সহিত আরও এক ব্যক্তি আছে।' হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন- 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা), আমার পরিধানে একটি পুরাতন কম্বল ব্যতীত আর কোন বস্ত্র নাই।' তিনি বলিলেন- 'এই কম্বল দ্বারাই স্বীয় শরীর ঢাকিয়া লও।' হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন- 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা সমস্ত শরীরে জড়াইয়া রাখিয়াছি; কিন্তু (ইহা এত ক্ষুদ্র যে) মস্তক অনাবৃত রহিয়াছে।' ইহা শুনিয়া হযরত (সা) স্বীয় পুরাতন চাদর মুবারক তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া তদ্দ্বারা মস্তক ঢাকিয়া লইতে বলিলেন। তৎপর

তিনি গৃহে প্রবেশ করত জিজ্ঞাসা করিলেন- "হে স্নেহের সন্তান, কেমন আছ?' হযরত ফাতিমা (রা) নিবেদন করিলেন- 'অত্যন্ত পীড়িত ও ব্যথাতুর আছি। এইরূপ পীড়িতাবস্থায় আবার ক্ষুধার্ত রহিয়াছি, এইজন্যই আরও অধিক কষ্ট হইতেছে। আর আহারেরও কিছুই নাই, ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য হইতেছে না।' ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন- 'হে ফাতিমা, ধৈর্যহারা হইও না। আল্লাহ্র শপথ, তিনদিন হইল আমিও কিছুই খাই নাই। আর আল্লাহ্র নিকট তোমা অপেক্ষা আমার মর্যাদা অনেক বেশী। আমি কিছু চাহিলে অবশ্যই তিনি দান করিতেন। কিন্তু আমি ইহকালের পরিবর্তে পরকাল অবলম্বন করিয়াছি।' তৎপর তিনি হযরত ফাতিমার (রা) স্কন্ধের উপর স্বীয় হস্ত মুবারক স্থাপনপূর্বক বলিলেন- 'সুসংবাদ শ্রবণ কর যে, আল্লাহ্র শপথ, তুমি বেহেশ্‌তে নারীকুলের সরদার হইবে।' হযরত ফাতিমা (রা) নিবেদন করিলেন 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা), ফিরআউন পত্নী আসিয়া ও হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের জননী মার্‌ইয়াম তবে কি হইবেন?' তিনি বলিলেন- 'তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ের নারীকুলের সরদার হইবে। তোমরা এত এক স্বর্ণরৌপ্যখচিত প্রাসাদে অবস্থান করিবে যথায় কোন গোলাম নাই, কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না ও কোন কর্মব্যবস্থতা নাই।' অনন্তর তিনি বলিলেন- ' হে স্নেহের কন্যা, আমার চাচাত ভাই- তোমার স্বামী- তোমাকে যাঁহার সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছি- যিনি ইহকালের (মানবের) সরদার- তিনি তোমার জন্য যথেষ্ট।"

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মানব ধনরূপ বিষের মন্ত্রে অতি সুনিপুণ এবং সুদক্ষ হইলেও ধনের প্রতি দৃক্‌পাত না করাই তাহার পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা; এমনকি ইহার নিকটবর্তী হওয়াও তাহার পক্ষে উচিত নহে। কেবল অভাব মোচন হয়, এই পরিমাণ ধন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। কারণ, সাপুড়িয়া পরিশেষে সর্প-দংশনেই প্রাণত্যাগ করে।

সপ্তম অধ্যায়

সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রতিকার এবং এতদুভয়ের বিপদসমূহ

সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার অপকারিতা- প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, বহু লোক সম্মান-লালসা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, সুখ্যাতি ও প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর এই কুপ্রবৃত্তিসমূহের কারণেই পরস্পর শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ গোনাহ্র কার্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। এই কুপ্রবৃত্তিগুলি অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষ ধর্মপথ হইতে সরিয়া যায় এবং হৃদয় তখন কপটতা ও কুস্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "বৃষ্টির পানি যেমন তৃণাদি জন্মায়, ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা তদ্রূপ মানব মনে কপটতা জন্মাইয়া থাকে।" তিনি আরও বলেন- "ধনাসক্তি ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা মানব হৃদয়ের যেরূপ ক্ষতিসাধন করে, দুইটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র ছাগলের পালে পতিত হইলে তদ্রূপ ক্ষতি করিতে পারে না।" তিনি এক সময় হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে বলেন- "দুইটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে। **প্রথম**—প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং **দ্বিতীয়**—নিজের গুণ ও প্রশংসা শ্রবণের লালসা। আর যে ব্যক্তি প্রভুত্ব ও ধন চায় না এবং অজ্ঞাত থাকিতে পছন্দ করে সেই ব্যক্তিই এই আপদ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন-

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ـ

"ঐ পরকাল সেই সমস্ত লোকের জন্য আমি নির্ধারিত করিতেছি যাহারা দুনিয়াতে না উঁচু হইতে চায় এবং না ফাসাদ চায়।" (সূরা কাসাস, ৯ রুকু, ২০ পারা)।

অজ্ঞাত পরহেযগারদের মর্যাদা—রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যাহারা ধূলায় ধূসরিত, দীনহীন দরিদ্র, মলিন বস্ত্র পরিহিত এবং যাহাদিগকে কেহই সম্মান করে না, যাহারা ধনীগণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে কেহই তাহাদিগকে (গৃহে) প্রবেশের অনুমতি দেয় না, বিবাহ করিতে চাহিলে কেহই তাহাদিগকে স্বীয় কন্যা দান করিতে চায় না, কিছু বলিলে কেহই তাহাদের কথা শুনে না এবং যাহাদের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তরেই তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, তাহারাই বেহেশ্‌তী। কিয়ামতের দিন তাহাদের নূর বন্টন করিলে সমস্ত লোকই ইহার

অংশ পাইতে পারিবে।" তিনি আরও বলেন- "ধূলি-ধূসরিত ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত লোকদের মধ্যে অনেকে এমন আছে যে, তাহারা যদি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বেহেশ্‌ত চায় তবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বেহেশ্‌ত প্রদান করিবেন; কিন্তু উম্মতের মধ্যে বহু লোক এমনও আছে যাহারা তোমাদের নিকট একটি পয়সা বা একটি শস্যদানা চাহিলে তোমরা দিবে না। আর তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট বেহেশ্‌ত চাহিলে তিনি বেহেশ্‌ত দান করিবেন; কিন্তু দুনিয়া চাহিলে কিছুই পাইবে না। দুনিয়া না পাওয়ার কারণে তাহারা তুচ্ছ নহে।"

একদা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু মসজিদে যাইয়া দেখিলেন হযরত মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু রোদন করিতেছেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- "আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সামান্য রিয়াও শিরকের মধ্যে গণ্য এবং আল্লাহ্ এমন অজ্ঞাত পরহেযগারদিগকে ভালবাসেন যাহারা নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে কেহই তাহাদের অনুসন্ধান করে না এবং উপস্থিত থাকিলে কেহই তাহাদিগকে চিনে না। তাহারা হেদায়েতের পথের উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ এবং সমস্ত কুপ্রবৃত্তি ও আবিলতা হইতে তাহারা মুক্ত।"

সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা ধর্মপথে প্রতিবন্ধক—হযরত ইবরাহীম আদহাম রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- " যে ব্যক্তি সুনাম ও সুখ্যাতি প্রিয় সে আল্লাহ্‌র ধর্মে অকপট নহে।" হযরত আয়ুব আলায়হিস সালাম বলেন- "লোকের নিকট পরিচিত হওয়ার অভিলাষ না করাই অকপটতার নিদর্শন।" হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর পশ্চাতে তাঁহার একদল শিষ্য গমন করিতেছিল। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) নিবেদন করিলেন- "হে আমীরুল মুমিনীন, লক্ষ্য করুন, আপনি কি করিতেছেন।" তিনি বলিলেন- "(তোমার) এই কাজ পশ্চাতে গমনকারীদের জন্য অপমানস্বরূপ; আর অগ্রে গমনকারীর জন্য গর্ব ও অহংকারের কারণ।" হযরত হাসান বসরী (র) বলেন,- "যে নির্বোধ ব্যক্তি অপর লোককে তাহার পশ্চাতে মতন করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহার অন্তর কোনরূপেই স্থির থাকিতে পারে না।" (অর্থাৎ তাহার অন্তরে আত্মম্ভরিতা দেখা দেয়)। একদা হযরত আয়ুব আলায়হিস সালাম ভ্রমণে বহির্গত হইলে একদল লোক তাঁহার পশ্চাতে চলিতে লাগিল দেখিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- "ভক্তি ভরে আমার পশ্চাতে চলাকে আমি যে ঘৃণা করি, ইহা যদি আল্লাহ্ না জানিতেন তবে আমি তাঁহার ভয়ে ভীত হইতাম।" হযরত সাওরী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- "নতুন বা অতি পুরাতন বলিয়া যাহা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন বস্ত্র পরিধান করাকে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ মাকরূহ (ঘৃণ্য) বলিয়া মনে করিতেন। বস্ত্র এইরূপ হওয়া আবশ্যক যাহার সম্বন্ধে (ইহা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হওয়ার দরুন) কেহই কিছু বলে না।" হযরত বিশ্‌রে

হাফী (র) বলেন- "যে ব্যক্তি লোকের নিকট পরিচিত হইতে ভালবাসে, অথচ সে অপদস্ত ও তাহার ধর্ম বরবাদ হয় নাই, এমন কাহাকেও আমি জানি না।"

সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার যথার্থ পরিচয়—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, কাহারও অধিকারে যদি প্রচুর ধন সম্পদ থাকে এবং ইহা যদৃচ্ছা ব্যয় করিবার তাহার স্বাধীন ক্ষমতা থাকে এবং তাহাদিগকে যদৃচ্ছা পরিচালনের ক্ষমতাও যাহার থাকে তাহাকেই প্রতিপত্তিশালী লোক বলে। অন্তর যাহার বশীভূত হয়, ধন এবং দেহও তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে। কাহারও প্রতি যতক্ষণ এই বিশ্বাস না জন্মিবে যে, তিনি শ্রেষ্ঠ, ততক্ষণ অপর লোকের মন তাঁহার বশীভূত হইতে পারে না।

শ্রেষ্ঠত্বের কারণ—পূর্ণ গুণরাজির সমাবেশ, জ্ঞানের গভীরতা, ইবাদতের আধিক্য, সৎস্বভাবের প্রাধান্য বা অপর কোন বস্তু যাহাকে লোকে মহত্ত্বের উপকরণস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছে ইত্যাদি কারণে মানুষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লোকে যাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করে অন্তর স্বভাবতই তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। তখন লোকে আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তাহার আদেশ পালন করিয়া চলে, তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, দেহকে তাহার খেদমতে নিয়োজিত করে এবং ধন-সম্পদ যথাসর্বস্ব তাহার পদতলে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়। গোলাম যেমন প্রভুর বশীভূত থাকে লোকেও তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির আজ্ঞাবহ ও বশীভূত থাকে। শুধু তাহাই নহে, গোলাম ত বলপ্রয়োগে বশীভূত হয়, কিন্তু তাহারা স্বেচ্ছায় হৃষ্টচিত্তে বশীভূত হয়।

প্রতিপত্তি-প্রিয়তার কারণ—মোটের উপর ধন দ্বারা বস্তুসমূহের অধিকার লাভ করা যায়; আর প্রতিপত্তি দ্বারা লোকের অন্তর জয় করা চলে। তিনটি কারণে অধিকাংশ লোক ধন অপেক্ষা প্রতিপত্তিকে অধিক ভালবাসে। **প্রথম কারণ**—ধনের সাহায্যে মানুষ তাহার সকল অভাব মোচন করিতে পারে, এইজন্যই ধন প্রিয় বস্তু। প্রতিপত্তি লাভেও ঠিক এই উদ্দেশ্যেই সফল হয়। বরং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে ধন লাভ করা নিতান্ত সহজসাধ্য। অপরপক্ষে যদি কোন ইতর ব্যক্তি ধনের বলে প্রতিপত্তি লাভ করিতে চায় তবে ইহা তাহার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কারণ- চুরি, অপহরণ বা অন্য কোন কারণে ধন অতি সহজেই বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ার এইরূপ কোন আশঙ্কা নাই। **তৃতীয় কারণ**—বাণিজ্য ও কৃষিকার্যে পরিশ্রম ও কষ্ট ব্যতীত ধন বৃদ্ধি পায় না; কিন্তু প্রতিপত্তির খ্যাতি স্বতঃই বিস্তার লাভ করে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কারণ, তাহার অন্তর তোমার বশীভূত, সে তোমার যশঃগান করিয়াই বেড়াইবে এবং যাহারা কখনও তোমার দর্শন লাভ করে নাই তাহারাও ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। এইরূপে মানুষ যতই অধিক বিখ্যাত হইবে ততই তাহার প্রতিপত্তি অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

যাহাই হউক, ধন ও প্রতিপত্তির আবশ্যকতা আছে; কারণ, উহার সাহায্যেই মানবের যাবতীয় অভাব পূরণ হয়। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রিয় হইয়া উঠে এবং যে সকল স্থানে তাহার গমনের কোনই সম্ভাবনা নাই সেসব স্থানে সে সুখ্যাতি বিস্তারের কামনা করে। মানুষ সমস্ত জগত তাহার বশীভূত দেখিতে চায়, যদিও সে জ্ঞাত আছে যে, ইহার কোন আবশ্যকতা তাহার নাই। মানুষের এই সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রিয়তার পিছনে এক বিরাট রহস্য রহিয়াছে।

মানুষের প্রতিপত্তি-প্রিয়তার গূঢ় রহস্য—ফেরেশতাদের মূল উপাদানেই মানুষ সৃষ্ট এবং মানবাত্মা একমাত্র আল্লাহ্‌রই কর্মবিশেষ; যেমন তিনি বলেন-

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

"বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১০ রুকু ১৫ পারা)। মোটের উপর মহাপ্রভু আল্লাহর সহিত মানবাত্মার এইরূপ ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে বলিয়াই প্রতিপত্তি কামনা মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে। আর এইজন্যই ফিরআউন বলিয়াছিল-

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى

"আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু" (সূরা নাযিআত, ১ রুকু, ৩০ পারা)। উল্লিখিত কারণেই মানুষ প্রভুত্ব-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিপত্তির মর্ম—প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই সর্বেসর্বা থাকিবে এবং তাহার সমকক্ষ কেহই হইবে না, ইহাই প্রতিপত্তির প্রকৃত মর্ম। কারণ, অপর কেহ তাহার সমকক্ষ হইলে তাহার চরমোৎকর্ষ রহিল না ও ইহাতে অপূর্ণতা দেখা দিল। সূর্য মাত্র একটি বলিয়াই ইহা পূর্ণ ও নিষ্কলঙ্ক এবং জগতের সকল পদার্থই ইহা হইতে জ্যোতি গ্রহণ করিয়া থাকে। অপর কোন বস্তু সূর্যের সমকক্ষ থাকিলে ইহার প্রতিপত্তি ও পূর্ণতা নষ্ট হইয়া যাইত। তদ্রূপ সর্বেসর্বা হওয়া একমাত্র মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য; কারণ, বাস্তবপক্ষে সমস্ত জগত ব্যাপিয়া একমাত্র তিনিই বিরাজমান। তাঁহাকে ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই এবং যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ একমাত্র তাঁহার কুদরতের আলোমাত্র ও তাঁহার অধীন, তাঁহার কোন অংশী বা সাথী নহে। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য কর, সূর্যের আলোকরাশি ইহার অধীন এবং সূর্য হইতে পৃথক করিয়া ইহার আলোকের কল্পনাও করা চলে না; আর আলোকরাশি সূর্যের অংশী ও সাথী নহে, কেননা, অংশী ও সাথী হইলে সূর্য অদ্বিতীয় হইত না এবং ইহার অপূর্ণতা প্রকাশ পাইত। তদ্রূপ সমস্ত মাখলুকাত (সৃষ্ট পদার্থ) একমাত্র আল্লাহ্‌র জ্যোতিতেই প্রকাশিত এবং তিনি ভিন্ন অপর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

মানব প্রকৃতিই এইরূপ যে, সে সর্বব্যাপী সর্বেসর্বা হইতে আকাঙ্খা করে। কিন্তু ইহাতে অক্ষম হইয়া জগতের যাবতীয় বস্তু সে তাহার অধিকারে পাইতে চায়; অর্থাৎ সে বাসনা করে যে সমস্তই তাহার বশীভূত থাকুক এবং তাহার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হউক। পরিশেষে এই বাপারেও সে অক্ষম হইয়া থাকে; কারণ, সৃষ্ট পদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর পদার্থের উপর মানবের কোন ক্ষমতাই চলে না; যেমন- আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, ফেরেশতা, শয়তান এবং যে সকল বস্তু পৃথিবী ও সমুদ্রের নিচে এবং পাহাড়ের গর্ভে রহিয়াছে। এই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতা পরিচালনে অসমর্থ হইয়া সে বিদ্যাবলে ইহাদের তত্ত্ব লাভ করত ইহাদিগকে জ্ঞানের অধীন রাখিতে ইচ্ছা করে। এই কারণে নভোমণ্ডল এবং জল ও স্থলের যাবতীয় আশ্চর্য বিয়ষাদির জ্ঞানান্বেষণে মানুষ ব্যাপৃত হয়; যেমন যে ব্যক্তি শতরঞ্জ খেলায় অভিজ্ঞ নহে সেও ইহার জ্ঞান লাভের কামনা করে। জ্ঞানমূলক ক্ষমতাও এক প্রকার প্রভুত্ব; এইজন্যই অজানাকে জানিবার অদম্য বাসনা মানবমনে আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে। অপর শ্রেণীর পদার্থের উপর তাহার ক্ষমতা চলে; ইহা হইল উদ্ভিদ, জীবজন্তু, জড়বস্তু ইত্যাদি ভূ-পৃষ্ঠস্থ পদার্থসমূহ। মানুষ ইহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করত ইহাদিগকে ইচ্ছামত ব্যবহার ও পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করে। জগতের যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানবমন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মনরম; সুতরাং মানুষ অপরের মনকে বশীভূত করত ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার ও পরিচালনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করে যেন লোক সর্বদা তাহার স্মরণে ব্যাপৃত থাকে। ইহাই মানব প্রতিপত্তির সারমর্ম।

মানব স্বভাবতই প্রতিপত্তি প্রিয়। মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের সহিত ইহার নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তাঁহার দরবার হইতেই ইহা আসিয়া থাকে। চরম ও পরম গুণরাজিতে গুণান্বিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাব অর্জনই প্রতিপত্তির প্রকৃত অর্থ। এই অপ্রতিহত প্রভাব পূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষমতা হইতেই জন্মে। ক্ষমতা আবার ধন ও প্রভুত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব ইহাই ধনাশক্তি ও প্রতিপত্তি-প্রিয়তার একমাত্র কারণ।

ধন ও প্রতিপত্তি নিকৃষ্ট হওয়ার কারণ—এই স্থলে কেহ হয়ত প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে যে, অপ্রতিহত প্রতিপত্তির লালসা যখন মানবের প্রকৃতিগত এবং ইহা পূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষমতা ব্যতীত লাভ করা যায় না, অপরপক্ষে, জ্ঞানান্বেষণ উত্তম কার্য, কেননা জ্ঞানবলে পূর্ণতা অর্জন করা চলে, তখন ধন ও প্রতিপত্তি কামনা করাও উত্তম কার্য। কারণ ইহাতে ক্ষমতা অর্জিত হয়; আর পূর্ণ জ্ঞান যেমন আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ গুণ, অপ্রতিহত পূর্ণ ক্ষমতাও তদ্রূপ তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। সুতরাং মানব যতই পূর্ণতা লাভ করিবে ততই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সমর্থ হইবে। প্রতিবাদের উত্তর এই- পূর্ণ জ্ঞান ও অপ্রতিহত ক্ষমতা উভয়ই চরমোৎকার্যের নিদর্শন এবং মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র গুণবিশেষ। মানব প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে না। জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ লাভ করা মানবের পক্ষে সম্ভবপর এবং ইহা মানবাত্মার

সহিত চিরকাল বিরাজমান থাকে। অপ্রতিহত ক্ষমতা মানুষ কখনও অর্জন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ভুলবশত সে মনে করে যে, সে ক্ষমতা অর্জন করিয়া লইয়াছে। আবার যে তুচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া সে নিজেকে মনে করে ইহাও তাহার সহিত চিরকাল থাকে না; কারণ ধন ও জনের সহিত ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্ষমতা বিলীন হইয়া যায়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যাহা বিলুপ্ত হয় ইহাকে চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক বস্তু বলা চলে না। অতএব অস্থায়ী বস্তুর অন্বেষণে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জ্ঞানার্জনের জন্য যতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়, ইহা প্রয়োজনীয়। আল্লাহ্র সহিত জ্ঞানের অবস্থান, দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা আবার নিত্য ও চিরস্থায়ী। সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না; বরং কোন জ্ঞানী ব্যক্তি পরলোকগমন করিলে ইহা তাহার সঙ্গে থাকিয়া জ্যোতিস্বরূপ কাজ করে এবং এই জ্যোতিতে উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি মহাপ্রভু আল্লাহ্র দর্শন লাভ করত এমন এক অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করে যাহার তুলনায় বেহেশ্তের যাবতীয় সুখ অতি নগণ্য বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয় এমন বস্তুর সহিত জ্ঞানের কোন সংশ্রব নাই; ধন ও জনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বরং মহাপ্রভু আল্লাহ্র অস্তিত্বের সহিত জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। কারণ, জ্ঞান আল্লাহ্র গুণরাজির অন্যতম। আর ইহার সম্বন্ধ আছে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডলে নিহিত হেকমতের সাথে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের সংশ্রব আছে ঐ সমস্ত বিস্ময়কর সম্ভাব্য অসম্ভাব্য এবং অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের সহিত যাহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে বোধগম্য হয়। এই ত্রিবিধ বস্তু অনাদি ও অনন্ত; উহাদের কোন পরিবর্তন নাই। কারণ, অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব কখনও অসম্ভাব্য হয় না এবং অসম্ভাব্য কখনও সম্ভাব্য হইতে পারে না। আদি, উদ্ভূত ও নশ্বর বস্তুর সহিত যে জ্ঞানের সম্পর্ক রহিয়াছে, ইহা নিতান্ত নগণ্য; যেমন ভাষা জ্ঞান। কেননা ভাষা উদ্ভূত ও নশ্বর। অবশ্য কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের মর্ম উদঘাটনে ভাষা জ্ঞানের সাহায্য পাওয়া যায় বলিয়াই ইহার মর্যাদা দেওয়া হয়। আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ও তাঁহার পথে চলার কালে বিপদ সমাকীর্ণ ভয়াবহ ঘাটিসমূহ পার হওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের জ্ঞান অপরিহার্য। মোটের উপর কথা এই যে, ধ্বংসী ও পরিবর্তনশীল বস্তুর জ্ঞান মানুষের লক্ষ্যবস্তু নহে। বরং ইহা অনন্ত জ্ঞানের অবলম্বন মাত্র। আর চিরন্তন অস্তিত্বের জ্ঞান মঙ্গলময় চিরস্থায়ী বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাহা অনাদি ও অনন্ত ইহাই আল্লাহ্র দরবার। অনাদি ও অনন্ত বস্তুতে কোন পরিবর্তন নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি যত অধিক এই জ্ঞান অর্জন করিতে পারে সে তত অধিক আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়।

ফল কথা, মানুষ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে, প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এক প্রকার ক্ষমতাও চিরস্থায়ী মঙ্গলময় বস্তুর মধ্যে গণ্য। ইহা

হইতেছে স্বাধীনতা; অর্থাৎ মানবের অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্তি লাভ করা। কারণ, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বন্ধনে আবদ্ধ সে বাস্তব পক্ষে প্রবৃত্তিরই গোলাম। প্রবৃত্তির অনুসরণ মানবের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ বটে। এই ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রবৃত্তির শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া ইহার উপর বিজয়ী হইতে হইবে। ইহা করিতে পারিলে মানুষ মহাপ্রভু আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত হইয়া উঠে; কেননা ইহাতে সে পরিবর্তন, বিবর্তন ও অভাব হইতে দূরে থাকিতে পারে। সুতরাং মানুষ যতই প্রবৃত্তির নাগপাশ ছিন্ন করত পরিবর্তন, বিবর্তন ও অভাব হইতে দূরে অবস্থান করিবে ততই সে ফেরেশতাতুল্য হইয়া উঠিবে। মোট কথা এই যে, জ্ঞান ও আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করা এবং প্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্ত হওয়া বাস্তব পক্ষে মানবের পরম গুণ। অপরদিকে ধন ও প্রভুত্ব কোন গুণ নহে; কারণ এই উভয়ই ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয়। গুণ ও পূর্ণতা অর্জনের জন্য মানুষ আদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু সে প্রকৃত গুণ ও পূর্ণত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। যাহা গুণ নহে তাহাকে গুণ মনে করত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া চরম পূর্ণতা হইতে সে উদাসীন রহিয়াছে। ধন-লালসা ও প্রভুত্ব প্রিয়তার মোহে ধ্বংসের পথে সে চলিয়াছে। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন–

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ

"আসরের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে।" (সূরা আসর, ৩০ পারা)।

পরিমিত সম্মান ও প্রভুত্ব নির্দোষ—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, ধন মাত্রই যেমন নিন্দনীয় নহে, বরং অভাব মোচনের উপযোগী ধন পরকালের পাথেয় বলিয়া গণ্য হয় এবং অতিরিক্ত ধনে মন নিমজ্জিত হইয়া গেলেই মানুষ পরকালের পথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সম্মান ও প্রভুত্বের অবস্থাও তদ্রূপ। পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত সংসারে জীবন যাপন করা দুষ্কর। এইজন্য বন্ধু ও পরিচারকের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা রহিয়াছে। অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে লোককে রক্ষা করিবার জন্য বাদশাহ্ বা শাসনকর্তারও আবশ্যক এবং লোকের অন্তরে বাদশাহ্ বা শাসনকর্তার প্রতি সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ভাব থাকাও উচিত। অতএব প্রয়োজনীয় কার্যোদ্ধার করার জন্য যতটুকু সম্মান ও প্রভুত্বের আবশ্যক অপরের নিকট নিজকে ততটুকু সম্মানিত ও প্রভুত্বশালী করিয়া তোলাতে কোন দোষ নাই; যেমন হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম বলিয়াছিলেন- اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ "অবশ্য আমি অভিজ্ঞ রক্ষক।" (সূরা ইউসুফ, ৭ রুকু, ১৩ পারা)। তদ্রূপ শিষ্যের প্রতি যদি শিক্ষকের স্নেহ না থাকে তবে তিনি শিক্ষাদান করিবেন না এবং শিক্ষকের প্রতি শিষ্যের ভক্তি-শ্রদ্ধা না থাকিলে সেও

তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিবে না। সুতরাং অভাব মোচনের উপযুক্ত ধনার্জন যেমন নির্দোষ, আবশ্যক পরিমাণ সম্মান লাভ ও প্রভুত্ব স্থাপনের আকাঙ্খাও তদ্রূপ দূষণীয় নহে।

সম্মান ও প্রভুত্ব লাভের উপায়—সম্মান ও প্রভুত্ব লাভের চারিটি উপায় আছে; তন্মধ্যে দুইটি হারাম ও দুইটি মুবাহ্ (নির্দোষ)।

প্রথম হারাম উপায়—ইবাদত প্রকাশ করিয়া সম্মান ও প্রভুত্ব লাভের আশা করা। কারণ, লোক দেখানো ইবাদতকে রিয়া বলে এবং ইহা হারাম। ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত; সুতরাং সম্মান ও প্রভুত্ব লাভের আশায় ইবাদত করা সম্পূর্ণ হারাম।

দ্বিতীয় হারাম উপায়—প্রতারণা। বাস্তবপক্ষে যে গুণ নিজের মধ্যে নাই প্রতারণাপূর্বক সেই গুণের অধিকারী বলিয়া নিজকে প্রকাশ করা; যেমন কেহ যদি বলে- "আমি সৈয়দ বংশোদ্ভূত," বা "অমুক অমুকের সহিত আমার আত্মীয়তা আছে;" অথচ এই সবই মিথ্যা; অথবা কোন বিশেষ শিল্প বা ব্যবসা সম্পর্কে কিছু না জানিয়াও এই বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া নিজকে পরিচয় দেওয়া। প্রতারণাপূর্বক ধন সংগ্রহ করা যেমন হারাম, প্রতারণা দ্বারা সম্মান লাভ করাও তদ্রূপ হারাম।

প্রথম মুবাহ উপায়—ধোঁকা-প্রবঞ্চনা যাহাতে নাই এবং যাহা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নহে, এমন বস্তু বা কার্য প্রকাশ করিয়া সম্মান লাভের কামনা করা।

দ্বিতীয় মুবাহ উপায়—স্বীয় দোষ-ত্রুটি গোপন করা। নিজের পবিত্রতা ও সাধুতা প্রকাশের উদ্দেশ্য না থাকিলে বাদ্শাহ বা শাসনকর্তার সম্মানভাজন হওয়ার জন্য স্বীয় দোষ-ত্রুটি গোপন করা দুর্বৃত্ত ফাসিকের পক্ষেও জায়েয।

সম্মান-লিপসা ও প্রভুত্ব দমনের উপায়

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিলে আত্মা পীড়িত হইয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাত ইহার চিকিৎসায় তৎপর হওয়া আবশ্যক। ধনাশক্তির ন্যায় সম্মান-লিপ্সা এবং প্রভুত্ব-প্রিয়তাও মানব মনকে কপটতা, রিয়া, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শত্রুতা, ঈর্ষা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি পাপের দিকে আকর্ষণ করে। বরং সম্মান-লিপ্সা এবং প্রভুত্ব-প্রিয়তা ধনাশক্তি অপেক্ষা জঘন্যতর; কেননা, সম্মান-লিপ্সা এবং প্রভুত্ব-প্রিয়তা মানব মনে তদপেক্ষা অধিক প্রবল হইয়া থাকে। যে পরিমাণ ধন ও সম্মান অর্জন করিলে ধর্মকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়, ততটুকু লাভ করত যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত থাকে এবং ইহার অতিরিক্ত কামনা করে না, তাহার আত্মা পীড়িত নহে। এইরূপ ব্যক্তি বাস্তব পক্ষে ধন ও সম্মানের প্রতি আসক্ত নহে; বরং উদ্বেগহীন চিত্তে ধর্মকর্ম সমাধা করিবার প্রচুর অবসর লাভ করাই তাহার একমাত্র

লক্ষ্য। কিন্তু সম্মানভাজন হওয়ার চিন্তায়ই সর্বদা বিভোর থাকে, এমন সম্মান-লোলুপ লোকও জগতে বিরল নহে। "লোকে আমাকে কিরূপ চক্ষে দেখে? তাহারা আমার সম্পর্কে কি বলে এবং বিরূপ ধারণা পোষণ করে?"- শত কাজে লিপ্ত থাকিলেও এবংবিধ চিন্তাসমূহ তাহাদের সমস্ত মন জুড়িয়া থাকে। তদ্রূপ পীড়িত ব্যক্তির জন্য এই পীড়ার চিকিৎসা অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞান ও অনুষ্ঠানের মিশ্রণে ইহার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জ্ঞানমূলক ঔষধ—সম্মান-লিপ্সাও প্রভুত্ব-প্রিয়তা ইহ-পরকালের কিরূপ দুর্গতির কারণ হইয়া থাকে তৎসম্পর্কে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া লওয়া। প্রভুত্ব-প্রিয় ব্যক্তি সর্বদা মানসিক যাতনা ও অপমান ভোগ করে এবং লোকের মনস্তুষ্টি বিধানের কার্যে ব্যাপৃত থাকে (কারণ, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করত সে অহরহ অন্য লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণের চিন্তায় ব্যাকুল থাকে)। ইহাতেও প্রভুত্ব স্থাপনে অক্ষম হইলে সে নিজকে নিজে অপদস্থ মনে করিয়া দুঃখকষ্টে জর্জরিত হইতে থাকে। আবার প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইলে অপর লোক ঈর্ষার বশীভূত হইয়া তাহাকে দুঃখকষ্টে ফেলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে সে সর্বদা শত্রুপ্রদত্ত যাতনায় জর্জরিত ও অপর প্রভুত্ব লোলুপ ব্যক্তির প্রতিযোগিতা দমনের কষ্টে নিপীড়িত হইতে থাকে। ধোঁকা, প্রবঞ্চনা ও ছলেবলে অপর লোকে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বিনাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে; ইহাতে তাহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হয়। আর শত্রুদের সহিত প্রতিযোগিতায় সে পরাজিত হইলে তো তাহার অপমানের সীমাই থাকে না। আবার বিজয়ী হইলেও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিতান্ত অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর। কেননা, অপর লোকের অন্তরের সহিত ইহার সম্পর্ক; সামান্য কারণে হঠাৎ তাহাদের মন বিগড়াইয়া যাইতে পারে। জনসাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত ক্ষণিকে উঠিয়া ক্ষণিকেই বিলীন হইয়া যায়। ইতর জনসাধারণের মনের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত ভক্তিসৌধ নিতান্ত দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী, বিশেষভাবে যাহাদের সম্মান রাজ-ক্ষমতা বা নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকার দরুন হইয়া থাকে তাহাদের সম্মান আরও অধিকতর ক্ষণভঙ্গুর; কেননা, যে কোন মুহূর্তে পদচ্যুতির আশঙ্কা রহিয়াছে, কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইলে পদচ্যুতি ঘটে এবং ফলে অপদস্থ হইতে হয়। প্রভুত্ব লোলুপ ব্যক্তি ইহকালে ত মনঃকষ্টে জর্জরিত থাকেই পরকালেও সে তদ্রূপ যাতনা ভোগ করিবে।

অপরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকে প্রভুত্ব-প্রিয়তার দুর্গতি উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সম্যক বুঝিতে পারেন যে, নিখিল বিশ্বের একাধিপত্য যদি কাহারও লাভ হয় এবং সমস্ত লোক তাহাকে সিজদা করে, তথাপি ইহাতে আনন্দিত হওয়ার কিছুই নাই, কারণ, অল্পদিনের মধ্যেই সেও থাকিবে না এবং তাহার

সিজদাকারীগণও থাকিবে না; অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আসিয়া সকলের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া দিবে। এই বিশাল সাম্রাজ্য তাহার পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে এবং সে পূর্বকালের বাদশাহদের ন্যায় মাটিতে মিশিয়া যাইবে- যাহাদের কথা আজ কেহ ভুলেও স্মরণ করে না। অতএব সম্মান ও প্রভুত্বের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তি ইহকালের ক্ষণিক আনন্দের বিনিময়ে পরকালের অশেষ আনন্দ ও চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য বিসর্জন দেয়। এইরূপ ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্-প্রেম থাকিতে পারে না; অথচ আল্লাহ্-প্রেম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অন্তরে প্রবল থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি পরলোকগমন করিলে সে দীর্ঘকাল কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে। এই কথাগুলি ভালরূপে হৃদয়গতভাবে বুঝিয়া লওয়াই সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার জ্ঞানমূলক ঔষধ।

অনুষ্ঠানমূলক ঔষধ—সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা দমনের অনুষ্ঠানমূলক উপায় দুইটি। **প্রথম উপায়**- যে স্থানের লোকে তোমাকে সম্মান করে সে স্থান হইতে পলায়ন করত এমন অজ্ঞাত স্থানে চলিয়া যাইবে যথায় কেহই তোমাকে জানে না। ইহাই পূর্ণ ও উত্তম ব্যবস্থা। তুমি যদি স্বীয় স্থানে অবস্থানপূর্বক নির্জন বাস অবলম্বন কর তবুও লোকে ইহা জানিতে পারিলে তোমার বিস্তর অনিষ্ট হইবে। তুমি নির্জনতা অবলম্বন করিয়াছ জানিয়া লোকে যখন তোমাকে তিরস্কার করে বা কপটতা বশতঃ তুমি নির্জনতা অবলম্বন করিয়াছ বলিয়া প্রকাশ করে, তখন যদি তুমি মনে কষ্ট ও যাতনা অনুভব কর, অথবা তাহারা যদি তোমাকে দোষারোপ করে তখন যদি তুমি তোমার প্রতি তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য ইহার প্রতিবাদ কর, তবেই বুঝা যাইবে যে, এখনও তোমার হৃদয়ে সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা রহিয়াছে। **দ্বিতীয় উপায়**- লোকদের তিরস্কারের পথ অবলম্বন করিবে এবং এমন এমন কার্য করিবে যেন লোকচক্ষে তুমি হেয় বলিয়া পরিগণিত হও। ইহার অর্থ হারাম ভক্ষণ করা নহে, যেমন বর্তমান একদল নির্বোধ লোক নিজদিগকে তিরস্কৃত করিতে যাইয়া ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করিতেছে; বরং সংসার বিরাগী পরহেযগারগণ যেরূপ কার্য করিতেন তদ্রূপ কার্য করিবে।

কোন শহরে একজন সংসারবিরাগী দরবেশ বাস করিতেন। বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেই শহরের শাসনকর্তা তাঁহার নিকট গমন করিতেন। একদা দরবেশ শাসনকর্তাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া রুটি ও তরকারি চাহিয়া লইলেন এবং খুব তাড়াহুড়া করিয়া বড় বড় লুকমা মুখে পুরিয়া দিতে লাগিলেন। শাসনকর্তা ইহা দেখিয়া দরবেশকে অতি লোভী বলিয়া মনে করিলেন এবং দরবেশের প্রতি তাঁহার সকল ভক্তি-শ্রদ্ধা বিনষ্ট হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ শাসনকর্তা প্রত্যাবর্তন করিলেন। অপর এক শহরে এক কামিল বুযুর্গ বাস করিতেন। লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা

করিত এবং সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। একদা গোসলান্তে স্বীয় ছিন্নবস্ত্র গোসলখানায় রাখিয়া দিয়া তিনি অপর লোকের উৎকৃষ্ট ও বহু মূল্য পোশাক পরিধান করত বাহিরে আসিলেন এবং নিকটবর্তী এক প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ধরিয়া খুব মারপিট করিল এবং বলিল-"এই ব্যক্তি চোর।" অপর এক বুযুর্গের ঘটনা এই যে, তিনি লোকের সম্মুখে মদের রঙবিশিষ্ট শরবত গ্লাসে ঢালিয়া পান করিতেন যেন তাহারা তাঁহাকে মদ্যপায়ী বলিয়া মনে করে। সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা ছিন্ন করিবার উপায় এই পর্যন্ত বর্ণিত হইল।

প্রশংসা-অনুরাগ ও দুর্নাম-বিরাগ কর্তনের উপায়

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, কোন কোন ব্যক্তি লোকমুখে স্বীয় প্রশংসা শুনিতে চায় এবং সর্বদা যশ ও সুখ্যাতির অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, যদিও তাহারা শরীয়তবিরুদ্ধ গর্হিত কার্যেই ব্যাপৃত থাকুক না কেন। আর তাহাদের মন্দ কার্যের জন্য যদি লোকে যথার্থভাবেই তাহাদিগকে তিরস্কার করে তবুও তাহারা বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়। এই অবস্থায় উপনীত ব্যক্তির হৃদয় জঘণ্য পীড়ায় আক্রান্ত। প্রশংসায় আনন্দ ও দুর্নামে কষ্ট হওয়ার কারণ উপলব্ধি না করা পর্যন্ত এই পীড়ার চিকিৎসা হইতে পারে না। প্রিয় পাঠক, অবগত হও, চারিটি কারণে মানুষ স্বীয় প্রশংসায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে।

প্রথম কারণ—স্বীয় পূর্ণতা উপলব্ধি। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষ স্বীয় কৃতিত্ব অত্যন্ত ভালবাসে এবং দোষ-ত্রুটিকে ঘৃণা করে। প্রশংসাকে সে কৃতিত্ব বলিয়া মনে করে। কারণ, মানুষ স্বীয় কৃতিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে হইতে পারে না। সুতরাং লোকমুখে প্রশংসা শুনিলেই এই সন্দেহ বিদূরীত হইয়া স্বীয় কৃতিত্বের প্রতি তাহার আস্থা জন্মে এবং সে তখনই পূর্ণ আনন্দ ও আরাম পায়। আর তখন তাহার মনও প্রশংসা লাভের দিকে আকৃষ্ট হয়। কেননা কৃতিত্ব প্রভুত্বের নিদর্শন এবং মানুষ স্বভাবতই প্রভুত্ব প্রিয়। অপরপক্ষে, লোকমুখে দুর্নাম শুনিলে সে স্বীয় দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতা বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইয়া থাকে। স্বীয় গুণ বা দোষের যত দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় আনন্দ বা দুঃখ তত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইজন্যই যাহারা বাচাল নহে এবং বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, যেমন- শিক্ষক, বিচারক, আলিম- এই প্রকার লোকের মুখে প্রশংসা বা নিন্দা শুনিলে অধিক আনন্দ বা দুঃখ হইয়া থাকে। আবার কোন অজ্ঞ লোক প্রশংসা বা নিন্দা করিলে তত আনন্দ বা কষ্ট হয় না। কেননা, ইহাতে স্বীয় গুণ বা দোষ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না।

দ্বিতীয় কারণ—স্বীয় প্রভুত্বের উপলব্ধি। অপরের মুখে প্রশংসা শ্রবণ করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, প্রশংসাকারীর হৃদয় বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার হৃদয়ে প্রশংসিত ব্যক্তির স্থান ও তাহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রহিয়াছে। যশস্বী লোকের মুখে স্বীয় প্রশংসা শুনিলে অত্যধিক আনন্দ হইয়া থাকে। কারণ, এই প্রকার লোকের মন বশীভূত করিতে পারিলে প্রভুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রশংসাকারী ইতর লোক হইলে তাহার প্রশংসায় কোনই আনন্দ পাওয়া যায় না।

তৃতীয় কারণ—প্রশংসায় প্রশংসাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির আনন্দ। প্রশংসা এই আনন্দবার্তা বহন করিয়া আনে যে, অপরাপর লোকের মনও অদূর ভবিষ্যতের প্রশংসিত ব্যক্তির বশীভূত হইয়া পড়িবে। কেননা, প্রশংসা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহারা প্রংশসিত ব্যক্তির প্রতি ভক্তিবান হইয়া উঠে। গণ্যমান্য ব্যক্তি লোক-সম্মুখে প্রশংসা করিলে ইহা অত্যধিক আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। নিন্দাবাদে ইহার বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

চতুর্থ কারণ—স্বীয় প্রভাব বিস্তারের আনন্দ। লোকমুখে প্রশংসা শুনিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রশংসাকারী প্রশংসিত ব্যক্তির প্রভাবে পরাভূত হইয়াছে। প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক সময় অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগে অর্জিত হইয়া থাকে; তথাপি ইহা মানুষের প্রিয় বস্তু। যদিও প্রতীয়মান হয় যে, প্রশংসাকারী ভক্তির আবেগে প্রশংসা করিতেছে না, বরং অভাব মোচন বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছে তবুও প্রশংসিত ব্যক্তি স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি অনুভব করত আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু কেহ মিছা-মিছি প্রশংসা করিলে প্রশংসিত ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারে যে, ইহা মিথ্যা, শ্রোতৃমণ্ডলীও ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে না, আর প্রশংসাকারীও অন্তরের সহিত প্রশংসা করিতেছে না বা সে ভয়ে ভীত হইয়াও প্রশংসা করিতেছে না, কেবল ঠাট্টা করিতেছে, এমতাবস্থায় প্রশংসিত ব্যক্তি কোনই আনন্দ পাইবে না, কেননা এইরূপ স্থলে আনন্দ লাভের মৌলিক কারণই বিদূরিত হইয়া গেল।

প্রশংসা-লালসা দমনের উপায়

প্রিয় পাঠক, প্রশংসা-লালসার কারণসমূহ অবগত হওয়ার পর উহা দমনের উপায় সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। আর চেষ্টা করিলে অবশ্যই প্রশংসা-লালসারূপ আন্তরিক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

প্রথম উপায়—লোকমুখে নিজের প্রশংসা শুনিলেই স্বীয় পূর্ণতা ও গুণ সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে; ফলে অন্তরে আনন্দ অনুভূত হয়। এমতাবস্থায়, তোমার চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক, পরহেযগারী, জ্ঞান ইত্যাদি যে সকল গুণের অধিকারী বলিয়া লোকে তোমার প্রশংসা করিতেছে, বাস্তবপক্ষে উহা তোমাতে আছে কিনা। বাস্তবিকই তুমি এই সকল গুণের অধিকারী হইয়া থাকিলে লোকমুখে প্রশংসা শুনিয়া তোমার পক্ষে আনন্দিত হওয়া উচিত নহে; বরং যে করুণাময় আল্লাহ্ তোমাকে উহা দান করিয়াছেন তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আনন্দিত হওয়া উচিত। কারণ, অপরের প্রশংসায় তোমার গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না এবং হ্রাসও হইবে না। আর ঐশ্বর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি পার্থিব বিষয়াদি অবলম্বনে লোকে তোমার প্রশংসা করিলে এই সকল ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে আনন্দিত হওয়ার কোন কারণই নাই। অপার্থিব চিরস্থায়ী গুণের অধিকারী হইয়া আনন্দিত হওয়া শোভন হইলেও লোকমুখে ইহার প্রশংসা শুনিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নহে। নিষ্ঠাবান মুহাক্কিক আলিমগণ নিজেদের জ্ঞান ও পরহেযগারী সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও পরিণাম চিন্তায় তাঁহারা আনন্দিত হইতে পারেন না; কেননা, মৃত্যুকালে তাঁহারা তৎসমুদয় গুণ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন, না বেঈমান হইয়া রিক্ত হস্তে জীবনের পরপারে যাত্রা করিতে হইবে, ইহা কাহারও জানা নাই। সুতরাং মৃত্যুর পর পরিণাম অজ্ঞাত বলিয়া চিরহিতকারী স্থায়ী জ্ঞান, পরহেযগারী ইত্যাদি গুণের উপর ভরসা করিয়াও আনন্দ অনুভব করা চলে না। অতএব অনুধাবন কর, সৎকর্মশীল সুনিপুণ আলিমদের অবস্থাই যখন এইরূপ আশঙ্কাজনক, এমতাবস্থায়, যাহাদের পরিণাম স্থানে দোযখ, তাহাদের আনন্দিত হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে?

অপরপক্ষে, জ্ঞান, পরহেযগারী ইত্যাদি যে সমুদয় গুণের কথা উল্লেখ করিয়া লোকে তোমার প্রশংসা করিতেছে উহা যদি তোমাতে না থাকে, আর তুমি তদ্রূপ গুণকীর্তন শুনিয়া উৎফুল্ল হও, তবে তোমাকে নিতান্ত বোকা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? ইহার উদাহরণ এইরূপ- যেমন, একজন অপরজনকে প্রশংসা করিয়া বলিল- "মহাত্মন, আপনি পরম শ্রদ্ধাভাজন। আপনার নাড়িভুড়ি আতর ও মহামূল্য মৃগনাভিতে পরিপূর্ণ।" প্রশংসিত ব্যক্তি উত্তমরূপেই অবগত আছে যে, তাহার উদরে পূতিগন্ধময় অপবিত্র মল-মূত্র ব্যতীত আর কিছুই নাই; তথাপি উক্তরূপ চাটুবাদ শুনিয়া তাহার আনন্দ আর ধরে না। ইহাকে পাগলামি ছাড়া আর কি বলা চলে?

প্রশংসা-প্রিয়তার যে চারিটি কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম কারণের প্রতিষেধক ব্যবস্থা এইস্থলে প্রদর্শন করা হইল। সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা হইতেই প্রশংসা-প্রীতির অন্যান্য কারণ উদ্ভূত এবং ইহা দমনের উপায়ও ইতিপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিন্দিত ব্যক্তির কর্তব্য—কেহ নিন্দা করিলে নিন্দুকের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হওয়া নির্বুদ্ধিতার কার্য। তোমার কোন দোষ দেখিয়া তোমাকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে যদি নিন্দুক সত্য কথা বলিয়া থাকে, তবে ফেরেশতা জ্ঞানে তাহাকে শ্রদ্ধা করিবে। সে যদি জানিয়া শুনিয়া তোমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে, তবে সে মানবরূপী শয়তান। আর না জানিয়া না শুনিয়া তোমার কুৎসা রটনা করিয়া থাকিলে সে নিরেট বোকা, গর্দভসদৃশ। আল্লাহ্ যদি কাহারও আকৃতি রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে গর্দভ, শয়তান বা ফেরেশতাতে পরিণত করিয়া দেন, তবে তোমার অসন্তুষ্ট হওয়ার কি কারণ আছে? নিন্দুক যদি যথার্থই বলিয়া থাকে অর্থাৎ তোমাতে বাস্তবিক কোন দোষ থাকে এবং ইহা ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তুমি যে এইরূপ দোষে দোষী তজ্জন্য তোমাকে অবশ্যই দুঃখিত হওয়া উচিত; অপরে দোষারোপ করিয়াছে বলিয়াই অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর সাংসারিক কোন বিষয়ে ত্রুটি অবলম্বনে তোমার প্রতি দোষারোপ হইয়া থাকিলে জানিয়া রাখ, ধর্মপরায়ণ লোকের নিকট ইহা ত্রুটি নহে, বরং গুণ।

দ্বিতীয় উপায়—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, নিম্নোক্ত তিনটি অভিপ্রায়ের যে কোন একটির বশবর্তী হইয়া নিন্দুক নিন্দা করিয়া থাকে।

প্রথম—তোমাতে অবশ্যই কোন দোষ আছে। নিন্দুক তোমার সংশোধনের জন্য সদয় অন্তঃকরণে তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। এমতাবস্থায়, তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক; কেননা, কেহ যদি তোমার পরিহিত বস্ত্রে সর্প দেখিয়া ইহার দংশন যাতনা হইতে তোমার পরিত্রাণের নিমিত্ত তোমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া থাকে, তবে তুমি তো তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া থাক। ধর্মকর্মে দোষ-ত্রুটি সর্প অপেক্ষাও মারাত্মক অনিষ্টকর; কারণ সর্প দংশন-যাতনা তো ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ধর্মকর্মে দোষ-ত্রুটি পরকালের অনন্ত জীবনে অসীম যাতনা দিতে থাকিবে। মনে কর, তুমি বাদশাহর দরবারে চলিয়াছ। তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার পরিহিত বস্ত্র মলমূত্রে দুর্গন্ধময় ও অপবিত্র হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া অপর এক ব্যক্তি তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল- "ভাই, তোমার পরিহিত বস্ত্রে মলমূত্র রহিয়াছে, সর্বাগ্রে ইহা পরিষ্কার করিয়া লও এবং তৎপর বাদশাহর দরবারে গমন কর।" তুমিও দেখিতে পাইলে যে, তোমার বস্ত্র মলমূত্রে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, গমন করিলে বাদশাহর বিরাগভাজন হইয়া তোমার লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অতএব যাহার কারণে তুমি পরিত্রাণ পাইলে তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কি তোমার উচিত নহে?

দ্বিতীয়—তোমার দোষ বাস্তবিকই আছে। তবে সেই ব্যক্তি বিদ্বেষভাবে তোমার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাতে তাহার ধর্মহীনতার পরিচয় পাওয়া গেল; কিন্তু তোমার উপকার ব্যতীত অপকার হইল না। নিন্দায় তোমার লাভ ও নিন্দুকের ক্ষতি হইল। সুতরাং তোমার ক্রুদ্ধ হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে?

তৃতীয়—নিন্দুক তোমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিতেছে। এমতাবস্থায়, অনুধাবন কর, নিন্দুক যে দোষের জন্য তোমার নিন্দা করিতেছে, তুমি এই বিষয়ে নির্দোষ হইলেও ইহা ব্যতীত তোমার বহু দোষ রহিয়াছে, যাহা সেই ব্যক্তি অবগত নহে। সুতরাং, নিন্দুকের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া মহাপ্রভু আল্লাহ্‌কে অশেষ ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যক। কারণ, তিনি তোমার অন্যান্য দোষ লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন এবং অপবাদকারী মিছামিছি দোষারোপ করিয়া স্বীয় পুণ্যসমূহ তোমাকে উপহার দিতেছে। সে তোমার প্রশংসা করিলে ইহা তোমাকে হত্যা করার তুল্য হইত। অতএব, যে ব্যক্তি তোমাকে হত্যা করিবার পরিবর্তে তাহার পুণ্যসকল তোমাকে দান করিল, তাহার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইবে কেন? যাহাদের দৃষ্টি কর্মের বাহ্য আকৃতির প্রতি নিবদ্ধ এবং ইহার নিগূঢ় মর্ম ও মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে যাহারা অক্ষম, কেবল তাহারাই নিন্দুকের প্রতি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, বুদ্ধিমান ও নির্বোধের মধ্যে ইহাই পার্থক্য; বুদ্ধিমানের দৃষ্টি প্রত্যেক কর্মের নিগূঢ় মর্ম ও মূলতত্ত্বের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, বাহ্য আকৃতির দিকে তাঁহারা দৃকপাত করেন না।

মোটের উপর কথা এই যে, মানবজাতি হইতে আশা-আকাঙ্খার সম্পূর্ণরূপে কর্তন না করা পর্যন্ত প্রশংসা-লালসারূপ মানসিক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে না।

প্রশংসা ও নিন্দা বিষয়ে মানুষের শ্রেণীবিভাগ

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, প্রশংসা ও নিন্দা শ্রবণে মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের তারতম্যানুসারে মানুষ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী-সর্বসাধারণ লোকজন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহারা নিজেদের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত হয় এবং নিন্দা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হইয়া উঠে। তাহারাই নিকৃষ্টতম শ্রেণীর মানুষ।

দ্বিতীয় শ্রেণী—সাধারণ পুণ্যবান লোকগণ। এই শ্রেণীর লোকেরা প্রশংসা শ্রবণে আনন্দিত ও নিন্দা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হয়; কিন্তু বাক্যে বা আচরণে ইহা প্রকাশ পায় না। বরং প্রকাশ্যভাবে তাহারা উভয়ের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করিয়া থাকে; তবে গুপ্তভাবে অন্তরে প্রশংসাকারীকে ভালবাসে এবং নিন্দুককে শত্রু বলিয়া গণ্য করে।

তৃতীয় শ্রেণী—পরহেযগার পুণ্যবানগণ। তাঁহারা প্রশংসাকারী এবং নিন্দুক উভয়কে আন্তরিকভাবে ও বাক্যে বা ব্যবহারে সমান মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিন্দাকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন না এবং প্রশংসাকারীকেও অধিক প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করেন না। অপরের প্রশংসা বা নিন্দা কোনটার প্রতিই তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। তাঁহারা অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর মানব।

সাধারণ আবিদগণের কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহারা উল্লিখিত উন্নত মানব শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভ্রমে নিপতিত রহিয়াছেন। তদ্রূপ নির্বিকারচিত্ত ও মানসিক উন্নতির নিদর্শনাবলী এই- (১) প্রশংসাকারী নিকটে উপবেশন করিলে মনে যেমন ভার বোধ হয় না নিন্দুকও সেইরূপ পার্শ্বে উপবেশন করিলে অন্তরে ভার বোধ না হওয়া; (২) প্রশংসাকারী ও নিন্দুক উভয়েই কোন কার্যে সাহায্য প্রার্থনা করিলে উভয়কেই সমানভাবে সাহায্য করা এবং প্রশংসাকারীকে সাহায্য প্রদানকালে যেরূপ আগ্রহ ও প্রফুল্লতা পরিলক্ষিত হয়, নিন্দুকের সাহায্য দান কালে ইহার ব্যতিক্রম না হওয়া; (৩) প্রশংসাকারীর সহিত বহুদিন যাবত সাক্ষাত না ঘটিলে মন যেমন তাহার সাক্ষাত লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে, তদ্রূপ নিন্দুকের সাক্ষাত লাভের জন্যও উৎসুক হইয়া থাকা; (৪) প্রশংসাকারী ও নিন্দুক উভয়ের মৃত্যুতে তুল্য পরিমাণে বিচ্ছেদ-যাতনা অনুভব করা; (৫) প্রশংসাকারীকে কেহ কষ্ট দিলে মন যেরূপ দুঃখিত হয়, নিন্দুককে কেহ যাতনা দিলেও মন তদ্রূপ দুঃখিত হওয়া এবং (৬) নিন্দুক কোন গর্হিত কার্য করিলে ইহা অসহনীয় ও প্রশংসাকারী তদ্রূপ অন্যায় করিলে ঘুষ বলিয়া মনে না হওয়া। এইরূপ নির্বিকার চিত্ত ও সমভাব রক্ষা করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার।

উল্লিখিতরূপ মানসিক অবস্থা লাভে অসমর্থ হইয়া যদি কোন আবিদ গর্বিত হইয়া বলে- 'নিন্দুক আমার নিন্দা করিয়া পাপী হইতেছে বলিয়াই আমি তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছি"- তবে ইহা শয়তানের প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, যাহারা মহাপাপে লিপ্ত রহিয়াছে এবং অপরের নিন্দা করিয়া ফিরিতেছে, বর্তমানকালে এইরূপ লোক বিরল নহে। কিন্তু উহাতে সে ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে না, শুধু স্বীয় নিন্দা শ্রবণে সে ক্রুদ্ধ হইতেছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কেবল অহংকার হইতেই এইরূপ ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে, অপরকে পাপ হইতে রক্ষার অভিপ্রায়রূপ ধর্মভাব হইতে ইহার উদ্ভব হয় নাই। মূর্খ আবিদগণের পক্ষে এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

চতুর্থ শ্রেণী—মহাসাধক সিদ্দীকগণ। তাঁহারা প্রশংসাকারীকে শত্রু বলিয়া জানেন এবং নিন্দুককে বন্ধু জ্ঞান করেন। কারণ, অপরের নিন্দা হইতে তাঁহারা তিন প্রকার উপকার পাইয়া থাকেন। **প্রথম**—তাঁহার নিন্দুকের নিকট হইতে স্বীয় দোষ শ্রবণ করিয়া সতর্ক হন। **দ্বিতীয়**—ইহাতে নিন্দুকের পুণ্যসমূহ তাঁহারা পাইয়া থাকেন। **তৃতীয়**- নিন্দাকারী যে দোষের উল্লেখ করিতেছে, ইহা হইতে বা তদ্রূপ অন্য কোন দোষ হইতে নিষ্কলঙ্ক থাকিতে তাহারা প্রলুব্ধ ও সচেষ্ট হইয়া উঠেন।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি (নিরবচ্ছিন্ন) রোযা রাখে, (রাত্রি জাগরণ করিয়া) নামায পড়ে এবং দরবেশী পোশাক পরিধান করে, অথচ তাহার অন্তর দুনিয়া হইতে নির্মোহ হয় নাই, তবে ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়।" ইহা যদি বাস্তবিকই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তি হইয়া থাকে তবে ব্যাপার বড় জটিল। কারণ, এই চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হওয়াই মানুষের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। এমন কি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হওয়াও সহজসাধ্য নহে, অর্থাৎ প্রশংসাকারী ও নিন্দুককে আন্তরিকভাবে সমান মনে না করিলেও বাক্যে বা ব্যবহারে উভয়কে তুল্যরূপ জ্ঞান করাই দুঃসাধ্য। কার্যে বা ব্যবহারে মানুষ সাধারণত প্রশংসাকারীর প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে দেখা যায়। অধিকাংশ লোকই সিদ্দীকগণের সেই চরম উন্নত সোপানে পৌঁছিতে পারে না: তবে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন এবং এইরূপে নিজেই নিজের শত্রু হইয়া পড়িয়াছেন, কেবল তিনিই স্বীয় নিন্দা শ্রবণে আনন্দিত হইতে পারেন এবং নিন্দুককে নিপুণ ও বুদ্ধিমান বলিয়া গণ্য করিতে সমর্থ হন। এইরূপ উন্নত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। সিদ্দীকগণের চূড়ান্ত শেষ শ্রেণীতে উপনীত হওয়া ত দূরের কথা, বরং আজীবন কঠোর সাধনার পর প্রশংসা ও নিন্দাকে সর্বতোভাবে তুল্য জ্ঞান করত নির্বিকার চিত্ত লাভ করাও অধিকাংশ সাধকের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে।

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, উক্তরূপ নির্বিকার চিত্ত লাভের পরও এই কারণে আশঙ্কা থাকিয়া যায় যে, সে যদি প্রশংসা ও নিন্দাকে সর্বতোভাবে সমান জ্ঞান করিতে না পারে, তবে প্রশংসা-লিপ্সু তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে এবং তখনই মানুষ প্রশংসা লাভের নিমিত্ত নানারূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে প্রতারণার অন্তরালে রিয়া প্রবেশ করাও অসম্ভব নহে। এমনকি পাপকর্ম দ্বারাও যদি প্রশংসা লাভ করা সম্ভবপর হয়, তবে হয়ত সে তাহাই করিয়া বসিবে। উপরিউক্ত হাদীসে রাসূলাল্লাহ্ (সা) যে রোযাদার নামাযী ব্যক্তির জন্য অনুশোচনা করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় এই কারণেই হইয়াছে যে, সংসারাসক্তি এবং প্রশংসা প্রীতির মূল

শিকড় অন্তর হইতে উৎপাটন করিতে না পারিলে মানব অতি তাড়াতাড়ি পাপে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু নিছক নিন্দাকে ঘৃণা করা ও সত্য প্রশংসাকে ভালবাসা হইতে অপর কোন আপদ ও অনিষ্টের উদ্ভব না হইলে উহাকে হারাম বলা চলে না। তবে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে নিন্দা-বিরাগ ও প্রশংসা-প্রীতি হইতে আপদ ও অনিষ্টের উদ্ভব না হইয়াই পারে না। মানবের অধিকাংশ পাপ প্রশংসা-প্রীতি ও নিন্দা-বিরাগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষ সাধারণত স্বীয় বাক্যে ও কর্মে অপরের মনোরঞ্জনের জন্য উদ্‌গ্রীব। তাহারা যাহা কিছু করে কেবল অপরের মনস্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকে (অথচ তাহার প্রতিটি বাক্য ও কর্ম একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত ছিল।) মানুষের এইরূপ পরমনোরঞ্জন-ব্যাকুলতা প্রবল হইয়া উঠিলে ইহার প্রভাবে সে নানারূপ অবৈধ ও অসঙ্গত কর্মে প্রবৃত্ত হয়। নতুবা রিয়ার ভাব না থাকিলে অপরের মনস্তুষ্টির বিধান হারাম নহে।

অষ্টম অধ্যায়

রিয়া ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র ইবাদত কার্যে রিয়া (ইবাদত কার্যে লোক দেখানো ভাব) মহাপাপ এবং প্রকারান্তরে ইহা শিরক অর্থাৎ অংশীবাদের তুল্য। পুণ্যবান লোকদের অন্তরে রিয়া অপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি আর নাই। ইবাদতকালে যদি মনে এইভাব থাকে যে, ইহা দেখিয়া ইবাদতকারীর সাধুতার প্রতি লোকে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তবে মনে করিবে তাহার হৃদয় অতি কঠিন রোগে আক্রান্ত। ইবাদতে অপরের ভক্তি আকর্ষণের উদ্দেশ্য থাকিলে উহা আল্লাহ্‌র ইবাদতে পরিগণিত হয় না; বরং তখন ইহা মানব পূজা বলিয়া গণ্য হয়। আর ইবাদত-কার্যে লোকের ভক্তি আকর্ষণ ও আল্লাহ্‌র আরাধনা উভয় উদ্দেশ্য হইলে শিরক এবং আল্লাহ্‌র সাথে অপরকে শরীক করিয়া তাহারও ইবাদত করা হইল। ইবাদত সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

"অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর দর্শন লাভের আশা রাখে তাহার উচিত যে, সৎ কাজ করে এবং আপন প্রভুর ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।" (সূরা কাহাফ, ১২ রুকু, ১৬ পারা)। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ -

"অনন্তর নিরতিশয় অনিষ্ট রহিয়াছে এমন নামাযীদিগের জন্য যাহারা নিজেদের নামাযকে ভুলিয়া থাকে (অর্থাৎ নামায পড়েই না), যাহারা এইরূপ যে (কোন সময় নামায পড়িলেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য পড়ে না-শুধু) রিয়াকারী (অর্থাৎ লোকের নিকট নামায পড়ার ভান) করে (মাত্র)।" (সূরা মাউন, ৩০ পারা)।

হাদীসে রিয়ার জঘন্যতা—এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাস করিল- "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, কোন্ কার্যে নাজাত (পরিত্রাণ) পাওয়া যায়?" তিনি বলিলেন- "রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত করাতেই পরিত্রাণ নিহিত আছে।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে বিচার স্থলে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে- "তুমি কোন্ প্রকার ইবাদত করিয়াছ? সেই ব্যক্তি বলিবে- "আমি আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ দান করিয়াছি; কাফিরগণ ধর্মযুদ্ধে

আমাকে শহীদ করিয়াছে।" আল্লাহ্ বলিবেন- 'তুমি মিথ্যা বলিতেছ; লোকে তোমাকে বাহাদুর বলিবে এইজন্য তুমি জিহাদ করিয়াছিল। (অতএব হে ফেরেশতাগণ) তাহাকে দোযখে লইয়া যাও।" তৎপর অপর ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে- 'তুমি কি ইবাদত করিয়াছ?" সেই ব্যক্তি বলিবে- "আমি বহু পরিশ্রমে ইল্ম শিক্ষা করিয়াছি এবং কুরআন শরীফ পড়িয়াছি।" আল্লাহ্ বলিবেন- "তুমি মিথ্যা বলিতেছ; লোকে তোমাকে আলিম বলিবে এইজন্যই তুমি ইলম শিক্ষা করিয়াছিলে। তাহাকে দোযখে লইয়া যাও।'

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আমার উম্মতের জন্য ছোট শিরক বিষয়ে আমি যেরূপ ভয় করি অন্য কোন বিষয়ে আমি তদ্রূপ ভয় করি না।" সমবেত সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ছোট শিরক কি?" তিনি বলিলেন- "রিয়া। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলিবেন-'হে রিয়াকারগণ, যাহাদের উদ্দেশ্যে তোমরা ইবাদত করিয়াছ তাহাদের নিকট গমন কর এবং তাহাদের নিকট হইতেই তোমাদের প্রতিদান চাহিয়া লও।" একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "জুবুলহুয্‌ন হইতে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর।" সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইহা কি?" তিনি বলিলেন- "রিয়াকার আলিমদের (শাস্তির) জন্য ইহা দোযখের একটি গর্ত। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ বলেন- "যে ব্যক্তি ইবাদতকালে অন্যকে আমার সহিত শরীক করে (আমি তাহার ইবাদত গ্রহণ করি না; বরং) এইরূপ ইবাদতের সমস্তই আমি ঐ শরীককে দিয়া দেই; কেননা অংশীরূপ কলঙ্ক হইতে আমি মুক্ত।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ইবাদতে রেণু পরিমাণ রিয়া থাকে আল্লাহ্ তাহা গ্রহণ করেন না।"

একদা হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে রোদন করিতে দেখিয়া হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- "আমি রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট শুনিয়াছি যে, সামান্য রিয়াও শিরক এবং তিনি বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন রিয়াকারীদিগকে আহ্বান করিয়া বলা হইবে- ' হে রিয়াকার, হে প্রতারক, হে অকর্মণ্য, তোমার ইবাদত ও সৎকর্ম নষ্ট হইয়াছে এবং তোমার প্রতিদান নিস্ফল হইয়া গিয়াছে। যাও, যাহার জন্য কাজ করিয়াছ তাহার নিকট হইতে তোমার প্রতিদান চাহিয়া লও।" হযরত শাদ্দাদ ইব্‌নে আউস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রোদন করিতেছেন দেখিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- "আমি ভয় করিতেছি যে, আমার উম্মত শিরক করিবে; ইহা নহে যে তাহারা মূর্তি, সূর্য বা চন্দ্রের পূজা করিবে, কিন্তু তাহারা ইবাদতে রিয়াকারী করিবে।" (অর্থাৎ লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা ইবাদত করিবে)। রাসূলে মাক্বূল

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কিয়ামতের দিন যখন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না তখন এই ছায়াতে ঐ ব্যক্তি স্থান লাভ করিবে যে ডান হস্তে দান করিয়া বাম হস্তকে জানিতে দেয় নাই।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,- "আল্লাহ্ পৃথিবী সৃষ্টি করিলে ইহা কাঁপিতে লাগিল। তৎপর তিনি পর্বতসমূহ সৃষ্টি করিলেন এবং পৃথিবী স্থির হইল। ইহা দেখিয়া ফেরেশতাগণ বলিল যে, আল্লাহ্ পর্বত অপেক্ষা মজবুত আর কোন জিনিস সৃষ্টি করেন নাই। আল্লাহ্ ইহা শুনিয়া লোহা সৃষ্টি করিলেন। তখন ফেরেশতাগণ বলিল- লোহা সর্বাপেক্ষা মজবুত। তৎপর আল্লাহ্ অগ্নি সৃষ্টি করিলেন- অগ্নি লোহা গলাইয়া দিল। পরে আল্লাহ্ পানি সৃষ্টি করিলেন এবং ইহা অগ্নি নির্বাপিত করিয়া দিল। অনন্তর বায়ুকে আদেশ করা হইল। বায়ু পানিকে জমাট বাঁধাইয়া দিল। অতএব (সৃষ্ট বস্তুর শক্তির তারতম্য নির্ধারণে) ফেরেশতাদের মধ্যে মতভেদ হইল। তাহারা আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার মীমাংসা করিতে চাহিল। তাহারা নিবেদন করিল- "হে খোদা, তোমার সৃষ্টির মধ্যে কোন্ বস্তু সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী?" আল্লাহ্ বলিলেন- "ডান হস্তে দান করিবারকালে যাহারা বাম হস্ত জানিতে দেয় না, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করিয়া আমি আর কাহাকেও সৃষ্টি করি নাই।"

হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আকাশ সৃজনের পূর্বে আল্লাহ্ সাতজন ফেরেশতা সৃষ্টি করিলেন এবং সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করত এক একজন ফেরেশতাকে এক এক আকাশের পাহারায় নিযুক্ত করিলেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ যে সমস্ত ইবাদত করে ইহা পৃথিবীতে অবস্থানকারী 'হাফাযা' নামক ফেরেশতা পৃথিবী হইতে প্রথম আকাশে লইয়া গিয়া বান্দার ইবাদতের বহু প্রশংসা করে, কারণ, সেই বান্দা এইরূপ ইবাদত করিয়াছে যে, উহা সূর্যসম উজ্জ্বল হইয়াছে। তখন প্রথম আকাশে পাহারায় রত ফেরেশতা বলে যে, এই ইবাদত ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর; কেননা আমি গীবতকারীদের পর্যবেক্ষক এবং গীবতকারীর ইবাদত যেন কেহ এই আকাশপথে লইয়া যাইতে না পারে, এই মর্মে আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করিয়াছেন। তৎপর যাহারা গীবত করে নাই তাহাদের ইবাদতসমূহ দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। তথায় নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, এই ইবাদত লইয়া ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর; কারণ দুনিয়া অর্জনের জন্য সে ইহা করিয়াছে এবং ইবাদত করত লোক সমক্ষে গর্ব করিয়াছে। এইরূপ ইবাদত ফেরত দেওয়ার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। ইহার পর ফেরেশতা অন্যান্য লোকের ইবাদত-নামায, রোযা, দান ইত্যাদি লইয়া দ্বিতীয় আকাশ অতিক্রম করিয়া যাইবে এবং এই সকল ইবাদতের জ্যোতি দর্শনে 'হাফাযা' আশ্চর্যান্বিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তৃতীয় আকাশের দ্বারদেশে পৌছিলেই সেই স্থানে নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, আমি

অহংকারীদের পর্যবেক্ষকরূপে নিযুক্ত রহিয়াছি। তাহাদের ইবাদত আমি প্রতিরোধ করি। কারণ, তাহারা লোকের সহিত অহংকার করিয়াছে। তৎপর অপরাপর লোকের ইবাদত চতুর্থ আকাশ পর্যন্ত উন্নীত করা হইবে। এই সমস্ত ইবাদত তসবীহ, নামায, হজ্জ ইত্যাদি প্রভাতী নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল থাকিবে। কিন্তু চতুর্থ আকাশের ফেরেশতা বলিবে, আমি খোদ-পছন্দ আত্মাভিমানী লোকের পর্যবেক্ষক। এই ইবাদত খোদ-পছন্দী, আত্মাভিমানশূন্য নহে; সুতরাং উহা এই আকাশ পথে লইয়া যাইতে দিব না, উহা ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর। তৎপর এই ইবাদতসমূহ ফেলিয়া দিয়া ফেরেশতা অন্যান্য লোকের ইবাদত লইয়া পঞ্চম আকাশ পর্যন্ত উপস্থিত হয়। এই ইবাদতসমূহ নব বধূর ন্যায় সৌষ্ঠবসম্পন্ন ও মনোহর, তথাপি সেই আকাশের ফেরেশতা বলিবে, এই ইবাদতসমূহ ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর এবং তাহার ঘাড়েই চাপাইয়া দাও; আমি ঈর্ষাকারীদের পর্যবেক্ষকরূপে নিযুক্ত রহিয়াছি; যে ব্যক্তি ইলম ও আমলে তাহার সমান হইতে সে তাহার প্রতি ঈর্ষাভাব পোষণ করিত এবং তাহার বিরুদ্ধে অপ্রিয় কথাবার্তা বলিত। ঈর্ষাপরায়ণ লোকের ইবাদত প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাকে আদেশ করা হইয়াছে। অনন্তর 'হাফাযা' এই ইবাদতসমূহ ফেলিয়া অবশিষ্টগুলি সহকারে ষষ্ঠ আকাশে দ্বারদেশে উপনীত হয়। শেষোক্ত ইবাদতসমূহেও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, উম্‌রা প্রভৃতি আমল রহিয়াছে। কিন্তু সেই আকাশের দ্বারবান ফেরেশতা বলিবে, এই ইবাদত ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর; কারণ এই ব্যক্তি দুস্থ ও বিপদগ্রস্ত লোকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে নাই, বরং তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া সে আনন্দিত হইয়াছে, আমি রহমতের ফেরেশতা। নির্দয় লোকের ইবাদত যেন এই স্থান দিয়া অতিক্রম না করে তজ্জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

তৎপর হাফাযা অবশিষ্ট ইবাদতগুলি সপ্তম আকাশে লইয়া যায়। এই ইবাদতসমূহ নামায, রোযা, পারিবারিক ব্যয়, জিহাদ, পরহেযগারী ইত্যাদি কার্যে পরিপূর্ণ এবং সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান থাকে। প্রচণ্ড বজ্রনিনাদের ন্যায় ধ্বনি সহকারে উহার সুখ্যাতি সমস্ত আকাশমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে তিন সহস্র ফেরেশতা ইবাদতগুলি পাহারা দিয়া চলে এবং কোন ফেরেশতাই কোন প্রকার বাধা প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু সপ্তম আকাশের দ্বারদেশে উপনীত হইলে দ্বারবান ফেরেশতা বাধা প্রদান করিয়া বলে, যে সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, শুধু আলিম সমাজে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন এবং দেশ-বিদেশে যশ প্রতিপত্তি বিঘোষণই যাহাদের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের আমল এই আকাশে প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি নাই। যে ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র জন্য না হয়, তাহাই রিয়া; আর রিয়াকারীর ইবাদত আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। সুতরাং রিয়াকারীদের ইবাদত তাহাদের মুখের উপর নিক্ষেপ কর। তৎপর রিয়াকারীদের ইবাদত ফেলিয়া অবশিষ্ট

ইবাদতসমূহ সহকারে ফেরেশতা সপ্তম আকাশ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। এই ইবাদতসমূহ বিশুদ্ধ, সৎস্বভাব, তস্‌বীহ্ ও নানাবিধ ইবাদতের সমষ্টি। আকাশের ফেরেশ্‌তাকুল হাফাযার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র দরবারে গিয়া উপনীত হয় এবং সকলেই এ ইবাদতের প্রশংসা করত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলে- ইয়া আল্লাহ্! এই ইবাদতগুলি পাক-পবিত্র এবং একমাত্র তোমার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন- হে ফেরেশ্‌তাগণ! তোমরা মানুষের বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ দর্শন করিয়া থাক মাত্র; কিন্তু আমি তাহাদের অন্তর দেখিয়া থাকি। এই ইবাদত আমার উদ্দেশ্যে করা হয় নাই। ইবাদতকারীর অন্তরে অন্য সংকল্প লুক্কায়িত ছিল। তাহার উপর আমার লা'নত। ফেরেশ্‌তাগণ বলিবে- হে খোদা, তাহার উপর তোমার ও আমাদের সকলের লা'নত। তখন সমস্ত আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলেই তাহার উপর লা'নত করে। রিয়ার জঘন্যতা সম্বন্ধে এবংবিধ আরও বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

বুযুর্গগণের উক্তিতে রিয়ার জঘন্যতা—হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা দেখিতে পাইলেন যে, এক ব্যক্তি স্বীয় সাধুতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিয়া আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত রহিয়াছে। তিনি তাহাকে বলিলেন- "ওহে, তোমার অবনত গ্রীবা সোজা কর। বিনয় অন্তরে থাকে, গ্রীবাতে থাকে না।" হযরত আবূ উমামা রাযিআল্লাহু আন্‌হু দেখিতে পাইলেন এক ব্যক্তি মসজিদে গমন করত সিজদায় প্রণত হইয়া রোদন করিতেছে। তিনি তাহাকে বলিলেন- "তুমি মসজিদে যাহা করিতেছ, তাহা যদি স্বীয় গৃহে করিতে তবে তোমার সমকক্ষ কেহই হইতে পারিত না।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, রিয়াকারের তিনটি নিদর্শন আছে। **প্রথম**—নির্জনে একাকী থাকিলে ইবাদত কার্যে শিথিল এবং অলস থাকে; কিন্তু লোক দেখিলে আনন্দিত হইয়া ইবাদতে আগ্রহ ও নিপুণতা দেখায়। **দ্বিতীয়**—লোকমুখে প্রশংসা শুনিলে অধিক ইবাদত করে এবং **তৃতীয়**—নিন্দা শুনিলে ইবাদত নিতান্ত কম করে। এক ব্যক্তি হযরত সা'দ ইব্‌নে মুসাইব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করিল- "যে ব্যক্তি সওয়াব ও লোকের প্রশংসা লাভের আশায় ধন দান করে, তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" তিনি বলিলেন- "আচ্ছা বলত সেই ব্যক্তি কি আল্লাহ্‌কে শত্রু বানাইতে ইচ্ছা করে?" সেই ব্যক্তি বলিল- "না।" তিনি বলিলেন- "তবে প্রত্যেক কাজই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা উচিত।"

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এক ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া তাহাকে বলিলেন- "এস ভাই, আমাকে প্রহার করিয়া তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার ও আল্লাহ্‌র সন্তোষ বিধানার্থ আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম।" তিনি বলিলেন- "এইরূপ ক্ষমা কোন কাজেরই নহে, হয়ত শুধু আমার জন্য ক্ষমা কর, আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব; আর না হয়,

কাহাকেও শরীক না করিয়া কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ক্ষমা কর।" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল-" কাহাকেও শরীক না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম।" হযরত ফুযাইল (রা) বলেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন অপরের ভক্তি ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে লোকে কাজ করিত; কিন্তু এখন লোকে কাজ না করিয়াই ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করে যে কাজ করা হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলিয়াছেন, লোকে রিয়া করিলে আল্লাহ্ বলেন- "দেখ, আমার বান্দা আমার সহিত কিরূপ ঠাট্টা করিতেছে।"

রিয়া প্রকাশক কর্মসমূহ

রিয়ার পরিচয়—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, নিজের সাধুতা প্রদর্শন ও অপর লোকের ভক্তি আকর্ষণের জন্য নিজকে সাধু ও পরহেযগাররূপে সাজাইবার বাসনাকে রিয়া বলে। যে ধর্মকর্মে সাধুতা ও মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা অপরের সম্মুখে করিয়া দেখাইবার ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইলেই বুঝিবে অন্তরে রিয়া রহিয়াছে।

রিয়া প্রকাশের ধারা—প্রকাশের ধারা বিচারে রিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

প্রথম—যাহা দেহের বাহ্য আকার, ক্রিয়া-কলাপ ও হাবভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে; যেমন- চেহারা পাণ্ডুবর্ণ করিয়া রাখিলে লোকে মনে করে যে, সেই ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করত ইবাদতে অতিবাহিত করিয়াছে। নিজকে জীর্ণশীর্ণ দেখাইলে লোকে বুঝে যে, সেই ব্যক্তি কঠোর সাধনা করিয়া থাকে। মুখাবয়বে রোদন চিহ্ন প্রদর্শন করিলে লোকে অনুমান করে, এই ব্যক্তি ধর্ম-চিন্তায় অধীর হইয়া এইরূপ হইয়াছে। চুলে চিরণী ব্যবহার না করিলে লোকে মনে করে যে, এই ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে এত ব্যাপৃত যে, স্বীয় দেহের প্রতি মনোযোগ দেওয়ারও তাহার অবসর নাই। মৃদুস্বরে আস্তে আস্তে কথা বললে লোকে মনে করে, সেই ব্যক্তি নিতান্ত ধর্মভীরু এবং তাহার অন্তর ধর্মভাবে অভিভূত। ওষ্ঠাধর শুষ্ক রাখিলে লোকে মনে করে, এই ব্যক্তি রোযা রাখিয়াছে। এবংবিধ নিদর্শনাবলী দেখিয়া দর্শকগণ তদ্রূপ লোককে সাধু জ্ঞানে ভক্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, উহাতে প্রদর্শক পরম আনন্দ অনুভব করে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন- "রোযা রাখিয়া চুলে চিরনী ব্যবহার করাও ওষ্ঠাধরে তৈল লাগানো উচিত, যেমন কেহই তাহাকে রোযাদার বলিয়া চিনিতে না পারে।"

দ্বিতীয়—পোশাক-পরিচ্ছদে প্রকাশিত রিয়া। সাধুদের বৈরাগ্য বসন এবং পুরাতন, মলিন, মোটা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করা যাহাতে লোকে পরিধানকারীকে দরবেশ বলিয়া মনে করে। তদ্রূপ নীল পরিচ্ছদ ও নানাবিধ কাপড়ের তালি দেওয়া জায়নামায রাখা যেন লোকে সূফী বলিয়া ভক্তি করে, যদিও সূফীদের গুণাবলীর কিছুই সেই

ব্যক্তির মধ্যে নাই। পাগড়ীর উপর একটি চাদর পরিধান ও মোজার উপর আর একখানা চর্মাবরণ ধারণ করা যেন লোকে বুঝিতে পারে যে, এই ব্যক্তি পবিত্রতা রক্ষার জন্য অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে; অথচ পবিত্রতা রক্ষাকল্পে সে মোটেই সর্তক নহে। তদ্রূপ আলিমগণের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, যেন পরিধানকারীকে লোকে আলিম জ্ঞানে মান্য করে যদিও সেই ব্যক্তি আলিম নহে।

পোশাক-পরিচ্ছদে রিয়াকারগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

প্রথম শ্রেণী—তাহারা জনসাধারণের ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টায় ব্যস্ত এবং সর্বদা বৈরাগ্য বসন এবং পুরাতন মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করেন।তদ্রূপ, বসন পরিত্যাগপূর্বক তাহাদিগকে বৈধ উৎকৃষ্ট আবাকাবা ইত্যাদি পরিধান করিতে বলিলে ইহা তাহাদের নিকট মৃত্যু অপেক্ষা কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কারণ এইরূপ পোশাক পরিধান করিলে লোকে ধারণা করিতে পারে যে, দরবেশ দরবেশী পরিত্যাগ করিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর লোকেরা জনসাধারণ, সম্ভ্রান্তমণ্ডলী ও বাদশাহ্‌র ভক্তি আকর্ষণে তৎপর থাকে। পুরাতন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিলে বাদশাহ্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ হেয় জ্ঞান করিতে পারে; আবার বহুমূল্য বসন পরিধান করিলে জনসাধারণের ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব, তাহারা বুটাদার সূক্ষ্ম পশমী বসন পরিধান করে সত্য, কিন্তু উহা অতি বহুমূল্য উকপরণে প্রস্তুত থাকে। দরবেশগণের পরিধেয় পোশাকের ন্যায় পাজামা, তহবনদ, জামা ইত্যাদি বস্ত্র তাহারা পরিধান করিলেও উহা ফুলদার, বুটাদার এবং অত্যন্ত মূল্যবান হইয়া থাকে। তাহাদের পরিধানে দরবেশগণের বৈরাগ্য বসন দেখিয়া ও পরহেযগারগণের পরিচ্ছদের ন্যায় বস্ত্র দর্শন করিয়া তাহাদের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে; অপরপক্ষে, বহু মূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া বাদশাহ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও তাহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকদিগকে সভ্যজনোচিত সাধারণ ও সুলভ বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলে তাহারা ইহাকে মৃত্যুসম কঠোর বিপদ মনে করে। এইরূপ সাধারণ ও সুলভ বস্ত্র পরিধান করিলে জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্মান হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলিয়া তাহারা উহা ধারণ করিতে অপমান মনে করে। এই নির্বোধগণ যদিও জানে যে তদ্রূপ পোশাক পরিধান করা অবৈধ নহে এবং বহু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি উহা পরিধান করিয়া থাকেন তথাপি প্রকাশ্যে উহা পরিধান হইতে তাহারা বিরত থাকে; তবে অপরের অলক্ষিতে স্বীয় গৃহে সেইরূপ পোশাক পরিধান করিয়া থাকে।

তৃতীয়—কথাবার্তায় ও বাগেন্দ্রিয় সঞ্চালনে রিয়া। ইহার উদাহরণ এইরূপ সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে ব্যাপৃত আছে, লোকের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেহ কেহ

সর্বদা ওষ্ঠ সঞ্চালন করিতে থাকে। হয়ত বা তাহারা আল্লাহ্র যিকির করিয়া থাকে। আন্তরিক যিকির করিলে কি যিকির হইত না? কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র স্তুতিগায়করূপে পরিচিত হইবার নিমিত্ত ওষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া থাকে। তাহাদের আশঙ্কা হয় যে, ওষ্ঠ সঞ্চালন না করিলে লোকে তাহাদিগকে ভক্তি করিবেনা। কেহ কেহ লোকসমক্ষে পাপের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ করে এবং পাপ হইতে অতি যত্নে বিরত থাকে; কিন্তু নির্জনে তাহাদের এই অবস্থা থাকে না। কেহ কেহ লোকের নিকট কামিল দরবেশ বলিয়া সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে সূফীদের দরবেশী কথা মুখস্ত করিয়া লয় এবং সুযোগ পাইলেই ইহা আওড়াইতে থাকে যেন লোকে মনে করে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্-প্রেমে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। কেহ মধ্যে মধ্যে 'হায়' 'আহা' শব্দ উচ্চারণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বা নিজেকে নিতান্ত দুঃখিত বিমর্ষ দেখায় যাহাতে লোকে মনে করিতে পারে যে, এই ব্যক্তি ইসলামের অবনতি দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছে। কেহ আবার কতিপয় হাদীসের উক্তি ও বিবিধ কাহিনী মুখস্থ করিয়া সময়ে-অসময়ে বর্ণনা করিতে থাকে; উহা শুনিয়া যেন লোকে তাহাকে বড় আলিম বলিয়া সম্মান করে এবং মনে করে যে, সে বহু অভিজ্ঞ পীরের দর্শন লাভ ও বহু দেশ পর্যটন করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছে।

চতুর্থ—ইবাদতে রিয়া। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ-কেহ কেহ লোকসমক্ষে খুব সুন্দরভাবে নামায পড়ে; যথোচিতভাবে মস্তক অবনত করিয়া দীর্ঘ রুকূ ও সিজদা করে এবং এদিক সেদিকও তাকায় না; আবার অপরকে দেখাইয়া দান-খয়রাত করে। এবং বিধ আরও বহু বিষয় আছে যাহাতে রিয়া হইয়া থাকে। যেমন লোকের সম্মুখে খুব মৃদু গতিতে মস্তক অবনত করিয়া চলা; একাকী চলিবারকালে এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতগতিতে চলা; কিন্তু দূর হইতে কাহাকেও আসিতে দেখিলে আবার আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করা ইত্যাদি।

পঞ্চম—আত্মশ্লাঘা প্রকাশে রিয়া। কেহ কেহ বাহাদুরী প্রকাশ করিয়া বলে যে, আমার বহু মুরীদ আছে, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমীর-ওমরা আমাকে সালাম দিতে আসেন এবং আমার আশীর্বাদ লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন; আলিমগণ আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা আমাকে ওলী বলিয়া বিশ্বাস করেন। কাহারও সহিত তর্ক-বিতর্ককালে এই প্রকৃতির লোকেই বলিয়া থাকে– তুমি অতি নগণ্য; তোমাকে কে চিনে? তোমার পীরই বা কে? তোমার মুরীদই বা কত? আমি বহু অভিজ্ঞ পীরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি এবং বহু বৎসর অমুক পীরের সাহচর্যে অতিবাহিত করিয়াছি। তুমি কাহাকে দেখিয়াছ? এই শ্রেণীর রিয়াকারগণ তদ্রূপ নানাবিদ কথা বলিয়া নিজদিগকে দুঃখ-কষ্টে নিপাতিত কর।

পানাহারে রিয়া অতি সহজে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক খৃষ্টান সন্ন্যাসী এত প্রশংসা প্রিয় ছিল যে, সাধু বলিয়া অপরের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় আহারহ্রাস

করিতে করিতে অবশেষে তাহার দৈনিক আহারের পরিমাণ মাত্র একটি চানাবুটে পরিণত করে। দরবেশী প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইবাদতে এবং বিধ সমস্ত কাজই হারাম, কেননা, একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই দরবেশী অর্জন করা আবশ্যক।

স্থান বিশেষে রিয়া নির্দোষ—ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কার্য দ্বারা দরবেশী প্রকাশ না করিয়া ও আবশ্যকতার সীমা অতিক্রম না করিয়া লোকের নিকট সম্মান ও প্রতিপত্তি কামনা করা হারাম নহে; যেমন উত্তম পোশক পরিধান করিয়া বহির্গত হওয়া। উত্তম পোশাক পরিধান করত বহিগত হওয়াতে কোন দোষ নাই বরং ইহা সুন্নত। কারণ এইরূপ পোশাক পরিধানে দরবেশী প্রকাশ পায় না, বরং সভ্যতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তদ্রুপ সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, চিকিৎসা-শাস্ত্র কিংবা এমন কোন বিষয় যাহার সহিত ধর্মবিদ্যার কোন সম্বন্ধ নাই বা যাহা ইবাদতের অন্তর্গত নহে তেমন বিষয়ে স্বীয় প্রাধান্য প্রকাশেও কোন দোষ নাই। ইতঃপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, আবশ্যকতা সীমা অতিক্রম না করিয়া ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কার্য দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করা অবৈধ নহে।

একদা সাহাবাগণ (রা) সমবেত ছিলেন, এমতাবস্থায়, রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গৃহ হইতে বহির্গত হইবার কালে একটি জলপত্রের পার্শ্বে দন্ডায়মান হইয়া স্বীয় কেশমুবারক ও পাগড়ী সুসজ্জিত করিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা নিবেদন করিলেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনিও এইরূপ করেন?" তিনি বলিলেন– "হাঁ, স্বীয় ভাই-বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কালে নিজের অঙ্গসৌষ্ঠব ও পরিচ্ছদ পরিপাটি করা আল্লাহ্ পছন্দ করিয়া থাকেন।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই মূল ধর্ম। তাঁহাকে নিখিল বিশ্বের শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে এইরূপে চলিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন লোকের হৃদয়-দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং লোকে তাঁহাকে ভক্তি ও অনুসরণ করে। কিন্তু কেহ যদি শুধু অঙ্গ-সৌষ্ঠবের উদ্দেশ্যে পরিচ্ছদ পরিপাটি করে তবে ইহা জায়েয হইবে; বরং ইহা সুন্নত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে বহু উপকার নিহিত রহিয়াছে। সমাজে প্রচলিত ভদ্রতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অপরিচ্ছন্ন ও অশোভন পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করিলে তৎপ্রতি লোকের ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে এবং অগোচরে তাহারা তাহার নিন্দা করিতে পারে। এমতাবস্থায়, নিজেই এইরূপ ঘৃণা এবং পরনিন্দার একমাত্র কারণ হইয়া থাকে।

ইবাদতে রিয়া হারাম হওয়ার কারণ—দুইট কারণে ইবাদতে রিয়া হারাম। প্রথম কারণ–প্রতারণা। রিয়াকার লোকের নিকট প্রকাশ করে যে, একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই সে ইবাদত করিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহা না করিয়া সে লোকের ভক্তি আকর্ষণের জন্য ইবাদত করত তাহাদিগকে প্রতারিত করে। লোকে যদি বুঝিতে

পারিত যে, ইবাদতের ভান করিয়া প্রতারণাপূর্বক তাহাদের নিকট ভক্তিভাজন হওয়ার চেষ্টা চলিতেছে তবে তাহারা এমন ব্যক্তিকে প্রতারক বলিয়া ঘৃণা করিত। দ্বিতীয় কারণ– আল্লাহ্‌র সহিত ঠাট্টা। নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত শুধু আল্লাহ্‌র জন্য সম্পাদন করা আবশ্যক; উহাতে মহাপ্রভু আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে না। কিন্তু উহাতে দুর্বল অপদার্থ মানবের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকিলে তদ্দারা পরম পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সহিত ঠাট্টা করা হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মনে কর, কোন ব্যক্তি বাদশাহ্‌র দরবারে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ করিতেছে যে, সে বাদশাহ্‌র খেদমতে নিযুক্ত আছে; কিন্তু দরবারের কোন দাস বা দাসীর সাক্ষাৎ লাভই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, খেদমত উদ্দেশ্য নহে। ইহাতে দাস বা দাসীর দর্শন লাভকে বাদশাহ্‌র খেদমতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইল। সুতরাং এমন কার্য বাদশাহ্‌র সহিত ঠাট্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। নামাযে দণ্ডায়মান হইয়া রুকূ-সিজদা আল্লাহ্‌র জন্য না করিয়া অপরের ভক্তি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে করাও ঠিক তদ্রূপ। এইরূপ ইবাদতে প্রকাশ্য শিরক হইয়া থাকে। কিন্তু রুকূ-সিজদা যদি আল্লাহ্‌র জন্য করা হয় এবং অন্তরে মানুষের ভক্তি আকর্ষণের উদ্দেশ্যও থাকে তবে ইহাকে গুপ্ত শিরক বলা যায়, প্রকাশ্য শিরক বলা চলে না।

রিয়ার শ্রেণীবিভাগ

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, রিয়া বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে কোনটি নিতান্ত মারাত্মক। ইহাদের মধ্যে পরস্পর যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(১) অপরের ভক্তি ও পুণ্যের আশায় তারতম্যানুসারে রিয়ার শ্রেণীভেদ। **প্রথম**—যে ইবাদতে পুণ্য লাভের আশা মোটেই থাকে না, শুধু অপরের ভক্তি পাইবার উদ্দেশ্যেই ইবাদত করা হয়, এইরূপ রিয়া নিতান্ত জঘন্য এবং তজ্জন্য পরকালে অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি লোকসমক্ষে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে, কিন্তু নির্জনে একাকী কিছুই করে না সে-ই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। **দ্বিতীয়**—ইবাদতে পুণ্য লাভের আশা থাকে সত্য, কিন্তু ইহা নিতান্ত দুর্বল। ইহার নিদর্শন এই যে, তদ্রূপ লোক নির্জনে একাকী অবস্থানকালে নামায, রোযা আদৌ করে না। এই প্রকার রিয়া প্রায় প্রথম শ্রেণীর মতই জঘণ্য। পুণ্য লাভের এইরূপ ক্ষীণ আশা তাহাকে আল্লাহ্‌র ক্রোধ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। **তৃতীয়**—পুণ্য লাভের আশা যদি প্রবল থাকে এবং একাকী থাকিবার কালেও সে নামায-রোযা করে, তবে লোকসমক্ষে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং কাজও অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে আমাদের আশা যে, তাহার ইবাদত সম্পূর্ণরূপে নষ্ট বা পুণ্য একেবারে বিনাশ হইবে না। কিন্তু

রিয়া যে পরিমাণে বলবান থাকিবে, সেই পরিমাণে অবশ্যই শাস্তি হইবে বা পূণ্য হ্রাস পাইবে। **চতুর্থ**—অপরের ভক্তি ও পূণ্য লাভের আশা। এই উভয়টিই সমান সমান হইলে এবং কোনটিই অপরটি অপেক্ষা প্রবল না থাকিলে পূণ্য ভাগাভাগি হইয়া পড়িবে। প্রকাশ্য হাদীস হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, মানুষ তদ্রূপ স্থলে রিয়ার পাপ হইতে নিরাপদে অব্যাহতি পাইবে না, বরং তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

(২) কার্যের প্রকৃতি ভেদে রিয়ার শ্রেণীভেদ—ইবাদত কার্যের প্রকৃতি ভেদে রিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম—মূল ঈমানের রিয়া করা অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে অন্তরে ঈমানদার না হইয়া শুধু লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিজকে ঈমানদার বলিয়া পরিচয় দেওয়া, ঈমানবিহীন মুনাফিকগণ এইরূপ করিয়া থাকে। পরকালে তাহাদের প্রতি শাস্তি কাফিরদের অপেক্ষা অধিক ভয়ংকর ও কঠোর হইবে। ইহার কারণ এই যে, তাহারা আন্তরিকভাবে কাফির; কিন্তু প্রতারণাপূর্বক লোকদের নিকট ঈমানদার বলিয়া প্রকাশ করে। ইসলামের প্রাথমিককালে এই প্রকার মুনাফিকের সংখ্যা অধিক ছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা অতি বিরল। তবে বর্তমানে ইবাদতী সম্প্রদায় ও ধর্মদ্রোহী নাস্তিকগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহারা শরীয়তের আইন ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রকাশ্যে উহার বিরুদ্ধাচরণ করে। তাহারাও উল্লিখিত বেঈমান মুনাফিকদের ন্যায় চিরকাল কঠিন দোযখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

দ্বিতীয়—প্রকৃত ইবাদত কার্যে রিয়া। লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামায পড়া বা রোযা রাখা; কিন্তু নির্জনে একাকী থাকিলে কিছুই না করা। তেমন লোক বিনা-ওযুতেও নামায পড়িয়া থাকে। এইরূপ রিয়াও অতি ভয়ংকর যদিও বেঈমান মুনাফিকদের রিয়ার ন্যায় ইহা তত মারাত্মক নহে। মোটের উপর কথা এই, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তোষ অপেক্ষা অপরের ভক্তি অধিক ভালবাসে, কাফির না হইলেও তাহার ঈমান নিতান্ত দুর্বল। সময় থাকিতে তওবা না করিলে মৃত্যুকালে এইরূপ ব্যক্তির বেঈমান হইয়া মরিবার আশঙ্কা আছে।

তৃতীয়—সুন্নত ইবাদতে রিয়া। কেহ কেহ ঈমান ও ফরয কার্যে রিয়া না করিয়া থাকিলেও সুন্নত কার্যে রিয়া করিয়া থাকে; যেমন, লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদ নামায পড়া, সদ্‌কা-খয়রাত করা, জমাআতে নামায পড়িতে যাওয়া, আরফা ও আশুরার দিন এবং প্রতি বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা। অপরের নিন্দা হইতে অব্যাহতি বা প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে এইরূপ কার্য করিলে রিয়া হইয়া থাকে। তেমন রিয়াকারকে রিয়া হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দিলে সে হয়ত বলিবে–"আমার পক্ষে এই সকল কার্য করা না করা সমান এবং উহা সম্পাদন করা আমার জন্য ওয়াজিব নহে। অতএব, উহাতে সওয়াব না হউক, কিন্তু কোন শাস্তি না হইলেও চলে।" জানিয়া রাখ, সুন্নত কার্যে রিয়া করিলে যে শাস্তি হইবে না তাহা ঠিক নহে। কারণ,

সর্বপ্রকার ইবাদতই একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত। উহাতে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও কোন অংশ নাই। সুতরাং যে কার্য একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা আবশ্যক তাহা অপরের প্রশংসা লাভ বা নিন্দার পথ রুদ্ধ করার জন্য করিলে সৃষ্ট জীবকে সৃষ্টিকর্তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয় এবং ইহাতে আল্লাহ্র প্রতি ঠাট্টা করা হইয়া থাকে। তজ্জন্যই এইরূপ রিয়ার কারণে শাস্তিরও বিধান রহিয়াছে। অবশ্য সেই শাস্তি ফরয ইবাদতে রিয়াজনিত শাস্তির তুল্য কঠোর হইবে না। তবে সুন্নত ইবাদতে রিয়া প্রায় ফরয কার্যে রিয়ার ন্যায়ই জঘণ্য। সুন্নত ইবাদতে রিয়ার দৃষ্টান্ত এই– লোকসমক্ষে উত্তমরূপে রুকূ-সিজদা করা এবং এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করা; লম্বা কিরাত না পড়া, জমাআত ব্যতীত নামায পড়াকে অসঙ্গত মনে করত জমাআতের অন্বেষণ করা এবং প্রথম সারিতে স্থান পাইবার চেষ্টা করা, উত্তম ধন হইতে যাকাত দেওয়া এবং রোযা রাখিয়া নির্জনতা অবলম্বনপূর্বক নীরব থাকা, ইত্যাদি।

(৩) উদ্দেশ্যের তারতম্যানুসারে রিয়ার শ্রেণীবিভাগ—রিয়া কার্যে রিয়াকারের কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই নিহিত থাকে। তাহার উদ্দেশ্যে গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিচারে রিয়া তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম—রিয়া দ্বারা প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করত পাপ ও কুকর্মের সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। যেমন নিজেকে বিশ্বস্ত, আমানতদার, পরহেযগার ও সন্দেহজনক ধন বর্জনকারীরূপে পরিচয় প্রদান করা, যেন লোকে তাহাকে ওয়াক্‌ফ ও য়াতীম সন্তান-সন্ততির সম্পত্তির মুতাওল্লী, ওসীয়ত করা বিষয়ের সম্পাদক নিযুক্ত করে এবং নানাবিধ ধন-দৌলত তাহার নিকট গচ্ছিদ রাখে; আর সে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বেচ্ছায় ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পারে। আবার কেহ এই দুরভিসন্ধি অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যাকাত ও দান-খয়রাতের ধন উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিবার ভার গ্রহণ করে, গরীব হজ্জ যাত্রীগণের পথ খরচ প্রেরণের ভার লয়, সুফীগণের খানকাহ্র ব্যয় নির্বাহ এবং পুল, পান্থশালা নির্মাণ ইত্যাদির অর্থ অপরের নিকট হইতে হস্তগত করত লোকের অজ্ঞাতসারে সে নিজেই উহা উপভোগ করে। কেহ হয়ত নিজের সাধুতার পরিচয় দেওয়ার জন্য ধর্ম-সভা আহবান করে; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য থাকে কোন মহিলা আগমন করিলে তাহার দর্শন লাভ ও তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা এবং সুযোগ পাইলে তাহার সহিত অপকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। কেহ হয়ত আবার কোন মহিলা বা দাসীর দর্শন লাভের কুমতলব লইয়া ধর্ম সভায় গমন করে। তদ্রূপ নানাবিধ অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া রিয়াকারগণ ধর্মের ভান করিয়া থাকে। এবং আল্লাহ্র ইবাদতকে তাঁহারই নিষিদ্ধ পাপাচারের অবলম্বন-স্বরূপ গ্রহণ করে। কোন সময় এইরূপও ঘটিয়া থাকে যে, মনে কর, কাহারও বিরুদ্ধে অপরের ধন অপহরণের দুর্নাম রটিয়াছে বা কোন কামিনীর সহিত ব্যভিচারের অপবাদ হইয়াছে, তেমন ব্যক্তি স্বীয় সাধুতা প্রদর্শন করত দুর্নাম অপসারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ধন বিতরণ করিয়া

থাকে, যেন লোকে বলে–যে-ব্যক্তি মুক্ত হস্তে স্বীয় ধন দান করে, সে কি কখনও অন্যের ধন অপহরণ করিতে পারে? অথবা এইরূপ সাধু ব্যক্তি কিরূপে পরস্ত্রীর প্রতি কু-ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে পারে? এই শ্রেণীর রিয়া অতি জঘন্য।

দ্বিতীয়—কোন নির্দোষ বস্তু হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে রিয়া। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ– মনে কর, কোন বক্তা স্বীয় সাধুতা প্রকাশ করত লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ বা কোন কামিনীকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে সুললিত বচনে সারগর্ভ বক্তৃতা করিল। এরূপ ব্যক্তিও পরকালের শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। কিন্তু ইহা প্রথম শ্রেণীর রিয়ার শাস্তির ন্যায় তত কঠিন হইবে না। এই প্রকার ব্যক্তি মহাপ্রভু আল্লাহ্র ইবাদতকে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী পদার্থ লাভের অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে; অথচ ইবাদত কেবল আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ ও পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই হওয়া আবশ্যক। অতএব যে ব্যক্তি ইবাদতকে দুনিয়া লাভের অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিল সে যেন পরমপরাক্রান্ত আল্লাহ্র সহিত প্রতারণা করিল!

তৃতীয়—এই শ্রেণীর রিয়াতে কোন পদার্থ লাভের আশা থাকে না বটে, কিন্তু সাধু দরবেশগণের ন্যায় সম্মান পাইবার উদ্দেশ্যে লোকে এইরূপ রিয়ার বশীভূত হইয়া থাকে, তেমন ব্যক্তি লোকসমক্ষে চলিবারকালে মস্তক অবনত করিয়া মন্থর গতিতে দরবেশী পদক্ষেপে চলিতে থাকে, যেন লোকে তাহাকে আল্লাহ্ হইতে অন্যমনস্ক মনে না করে এবং এই বলিয়া তাহাকে সম্মান করে যে, পথ চলিবার কালেও তিনি ধর্ম-কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। হাসি আসিলে কেহ কেহ আটকাইয়া রাখে, যাহাতে অপরে তাহাকে কৌতুক-প্রিয়, চপল বলিয়া অবজ্ঞা না করে অথবা তাহাকে লোকে উপহাসাস্পদ মনে করিবে বলিয়া সে কৌতুক হইতে বিরত থাকে। আবার কেহ কেহ নিজকে গভীর ধর্মভাবে মগ্ন বলিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে সময়ে অসময়ে 'হায়!' 'আহা!' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং 'ইস্তিগফার' পড়িতে থাকে ও বলে– "সুবহানাল্লাহ্! মানুষ কত গাফ্‌লতে (খোদা বিস্মৃতিতে) নিমগ্ন রহিয়াছে? আমরা এত সমস্ত সংকটের সম্মুখীন হইয়াও কিরূপে এমন উদাসীন থাকিতে পারি?" নির্জনে একাকী থাকিলে সেই ব্যক্তি হয়ত কখনও তদ্রূপ ইস্তিগফার ও অনুতাপ করে না। অন্তর্যামী আল্লাহ্ তাহাদের মনের কথা ভালরূপেই অবগত আছেন।

আবার এমন লোকও আছে, যাহার সম্মুখে একে অপরের গীবত করিলে সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠে– "গীবত করা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য মানুষের রহিয়াছে।" গীবতের প্রতি তাহার আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করাই তদ্রূপ উক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার কেহ কেহ অপরকে তারাবী ও তাহাজ্জুদের নামাযে রত এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখিতে দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে ধর্ম-কর্মে শিথিল মনে করিবে, এই আশংকায় তদ্রূপ নামায-রোযায় প্রবৃত্ত হয়। আবার কতক

লোক আরফা ও আশুরার দিনে রোযা রাখে না বটে, অথচ লোকের নিকট রোযাদাররূপে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পানাহার হইতে নিবৃত্ত থাকে। আবার এমন লোকও আছে, যে বাস্তবিকপক্ষে রোযা রাখে নাই, কিন্তু তাহাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে সে বলিয়া থাকে– "আমার ওযর আছে।" (অর্থাৎ আমি রোযা রাখিয়াছি)। এইরূপ উক্তিতে সেই ব্যক্তির অন্তর দুইটি দোষে কলুষিত হইয়া থাকে। যথা– (ক) কপটতা; কেননা সে রোযা রাখে নাই, অথচ প্রকাশ করে যে, সে রোযা রাখিয়াছে। (খ) রিয়া। সেই ব্যক্তি বলে– "আমি বলি না যে, আমি রোযা রাখিয়াছি; বরং আমি আমার ওযরের কথা জানাইয়াছি।" এইরূপ উক্তি দ্বারা সেই ব্যক্তি স্বীয় সংকল্পের বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র, অথচ সে নিজ সংকল্পে বিশুদ্ধ নহে।

আর কেহ কেহ লোকের সম্মুখে পানি পান করিয়া বলে– "গতকল্য অসুস্থ ছিলাম বলিয়া অদ্য রোযা রাখিতে পারি নাই।" অথবা "অমুক ব্যক্তি আমাকে রোযা রাখিতে দেয় নাই।" আবার কেহ কেহ রিয়া প্রকাশিত হওয়ার আশংকায় পানি পানের সাথে সাথে তদ্রূপ উক্তি করে না বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর অন্য প্রসঙ্গে বলে– "আমার জননীর হৃদয় নিতান্ত কোমল। পুত্রের উপবাস তাহার জন্য প্রাণান্তকর হইবে।" অথবা কেহ বলে– "আমার উপবাস-কষ্টে মাতার প্রাণাবসান ঘটিতে পারে, এই আশংকায় আমি রোযা রাখি নাই।" আবার কেহ কেহ এইরূপও বলিয়া থাকে– "দিবসে রোযা রাখিলে রাত্রিতে শীঘ্র নিদ্রা আসে। অতএব, ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ করা যায় না।"

রিয়ার অপবিত্রতায় অন্তর কলুষিত হইলে সেইরূপ নানাবিধ উক্তিই মানুষের রসনা হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারে না যে, ইহাতে তাহার পরহেযগারীর মূল উৎপাটিত হয় এবং তাহার ইবাদতও বিনষ্ট হইয়া যায়। যে সকল রিয়ার কথা উপরে বর্ণিত হইল উহা অবগত হওয়া নিতান্ত সহজ। কিন্তু এইরূপ কতকগুলি রিয়া আছে যাহা পিপীলিকার পদধ্বনি অপেক্ষা অধিক প্রচ্ছন্ন। বিচক্ষণ জ্ঞানীগণের পক্ষেও তদ্রূপ রিয়া চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। অল্প বুদ্ধিমান ও মূর্খ আবিদগণ কিরূপে উহা বুঝিতে পারিবে?

প্রকাশের তারতম্যানুসারে রিয়ার শ্রেণীবিভাগ

পিপীলিকার পদসঞ্চার অপেক্ষা গুপ্ত ও দুর্বোধ্য রিয়া। সুস্পষ্ট রিয়া– প্রিয় পাঠক, অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ যে, কতকগুলি রিয়া অতি সুস্পষ্ট; যেমন– কোন ব্যক্তি লোকসমক্ষে উৎসাহের সহিত তাহাজ্জুদের নামায পড়ে, কিন্তু একাকী নির্জনে অবস্থানকালে পড়ে না। অস্পষ্ট রিয়া– ইহা পিপীলিকার পদসঞ্চারের মত এত দুর্বোধ্য না হইলেও পূর্বোক্ত রিয়ার ন্যায় তত সুস্পষ্ট নহে। যেমন মনে কর, কেহ একাকী

নির্জনে অবস্থানকালেও তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু লোকের সম্মুখে নামায পড়িলে তাহার হৃদয়ে অধিক আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে এবং অতি সহজে কাজটি সুসম্পন্ন হয়। এই শ্রেণীর রিয়াও বেশ বুঝা যায়। গুপ্ত রিয়া– আবার এইরূপ লোকও আছে, অপরের সম্মুখে তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে যাহার অধিক আনন্দ অনুভব হয় না বা নামায সম্পন্ন করাও তাহার নিকট অতি সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না; আর অভ্যাসবশতঃ প্রত্যহই সে নামায পড়িয়া থাকে এবং রিয়ার কোন প্রকাশ্য নিদর্শনই ইহাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু লৌহের মধ্যে যেমন অগ্নি গুপ্তভাবে থাকে তাহার অন্তরেও তদ্রূপ রিয়া গুপ্তভাবে থাকিতে পারে। ইবাদত-কার্য ও সদগুণ প্রকাশ পাইলে যদি মনে আনন্দ ও প্রফুল্লতা জন্মে তবেই এইরূপ গুপ্ত রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ আনন্দ সঞ্চারের বিরুদ্ধাচরণ ও তৎপ্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে অবলোকন না করিলে এই গুপ্ত রিয়া প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পন্ন ইবাদত প্রকাশিত হউক, এই আশা তখন ইবাদতকারীর হৃদয়ে গুপ্তভাবে থাকে। স্বীয় ইবাদত পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর ইশারা-ইঙ্গিতে ইহা প্রকাশ না পাইলেও আকৃতিতে এমন ভাব অবলম্বন করা হয়, যাহাতে লোকে তাহার ইবাদত সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে পারে, যেমন লোকের সম্মুখে বিমর্ষ হৃদয়ে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া থাকে যেন অপরে বুঝিতে পারে যে, সে রাত্রি জাগরণ করত ইবাদত করিয়াছে।

পিপীলিকার পদসঞ্চার অপেক্ষা গুপ্ত ও দুর্বোধ্য রিয়া—উপরিউক্ত রিয়া অপেক্ষাও নিতান্ত গুপ্ত রিয়া আছে; ইহা পিপীলিকার পদসঞ্চার অপেক্ষাও অধিক গুপ্ত এবং দুর্বোধ্য। গোপনীয় ইবাদত কার্য প্রকাশিত হইলে মনে আনন্দের সঞ্চার না হইলে বা লোকসমক্ষে তদ্রূপ ইবাদত করিতে হৃদয় অধিকতর উৎফুল্ল হইয়া না উঠিলেও অন্তরে রিয়া থাকিতে পারে। ইহার নিদর্শন এই– তদ্রূপ রিয়াবিশিষ্ট লোকের নিকট কেহ আসিয়া অগ্রে সালাম না করিলে সে বিস্মিত হয়। তাহাকে সম্মান প্রদর্শন না করিলে, আনন্দের সহিত তাহার কার্য সম্পন্ন করিয়া না দিলে, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তাহাকে অনুগ্রহ না দেখাইলে বা উত্তম স্থানে তাহাকে বসিতে না দিলে সে মনে মনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া থাকে। আর সেই ব্যক্তি তখন মনে মনে বলিতে থাকে– "রে মূর্খ, তুই গুপ্তভাবে ইবাদত না করিলে লোকে তোর সহিত এইরূপ ব্যবহার করিত না।" এইরূপ মনোভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান তাহার ইবাদতের উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা দ্বারা লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা রহিয়াছে। মোটের উপর কথা এই যে, ইবাদত-কার্য করিয়া 'করিলাম' বলিয়া মনে যে ভাব জন্মে, ইহা হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া 'কিছুই করিতে পারিলাম না' এইভাব অন্তরে জাগরূক রাখিতে না পারিলে অন্তর কখনও গুপ্ত রিয়া হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

মনে কর, এক ব্যক্তি এক লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য লাভের আশায় কাহাকেও এক হাজার টাকা প্রদান করিল। ইহাতে অন্য কাহারও কোন উপকার হয় নাই; সুতরাং সে তজ্জন্য অপরের নিকট হইতে সম্মানের প্রত্যাশা করিতে পারে না; তদ্রূপ লাভজনক ব্যবসায় সে করিল বা না করিল, তাহাতে অপরের কিছুই আসে যায় না; উভয়ই অপরের পক্ষে সমান। মানব এই নশ্বর দুনিয়াতে নগন্য ও সামান্য ইবাদত করিয়া থাকে। (যাহা হাজার টাকা স্বরূপ)। এমতাবস্থায়, ইবাদত কার্য করিয়া সে অপরের সম্মানপ্রত্যাশী কিরূপে হইতে পারে? এই শ্রেণীর রিয়া নিতান্ত গুপ্ত ও দুর্বোধ্য।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু বলেন, কিয়ামত দিবস মহাপ্রভু আল্লাহ্ কুরআন পাঠকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন– "তোমাদের নিকট কি লোকে সস্তা মূল্যে জিনিসাদি বিক্রয় করে নাই? অতি আগ্রহের সহিত তাহার কি তোমাদের কার্য সমাধা করিয়া দেয় নাই? আর তাহারা কি অগ্রে তোমাদিগকে সালাম দেয় নাই? এই সমুদয়ই তোমাদের ইবাদতের পুরস্কারস্বরূপ (দুনিয়াতে) তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। (কারণ) তোমরা একমাত্র আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ইবাদত কার্য কর নাই।" তৎপর যে ব্যক্তি লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক নির্জনে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে– "লোকসমাজে অবস্থানের ফলে আমার ইবাদত নষ্ট হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় আমি সমাজ পরিত্যাগ করত নির্জনে ইবাদত করিয়াছি! কারণ, কাহাকেও দেখিলেই আমার বাসনা হইত যে, সে আমাকে সম্মান করুক এবং আমার হক সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকুক।

উল্লিখিত কারণেই লোকে যেরূপভাবে পাপ ও অপকর্ম গোপনে ঢাকিয়া রাখে যাঁহারা একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইবাদত করেন তাঁহারাও তদ্রূপ ইবাদত কার্য ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট থাকেন। কারণ, তাঁহারা অবগত আছেন যে, কিয়ামতের দিন যে ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা হয়, শুধু তাহাই গৃহীত হইবে এবং তদ্ব্যতীত আর কিছুই কবুল হইবে না। এইরূপ খাঁটি ইবাদতকারীগণকে হজ্জযাত্রীদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হজ্জযাত্রীগণ জানে যে, আরব প্রানতরে বিশুদ্ধ স্বর্ণ ব্যতীত গৃহীত হয় না। সুতরাং বিশুদ্ধ স্বর্ণ না দিলে তথায় খাদ্য, পানীয় দ্রব্য ইত্যাদি পাওয়া যায় না বলিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ ব্যতীত সেই স্থানে জীবন ধারণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এইজন্য হজ্জযাত্রীগণ পূর্বাহ্নেই সঙ্কটাপন্ন দিবসের স্মরণ করত মেকী স্বর্ণ ফেলিয়া দিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ সংগ্রহে তৎপর হইয়া থাকে। কিয়ামত-দিবস অপেক্ষা অধিক সঙ্কটের দিন মানুষের আর নাই। যে ব্যক্তি এখন এই দুনিয়াতে বিশুদ্ধ ইবাদত না করিবে সে কিয়ামত-দিবসে অতি কঠিন সঙ্কটে নিপত্তি হইবে এবং তখন কেহই তাহাকে সাহায্য করিবে না।

যে পর্যন্ত নিজের ইবাদত চতুষ্পদ জন্তু দেখিতেছে, না মানুষ দেখিতেছে, এই প্রভেদ বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্যন্ত মানব রিয়াশূণ্য হইতে পারে না। রাসূলে মাক্‌বূল

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "সামান্য এবং গুপ্ত রিয়াও শিরকের মধ্যে গণ্য।" অর্থাৎ এইরূপ করিলেও বস্তুত আল্লাহ্র ইবাদতের সহিত অপরকে শরীক করা হইয়া থাকে। ইবাদত সম্বন্ধে মহাপ্রভু আল্লাহ্ অবগত আছেন, ইহাতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তদ্রূপ ইবাদতে অপরের প্রভাব অবশ্যই থাকিবে।

গুপ্ত ইবাদত প্রকাশে আনন্দ স্থলবিশেষে নির্দোষ—মোটের উপর কথা এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় ইবাদত প্রকাশ পাইলে আনন্দিত হয়, সে রিয়াশূণ্য নহে। কিন্তু চারটি কারণে ইবাদত প্রকাশে আনন্দিত হওয়া অবৈধ নহে।

প্রথম কারণ—ইবাদতকারী স্বীয় ইবাদত গোপন রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, অথচ তাহার সমস্ত পাপ তিনি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। এমতাবস্থায়, তিনি যে তাহার অপকর্ম ঢাকিয়া রাখিয়া সৎকর্ম প্রকাশ করিয়াছেন তৎপ্রতি আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ অনুভব করিয়া যদি সে আনন্দিত হয় এবং লোকের প্রশংসা ও ভক্তিতে তাহার হৃদয়ে আনন্দ জন্মে, তবে এইরূপ আনন্দে কোন দোষ নাই। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা), আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্র বদান্যতা ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভে তোমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত" (সূরা ইউনুস, ৬ রুকূ, ১১ পারা)।

দ্বিতীয় কারণ—"আল্লাহ্ যেমন দুনিয়াতে আমার পাপসমূহ গোপন রাখিয়াছেন তদ্রূপ পরকালেও তিনি আমার পাপসমূহ গোপন রাখিবেন'– এই আশায় হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইলে কোন দোষ নাই। হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, আল্লাহ্ এত দয়ালু যে, তিনি দুনিয়াতে পাপ গোপন রাখিয়া তৎপর পরকালে ইহা প্রকাশ করিয়া তাহার বান্দাকে লজ্জিত করিবেন না।

তৃতীয় কারণ—ইবাদত প্রকাশ করিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না; বরং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায়, এই ইবাদত দেখিয়া অপর লোকে তাহার অনুকরণ করত সৌভাগ্য লাভ করিবে মনে করিয়া আনন্দিত হওয়াতে কোন দোষ নাই। এমন ব্যক্তিকে গুপ্ত ও প্রকাশ্য, উভয় প্রকার ইবাদতের পূণ্যই প্রদান করা হইবে।

চতুর্থ কারণ—কাহারও ইবাদত দেখিয়া যদি অপর লোকে তাহার প্রশংসা করে ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া তাহারা আল্লাহ্র ইবাদতে প্রবৃত্ত হয়, আর ইবাদতকারী লোকের ভক্তি ও সম্মান পাইয়া আনন্দিত না হইয়া বরং লোকে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হয়, তবে এইরূপ আনন্দেও কোন দোষ নাই। কিন্তু অপর উপাসনাকারীর ইবাদত দর্শনেও যদি লোকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আল্লাহ্র

ইবাদতে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তির আনন্দ অটুট থাকে, তবেই তদ্রূপ আনন্দ নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সৎকার্য বিনাশক রিয়া—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, রিয়ার বাসনা কোনও সময় ইবাদতের প্রারম্ভে, কখনও ইবাদতের মধ্যে, আবার কোন সময় ইবাদত কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। রিয়ার ভাব ইবাদতের প্রারম্ভে উদিত হইলে ইবাদতকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া ফেলে। কেননা, ইবাদত নিতান্ত বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হওয়া অনিবার্য এবং ইহাতে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে সঙ্কল্পের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মূল ইবাদতের সঙ্কল্পে রিয়া না থাকিয়া ইহার কোন অবস্থা বা প্রকারের মধ্যে থাকিলে মূল ইবাদতটি নষ্ট হইবে না। বরং ইহার বিশেষত্বটুকুই নষ্ট হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তি রিয়ার বশীভূত হইয়া লোকের সম্মুখে আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িবার জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু সে একাকী নির্জনে থাকিলেও নামায সমাপনে কোন ত্রুটি করে না, যদিও একটু বিলম্বে নামায পড়িয়া থাকে। এমতাবস্থায়, সে আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িলে যে সওয়াব লাভ করিত ইহা মাত্র নষ্ট হইয়া যাইবে, মূল নামায বিনষ্ট হইবে না। কারণ, মূল নামায সমাপনে তাহার সঙ্কল্প বিশুদ্ধ আছে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে বলপূর্বক অধিকৃত গৃহে নামায পড়ে তবে নামায অনাদায়ের অপরাধ হইতে সে মুক্তি পাইবে বটে, কিন্তু বলপূর্বক অন্যায়ভাবে অধিকৃত গৃহে নামায পড়ার দরুন তাহাকে অবশ্যই পাপী হইতে হইবে। মূল নামাযের জন্য সে পাপী হইবে না। তদ্রূপ আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার উদ্দেশ্যের মধ্যে রিয়া থাকাতে সেই সওয়াবই বিনষ্ট হইবে এবং নামাযের সঙ্কল্প বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া উহা নষ্ট হইবে না।

আবার কোন ব্যক্তি বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত নামায সমাপন করিল। কিন্তু নামাযান্তে তাহার অন্তরে রিয়ার ভাব উদয় হওয়ায় সে তাহার গুপ্ত নামায প্রকাশ করিয়া ফেলিল। এমতাবস্থায়, তাহার নামায বিনষ্ট হইবে না। তবে রিয়ার বশবর্তী হইয়া ইবাদত প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হাদীস শরীফে উক্ত আছে, এক ব্যক্তি বলিল– "আমি গতকল্য সূরা বাকারাহ্ পাঠ করিয়াছি।" হযরত ইব্ন মাসঊদ রাযিআল্লাহু আনহু ইহা শুনিয়া বলিলেন– "যাহা সে প্রকাশ করিয়া দিল (উক্ত) ইবাদতের মধ্যে ইহাই তাহার প্রাপ্য ছিল।" অর্থাৎ প্রকাশ করার জন্য তাহার কুরআন পাঠের সওয়াব নষ্ট হইয়া গেল। এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বলিল– "আমি সর্বদা রোযা রাখিয়া থাকি।" হযরত (সা) বলিলেন– "তুমি রোযা রাখ না, আবার তুমি রোযা ভঙ্গও কর না।" অর্থাৎ রোযা প্রকাশ করাতে ইহার সওয়াব বিনষ্ট হইয়া গেল।

কিন্তু আমাদের মতে উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়ের প্রকাশ্য অর্থ এই– রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও হযরত ইব্ন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝিতে

পারিয়াছিলেন যে, ইবাদতকালে ঐ দুই ব্যক্তির অন্তর রিয়া শূণ্য ছিল না এবং এইজন্যই তদ্রূপ উক্তি করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে বিশুদ্ধ সংকল্পের সহিত সমাপনের পর রিয়া দেখা দিলে ইবাদত বিনষ্ট হয় না। শেষোক্ত হাদীস হইতে কোন কোন মুহাদ্দিস এই অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন যে, নিরন্তর রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

ইবাদতকালে ইহার অভ্যন্তরে যদি রিয়ার ভাব উদিত হয় এবং ইহা এত প্রবল হইয়া উঠে যে, ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট করিয়া ফেলে তবে এমন ইবাদত বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মনে কর, বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত এক ব্যক্তি নামায পড়িতে আরম্ভ করিল। এমন সময় কোন মনোহর দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হইল বা কোন হারানো দ্রব্যের সন্ধান মিলিল। এমতাবস্থায়, সে একাকী নির্জনে থাকিলে নামায ভাঙ্গিয়া ফেলিত; কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে সে কোন প্রকারে নামায সমাপ্ত করিয়া লইল। এমন নামাযও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কেননা এইরূপ স্থলে ইবাদতের ইচ্ছাই রহিল না, কেবল লোককে দেখাইবার জন্যই সে নামাযে দন্ডায়মান রহিয়াছে। কিন্তু তদ্রূপ স্থলেও যদি ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য অটুট থাকে এবং লোকে দেখিতেছে বলিয়া অধিকতর আনন্দের সহিত উত্তমরূপে সে নামায আদায় করে তবে আমাদের মতে ইহাই ঠিক যে, তাহার নামায বিনষ্ট হইবে না যদিও এইরূপ রিয়ার জন্যও সে পাপী হইবে।

কিন্তু মনে কর, এক ব্যক্তি বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে নামাযে প্রবৃত্ত হইল। এমন সময় অপর লোকে তাহার নামায দেখিতেছে বলিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল। হযরত হারেস মুহাসেবী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, এইরূপ ব্যক্তির নামায নষ্ট হইবে, না ইহা আদায় হইয়া যাইবে, তৎসম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন– "এই বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমি ইতস্তত করিতেছিলাম। কিন্তু এখন আমার প্রবল ধারণা এই যে, তদ্রূপ ব্যক্তির নামায বিনষ্ট হইয়া যাইবে।" হাদীসে উক্ত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল– "আমি স্বীয় ইবাদত গোপন রাখি; কিন্তু ইহা লোকের নিকট প্রকাশিত হইয়া গেলে আমি আনন্দিত হইয়া থাকি।" হযরত (সা) ইহা শুনিয়া বলিলেন– "তুমি দুই প্রকার পুরস্কার লাভ করিবে। প্রথম, ইবাদত গোপন রাখিবার (ইচ্ছার) পুরস্কার এবং দ্বিতীয়, (ইবাদত প্রকাশিত হইলে লোকে অনুকরণে তদ্রূপ ইবাদত করিবে বলিয়া) প্রকাশ্যে ইবাদতের পুরস্কার।" এই হাদীসের উল্লেখ করিয়া কেহ হয়ত আমাদের বিরুদ্ধমত পোষণ করিতে পারে। এমতস্থলে, আমাদের উত্তর এই যে, উক্ত হাদীসখানা মুরসাল এবং ইহার বর্ণনাকারীগণ পরস্পর সংলগ্ন নহে অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের তালিকা সংলগ্নভাবে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে নাই। আর হযরতের (সা) উক্তির উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, সেই ব্যক্তির ইবাদত বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে যথারীতি সম্পন্ন হওয়ার পর তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং

ইহাতে সে আনন্দ লাভ করিয়াছিল। অথবা হযরত (সা) হয়ত ইহাও বুঝিয়া থাকিবেন যে, তাহার ইবাদত প্রকাশিত হওয়ায় তৎপ্রতি মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা স্মরণ করিয়া সেই ব্যক্তি আনন্দিত হইয়াছিল; যেমন আনন্দিত হওয়ার সঙ্গত কারণসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। উপরিউক্ত হাদীসের অর্থ ইহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, স্বীয় ইবাদত লোকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়, তাহার সেই ইবাদতে পাপ হউক বা না হউক, কিন্তু ইহাতে যে পূণ্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহা কেহই বলিতে পারে না। এই পর্যন্ত হযরত হারেস মুহাসেবীর (রা) অভিমত বর্ণিত হইল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাই বুঝা যায় যে, নামায বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে ঠিকভাবে চলিতেছে, এমন সময় লোকে দেখিলে যদি আনন্দ জন্মে এবং ইহাতে নামাযের অন্তর্গত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের তারতম্য না ঘটে তবে নামায বিনষ্ট হইবে না।

রিয়াজনিত আন্তরিক ব্যাধির প্রতিকার

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, রিয়া মানব-হৃদয়ের নিতান্ত মারাত্মক ব্যাধি এবং ইহার প্রতিকার করা অবশ্য কর্তব্য। অসীম যত্ন ও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে এই ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। কেননা, ইহা মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করত ইহার সহিত বিজড়িতভাবেই মিলিয়া বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে এবং এই জন্যই ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ নিতান্ত দুষ্কর। রিয়া-ব্যাধি এ বিপজ্জনক ও কঠিন হওয়ার কারণ এই যে, শৈশবকাল হইতেই মানব অপরকে তাহার চতুর্দিকে একে অন্যের সম্মুখে সাজিয়া গুজিয়া এবং নিজের গুণাবলী অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া সুখ্যাতি অর্জনে ব্যস্ত দেখিতে পায়। অধিকাংশ লোক বা সাধারণভাবে সকলেই রিয়া রোগে আক্রান্ত রহিয়াছে এবং তাহাদের সংশ্রবে থাকিয়া ইহা শিশু সন্তানদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে ও প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তৎপর বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, এই রোগ বিষম ক্ষতিকর। এইরূপ প্রদর্শনেচ্ছা প্রবল হইয়া অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেলে ইহা বিদূরিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কেহই রিয়া শূণ্য নহে এবং ইহা হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত অসীম সাধনা ও পরিশ্রম করা সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য।

রিয়ার ব্যাধির প্রতিকার ব্যবস্থা

রিয়া-ব্যাধির দুই প্রকার প্রতিকার ব্যবস্থা আছে। **প্রথম**—বহিষ্কারক ব্যবস্থা ও দ্বিতীয়—উপশমমূলক ব্যবস্থা।

রিয়া বহিষ্কারক ব্যবস্থা—ইহা জোলাপের ন্যায় রিয়ারূপ ব্যাধির মূল অন্তর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহা ইলম (জ্ঞান) ও আলিমের (অনুষ্ঠানের) মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রিয়া বহিষ্কারক জ্ঞানমূলক ব্যবস্থা—এই কথা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লওয়া যে, মানব তাহার সমুদয় ক্রিয়া-কলাপ সুখাস্বাদ ও আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে। কিন্তু সে যদি জানিতে পারে যে, কোন বিশেষ কাজের দরুন পরকালে তাহার অপূরণীয় ক্ষতি হইবে এবং তজ্জন্য তাহাকে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তবে তদ্রূপ কাজ আনন্দদায়ক হইলেও ইহা পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। যেমন, মনে কর, এক পাত্র মধু দেখিয়া কোন ব্যক্তি যতই ইহার প্রতি প্রলুব্ধ হউক না কেন, সে যদি জানিতে পারে যে, ইহাতে হলাহল বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে, তবে তৎক্ষণাৎ সে ইহা পরিত্যাগ করিবে। প্রভুত্ব-প্রিয়তা ও সম্মান-লিপ্সারূপ মূল শিকড় হইতে রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকিলেও এই মূল শিকড় হইতে আবার তিনটি শিকড় বহির্গত হইয়াছে। **প্রথম**—প্রশংসা-প্রীতি, **দ্বিতীয়**—নিন্দা-ভীতি ও **তৃতীয়**—পরপ্রত্যাশী হওয়া। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এক আরব পল্লীবাসী রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিল– "আপনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে কি বলেন, যে ধর্মের জন্য জিহাদ করে বা নিজের বাহাদুরী প্রদর্শন অথবা প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্য ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়?" হযরত (সা) বলিলেন– "যে ব্যক্তি কলমায়ে তাওহীদ (একত্ববাদ) সমুন্নত করিবার উদ্দেশ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হয়, সে আল্লাহ্‌র পথে আছে।" মানুষ যেন প্রশংসা-প্রিয়, সম্মান-লোলুপ বা নিন্দা-ভীত না হয়, তৎপ্রতি এই হাদীসে ইঙ্গিত রহিয়াছে। অন্যত্র রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি উষ্ট্র বন্ধনের নগণ্য রশি পাওয়ার উদ্দেশ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হয়, সে ঈপ্সিত রশিটুকু ব্যতীত আর কিছুই পাইবে না।" এই হাদীসদ্বয় হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, উপরিউক্ত তিনটি কারণেই রিয়ার উদ্ভব হইয়া থাকে।

রিয়া বহিষ্কারক জ্ঞানমূলক ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়—প্রশংসা-প্রীতি অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিবে এবং চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইবে যে, কিয়ামত দিবসে সকল মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশ্‌তার সম্মুখে রিয়াকারদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে– "রে রিয়াকার, ওরে পাপী, ওরে পথভ্রান্ত! তোর কি লজ্জা নাই? তুই আল্লাহ্‌র ইবাদতের বিনিময়ে কিরূপে লোকের প্রশংসা ক্রয় করিলি? তুই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা না করিয়া লোকের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত হইলি। মানুষের ভালবাসা লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা হইতে দূরে সরিয়া পড়িলি। আল্লাহ্‌র ভালবাসার উপরে মানুষের ভালবাসাকে স্থান দিলি। লোকের প্রশংসা পাওয়ার লালসায় আল্লাহ্‌র নিন্দাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলি। আল্লাহ্‌র নিকট তোর চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত আর কেহই ছিল না: কেননা তুই সকলের

মনস্তুষ্টি করিতে চাহিয়াছিলি; কিন্তু মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র ক্রোধের ভয় করিস নাই।" যাহাদের কিঞ্চিত মাত্রও বুদ্ধি আছে তাহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ইবাদত প্রকাশ করিয়া লোকের নিকট হইতে যে প্রশংসা পাওয়া যায়, তাহা মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র এই প্রকার তীব্র লাঞ্ছনা ও দুর্বহ তিরস্কারের তুলনায় কত নগণ্য। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, ইবাদত পুণ্যের পাল্লা ভারী করে। কিন্তু ইবাদতে রিয়া প্রবিষ্ট হইলে ইহার পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ফলে পাপের পাল্লা ভারী হইয়া পড়ে। তৎপর ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি রিয়া না করিবে সে পরকালে নবী ও ওলীগণের সঙ্গে বেহেশতে থাকিবে; অপরপক্ষে, রিয়াকারগণ দোযখের ফেরেশতাগণের নিকট বন্দী হইয়া আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত লোকদের সহিত দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

আবার ভাবিয়া দেখ, অপরের মনস্তুষ্টির জন্যই লোকে রিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু তদ্দ্বারা সকলের মনতুষ্টি অর্জন করা যায় না; একজন সন্তুষ্ট হইলে অপরজন অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে; একজন প্রশংসা করিলে অপরজন নিন্দা করে। আর সকল লোকেই যদি তোমার প্রশংসা কীর্তন করে তবেই-বা তোমার কি লাভ? তাহাদের হস্তে কি তোমার জীবিকা আছে? না, তোমার পরমায়ুর উপর তাহাদের কোন ক্ষমতা চলে? না, তোমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্যের ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে? এমতাবস্থায়, অপরের মনতুষ্টির জন্য এই নশ্বর জগতে নিজকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত রাখা এবং প্রশংসা লাভের হীন প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া নিজকে পরকালের কঠিন আযাবে নিপতিত করা নিতান্ত মূর্খতা। এই প্রকার জ্ঞান ও চিন্তা হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখা কর্তব্য।

রিয়া বহিষ্কারক জ্ঞানমূলক ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়—অপরের নিকট হইতে কিছু পাওয়ার লোভ অপসারণ করিতে হইবে। ইহার ব্যবস্থা 'ধনাসক্তি' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে। তদ্ব্যতীত ইহাও বুঝিয়া লইবে যে, তুমি অপরের নিকট হইতে যাহা পাইতে লালায়িত তাহা তুমি পাইতেও পার অথবা নাও পাইতে পার। আর পাইলেও তজ্জন্য তোমাকে অপমান, লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে এবং অপরপক্ষে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে তুমি বঞ্চিত থাকিবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত লোকের অন্তর কাহারও বশীভূত হয় না। তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হইলে তিনি স্বতঃই লোকের মন তোমার আজ্ঞাধীন করিয়া দিবেন। আর তুমি আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জন করিতে না পারিলে তোমার প্রতি তাঁহার তিরস্কার ও লাঞ্ছনা আপনা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং রিয়াকার কপট বলিয়া লোকেও তখন তোমাকে ঘৃণা করিতে থাকিবে।

রিয়া বহিষ্কারক জ্ঞানমূলক ব্যবস্থার তৃতীয় পর্যায়—নিন্দা-ভীতি বিদূরিত করিতে হইবে। তাহার উপায় এই– তুমি নিজকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, "আমি আল্লাহ্‌র নিকট সৎ ও প্রশংসিত হইতে পারিলে লোকের নিন্দায় আমার বিন্দুমাত্রও

অনিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট আমি ঘৃণিত ও অপমানিত হইলে দুনিয়ার সকল লোকের প্রশংসায়ও আমার কোন লাভ নাই।" আর যদি বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি ইবাদত কর এবং লোকের মনস্তুষ্টির জন্য তুমি উদ্বিগ্ন না হও, তবে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিবেন। অন্যথায়, তাহারা অনতি বিলম্বে তোমার রিয়া ও কপটতা ধরিয়া ফেলিবে এবং যে নিন্দার ভয়ে তুমি ভীত হইতেছিলে ইহাই চতুর্দিক হইতে আসিয়া তোমাকে ঢাকিয়া লইবে। আর রিয়া-দোষে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হয়ত তুমি ইতিপূর্বে হারাইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে, তুমি যদি নিজের মনকে এক প্রাণে এক ধ্যানে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত-কার্যে নিবিষ্ট রাখ তবে লোকে তোমার সম্বন্ধে কি বলিতেছে, ইহা ভাবিয়া তোমাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না এবং তোমার অন্তর হইতে উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইবে। তুমি এইরূপ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে স্বর্গীয় আলোকপুঞ্জে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং তখন আল্লাহ্‌র করুণা, সাহায্য ও দান অবিরাম ধারায় তোমার উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে। সেই সময়ে সংকল্পের শক্তিও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার সুখাস্বাদও তুমি উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে উপভোগ করিতে থাকিবে।

রিয়া বিনাশক অনুষ্ঠানমূলক ব্যবস্থা—লোকে যেমন অতি সাবধানে স্বীয় পাপ গোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ তুমি তোমার ইবাদত ও সৎ কার্যসমূহ গোপন করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে একমাত্র আল্লাহ্ই যে তোমার কার্যাবলী পরিদর্শন করিতেছেন, ইহা ভাবিয়া তুমি পরিতুষ্ট থাকিতে পারিবে। প্রাথমিক অবস্থায়, ইহা দুষ্কর বলিয়া মনে হইলেও যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে করিতে আরম্ভ করিলেই ইহা সহজসাধ্য হইয়া উঠে। সেই সময় আল্লাহ্‌র নিকট নির্জন মুনাজাত ও আন্তরিকতার মাধুর্য উপভোগ আসিয়া থাকে; অবশেষে মনের এই অবস্থা হয় যে, লোকে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও সে তখন তাহাদের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া পড়ে।

রিয়া উপশমমূলক ব্যবস্থা—রিয়ার ভাব হৃদয়ে উদয় হওয়া মাত্র ইহা দূর করিতে তৎপর হইবে। যদিও সাধনাবলে প্রশংসা-প্রীতি ও অপরের নিকট হইতে প্রাপ্তি-লোভ বিদূরিত হয় এবং পার্থিব সমুদয় বস্তু মানবের নিকট হেয় ও তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তথাপি ইবাদতের মধ্যে শয়তান তাহার হৃদয়ে রিয়ার ভাব জাগাইয়া তোলে। তিন শ্রেণীর ভাব তখন হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। **প্রথম**–ইবাদতে প্রবৃত্ত হইলে এই ভাবটি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে– "লোকে হয়ত আমার এই ইবাদত জানিতে পারিয়াছে; অথবা, আশা করি জানিতে পারিবে।" **দ্বিতীয়**– ইবাদতকারীর হৃদয়ে এই ভাবপ্রবণতা দেখা দেয় যে, ইবাদত প্রকাশ পাইলে লোকে তাহাকে সম্মান করিবে। **তৃতীয়**– তৎপর উক্ত ভাবপ্রবণতা অনুযায়ী লোকে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছে কিনা, ইহার অনুসন্ধানে তৎপর হয়।

যাহাই হউক, প্রথম ভাবটি হৃদয়ে উদিত হইলেই ইহা দূর করিবার চেষ্টা করিবে। তাহার উপায় এই যে, মনে মনে বলিবে– "লোকের জানাতে আমার কি লাভ? মহাপ্রভু আল্লাহ্ স্বয়ং যখন সবকিছু দেখিতেছেন ও জানিতেছেন, তখন ইহাই ত আমার জন্য যথেষ্ট। আমার কোন কার্যই ত মানুষের ক্ষমতাধীন নহে।" তৎপর ইবাদত প্রকাশ পাইলে লোকে সম্মান করিবে, এই দ্বিতীয় ভাবটি হৃদয়ে প্রকট হইয়া উঠিলেও তদ্রূপ চিন্তা করিবে। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে উল্লিখিত তৃতীয় ভাবটিও হয়ত দেখা দিবে। তুমি হৃদগতভাবে বুঝিয়া লইবে যে, রিয়া করিলে মহাপ্রভু আল্লাহ্ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন, এমতাবস্থায়, লোকের প্রশংসা তোমার কি উপকার করিতে পারিবে? এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে রিয়ার প্রতি তোমার হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হইবে। তোমার পূর্বোক্ত মনোভাব তোমাকে প্রশংসা-প্রীতির দিকে আকর্ষণ করিবে, অপরপক্ষে, রিয়ার প্রতি তোমার ঘৃণা তোমাকে প্রশংসা-প্রীতির দিকে আকৃষ্ট হইতে দিবে না। অতএব এই আকর্ষণ ও ঘৃণার মধ্যে যে ভাবটিই অধিকতর সবল ও মজবুত হইয়া উঠিবে, ইহা তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে।

উপরিউক্ত তিনটি ভাব দমন করিবার জন্য তুমি আরও তিনটি কার্য সম্পন্ন করিবে। তাহা এই– (১) হৃদয়ে এই জ্ঞান বদ্ধমূল করিয়া লইবে যে, রিয়ার অপরাধে তুমি আল্লাহ্র অভিশাপ ও ক্রোধে নিপতিত হইবে; (২) এই জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তোমার হৃদয়ে রিয়ার প্রতি যে ঘৃণার উদ্রেক হইবে ইহাকে তীব্র করিয়া তুলিবে এবং (৩) তৎপর রিয়ার ভাব হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবে। মানবমনের এইরূপ চরম অধোগতিও হইয়া থাকে যে, রিয়ার ভাব সমস্ত অন্তররাজ্য অধিকার করিয়া ফেলে এবং তখন উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইহার জঘন্যতার জ্ঞান ও তৎপ্রতি ঘৃণা হৃদয়ের চতুঃসীমায়ও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। যাহার এই অবস্থা সে শয়তানের বন্ধু হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ– মনে কর, এক ব্যক্তি সহিষ্ণুতা গুণ প্রচুর পরিমাণে অর্জন করিয়াছে এবং ক্রোধের আপদসমূহ সম্যকরূপে সে উপলব্ধি করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ক্রোধের সময় সে সব কিছু ভুলিয়া একেবারে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূণ্য হইয়া পড়ে।

তদ্রূপ, কোন ব্যক্তি হয়ত রিয়ার জঘন্যতা জ্ঞান অর্জন করিয়াছে এবং সে রিয়াকে রিয়া বলিয়া চিনিতেও পারিতেছে। কিন্তু তাহার অন্তরে রিয়ার ভাব আসিলে তৎপ্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইল না। আবার কখন কখনও ঘৃণার উদ্রেক হইলেও রিয়ার ভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হইবার মত বলে সে বলীয়ান হইতে পারে না এবং তখন সে লোকের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে কার্য করিতে থাকে। আলিমদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা সম্যকরূপে অবগত আছেন যে, তাঁহারা রিয়ার বশীভূত হইয়া লোকের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন এবং বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহা তাঁহাদের জন্য নিতান্ত অনিষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা তদ্রূপ কার্য করিয়া চলিয়াছেন এবং তওবা করিয়া ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে অযথা বিলম্ব করিতেছেন।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে, রিয়ার প্রতি যে ঘৃণা জন্মে ইহার শক্তির তারতম্যানুসারে রিয়া দমন হইতে পারে। (অর্থাৎ রিয়ার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা যত প্রবল হইবে ততই রিয়া দমন হইবে)। রিয়ার জঘন্যতা-জ্ঞানের তীব্রতার অনুপাতে ইহার প্রতি ঘৃণার ভাব উদ্রেক হইয়া থাকে। এই জ্ঞান আবার ঈমানের বলের তারতম্যানুসারে দুর্বল বা প্রবল হইয়া উঠে এবং ফেরেশতার সাহায্যেও ঈমান বলীয়ান হইয়া থাকে। অপরপক্ষে, সংসারাসক্তির তারতম্যানুসারে রিয়া উৎপন্ন হয় এবং শয়তানের সাহায্যে ইহা শক্তিমান হইয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানব-মন দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদলের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এই দলের সহিতই ইহার সম্বন্ধ আছে। অনন্তর যে দলের সহিত সম্বন্ধ প্রবল, সেই দলের প্রতিক্রিয়াই তাহার অন্তরে অধিক প্রতিফলিত হয় এবং সে তৎপ্রতিই অধিক ঝুঁকিয়া পড়ে। হৃদয়ের এই সম্বন্ধটুকু নতুন নহে; পূর্ব হইতেই ইহা তাহার মনে লাগিয়া রহিয়াছে। কারণ, নামাযের প্রারম্ভেই মানব আপন মনকে এমন করিয়া লয় যে, ফেরেশ্‌তার স্বভাব বা শয়তানের স্বভাব তাহার উপর প্রবল হইয়া উঠে। অতএব ইবাদতের মধ্যে তাহার ঐ আদি সম্বন্ধটুকুই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং শয়তান বা ফেরেশ্‌তার সহিত তাহার পূর্ব সম্বন্ধের আধিক্য অনুসারে ভাগ্য নির্ধারণকালে তাহার জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে তকদীর তাহাকে সেই স্থানেই টানিয়া লইয়া যায়।

রিয়ার মূলোচ্ছেদে অক্ষম হইলে ইহা দমনে মঙ্গল– প্রিয় পাঠক, তুমি রিয়ার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যখন তৎপ্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করিতে পারিবে তখন তোমার অন্তরে রিয়ার ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকিলেও আল্লাহ্র বিচারে তুমি অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে না; কেননা উহা মানব প্রকৃতির সহিত জড়িত রহিয়াছে। আর যাহা তোমার প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে, ইহাকে একেবারে নির্মূল করিতে তোমাকে আদেশ করা হয় নাই; বরং ইহাকে দমন করিয়া আজ্ঞাধীন করিতে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ, যেন এই কুপ্রবৃত্তি তোমাকে দোযখে লইয়া যাইতে না পারে। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিলেই তুমি ইহাকে দমন করিলে এবং ইহাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণই ইহার প্রায়শ্চিত্ত। ইহার প্রমাণ এই যে, একদা সাহাবাগণ (রা) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন– "আমাদের অন্তরে বহু অমূলক চিন্তা ও সন্দেহের উদ্রেক হয়। তৎসমূদয়ের পরিবর্তে যদি আমাদিগকে আকাশ হইতে নিক্ষেপ করিয়া ফেলা হইত, ইহা বরং বহুগুণে ভাল হইত। আমরা এই সকল অমূলক খেয়ালকে বড় ঘৃণা করিয়া থাকি।" হযরত (সা) বলিলেন– "ইহা ঈমানের প্রকাশ্য নিদর্শন।" সাহাবাগণের (রা) মনে আল্লাহ্র সম্বন্ধে অমূলক খেয়ালের উদ্রেক হইয়াছিল এবং তৎপ্রতি ঘৃণাকে প্রকাশ্য ঈমান ও উহার প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্ট মানবের সম্বন্ধে যে সকল খেয়াল উদ্রেক হয়, তৎসমুদয়ের প্রতি ঘৃণা উহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

অমূলক চিন্তার আগমনে মানুষের কর্তব্য—ব্যক্তি বিশেষের মনে অমূলক চিন্তার উদয় হওয়া মাত্র সে ইহার বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু মানবের চিরশত্রু শয়তান তখন হিংসার বশীভূত হইয়া তাহাকে প্ররোচিত করিয়া বলে- "এই সন্দেহ দূরীকরণের মধ্যে তোমার উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। যুক্তি-তর্কে ইহা খন্ডন করিয়া লও।" ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অমূলক সন্দেহের পিছনে পড়িলে মুনাজাতের মাধুর্য বিনষ্ট হইয়া যায়। অস্‌অসা অর্থাৎ অমূলক সন্দেহ বা চিন্তা উপস্থিত হইলে মানুষের চারি প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। **প্রথম**—কেহ উহা খন্ডনার্থ যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হইয়া মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট করে। **দ্বিতীয়**—কেহ তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ সন্দেহকে অমূলক বুঝিয়া পরিত্যাগ করে এবং মুনাজাতে (ও নিজ কার্যে) লিপ্ত হয়। **তৃতীয়**—কেহ সেই সন্দেহকে অমূলক মনে করিয়া ইহা দমনে তৎপর হয় না; কেননা ইহাতেও অনর্থক সময় অপচয় হইয়া থাকে। বরং সে তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপও না করিয়া মুনাজাতে প্রবৃত্ত হয়। **চতুর্থ**—কেহ কেহ আবার অস্‌অসা আসিতেছে বুঝিতে পারিলেই বিশুদ্ধ সংকল্পের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ইবাদত কার্যে অধিকতর তৎপর হইয়া উঠে। তাহারা ভালরূপে অবগত আছে যে, শয়তান ক্রুদ্ধ ও হতাশ হইয়া তখন তদ্রূপ লোকের অন্তরে সন্দেহ নিক্ষেপ করা হইতে বিরত থাকে এবং তজ্জন্য তাহারা উহার প্রতি মোটেই কর্ণপাত করে না। এই সোপানে উপনীত হইতে পারিলেই মানবাত্মা চরম উন্নতি লাভ করে।

উপরিউক্ত চারিটি অবস্থা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যাইতেছে। মনে কর, চারি ব্যক্তি বিদ্যার্জনের নিমিত্ত বিদেশ যাত্রা করিল। এমন সময় জনৈক ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি পথে দন্ডায়মান হইয়া তাহাদের একজনকে বিদেশ গমনে বাধা প্রদান করিল। কিন্তু সে তাহার কথা না মানিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং এইরূপে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক ও যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া স্বীয় সময় নষ্ট করিল। ইহার পর সেই ঈর্ষাপরায়ণ লোকটি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিদেশ গমনে বাধা দিল। সে তর্ক-বিতর্কে তাহাকে পরাস্ত করিয়া নিজ পথে চলিয়া গেল; কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হইল না। তৎপর তৃতীয় ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করা হইলে সে কোন প্রকার তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হইল না। বরং সে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পূর্ববৎ স্বীয় গন্তব্য পথে চলিয়া গেল, যেন অনর্থক তাহার সময় নষ্ট না হয়। অবশেষে ঐ ঈর্ষাপরায়ণ লোকটি চতুর্থ ব্যক্তিকেও বিদেশ গমনে নিষেধ করিল। কিন্তু সে তৎপ্রতি মোটেই লক্ষ্য না করিয়া অতি দ্রুত বেগে স্বীয় পথ অতিক্রম করিয়া গেল। এমতাবস্থায়, উক্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি প্রথম দুইজনকে বাধা দিয়া প্রকারান্তরে সে তাহার উপকার সাধন করিল, তাহার কোন ক্ষতি করা ত দূরে থাকুক। প্রথম তিনজনকে বাধা প্রদান করিয়া ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি লজ্জিত হইবে না; কিন্তু চতুর্থ জনকে নিষেধ করিয়া সে লজ্জা ও ক্ষোভে বলিবে- "হায়, তাহাকে বরং বাধা প্রদান না করিলেই ভাল হইত।" মোটের উপর কথা এই যে, শয়তানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই সমীচীন নহে।

স্থলবিশেষে ইবাদত প্রকাশের বিধান—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, ইবাদত গোপন রাখিলে এই লাভ হয় যে, রিয়ার আপদ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু ইবাদত প্রকাশ পাইলে সর্বাপেক্ষা বড় উপকার এই যে, অপর লোকে ইবাদতকারীর অনুসরণ করিবে এবং এইরূপে জগতে অধিক পরিমাণে ইবাদতের প্রচলন হইবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উভয় প্রকার সৎকার্যের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ্ বলেন-

ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم -

"তোমরা যদি প্রকাশ করিয়া সদকাসমূহ প্রদান কর তথাপি ভাল কথা; কিন্তু যদি উহার গোপনীয়তা অবলম্বন কর ও ফকীরদিগকে দান কর, তবে ইহা তোমাদের জন্য উত্তম" (৩৭ রুকূ, সূরা বাকারাহ্, ৩ পারা)। একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কিছু অর্থ চাহিলে এক আনসারী এক থলিপূর্ণ অর্থ লইয়া আগমন করিল। ইহা দেখিয়া অপর লোকেও অর্থ আনিতে আরম্ভ করিল। তখন হযরত (সা) বলিলেন- "যে ব্যক্তি কোন সৎপ্রথা প্রচলন করে এবং লোকে (ইহা দেখিয়া) তাহার অনুকরণ করে, সেই ব্যক্তি নিজ কার্যের সওয়াব ত পাইবেই তদুপরি অপর লোকে তাহার অনুসরণ করিয়া যে সওয়াব পাইবে সেই পরিমাণ সওয়াবও সে লাভ করিবে।"

তদ্রূপ, কোন হজ্জযাত্রী যদি স্বীয় পাথেয় সংগ্রহ করিয়া গৃহের বহির্গত হয় যাহাতে অপর লোকও তাহাকে দেখিয়া হজ্জব্রত পালনের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে এবং অপর লোকে সাড়া পাইলে জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জুদ নামাযে প্রবৃত্ত হইবে, এই উদ্দেশ্যেও যদি কোন তাহাজ্জুদ নামাযী আওয়ায উচ্চ করে, এমতস্থলে, উহা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; বরং ইহাতে প্রচুর সওয়াব ও পুরস্কার পাওয়া যাইবে। মোটের উপর কথা এই যে, মনে কোন রিয়ার আশঙ্কা না থাকিলে অপরের হৃদয়ে সৎকার্যের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইবাদত প্রকাশ করা উত্তম কার্য এবং ইহাতে প্রচুর সওয়াব মিলিবে। কিন্তু ইহাতে রিয়ার লোভ বাড়িয়া উঠিলে অপরকে সৎকার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া কোন উপকারই হইবে না। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে সৎকার্য গোপন রাখাই উত্তম ব্যবস্থা।

ইবাদত প্রকাশ মঙ্গলজনক হওয়ার অবস্থা—ইবাদত প্রকাশ করিতে চাহিলে এমন স্থলেই করা উচিত যথায় ইবাদতকারীকে দেখিয়া অপর লোকের মনে তদ্রূপ কার্য সম্পাদনের বাসনা জন্মিবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। কারণ, স্থানবিশেষে দেখা যায় যে, স্বীয় পরিবারস্থ লোকজন তাহার সৎকার্য অনুকরণ করে বটে, কিন্তু অন্যান্য লোকে তাহার অনুকরণ করে না। আবার ইবাদতকারীর পক্ষে স্বীয় অন্তরের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কারণ, অধিকাংশ সময় রিয়ার বাসনা অতি সংগোপনে

তাহার অন্তরে লুক্কায়িত থাকে এবং অপরলোক তাহার অনুকরণে সৎকার্যে প্রবৃত্ত হইবে, এই ভান করিয়া সে স্বীয় ইবাদত প্রকাশ করে। এইরূপে সে রিয়ার কবলে পতিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমন লোককে ঐরূপ ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যে সাঁতার জানে না এবং পানিতে নিমজ্জিত হয়, অথচ সে অপরকে উদ্ধারের নিমিত্ত তাহার হস্ত ধারণ করে এবং ফলে উভয়েই ডুবিয়া মরে। অপরকেও উদ্ধার করিতে সক্ষম হন। নবী ও ওলীগণই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অতএব আত্মগর্বে মাতিয়া উঠিয়া যে ইবাদত গোপন রাখা চলে তাহা প্রকাশ করা যেমন-তেমন লোকের পক্ষে উচিত নহে।

ইবাদত প্রকাশে রিয়াহীনতার নিদর্শন—ইবাদত প্রকাশে রিয়া আছে কিনা, তাহা বুঝিবার উপায় এই– মনে কর, ইবাদত কার্যে লোকের উৎসাহ বাড়াইবার নিমিত্ত তুমি তোমার ইবাদত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমন সময় যদি কেহ তোমাকে বাধা দিয়া বলে– 'তোমার ইবাদত গোপন রাখ, লোকে অমুক ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ ও তাঁহার অনুকরণ করুক', তখন যদি তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে নীরব থাকিতে পার তবে বুঝিবে তোমার অন্তরে রিয়ার ভাব নাই। এরূপ স্থলে তুমি স্বীয় ইবাদত প্রকাশ করিয়া যে সওয়াব পাইতে তাহাই পাইবে। এমতাবস্থায়ও যদি স্বীয় ইবাদত প্রকাশের জন্য লালায়িত হও তবে অবশ্যই বুঝিবে যে, তোমার অন্তরে রিয়ার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং তুমি ইবাদত প্রকাশ করিয়া লোকের ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টায় তৎপর রহিয়াছ ও পারলৌকিক সওয়াবের অন্বেষণে তুমি ব্যাপৃত নহ। ইবাদত প্রকাশের অপর এক ধারা এই যে, লোকে সৎকার্য সম্পাদনের পর বলিয়া বেড়ায়– 'আমি অমুক অমুক কার্য করিয়াছি।' ইহাতে প্রবৃত্তি বেশ আরাম ও আনন্দ উপভোগ করে। এইরূপ হইয়া থাকে যে, সে স্বকৃত সৎকার্য অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করে। সুতরাং রসনা সংযত রাখিয়া এইরূপ স্থলে ইবাদত প্রকাশ না করাই অবশ্য কর্তব্য। তবে যিনি প্রশংসা ও নিন্দাকে তুল্য ভাবিয়া নির্বিকার থাকিতে পারেন, যাঁহার নিকট তৎপ্রতি লোকের অনুরাগ ও বিরাগ সমান বলিয়া মনে হয় এবং পরিশেষে যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন যে, সৎকার্য প্রকাশ করিলে দেখাদেখি সৎকার্যের প্রতি লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপ স্থলে সৎকার্য প্রকাশ করা যায়। শক্তিমান কামিল সিদ্ধপুরুষগণ জগতের মঙ্গল কামনায় বহু সৎকার্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সৎকার্য প্রকাশের দৃষ্টান্ত—হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয রাযিআল্লাহু আনহু বলেন– "আমি ইসলাম গ্রহণের পর হইতে যত নামায পড়িয়াছি ইহাতে সর্বদা এই ধারণা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি যে, কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, এই উত্তর দিব– 'ইহা ভিন্ন আমি অন্য কোনই পছন্দ করি নাই এবং রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে আমি যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছি ইহাকে সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছি।" হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন–

"প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পর আমার সম্মুখে যত সহজ বা কঠিন কার্য উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে কোনটিতে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারি।" হযরত ইব্‌ন মাসউদ রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন– "আমি প্রভাতে যে অবস্থায় জাগ্রত হই, তাহার কোন পরিবর্তন হউক, ইহা আমি চাই না।' হযরত ওসমান রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন– "আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুবারক হস্তে হস্ত রাখিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর হইতে কখনও ডান হাতে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করি নাই, কখনও গান করি নাই এবং কখনও মিথ্যা বলি নাই।" হযরত আবূ সুফিয়ান রাযিআল্লাহু আন্‌হু মৃত্যু সময়ে বলেন– "আমার জন্য রোদন করিও না। ইসলাম গ্রহণের পর হইতে আমি কোন পাপ করি নাই।" হযরত উমর ইব্‌ন আব্দুর আযীয (র) বলেন– "আল্লাহ্‌র মঙ্গলময় বিধানে যে কোন বিপদেই আমি নিপতিত হইয়াছি, ইহাতে আমি ধৈর্য ধারণ করিয়াছি। আর অদৃষ্টলিপিতে আল্লাহ্ যাহা আমার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাতে আমি পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট রহিয়াছি।" এই সকল উক্তি অসীম শক্তিশালী মহামনীষীগণের পক্ষেই সম্পবপর; যেমন-তেমন লোকের পক্ষে তদ্রূপ উক্তি শোভা পায় না।

মন্দের মধ্যে মঙ্গল—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, পরম কৌশলী আল্লাহ্ নিখিল বিশ্বে প্রত্যেক বস্তু এমন কৌশলে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রত্যেক মন্দের ভিতরও এমন মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে যাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। দেখ, রিয়া যে এত বড় ক্ষতিকর কুপ্রবৃত্তি ইহাতেও অপর লোকের জন্য প্রচুর মঙ্গল নিহিত আছে, যদিও রিয়ার দরুন ইবাদতকারীর সকল সওয়াব বিনষ্ট হইয়া যায়। কারন, বহু লোক এমন আছে যাহারা রিয়ার বশবর্তী হইয়া সৎকর্ম করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা শুদ্ধ সংকল্প লইয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছে মনে করিয়া অপর লোকে তাহাদের অনুকরণ করত প্রভূত কল্যাণ লাভ করে।

একটি ঘটনা—কথিত আছে এক সময়ে বসরা শহরের প্রত্যেক অলিতে-গলিতে কুরআন পাঠ ও যিকিরের শব্দ শুনা যাইত। ইহাতে সকলের মনেই কুরআন শরীফ পাঠ ও যিকির করিবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইত। এক ব্যক্তি রিয়ার সুক্ষ্ম বিষয়াদি বর্ণনা করিয়া একখানা পুস্তক প্রকাশ করিলেন। এই পুস্তক প্রচারের ফলে লোকের মন হইতে প্রকাশ্য যিকির ও উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ পাঠের ইচ্ছা লোপ পাইল এবং ইহাতে যিকির ও কুরআন পাঠের প্রতি তাহাদের আগ্রহও কমিয়া গেল। এই পরিবর্তন দেখিয়া অনেকে দুঃখ করিয়া বলিলেন– "হায়! এই পুস্তকখানা প্রকাশিত না হইলেই ভাল হইত।" রিয়ার বশীভূত হইয়া কাজ করিলে স্বীয় অনিষ্ট সাধন করা হয় বটে, কিন্তু সৎকার্য প্রদর্শনে অপরের পরিত্রাণের উপায় করিয়া দেওয়া হয়।

পাপ গোপনের বিধান—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, ইবাদত প্রকাশ করাকে রিয়া বলে। কিন্তু সাতটি কারণে সর্বদাই পাপ গোপন করার বিধান রহিয়াছে। প্রথম–

আল্লাহ্ পাপ গোপনের আদেশ দিয়াছেন। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "কাহারও দ্বারা কোন পাপকার্য সংঘটিত হইলে আল্লাহ্ যে প্রকারে ইহা ঢাকিয়া রাখেন, তদ্রূপ আবরণে ইহাকে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক।" দ্বিতীয়– ইহকালে পাপ গোপন রাখিলে আশা করা যায় যে, পরকালেও ইহা গোপন থাকিবে। তৃতীয়– লোকের তিরস্কার হইতে বাঁচিবার জন্য পাপ গোপন করা সঙ্গত; কেননা অপরের তিরস্কারে অন্তর পেরেশান থাকিবে, ইবাদতকার্যে বিঘ্ন ঘটিবে এবং মনের একাগ্রতা বিনষ্ট হইবে। চতুর্থ– তিরস্কার ও নিন্দায় মানুষ দুঃখিত হইয়া থাকে, ইহা তাহার প্রকৃতিগত। তিরস্কারে দুঃখিত হওয়া ও ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা হারাম নহে। তাওহীদ জ্ঞানের (আল্লাহ্র একত্ব জ্ঞানের) পরম উন্নতি লাভ না করিলে প্রশংসা ও নিন্দাকে তুল্য ভাবিয়া নির্বিকার থাকা চলে না এবং সকলে চূড়ান্ত শিখরে উপনীত হইতে পারে না। নিন্দার ভয়ে ইবাদত গোপন করা জায়েয নহে; তবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত বিশুদ্ধ সংকল্পে ইবাদত করা অবশ্য কর্তব্য। প্রশংসার লোভ সংবরণ করত সৎকার্য করা বরং কতকটা সহজ, কিন্তু নিন্দার বিষদংশন সহ্য করিয়া কর্তব্যে দৃঢ়পদ থাকা বড় দুষ্কর। পঞ্চম– যদি আশংকা হয় যে, পাপ প্রকাশ পাইলে লোকে কষ্ট দিবে এইরূপ স্থলে তদ্রূপ পাপের জন্য শরীয়ত মতে তাহার উপর শাস্তি প্রদান অবশ্য কর্তব্য হইলেও ইহা গোপন রাখা ও অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকার বিধান আছে। তবে পাপাচারীকে পাপের জন্য যথারীতি তওবা করিতে হইবে। ষষ্ঠ– লোক-লজ্জার ভয়ে পাপ গোপন করা যায়। লজ্জা প্রশংসনীয় এবং ঈমানের অংশবিশেষ। আর লজ্জা ও রিয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। সপ্তম– পাপকার্য প্রকাশ পাইলে অপর লোকের পাপকার্যে সাহসিকতা বৃদ্ধি পাইবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া পাপাচার গোপন করাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু পাপ গোপন করিলে লোকে পাপাচারীকে পরহেযগার বলিয়া ভক্তি করিবে, এই উদ্দেশ্যে পাপ গোপন রাখা স্পষ্ট রিয়া ও হারাম।

জগতে এমন লোকও আছেন যাঁহাদের ভিতর-বাহির সমান। তাঁহারা সিদ্দীক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল পাপ পরিহার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই এই উন্নত মর্যাদা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। আবার সংসারে এইরূপ লোকও বিরল নহে, যাহারা স্বীয় পাপাচার প্রচার করিয়া বেড়ায় এবং বলে "যাহা আল্লাহ্ অবগত আছেন, তাহা লোকের অগোচরে রাখিলে কি লাভ হইবে?" নির্বোধরাই এইরূপ উক্তি করিয়া থাকে। এইরূপ কথা বলা নিষিদ্ধ, বরং নিজ ও অপরের পাপ ঢাকিয়া রাখা কর্তব্য।

রিয়ার ভয়ে সৎকার্য পরিহারের স্থান—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, ইবাদত তিন প্রকার। প্রথম প্রকার ইবাদত সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব, অপরের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই; যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার ইবাদতের সর্বতোভাবে লোকের

সঙ্গে সম্বন্ধ রহিয়াছে; যথা রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচারকার্য ও শাসনকার্য। তৃতীয় প্রকার ইবাদতের প্রভাব অপর লোকের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং নিজের সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক থাকে; যথা– শিক্ষাদান, উপদেশ প্রদান, ওয়ায-নসীহত ইত্যাদি।

প্রথম প্রকারের ইবাদত, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি রিয়ার ভয়ে কখনও ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। যদি এইরূপ ইবাদত-কার্যের প্রারম্ভে বা মধ্যভাগে রিয়ার ভাব উপস্থিত হয় তবে ইহা দূরীকরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে এবং ইবাদতের সংকল্পকে সতেজ করিয়া লইতে হইবে। আর অপর লোকে দেখেতেছে বলিয়া তদ্রূপ কার্য সম্পাদনে কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইবে না। কিন্তু যে-স্থলে ইবাদতের নিয়তই থাকে না, কেবল রিয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদত করা হয়, এমন ইবাদতকে ইবাদতের মধ্যে গণ্য করা হয় না। তবে, যতক্ষণ মূল নিয়ত বিনষ্ট না হয় ততক্ষণ ইবাদত ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। হযরত ফুযাইল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– " লোকে দেখিতেছে বলিয়া ইবাদত কার্য ছাড়িয়া দেওয়া রিয়া এবং মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করা হয়, ইহা ইবাদতে পরিগণিত হয় না, বরং ইহা শিরিকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।"

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, শয়তান তোমাকে ইবাদত করিতে দিতে চায় না। কিন্তু তোমাকে বিরত রাখিতে অসমর্থ হইলে সে অন্য প্রকার প্ররোচনা দিয়া বলে– "লোকে তোমার ইবাদত দেখিতেছে; সুতরাং ইহা রিয়া, ইবাদত নহে।" শয়তান এইরূপে ধোঁকা দিয়া তোমাকে ইবাদত হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করে। তুমি যদি এই ধোঁকায় পড়িয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক ভূগর্ভেও প্রবেশ কর তথাপি শয়তান তোমাকে বলিবে– "লোকে জানিতে পারিয়াছে যে, তুমি লোকালয় হইতে পালাইয়া আসিয়া সংসারবিরাগী পরহেযগার সাজিয়াছ। ইহা বৈরাগ্য ও পরহেযগারী নহে, বরং ইহাও রিয়া।" অতএব তুমি তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া শয়তানকে এই উত্তর দিয়া নিরস্ত করিবে– "অপরের মনস্তুষ্টি বিধানে ব্যাপৃত থাকা ও লোকে দেখিবে বলিয়া ইবাদত ছাড়িয়া দেওয়া রিয়া। পরের দেখা, না দেখা আমার নিকট সমান। আমার অভ্যাস অনুযায়ী আমি কাজ করিয়া যাইতেছি এবং আমি কল্পনাও করি না যে, অপর লোকে ইহা দেখিতেছে।"

লোকে দেখিবে বলিয়া ইবাদত ছাড়িয়া দেওয়া কেমন, ইহা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে। মনে কর, ঝাড়িয়া বাছিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য প্রভু স্বীয় ভৃত্যকে কিছু গম দিল। কিন্তু ভৃত্য ইহা পরিষ্কার না করিয়াই বলিল– "শত চেষ্টা করিলেও ইহা একেবারে নির্মল করা যাইবে না; কাজেই ইহার চেষ্টা করি নাই।" এমতাবস্থায়, প্রভু বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিবে– "রে নির্বোধ! তুই ত মূলত কাজটিই করিস নাই। তোর এইরূপ আচরণে গমগুলি ত আর নির্মল হইল না।" বিশুদ্ধ সংকল্পে ইবাদত করিবার জন্য আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন। তুমি সংকল্প বিশুদ্ধ

করিতে পারিলে না বলিয়া যদি ইবাদত ছাড়িয়া দাও, তবে বিশুদ্ধ সংকল্প কোথায় পাওয়া যাইবে? কারণ, সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই বিশুদ্ধ সংকল্প থাকে। কথিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম নখয়ী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি কুরআন শরীফ পাঠকালে কেহ তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি পাঠ বন্ধ করিয়া দিতেন এবং তিনি যে সর্বদা কুরআন শরীফ পাঠ করেন, ইহা লোককে জানিতে দিতে পছন্দ করিতেন না। ইহা হইতে এই ধারণা করা সঙ্গত নহে যে, লোকে দেখিবে বলিয়া তিনি কুরআন পাঠ বন্ধ করিয়া দিতেন; বরং তিনি জানিতেন যে, কোন আগন্তুক আসিলে পাঠ বন্ধ করিয়া তাহার সহিত কথা বলা উচিত। আর ইহাও হইতে পারে যে, তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে কুরআন পাঠকেই অধিক মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন। হযরত হাসান বসরী (রা) এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার রোদন আসিলে তিনি স্বীয় মুখ ঢাকিয়া লইতেন, যাহাতে লোকে তাঁহার রোদন সম্পর্কে অবগত না হইতে পারে। কারণ, আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রকাশ্য রোদন অপেক্ষা গোপন রোদন উত্তম। ঐ ব্যক্তি প্রকাশ্য রোদন হইতে বিরত রহিলেন; আর রোদন প্রকাশ করা কোন ইবাদত নহে। হযরত হাসান বস্‌রী (র) আরও বলেন– এক ব্যক্তি রাস্তার উপর হইতে লোকের কষ্টদায়ক দ্রব্যাদি সরাইয়া দিতে চাহিত। কিন্তু লোকে তাহাকে পরহেযগার বলিয়া মনে করিবে, এই আশঙ্কায় সে উহা করিত না। ইহা কোন দুর্বলচিত্ত লোকের ঘটনা হইবে। সে হয়ত মনে করিয়াছে যে, লোকে তাহার পরহেযগারী জানিতে পারিলে অন্যান্য ইবাদতে সে স্বাদ পাইবে না। কিন্তু রিয়ার ভয়ে তদ্রূপ কার্য হইতে বিরত থাকা তাহার পক্ষে ভাল হয় নাই, বরং রাস্তার কষ্টদায়ক দ্রব্যাদি দূরীকরণ এবং তৎসঙ্গে রিয়ার ভাব দূর করিবার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে উচিত ছিল। দুর্বলচিত্ত লোকেরাই ঐরূপ সৎকার্য পরিত্যাগ করত নিজের মঙ্গল কামনা করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহাদের জন্য অনিষ্টকরই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদত শাসন কার্য, বিচার কার্য ও রাষ্ট্র পরিচালনা অপর লোকের সহিত সম্বন্ধ রাখে। ন্যায়বিচারের সহিত সুক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করিতে পারিলে এই সকল শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে গণ্য। কিন্তু উহাতে পক্ষাপতিত্ব ও অবিচার করিলে মহাপাপী হইতে হয়। যে ব্যক্তি সুবিচার করিবে বলিয়া নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, তাহার পক্ষে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য গ্রহণ করা হারাম। কারণ, উহা ভীষণ বিপদসমূহে পরিপূর্ণ। নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত কিন্তু এইরূপ নহে। কারণ, নিছক নামায রোযাতে কোন আনন্দ নাই। অবশ্য উহা প্রকাশ পাইলে আনন্দ হইয়া থাকে; কিন্তু রাজশক্তি পরিচালনা কার্যে আনন্দ অপরিসীম এবং ইহা বিষম প্রলোভনের আকর। যে ব্যক্তি সুবিচার করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া নিজের উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করিতে পারে, তাহার পক্ষেই তদ্রূপ কার্য শোভা পায়। যে ব্যক্তি বিশেষ পরীক্ষার পর নিজের অপক্ষপাতিত্ব ও ন্যায়বিচার শক্তির উপর নির্ভর করিতে

পারিয়াছে এবং রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই আমানতদারীর পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছে, এমন ব্যক্তির অন্তরেও যদি বিচারকের পদ প্রাপ্তির পর তাহার স্বভাব পরিবর্তন হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং পদচ্যুতির ভয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খোশামোদ করিবে বলিয়া মনে হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে উক্ত পদ গ্রহণ করা উচিত কিনা, তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কতক আলিম রাজপথ গ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রদান করিয়া বলেন যে, যখন নিজকে পূর্বেই পরীক্ষা করা হইয়াছে তখন সে সন্দেহকে অমূলক সন্দেহই মনে করিয়া নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। কিন্তু আমাদের মতে তদ্রূপস্থলে পদ গ্রহণ না করাই সঙ্গত। পূর্ব পরীক্ষাকালে প্রবৃত্তি ন্যায়বিচারের অঙ্গীকার করিয়া থাকিলেও ইহা হয়ত প্রতারণামূলক হইতে পারে এবং পদ লাভের পর স্বভাব পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে। প্রথমেই মনে সংশয় দেখা দিলে পরে স্বভাব পরিবর্তনের প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায়, রাজপদ গ্রহণে বিরত থাকাই উত্তম। অপরিসীম মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত নহে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আন্‌হু হযরত রাফে' রাযিআল্লাহু আন্‌হুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন– "তুমি কখনও শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করিও না, যদিও তুমি দুই ব্যক্তির শাসনকর্তাই হও না কেন।" তৎপর তিনি খলীফা পদে অভিষিক্ত হইলে হযরত রাফে' (রা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– "আপনি তো আমাকে শাসনভার গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি খলীফার পদ গ্রহণ করিলেন।" হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে বলিলেন– "আমি এখনও তোমাকে নিষেধ করিতেছি। যে ব্যক্তি ন্যায়বিচার করে না, তাহার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।" এইরূপ দুর্বল প্রতিবাদের মীমাংসার জন্য এই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মন কর, এক সন্তরণপটু ব্যক্তি নদীর গভীর পানিতে অবতরণ করে; অথচ সে তাহার পুত্রকে নদীর তীরে আসিতেও নিষেধ করে। কারণ, পুত্র সন্তরণ জানে না বলিয়া নদীতে পড়িলে ডুবিয়া মরিবে। বাদশাহ যদি অত্যাচারী হয় এবং বিচারক ন্যায়বিচার করিতে না পারে ও পদরক্ষার্থ কর্তৃপক্ষকে খোশামোদ করিতে হয়, এমতাবস্থায়, বিচারক ও শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করা উচিত নহে। আবার কোন পদ গ্রহণ করিলেও পদচ্যুতির ভয়ে কাহাকেও খোশামোদ করা সঙ্গত নহে। বরং তদ্রূপ স্থানেও ন্যায়পরায়ণতার সহিত সুবিচার করা উচিত। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়বিচার করিতে গেলে যদি পদচ্যুত হইতে হয়, তবে ইহাতে আনন্দ হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় প্রকারের ইবাদত, ওয়ায করা ও ফতওয়া (ধর্ম-ব্যবস্থা) প্রদান, শিক্ষাদান এবং হাদীস বর্ণনাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই সমুদয় কার্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক, উহাতে নামায-রোযা অপেক্ষাও অধিক রিয়ার প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। এই শ্রেণীর কাজ শাসনকার্যের প্রায় সমতুল্য। প্রভেদ মাত্র এতটুকু যে, বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান

শ্রোতৃবর্গ ও বক্তা উভয় পক্ষেরই উপকার হইয়া থাকে। ওয়ায-নসীহত দ্বারা লোককে ধর্মের দিকে আহবান করা হয় এবং ইহা রিয়া হইতেও তাহাদিগকে অব্যাহতি দেয়। রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যে এই বিশেষত্ব নাই। তবে বক্তার মনে রিয়ার ভাব উদয় হইলে ওয়ায-নসীহত পরিত্যাগ করা উচিত কিনা, এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কতক আলিম এইরূপ স্থলে ওয়ায-নসীহত করা হইতে বিরত থাকেন। সাহাবা রাযিআল্লাহু আন্হুমের নিকট কেহ কোন ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেন। হযরত বিশরে হাফী (র) হাদীসের বহু কিতাব ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া বলিলেন- "মুহাদ্দিস (হাদীস বর্ণনাকারী) হওয়ার বাসনা আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। তাহা না হইলে আমি হাদীস বর্ণনা করিতাম।" বুযুর্গগণের উক্তি এই যে, হাদীস বর্ণনা করাও দুনিয়ার একটি কাজ। আর যে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করে সে যেন বলে- "হে মানব, আমাকে সভাপতির আসনে বরণ করিয়া লও এবং আমাকে উচ্চ আসনে বসাও।" এক ব্যক্তি হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর নিকট লোককে উপদেশ দানের অনুমতি চাহিল। তিনি বলিলেন- "(তুমি উপদেশ প্রদানে রত হইলে) আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমার পেটে এত বাতাস প্রবেশ করিবে যে, তোমাকে উড়াইয়া আকাশে তুলিবে।" অর্থাৎ ইহাতে গর্বিত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। হযরত ইবরাহীম তাইমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন— "যখন তোমাদের কথা বলার অভিলাষ দেখিতে পাও তখন চুপ থাক; আর চুপ থাকিবার অভিলাষ হইলে কথা বল।"

কিন্তু ওয়ায-নসীহত করার প্রশ্নে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ওয়ায-নসীহতকারী বা হাদীস বর্ণনাকারীকে স্বীয় অন্তর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর ইবাদতকার্যে রিয়ার ভাবও বিদ্যমান রহিয়াছে, তবুও ইহা হইতে বিরত না থাকিয়া ওয়ায-নসীহত করিয়া যাওয়া আবশ্যক। তবে, তৎসঙ্গে ইবাদতের সেই উদ্দেশ্যকে ক্রমশ সবল করিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে।

ওয়ায-নসীহতের আদেশকে সুন্নত ও নফলতুল্য গণ্য করিবে। উহাতে ইবাদতের মূল সংকল্প পরিলক্ষিত হইলে রিয়ার আশংকায় উহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে; শাসনকার্যের ব্যাপারে এই কথা খাটে না। কারণ, তদ্রূপ কার্যে ইবাদতের সংকল্প নষ্ট হইয় অতি তাড়াতাড়ি অসাধু অভিলাষ মানব-অন্তরে প্রবল হইয়া উঠে। এই কারণেই হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বিচারকের পদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি শিক্ষাদানকার্য পরিত্যাগ করেন নাই। অপরপক্ষে, যদি বুঝা যায় যে, ইবাদতের সংকল্প মোটেই নাই এবং অন্তর একমাত্র রিয়ার ভাবেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তবে এইরূপ স্থলে ওয়াস-নসীহত পরিত্যাগ করাই অবশ্য কর্তব্য।

এই বিষয়ে যদি কেহ আমাদের পরামর্শ চাহে এবং আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে, ইহাতে কোন মঙ্গল হইবে না, অর্থাৎ তাহারা বক্তৃতা যদি নিরর্থক উক্ত ও

হাস্যরসিকতায় ভরপুর হয়, সে যদি আল্লাহ্র রহমতের অলীক প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া পাপের প্রতি লোকের সাহসিকতা বাড়াইয়া তুলে বা ঝগড়া ও বাদ-প্রতিবাদে লোককে উদ্বুদ্ধ করে এবং উহাতে মানব হৃদয়ে গর্ব ও অহংকারের বীজ অঙ্কুরিত হয়, তবে এমন ব্যক্তিকে আমরা ওয়ায-নসীহত করিতে নিষেধ করিব। তদ্রূপস্থলে ওয়াস-নসীহত করিতে না দিলেই তেমন ব্যক্তির উপকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু বক্তার কথা যদি শরীয়ত অনুযায়ী হয়, লোকে যদি তাহাকে খাঁটি বলিয়া মনে করে এবং তাহার উপদেশ লোকের ধর্ম জ্ঞানের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে তেমন বক্তাকে ওয়ায-নসীহত হইতে বিতর থাকিবার অনুমতি আমরা দিব না। কারণ, এইরূপ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদানে নিষেধ করিলে বহু লোকের ক্ষতি হয়; আর তদ্রূপ স্থলে রিয়ার বশীভূত হইয়া উপদেশ প্রদান করিলে শুধু উপদেষ্টারই ক্ষতি হইয়া থাকে। আবার একজনের পরিত্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা বহু লোকের পরিত্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে অধিক গুরত্ব দেওয়া উচিত। অতএব বহু লোকের মঙ্গল কামনায় তদ্রূপ ব্যক্তিকে আমরা উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আল্লাহ্ (ইসলাম) ধর্মের সাহায্য এমন লোকের দ্বারা করাইবেন যাহাদের মধ্যে ধর্মভাব বিন্দুমাত্র নাই।" রিয়ার বশবর্তী হইয়া যাহারা সদুপদেশপূর্ণ ওয়ায-নসীহত করে, এই হাদীসে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা তদ্রূপ ইহা ব্যতীত আর কিছুই বলিব না- "তুমি অপরকে যে উপদেশ দান কর, অগ্রে তুমি ইহা প্রতিপালন কর; সর্বাগ্রে তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তৎপর অপরকে ভয়ের কথা শুনাও।"

বক্তার উদ্দেশ্য বিচার—কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, বক্তার নিয়ম যে বিশুদ্ধ ও সঠিক ইহার নিদর্শন কি? তবে আমাদের উত্তর এই ঃ **প্রথম**—মানব জাতির প্রতি মমতাবোধে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে যদি বক্তা উপদেশ দান করে, তবে বুঝা যাইবে যে, তাহার নিয়ত বিশুদ্ধ ও সঠিক। কিন্তু অপর বক্তাকে দেখিয়া যদি তাহার মনে হিংসার উদ্রেক হয় তবে বুঝিবে তাহার নিয়ত বিশুদ্ধ নহে; জনগণের মন আকর্ষণ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। **দ্বিতীয়**—সভাস্থলে যদি কোন দুনিয়াদার লোক বা উচ্চ রাজকর্মচারী আগমন করে এবং বক্তা বক্তৃতার ভাব ও বিষয় পরিবর্তন না করিয়া অভ্যাস অনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিয়া চলে, তবে তাহার নিয়তের বিশুদ্ধতা বুঝা যাইবে। নিয়তের বিশুদ্ধতা বুঝিবার **তৃতীয় নিদর্শন এই**—বক্তার মুখে শরীয়ত-বহির্ভূত কথা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ রোদন বা কোন প্রকার উচ্চ ধ্বনি করে, শরীয়ত-বহির্ভূত হওয়ার দরুন কোন কথা আসিয়া পড়ে এবং তৎপ্রতি বক্তারা হৃদয়ে ঘৃণার উদ্ভব না হয় তবে বুঝিবে যে, রিয়ার বশবর্তী হইয়া সে বক্তৃতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর যদি ঘৃণার উদ্রেক হয় তবে বুঝা যাইবে যে, রিয়া ভিন্ন তাহার অন্য সদুদ্দেশ্যও আছে। তেমন স্থলে এই সঠিক নিয়তকে প্রবল করিয়া তোলার চেষ্টায় তৎপর হওয়া উচিত।

স্থানবিশেষে ইবাদত প্রকাশে রিয়া না হওয়ার কারণ—কোন কোন সময় ইবাদত করিতে অপর লোকে দেখিলে মনে যে আনন্দ হয়, ইহা নাজায়েয ও রিয়া নহে। কারণ, ইবাদত সর্বদাই মুসলমানের হৃদয়গ্রাহী বস্তু। কোন কোন বিষয়ে ইহাতে বিঘ্ন ঘটিলে লোকের সম্মুখীন হওয়ার কারণে যদি এই বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত হয়, তবে আনন্দ প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। উহাদরণস্বরূপ মনে কর, কোন এক ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় গৃহে তাহাজ্জুদ নামায পড়া দুষ্কর। কারণ, তথায় সে স্বীয় স্ত্রীর সহিত কথাবার্তায় ব্যাপৃত থাকে; কিন্তু অপরের বাড়ীতে গেলে সেইরূপ বাধা-বিঘ্ন থাকে না এবং তজ্জন্য ইবাদতের সুযোগ পাইয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। অপর লোককে ইবাদতে লিপ্ত দেখিয়া তাহার মনে তৎপ্রতি উৎসাহ পাইয়া থাকে এবং নিজকে পুণ্যের ভিখারী ভাবিয়া তাহাদের সহিত ইবাদতে প্রবৃত্ত হয়। যে স্থানে সকলেই রোযা রাখে বা আহার্য সামগ্রীর অভাব, এইরূপ স্থানে গমন করিলে তাহার হৃদয়ে রোযা রাখিবার বাসনা প্রবল হয়। স্বীয় গৃহে তারাবীহ্‌র নামায পড়িতে আলস্য আসে; কিন্তু অপর লোককে মসজিদে নামায পড়িতে দেখিয়া তাহার সেই আলস্য বিদূরিত হয়। অথবা জুমআর দিনে অপর লোককে আল্লাহ্‌র যিকিরে অধিক লিপ্ত দেখিয়া সেও তদ্রূপ নামায ও তস্‌বীহ পড়িতে থাকে। এবংবিধ স্থানসমূহে রিয়া না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অথচ শয়তান বলে- ইবাদতে উৎসাহ মানুষের দৃষ্টির কারণেই হইয়াছে, অতএব উহা রিয়া।

ইবাদত প্রকাশে আনন্দ রিয়া কিনা বুঝিবার উপায়—লোক-সমক্ষে ইবাদতে উৎসাহ বর্ধন ও ইহার বাধা-বিঘ্ন অপসারণের নিমিত্ত যে স্থলে সৎকার্যে আনন্দ জন্মে না, বরং লোকে দেখিতেছে বলিয়াই আনন্দ হয়, তদ্রূপ স্থলে কিন্তু শয়তান বলিতে থাকে- "এই ইবাদত করিতে থাক। ইহার বাসনা তোমার হৃদয়ে পূর্ব হইতেই আছে। কিন্তু ইহাতে যে বাধা-বিঘ্ন ছিল, তাহা এখন বিদূরিত হইল।" এমতাবস্থায়, উপরি উক্তি দ্বিবিধ কারণের কোন্‌টির দরুন হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়, গভীর মনোনিবেশ সহকারে ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। মনে কর, তুমি অন্য লোককে ইবাদত করিতে দেখিতেছ, কিন্তু তাহারা তোমার ইবাদতের দিকে লক্ষ্য করিতেছে না, তবুও তুমি আনন্দানুভব করিলে মনে করিবে পূণ্য-প্রাপ্তির বাসনাই তোমার ইবাদতের কারণ। আর তাহারা দেখিতেছে না বলিয়া যদি তোমার পূর্ববৎ আনন্দ না থাকে, তবে বুঝিবে ইহা রিয়া। এইরূপ স্থলে, রিয়া হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিবে। আবার যে ইবাদতে প্রশংসা-লিপ্‌সা ও মঙ্গল-কামনা উভয়ই নিহিত থাকে তথায় দেখিবে ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল। যাহাকে প্রবল পাইবে তাহাকেই তোমার ইবাদতের কারণ বলিয়া মনে করিবে।

কোন কোন সময় কুরআন শরীফ শ্রবণ করিয়া কাহাকেও রোদন করিতে দেখিলে দর্শনকারীকেও রোদন করিতে দেখা যায়; কিন্তু একাকী থাকিলে সে রোদন করিত না। এমতাবস্থায়, অপরের রোদন দেখিয়া রোদন করা রিয়া নহে। কারণ, অপরের শোকাতুর দেখিয়া নিজের অবস্থা স্মরণ হইয়া গেলে সেও তখন কাঁদিতে আরম্ভ করে। আবার অনেক সময় হৃদয়ে কোমলতার দরুনই ক্রন্দন আসে। তবে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিয়া রোদন করা রিয়ার কারণেই হইয়া থাকে। অপরকে শোনানোই চিৎকার করিয়া রোদনের উদ্দেশ্য। কোন সময় আবার শোকাতুর অবস্থায় কাহাকেও ভূতলশায়ী হইয়া যাইতে দেখা যায়। এমতাবস্থায়, পাছে লোকে তদ্রূপ শোকাভিভূত হওয়াকে অমূলক বলিয়া মনে করিবে, এই আশঙ্কায় যদি সে তৎক্ষণাৎ উঠিবার শক্তি লাভ করা সত্ত্বেও ভূতলে পড়িয়া থাকে, তবে তেমন ব্যক্তি প্রথমে রিয়াকার ছিল না; কিন্তু পরে রিয়াকার হইয়া গেল। কোন ব্যক্তি হয়ত ভাবোন্মত্ততায় নাচিতে থাকে। তৎপর ইহা তিরোহিত হওয়ার পর স্বাভাবিক গতিতে চলিবার শক্তি লাভ করিয়াও অপরের উপর হেলান দিয়া আস্তে আস্তে চলা রিয়া। লোকে যেন না বলিতে পারে যে, তাহার ভাবাবেগ ক্ষণিকেই চলিয়া গেল, এই উদ্দেশ্যে তদ্রূপ করা হইয়া থাকে। অপর লোককে ইবাদতে লিপ্ত দেখিয়া স্বীয় দোষ-ত্রুটি স্মরণ হইলে বা অন্য কোন কারণে স্বীয় পাপ মনে পড়িলে আউযুবিল্লাহ ও ইস্তিগফার পড়া অবৈধ নহে। কিন্তু রিয়ার বশীভূত হইয়াও কেহ কেহ তদ্রূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে।

অতএব, রিয়ার আপদ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "রিয়ার সত্তরটি দ্বার আছে।"

রিয়ার ভাব উদয়কালীন কর্তব্য—রিয়ার ভাব উদয় হইলে মনে মনে বিবেচনা করা উচিত যে, রিয়াকারের অন্তরের কলুষতা সম্বন্ধে আল্লাহ্ অবগত আছেন এবং যতক্ষণ যে রিয়ার ভাব বিদূরিত না করে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত থাকে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ

"আমরা কপট বিনয় হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি।" অর্থাৎ শারীরিক আকৃতিতে বিনয় প্রকাশ করা এবং অন্তরে বিনয়ভাব না থাকা কপটতার অন্তর্ভুক্ত।

রিয়াশূণ্য ইবাদতের নিদর্শন—প্রিয় পাঠক, ইতঃপূর্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছ যে, নামায-রোযা ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত কার্যে নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কাহারও কোন অভাব মোচন করিতে চাহিলে সর্বপ্রথমে নিয়ম ঠিক করিয়া লইবে। উপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে বিনয় ব্যবহার কামনা করে তবে যেন শিক্ষাদানের বিনিময় চাওয়া হইল। সুতরাং এইরূপ স্থলে শিক্ষক কোন সওয়াব পাইবে না। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উস্তাদের খেদমত করাই শাগরিদের পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। তবে উস্তাদের পক্ষে শাগরিদের খেদমত গ্রহণ না করা উচিত। কিন্তু তদ্রূপ খেদমত গ্রহণ করিলেও শিক্ষাদানের সওয়াব বিনষ্ট হইবে না। শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের খেদমত করিতে অস্বীকার করে, ইহাতে তাহার বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত নহে। হুঁশিয়ার ব্যক্তিগণ এইরূপ কার্য হইতে বিরত রহিয়াছেন।

একদা এক বুযুর্গ কূপে পতিত হইলেন। তাঁহাকে উত্তোলনের জন্য লোকে রশি আনয়ন করিল। কিন্তু তিনি শপথ দিয়া বলিলেন- "যে ব্যক্তি আমার নিকট হাদীস ও কুরআন শরীফ পাঠ করিয়াছে, সে যেন এই রশি স্পর্শও না করে।" তিনি ভয় করিয়াছিলেন যে, শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিলে শিক্ষাদানের পূণ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। এক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট উপঢৌকন লইয়া আগমন করিল; কিন্তু তিনি ইহা গ্রহণ করিলেন না। তখন সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "আমি কখনও আপনার নিকট হাদীস পড়ি নাই।" তিনি বলিলেন- " তোমার ভাইতো পড়িয়াছে। এই উপঢৌকন গ্রহণ করিলে তোমার ভ্রাতা প্রতি অন্যান্য শিক্ষার্থী অপেক্ষা আমি অধিক সদয় হইয়া পড়ি কিনা, আমার এই আশংকা আছে।" এক ব্যক্তি দুই থলিয়াপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রাসহ হযরত সুফিয়ান সাওরীর (র) নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল- "আপনি ভালরূপে অবগত আছেন যে, আমার পিতা আপনার বন্ধু ছিলেন এব তিনি হালাল উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। আমি উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পাইয়াছি তাহাও সম্পূর্ণরূপে হালাল। অনুগ্রহপূর্বক এই দুই থলিয়াপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকনস্বরূপ গ্রহণ করুন।" তিনি উহা গ্রহণ করিলেন এবং লোকটি চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পর হযরত সুফিয়ান সাওরীর (র) স্মরণ হইল যে, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ঐ ব্যক্তির পিতার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার পুত্রকে ঐ দাতার অনুসরণ পাঠাইলেন এবং স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়া দুইটি তাহাকে ফেরত দিয়া দিলেন। হযরত সুফিয়ান সাওরীর (র) পুত্র বলেন- "স্বর্ণমুদ্রাগুলি ফেরত নিয়া আসার পর আমার ধৈর্যাবলম্বনের ক্ষমতা রহিল না। সুতরাং, আমি পিতাকে বলিলাম- 'আপনার মন প্রস্তুরবৎ কঠিন। আপনি জানেন যে, আপনার বিরাট পরিবার রহিয়াছে এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য আপনার নিকট একটি কপর্দকও নাই। এমতাবস্থায়ও আমাদের উপর আপনার দয়া হয় না।' তিনি বলিলেন- 'তুমি কি চাও যে, তোমরা পরিতৃপ্তির সহিত পানাহার ও আমোদ-স্ফূর্তি কর এবং কিয়ামত দিবসে তজ্জন্য আমি জওয়াবদিহি করি?"

বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য—শিক্ষাদান যেমন একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত তদ্রূপ একমাত্র আল্লাহ্র প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যেই বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক। উস্তাদের নিকট ইলম ব্যতীত অন্য কিছুর প্রত্যাশী হওয়া উচিত নহে। তাঁহার খেদমত করিলে তিনি শিক্ষাদানে অধিক যত্নবান হইবেন, এই ধারণায় তাঁহার খেদমত করা রিয়া এবং স্পষ্ট পাপ। শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য উস্তাদের খেদমতের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং ইহাতে কোন সম্মানের প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে। তদ্রূপ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তই মাতা-পিতার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা উচিত। তাহাদের সম্মুখে নিজকে পুণ্যবান বলিয়া পরিচয় দিবে না। তাঁহাদের আনন্দ বর্ধনের জন্য তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করা পাপ।

মোটের উপর কথা এই যে, পুণ্য লাভের আশায় যে কাজ করা হয় তাহা আন্তরিকতার সহিত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করা আবশ্যক।

নবম অধ্যায়

অহংকার ও আত্মগর্ব

অহংকার-প্রিয় পাঠক, অবগত হও, অহংকার ও আত্মগৌরব নিতান্ত জঘন্য কুস্বভাব। উহা করিলে বাস্তবপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই শোভা পায়। এই কারণেই পবিত্র কুরআনে উদ্ধত অহংকারী লোকের বহু নিন্দা করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন-

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

"এইরূপে প্রত্যেকে অহংকারী উদ্ধত ব্যক্তির হৃদয়ে আল্লাহ্ সীলমোহর লাগাইয়া থাকেন।" (সূরা মুমিন, ৪ রুকু, ২৪ পারা)। তিনি অন্যত্র বলেন—

وَخَافَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

"আর সমুদয় ধৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী বিফল মনোরথ হইল।" (সূরা ইবরাহীম, ৩ রুকু, ১৩ পারা)। তিনি আরও বলেন—

اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

"অবশ্যই আমি প্রত্যেক এমন অহংকারী ব্যক্তি হইতে আপন প্রভু ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় লইয়াছি যাহারা হিসাবের দিনকে বিশ্বাস করিত না।" (সূরা মুমিন, ৩ রুকু, ২৪ পারা)।

হাদীস ও বুযুর্গদের উক্তিতে অহংকারের জঘন্যতা—রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কাহারও অন্তরে রাই কণিকাতুল্য অহংকার থাকিলেও সে বেহেশ্তে যাইবে না।" তিনি আরও বলেন- "কোন কোন লোক সর্বদা অহংকার করিয়া বেড়ায়। সমুদয় অহংকারী ব্যক্তির শাস্তি তাহার নামে লিপিবদ্ধ হইবে।" হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, একদা হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম জ্বিন, পক্ষী ও মানবকে ভ্রমণে বাহির হইবার আদেশ দিলেন। কথিত আছে যে, দুই লক্ষ মানব ও দুই লক্ষ জিন তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি তাহাদিগকে আকাশে লইয়া গেলেন। তাঁহারা এত উর্ধ্বে উঠিলেন যে, ফেরেশ্তা কর্তৃক আল্লাহ্র প্রশংসা কীর্তনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তৎপর তিনি ভূতলে অবতরণ করিলেন; এমনকি সমুদ্রতল পর্যন্ত গমন করিলেন। সেই সময় তিনি এক আকাশ বাণী শুনিতে পাইলেন

যে, "সুলায়মান আলায়হিস সালামের অন্তরে যদি কণামাত্র অহংকার থাকিতে তবে আকাশে লইয়া যাইবার পূর্বেই তাহাকে এই পাতালপুরীতে ডুবাইয়া দেওয়া হইত।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কিয়ামত দিবসে অহংকারী লোক পিপীলিকার আকার ধারণ করিবে এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণে তাহারা অপরাপর লোকর পদতলে নিপতিত থাকিবে।" তিনি অন্যত্র বলেন- "দোযখে 'হবহব' নামক একটি গর্ত আছে। অহংকারী ও উদ্ধত লোক ইহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে।"

হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম বলেন- "অহংকারের দরুন ইবাদতও ফলপ্রদ হয় না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি অহংকার ও গর্বভরে পোশাক পরিধান করত পৃথিবীতে বিচরণ করে, মহাপ্রভু আল্লাহ্ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না।" তিনি আরও বলেন- "এক ব্যক্তি উত্তম পোশাক পরিধান করত অঙ্গসৌষ্ঠবে গর্বভরে বিচরণ করিতেছিল এবং নিজের (অঙ্গ-সৌষ্ঠবের) প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। আল্লাহ্ তাহাকে ভূগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া দিলেন। অদ্যাবধি সে সেই অবস্থায় নিমজ্জিত হইতেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিমজ্জিত হইতে থাকিবে।" তিনি অন্যত্র বলেন- "যে ব্যক্তি গর্বভরে পদ বিক্ষেপ করিয়া চলে এবং নিজকে বড় বলিয়া মনে করে, সে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌কে তাহার উপর ক্রুদ্ধ দেখিতে পাইবে।" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে ওয়াসে' রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় পুত্রকে গর্বভরে চলিতে দেখিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলিলেন- "তোমার মাতাকে আমি দুইশত দেরেম মূল্যে খরিদ করিয়া লইয়াছিলাম। আর মুসলমানদের মধ্যে তোমার পিতার ন্যায় লোক যত কম হইবে ততই মঙ্গল।" হযরত মুতাররাফ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি একদা হযরত সাহ্‌লব রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হিকে গর্বভরে পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিতে দেখিয়া বলিলেন- "হে বান্দা, আল্লাহ্, এইরূপ চলনকে ঘৃণা করেন।" তিনি উত্তরে বলিলেন- "অন্ততপক্ষে তুমি ত আমাকে চিন।" হযরত মুতাররাফ (র) বলিলেন- "হাঁ, তোমাকে ভালরূপে চিনি। প্রথমে তুমি এক বিন্দু অপবিত্র পানি ছিলে; সর্বশেষে ঘৃণিত মৃত শবে পরিণত হইবে। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে (অর্থাৎ জীবিতকালে) তুমি মলমূত্রাদি অপবিত্র পদার্থের ভার বহন করিয়া চলিতেছ।"

হাদীসে বিনয়ের ফযীলত—রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, মহাপ্রভু আল্লাহ্ তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন।" তিনি অন্যত্র বলেন- "প্রতিটি মানুষের মাথায় একটি করিয়া লাগাম লাগানো আছে এবং দুইজন ফেরেশতা ইহা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে ফেরেশ্‌তাদ্বয় লাগামটি ঊর্ধ্ব দিকে টানিতে থাকে এবং বলে- ইয়া আল্লাহ্, তাহার মর্যাদা হ্রাস কর।" তিনি আরও বলেন- "যে ব্যক্তি দুর্বল নহে, অথচ নম্রতা প্রদর্শন করে, হালাল উপায়ে অর্জিত ধন আল্লাহ্‌র পথে বিতরণ করে, অসহায় লোকের

উপর দয়া করে এবং তত্ত্বজ্ঞ ও আলিমদের সহিত মেলামেশা রাখে, সেই ব্যক্তি পুণ্যবান।" হযরত আবূ সাল্‌মা রাহ্‌মাতুল্লাহি আয়ায়হি স্বীয় পিতামহ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- "একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার গৃহে মেহ্‌মানস্বরূপ ছিলেন। তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতারের জন্য আমি তাঁহাকে মধুমিশ্রিত এক পেয়ালা দুধ দিলাম। তিনি আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা মিষ্ট এবং জিজ্ঞাসা করিলেন- 'ইহা কি?' আমি নিবেদন করিলাম- 'ইহাতে মধু মিশ্রিত করা হইয়াছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ পেয়ালাটি রাখিয়া দিলেন এবং পান না করিয়া বলিলেন- 'আমি ইহাকে (মধু মিশ্রিত দুধকে) হারাম বলিতেছি না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে, তিনি তাহার শির উন্নত করেন। যে ব্যক্তি অহংকার করে, তিনি তাহাকে হেয় করেন। যে ব্যক্তি অপব্যয় হইতে বিরত থাকে, তিনি তাহাকে পরমুখাপেক্ষী করেন না। যে ব্যক্তি অপব্যয় করে, তিনি তাহাকে পরমুখাপেক্ষী করেন। আর যে ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করে, তিনি তাহাকে ভালবাসেন।"

একদা এক রোগাক্রান্ত ভিক্ষুক রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া কিছু প্রার্থনা করিল। তখন তিনি আহার করিতেছিলেন। হযরত (সা) তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া লইলেন। পীড়ার কারণে সকলেই ভিক্ষুকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহিল। কিন্তু হযরত (সা) তাহাকে স্বীয় পবিত্র উরুর উপর বসাইয়া লইলেন এবং বলিলেন- "কুরায়শ বংশীয় এক ব্যক্তি তৎপ্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। অনন্তর সে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- নবী ও বাদশাহ্ কিংবা নবী ও বান্দা, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি হইবে, পছন্দ করিয়া লইবার জন্য মহাপ্রভু আল্লাহ্ আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি উত্তর দিতে বিলম্ব করিলাম। ফেরেশতাদের মধ্যে আমার বন্ধু জিবরাঈল উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার দিকে তাকাইলাম। তিনি বলিলেন- 'বিনয় অবলম্বন করুন।' আমি আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলাম- 'আমি রাসূল ও বান্দা থাকিতে ইচ্ছা করি।'

হযরত মূসা আলায়হিস সালামের নিকট আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন- " যে ব্যক্তি আমার মহত্ত্বে বিনয়ী হয়, আমার বান্দাদের সহিত অহংকার করে না, আমাকে আন্তরিকভাবে ভয় করে, সমস্ত দিন আমার স্মরণে অতিবাহিত করে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় কুপ্রবৃত্তিসমূহ হইতে বিরত থাকে, আমি তাহার নামায কবুল করি।" রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "উদারতা পরহেযগারীর মধ্যে, বিনয়ে ভদ্রতা এবং ঐশ্বর্য (অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী না হওয়া) দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত আছে।" তিনি আরও বলেন- "পৃথিবীতে যে ব্যক্তি বিনয়ী, সেই সৌভাগ্যশালী এবং পরকালে সে উচ্চ আসন লাভ করিবে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে

লোকের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া দেয়, তাহাকে বেহেশতে স্থান দান করা হইবে। আর দুনিয়ার কলুষতা হইতে যাহার হৃদয় নির্মুক্ত, সেই পুণ্যবান এবং উহার বিনিময়ে সে আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) লাভ করিবে।" তিনি একদা সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্হুমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- " তোমাদের মধ্যে ঈমানের মাধুর্য পরিলক্ষিত হয় না কেন?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন- "ঈমানের মাধুর্য কি?" তিনি বলিলেন- "বিনয়।" তিনি অন্যত্র বলেন- "বিনয়ী লোকের সহিত নম্রতা অবলম্বন কর এবং অহংকারীর সহিত অহংকার কর, যেন অহংকারের প্রতি ঘৃণা ও অসম্মান প্রকাশ পায়।"

বিনয় সম্বন্ধে বুযুর্গদের উক্তি—হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন- "তোমরা উৎকৃষ্ট ইবাদতের প্রতি উদাসীন এবং ইহা (উৎকৃষ্ট ইবাদত) বিনয়।" হযরত ফুযাইল (র) বলেন, "হক কথা মানিয়া লওয়াকেই বিনয় বলে; যদিও ইহা কোন মূর্খ বা বালকের মুখ নিঃসৃতই হউক না কেন।" হযরত ইবনে মুবারক রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- "সাংসারিক ধনৈশ্বর্যে যে ব্যক্তি তোমা হইতে হীন, তাহার নিকট তুমি নিজকে তদপেক্ষা ছোট করিয়া দেখাও, তাহা হইলে সে মনে করিবে সাংসারিক শ্রেষ্ঠত্বের দরুন তুমি গৌরব অনুভব কর না। আবার সাংসারিক সম্পদ ও প্রতিপত্তিতে যে ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার নিকট তুমি নিজকে তদপেক্ষা বড় করিয়া দেখাও, তাহা হইলে সেও মনে করিবে যে, পার্থিব শ্রেষ্ঠত্বের দরুন তোমার নিকট তাহার কোন মর্যাদা নাই। এই প্রকার ব্যবহারকেই বিনয় বলে।" হযরত সাম্মাক রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি খলীফা হারুনুর রশীদকে বলিলেন- "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি এত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যে নম্রতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব অপেক্ষা অধিক ভদ্রতার পরিচায়ক।" খলীফা বলিলেন- "হে আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ যাহাকে ধন, সৌন্দর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করিয়াছেন, তিনি যদি ধন পর দুঃখ মোচনে ব্যয় করেন, প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করিয়া নম্রতা অবলম্বন করেন এবং তাহার সৌন্দর্যে যদি পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়, তবে আল্লাহ্ তাঁহার নাম স্বীয় বন্ধুগণের তালিকাতে লিখিয়া লন।" খলীফা এই বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করত নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন।

হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম রাজকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রত্যুষে ধনীদের সহিত উপবেশন করিতেন এবং তৎপর তিনি গরীবদের সহিত উপবেশন করিয়া বলিতেন- "একজন গরীব অপর গরীবদের সহিত উপবেশন করিল।" হযরত হাসান বসরী (র) বলেন- "গৃহ হইতে যে কেহই দৃষ্টিগোচর হউক না কেন, তাহাকে নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করাকেই বিনয় বলে।" হযরত মালিক ইব্নে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- 'কেহ যদি মসজিদের দ্বারদেশে থাকিয়া আহ্বান করে যে, তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বাহির হও, তবে আমি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে সর্বাগ্রে বাহির হইব।" হযরত ইব্নে মুবারক (র) ইহা শুনিয়া বলিলেন- "হযরত

মালিক (র) এইজন্যই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।" এক দরবেশ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে স্বপ্নে দেখিয়া নিবেদন করিলেন- "আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।" তিনি বলিলেন- "পরকালে সওয়াবের আশায় আমীরের পক্ষে ফকীরের নিকট বিনয়ী হওয়া কত ভাল। আবার আল্লাহ্র বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া ফকীরগণ যদি আমীরদের নিকট অহংকার প্রকাশ করে, তবে ইহা ততোধিক উৎকৃষ্ট।" হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে মুয়ায (র) বলেন- "উদার ব্যক্তি পুণ্যবান হইলে বিনয়ী হয়, কিন্তু কোন ইতর লোক পূণ্যবান হইলে সে অহংকারী হইয়া পড়ে।"

হযরত বায়েযীদ রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- "মানব যতক্ষণ অপরকে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্ঞান করিবে ততক্ষণ সে অহংকারী থাকিবে।" হযরত জুনায়দ রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি এক শুক্রবারে ওয়াযের সময় বলেন- "শেষ যমানায় সমাজের নিকৃষ্ট লোকই নেতা হইবে, হাদীস শরীফে এই উক্তি না থাকিলে আমি তোমাদের সম্মুখে ওয়ায করিতাম না।" তিনি অন্যত্র বলেন- "একত্ববাদীদের নিকট বিনয়ই অহংকার।" অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা হইতে নামিয়া আসাকে বিনয় বলে, আর নীচে নামার আবশ্যকতা দেখা দিলেই বুঝা যায় যে, সে নিজকে উচ্চমর্যাদার অধিকারী বলিয়া মনে করিত। প্রবল ঝড় উঠিলে বা মেঘ গর্জন করিলে হযরত আত্তাসী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি গর্ভবতী নারীর ন্যায় স্বীয় উদর আঁটিয়া ধরিয়া ঘুরাঘুরি করিতেন এব বলিতেন- "আমার পাপের দরুনই মানব জাতির উপর এই বিপদ অবতীর্ণ হইতেছে।' কয়েকজন লোক হযরত সালমান রাযিআল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া গর্ব করিতেছিল দেখিয়া তিনি বলিলেন- "আদিতে আমি একবিন্দু অপবিত্র পানি এবং পরিণামে মৃতদেহ। তৎপর আমাকে দাঁড়ি-পাল্লার নিকট লইয়া যাইয়া ওজন করা হইবে। আমার পূণ্যের পাল্লা ভারী হইলে আমি মহৎ। অন্যথায়, আমি হেয় ও নিকৃষ্ট।"

অহংকারের পরিচয় ও ইহার আপদসমূহ—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, অহংকার একটি নিতান্ত মন্দ স্বভাব। প্রতিটি স্বভাবই মানব হৃদয়ের একটি ভাব (এবং হৃদয়েই ইহা নিহিত থাকে)। কিন্তু অহংকারের প্রতিক্রিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। মানব নিজকে অপরলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করে এবং এইজন্য সে আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। যে পদার্থ তাহাকে স্ফীত করিয়া তোলে ইহাকেই অহংকার বলে। অহংকার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এইরূপ প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَّفْخَةِ الْكِبْرِ

"ইয়া আল্লাহ্, অহংকারের বায়ু হইতে রক্ষার জন্য আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" অহংকাররূপ বায়ু মানব হৃদয়ে উৎপন্ন হইলেই সে অপর লোককে

নিজ অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করে এবং তাহারা দৃষ্টিগোচর হইলে তাহাদিগকে স্বীয় দাসরূপে জ্ঞান করে, বরং অনেক সময় তাহাদিগকে স্বীয় দাসের উপযুক্ত বলিয়াও গণ্য করে না। সে তখন অপর লোককে বলে- "তোমার কি যোগ্যতা আছে যে, নিজকে আমার খেদমতের উপযোগী বলিয়া মনে করিতে পার?" যেমন যথেচ্ছাচারী বাদশাহ্ কাহাকেও তাহার আস্তানা চুম্বন করিতে দিতেও সম্মত হয় না এবং নিজকে তাহাদের সেবক বলিয়া মনে করে না, বরং অপরাপর বাদশাহকে মাত্র তাহার রাজপ্রাসাদে অভ্যর্থনা করে। ইহাই অহংকারের পরাকাষ্ঠা। মহাপ্রভু আল্লাহ্ও মানবকে স্বীয় দাসরূপে গ্রহণ করেন এবং তাহাদের বন্দেগী, সিজদা, সকল ইবাদত কবুল করিয়া থাকেন; কিন্তু সেইরূপ অহংকারী ব্যক্তির অহমিকা আল্লাহ্র অহমিকার সীমাও অতিক্রম করিয়াছে।

যাহার অহংকার তদপেক্ষা কম সে চলিবারকালে অগ্রে চলিতে চায়, উপবেশনের জন্য উচ্চ স্থান অন্বেষণ করে এবং সম্মানের প্রত্যাশী থাকে। তেমন ব্যক্তি অপরের উপদেশ গ্রহণ করে না, অপরকে উপদেশ দানকালে কঠোরতা অবলম্বন করে তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে গেলে সে ক্রুদ্ধ হয় এবং অপর লোক নয়নগোচর হইলে হিংস্র জন্তুর প্রতি যেরূপ ক্রোধের সঞ্চার হয় তাহার হৃদয়েও তদ্রূপ ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাস করা হইল- "ইয়া রাসুলাল্লাহ্, অহংকার কাহাকে বলে?" তিনি বলিলেন- "আল্লাহ্র নিকট গ্রীবা নত না করা এবং অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখা।" এই দুইটি স্বভাব আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে এক বড় অন্তরালের সৃষ্টি করে এবং উহা হইতে সমস্ত কুস্বভাব উৎপন্ন হয় ও মানব সৎস্বভাব অর্জনে বঞ্চিত থাকে।

অহংকারের নিদর্শন—যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুত্ব, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে তাহার অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে- (১) সে নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে অপর মুসলমানের জন্য তাহা কখনই পছন্দ করিতে পারে না। ইহা ঈমানের লক্ষণ নহে। (২) কাহারও সহিত সে নম্র ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা পরহেযগারদের স্বভাব নহে। (৩) সে দ্বেষ, ঈর্ষা ও ক্রোধকে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হয়। (৪) সে স্বীয় রসনাকে গীবত হইতে বাঁচাইতে সমর্থ হয় না। (৫) সে নিজ হৃদয়কে কলুষমুক্ত রাখিতে পারে না। কারণ, অপর লোকে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন না করিলে সে অবশ্যই কিছু না কিছু ভাবিয়া থাকিবে। অন্ততপক্ষে, সে দিবা-রাত্র আত্মপূজা ও স্বীয়কথা সমুন্নত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। আর (৬) নিজের কাজ অপরের নিকট বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সে প্রবঞ্চনা, কপটতা ও মিথ্যা হইতে অব্যাহতি পায় না।

বাস্তবিক কথা এই যে, যে পর্যন্ত মানুষ আত্মবিস্মৃত না হইবে সে পর্যন্ত সে ইসলামের সামান্য গন্ধটুকুও পাইবে না, এমনকি পার্থিব শান্তিও সে লাভ করিতে

পারিবে না। এক বুযুর্গের উক্তি এই যে, তুমি যদি বেহেশ্তের সুগন্ধ পাইতে চাও তবে নিজকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে কর। দুইজন অহংকারী লোক পরস্পর মিলিত হইলে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের উভয়ের মনে মধ্যে যেরূপ মলমূত্র ও দুর্গন্ধ জমা হইয়া রহিয়াছে তদ্রূপ কোন ময়লার স্তূপেও নাই। কারণ, অহংকারীদের অভ্যন্তরীণ আকৃতি কুকুরের ন্যায় এবং তাহাদের বহিরাবরণ কুলটা রমণীদের ন্যায়। মুসলমানগণ পরস্পর মেলামেশা করিলে তাহাদের মধ্যে যে ভালবাসার সৃষ্টি হয়, অহংকারীদের মধ্যে তদ্রূপ হয় না।

শান্তি লাভের উপায়—প্রিয় পাঠক, তুমি যখন অপরের জন্য যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে পার এবং তোমার আপাদমস্তক তাহার প্রতি ভক্তিভাবে অবনত হইয়া থাকে যেন দ্বিত্বভাব বিদূরিত হইয়া একাত্মবোধ জাগিয়া উঠে, যেন সেই আছে, তুমি নাই, বা সে তোমাতে বিলীন হইয়া যায় এবং তুমিই অবশিষ্ট থাক, অথবা তোমরাই উভয়ই আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ করত স্বীয় অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে পার, কেবল তখনই তুমি প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাই মানবের চরমোৎকর্ষ ও তদ্রূপ অন্তরঙ্গতা হইতেই পূর্ণ শান্তি লাভ হইয়া থাকে। মোটকথা, এই যে, দ্বিত্বভাব বিদূরিত না হইলে শান্তি লাভ হইবে না। কারণ, অন্তরঙ্গতা ও খেদমত (সেবা) হইতেই শান্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। উপরে যাহা বর্ণিত হইল বাস্তবপক্ষে ঐ সকলই অহংকারের আপদ।

অহংকারের শ্রেণীভেদ—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, কোন কোন অহংকার নিতান্ত জঘন্য ও নিন্দনীয়। যাহার উপর অহংকার প্রকাশ করা হয় তাহার গুরুত্ব-লঘুত্বের তারতম্যানুসারে অহংকারের গুরুত্ব-লঘুত্বেও তারতম্য হইয়া থাকে। অহংকার তিন প্রকারেই হইতে পারে- আল্লাহ্র প্রতি, তদীয় রাসূল (সা) বা অপর লোকের প্রতি।

প্রথম শ্রেণীর অহংকার—নমরূদ, ফিরাউন, শয়তান এবং অপরাপর যাহারা স্বয়ং আল্লাহ্ বলিয়া দাবী করিয়াছে ও মহাপ্রভু আল্লাহ্র ইবাদত করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছে, তাহাদের অহংকার এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ বলেন-

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ

"মসীহ কখনও আল্লাহ্র বান্দা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করিবেন না এবং না নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশ্তাগণ।" (সূরা নিসা, শেষ রুকু ৬ পারা)।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অহংকার—রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহংকার এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন কুরায়শ বংশীয় কাফিরগণ অহংকারে বলিত- "আমাদের মত মানুষের নিকট আমরা মস্তক অবনত করিব না। আচ্ছা,

আল্লাহ্ কেন ফেরেশতাকে (রাসূল করিয়া) আমাদের নিকট পাঠাইলেন না? একজন য়াতীমকে কেন পাঠাইলেন?" তাহাদের উক্তি উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ বলেন–

وَقَالُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

"আর তাহারা (কুরায়শগণ) বলিল—এই দুই নগরের (মক্কা ও তায়িফের) কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর কুরআন নাযিল করা হয় নাই কেন?" (সূরা যুখরুফ, ৩ রুকু, ২৫ পারা)। এইরূপ অহংকারী কাফিরগণ দুই দলে বিভক্ত ছিল। এক দল অহংকারে সমাচ্ছন্ন রহিল এবং ইহাই তাহাদের অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইল। ফলে, তাহারা গভীরভাবে মনোনিবেশ ব্যতিরেকে না বুঝিয়াই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নবী বলিয়া অস্বীকার করিল। যেমন আল্লাহ্ বলেন –

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"যাহারা দুনিয়াতে অযথা অহংকার করে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে নিজের নিদর্শনাবলী হইতে ফিরাইয়া দিব।" অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবে না (সূরা আরাফ, ১৭ রুকূ, ৯ পারা)। কাফিরদের অপর দল হযরতকে (সা) নবী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু অহংকারবশত তাহারা স্বীকার করিতে পারে নাই। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا

"তাহাদের অন্তঃকরণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে ও অহংকার করিয়া তাহারা অস্বীকার করিল" (সূরা নহল, ১ রুকু, ১৯ পারা)।

তৃতীয় শ্রেণীর অহংকার–অপর লোকের প্রতি অহংকার। তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা, তাহাদের সত্য কথাও গ্রহণ না করা, নিজকে অপর লোক অপেক্ষা ভাল এবং শ্রেষ্ঠ মনে করা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর অহংকার প্রথম দুই শ্রেণী অপেক্ষা লঘু হইলেও দুইটি কারণে ইহা নিতান্ত গুরুতর।

প্রথম কারণ—আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা শোভা পায় না এবং ইহা একমাত্র আল্লাহ্রই একক গুণ। মানুষ নিতান্ত দুর্বল ও নিঃসহায় এবং তাহার হস্তে কোন ক্ষমতাই নাই। এমতাবস্থায়, তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা ও নিজকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করা কিরূপে শোভা পাইতে পারে ? মানুষ নিজকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলে মহাপ্রভু আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা হয়। ইহা কোন দাসের পক্ষে বাদশাহ্র মুকুট পরিধানপূর্বক সিংহাসনে উপবেশন করার সমতুল্য। ভাবিয়া দেখ, তদ্রূপ দাস কিরূপ ভয়ানক শাস্তির উপযোগী হইবে! এইজন্যই হাদীসে উক্ত হইয়াছে, আল্লাহ্ বলেন–

اَلْعَظْمَةُ اِزَارِىْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ فِيْهِمَا قَصَمْتُهٗ

"শ্রেষ্ঠত্ব ও আত্মগর্ব একমাত্র আমার নিজস্ব গুণ। যে ব্যক্তি উহা লইয়া আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে আমি তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিব।" অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে অহংকার শোভন নহে। অনন্তর যে ব্যক্তি অপর লোকের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে সে যেন আল্লাহ্র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিল। তাহা হইলে একমাত্র বাদশাহ্র জন্য যাহা শোভা পায় তদ্রূপ কার্যের আদেশ যেন দাসকে দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় কারণ—অহংকার অপরের হক কথাও গ্রহণ করিতে দেয় না। অহংকারী ব্যক্তি অপরের সহিত ধর্ম বিষয় লইয়া ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়। অপরে সত্য কথা বলিলেও সে অহংকারবশত ইহা অস্বীকার করে। ইহাই কাফির ও মুনাফিকদের স্বভাব; যেমন আল্লাহ্ বলেন–

لاَ تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

"(কাফিরগণ বলিয়াছিল) তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না; বরং ইহা পাঠকালে হট্টগোল কর। তাহা হইলে (তোমরা মুসলমানদের উপর) জয়ী হইবে' (সূরা হা-মীম সিজদা, ৪ রুকূ, ২৪ পারা)। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

"আর যখন তাহাকে বলা হয়– আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন অহংকার তাহাকে পাপ কার্য জেদ ধরিতে প্রবৃত্ত করে" (সূরা বাকারা, ২৫ রুকূ, ২ পারা)। হযরত ইব্ন মাসঊদ রাযিআল্লাহু আন্হু বলেন– "কোন ব্যক্তিকে এই কথা বলিলে যে, আল্লাহ্কে ভয় করে, সে যদি বলে– 'তুমি নিজের কাজ কর, তবে ইহা মহাপাপ।"

অহংকারের অনিষ্টকারিতা—একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বাম হস্তে আহার গ্রহণ করিতে দেখিয়া ডান হস্তে আহার করিতে বলিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল– "আমি (ডান হস্তে) আহার করিতে পারি না।" হযরত (সা) বুঝিতে পারিলেন যে, অহংকারের বশীভূত হইয়াই সে এইরূপ উত্তর দিয়াছে। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি কি ডান হস্তে আহার করিতে পার না?" তৎক্ষণাৎ দেখা গেল যে, সেই ব্যক্তি হাত অবশ হইয়া গিয়াছে। কুরআন শরীফে শয়তানের কাহিনীটি আল্লাহ্ গল্পস্বরূপ বর্ণনা করেন নাই। বরং অহংকার লোকের কি ভীষণ ক্ষতি সাধন করিতে পারে, কেবল ইহা দেখাইবার জন্যই বলিয়াছেন–

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

"আমি তাহা (আদম) অপেক্ষা উত্তম। তুমি আমাকের অগ্নি দ্বারা সৃজন করিয়াছে, আর তাহাকে (আদমকে) মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছ" (সূরা আরাফ, ২

রুকু, ৮ পারা)। অহংকার শয়তানকে এতটুকু বাড়াইয়া দিল যে, শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘন করিল, হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সিজদা করিল না এবং ফলে চির অভিশপ্ত হইয়া রহিল।

অহংকারের কারণসমূহ ও উহা হইতে অব্যাহতির উপায়

অহংকারের কারণ—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, অহংকারী ব্যক্তিমাত্রই ধারণা করে যে, তাহার মধ্যে এমন বিশেষ গুণ আছে যাহা অপরের মধ্যে নাই। এইরূপ গুণের উপলব্ধি হইতেই অহংকার জন্মিয়া থাকে এবং ইহার সাতটি কারণ রহিয়াছে।

প্রথম কারণ—বিদ্যা। বিদ্বান ব্যক্তি নিজকে জ্ঞানে বিভূষিত দেখিয়া তাহার তুলনায় অপরকে পশু তুল্য বিবেচনা করে। এই অহংকার তৎপর তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। ইহার নিদর্শন এই যে, সে তখন সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ পাইবার জন্য সে আশ্চর্য বোধ করে। কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বা কাহারও দাওয়াত কবুল করিলে সে তৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিল বলিয়া প্রকাশ করে। এইরূপ অহংকারী বিদ্বান ব্যক্তি স্বীয় ইলম দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। পরকালের কার্যে সে আল্লাহ্‌র নিকট নিজকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করে এবং স্বীয় পরিত্রাণের প্রবল আশা পোষণ করে, কিন্তু অপর লোকের জন্য সে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলে– "প্রত্যেকেই আমার উপদেশ ও দোয়ার মুখাপেক্ষী। আমার কারণেই তাহারা দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে।" এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اٰفَةُ الْعِلْمِ الْخُيَلَاءُ

অর্থাৎ "নিজে নিজকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা ইলমের আপদ।" তদ্রূপ বিদ্বানকে আলিম না বলিয়া জাহিল বলা সঙ্গত।

প্রকৃত আলিমের অবস্থা– বাস্তবিকপক্ষে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত আলিম যাঁহার হৃদয়ে পরকালের ভয় সর্বদা জাগরূক থাকে এবং যিনি 'সিরাতুল মুস্তাকীম' নামক সরল সোজা পথের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত আছেন। এমন ব্যক্তি সর্বদাই তদ্রূপ উক্তি হইতে বিপদের কারণ হইয়া পড়ে, এই ভাবনায় কখনও তিনি আত্মগর্ব ও অহংকারে প্রবৃত্ত হন না। যেমন হযরত আবূ দারদা রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পায় বিপদও ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বিদ্বান ব্যক্তির অহংকারের কারণ– দ্বিবিধ কারণে বিদ্বান ব্যক্তির হৃদয়ে অহংকার বৃদ্ধি পায়। প্রথম – ধর্মবিদ্যা শিক্ষা না করা। ধর্মবিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। ইহা শিক্ষা করিলে মানব আত্মজ্ঞান লাভ করে, ধর্মপথের সঙ্কটসমূহ এবং আল্লাহ্‌র ভয়জনিত বেদনা বৃদ্ধি পায়, স্বীয় অসহায়তা প্রকাশ পায় এবং দর্পচূর্ণ হইয়া যায়।

কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ, ভাষাজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র শিক্ষা করিলে কেবল অহংকারই বর্ধিত হইয়া থাকে। ইলমে ফত্‌ওয়া অর্থাৎ ধর্মব্যবস্থা জ্ঞান ধর্মবিদ্যার প্রায় সমতুল্য। ইলমে ফত্‌ওয়া মানবের দোষসমূহ সংশোধন করে। তথাপি ইহা সাংসারিক বিদ্যার অন্তর্গত, যদিও ধর্মক্ষেত্রে ইহার আবশ্যকতা আছে। এই বিদ্যা মানব হৃদয়ে পরকালের ভয় জন্মাইয়া দিতে পারে না। বরং অন্য ইলম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র ইলমে-ফত্‌ওয়াকে যথেষ্ট মনে করিলে হৃদয় মলিন হইয়া পড়ে এবং অহংকার প্রবল হইয়া উঠে। কেবল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারেন।

প্রিয় পাঠক, অপরিপক্ক আলিমগণের দুরবস্থার প্রতি অবলোকন কর। আর আত্মশুদ্ধিজ্ঞান বিবর্জিত বক্তাদের জ্ঞান, ছন্দবিন্যাস, নিরর্থক বাক্য, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে হর্ষোদ্দীপক সুললিত বচন এবং অন্য মযহাবের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার প্রতিও মনোনিবেশ কর। সাধারণ লোকে শুনিয়া যেন তদ্রূপ বাহুল্য বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে, এজন্যই তাহারা মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করিয়া বেড়ায়। উহাতে লোকের মনে অহংকার, ঈর্ষা, শত্রুতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বীজ রোপিত হয়। উহাতে মানবের অক্ষমতার উপলব্ধি ও ধর্মকার্যে তাহার অকপটতা বৃদ্ধি পায় না বরং আত্মগর্ব ও অহংকার জন্মে মাত্র।

দ্বিতীয়—ধর্মজ্ঞানের উদ্দেশ্য পরিবর্তন। কেহ কেহ হয়ত ধর্ম বিষয়ে কল্যাণকর বিদ্যা, যেমন– তাফসীর, হাদীস, বুযুর্গদের জীবনচরিত্র পাঠ এবং এই গ্রন্থ ও ইয়াহ্‌ইয়াউল উলুমে বর্ণিত বিদ্যাতুল্য ইল্‌ম অর্জন করে। কিন্তু তথাপি তাহারা অহংকারী হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, তাহাদের হৃদয়ই কলুষিত এবং তাহাদের স্বভাবও মন্দ। লোকের নিকট বর্ণনা করত বাহাদুরী প্রকাশ করাই তাহাদের বিদ্যার্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এতদ্ব্যতীত ইলমা অনুযায়ী কার্য করা তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে না। সুতরাং তাহাদের অর্জিত ইলমও তাহাদের আন্তরিক অবস্থার অনুরূপই থাকে, যেমন জোলাপের অগ্রে যে ঔষধ পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, ইহা পাকস্থলীর প্রকৃতিই গ্রহণ করে। আবার দেখ, বৃষ্টির পানি আকাশ হইতে পড়িবার কালে একইরূপ নির্মল ও পবিত্র থাকে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পর ইহা যে বৃক্ষলতার মূলে প্রবেশ করে ইহারই গুণপ্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ গুণের মাত্রাই বৃদ্ধি করিয়া দেয়। যে বৃক্ষের স্বাদ তিক্ত, ইহার তিক্ততা বৃদ্ধি করে এবং যে বৃক্ষের স্বাদ মিষ্ট, ইহার মিষ্টতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

হযরত আব্বাস রাযিআল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "কোন কোন লোকে কুরআন শরীফ পাঠ করে, কিন্তু ইহা তাহাদের কণ্ঠ-নালীর নিম্নগামী হয় না এবং তাহারা দাবী করে যে, তাহাদের ন্যায় কুরআন পাঠকারী আর কেহই নাই এবং তাহারা যাহা জানে তাহা অপর কেহই জানে না।" তৎপর তিনি সাহাবাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত আবার

বলিলেন– "এইরূপ লোক তোমাদের মধ্যেই হইবে, অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে হইবে এবং সেইরূপ লোক সকলেই দোযখী।" হযরত ওমর রাযিআল্লাহু আন্হু বলেন– "হে লোকগণ, তোমরা অহংকারী আলিমদের দলভুক্ত হইও না। অন্যথায় মুর্খতার প্রতিকূলে ইলম তোমাদের কোন উপকারই করিবে না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিনয় অবলম্বনের আদেশ প্রদান করিয়া আল্লাহ্ বলেন–

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আর আপনি স্বীয় বাহু সেই মু'মিন ব্যক্তির জন্য অবনত করুন, যে আপনার অনুসরণ করে" (সূরা শু'আরা, ১১ রুকূ, ১৯ পারা)। এই কারণেই সাহাবাগণ (রা) সর্বদা শঙ্কিত চিত্তে অহংকার হইতে বিরত থাকিতেন।

হযরত হুযায়ফা রাযিআল্লাহু আন্হু একবার নামাযের ইমামতি করিলেন। নামাযান্তে তিনি মুসল্লিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– "আপনারা অপর কাহাকেও ইমাম নিযুক্ত করিয়া লউন, কেননা (ইমামতি করিলে) আমার মনে এই ভাব আসে যে, আমি আপনাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" তাঁহার মত ব্যক্তিও যখন অহংকারের অমূলক চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই, এমতাবস্থায়, অপর লোকে কিরূপে ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবে? হযরত হুযায়ফার (রা) ন্যায় আলিমই-বা এইকালে কোথায় পাওয়া যাইবে ? বরং অহংকারকে নিন্দনীয় বলিয়া জানে এবং ইহা পরিহার করা উচিত মনে করে, এমন আলিমই আজকাল নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, বর্তমানে সাধারণত আলিমগণ এ বিষয়ে উদাসীন হইয়া রহিয়াছে এবং তাহারা অহংকার করিয়া গর্ববোধ করে। আর তাহারা বলে– "অমুক ব্যক্তির কোন উপযুক্ততা আছে বলিয়া আমি মনে করি না, অমুককে অপদার্থ বলিয়া জানি এবং তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও আমি পছন্দ করি না।" এই প্রকার অহংকারপূর্ণ বহু উক্তি তাহারা করিয়া থাকে। অহংকারের অপকারিতা সম্বন্ধে অবগত আছে এবং নিজে অহংকারী নহে এমন আলিম বর্তমানকালে অতি বিরল। অহংকারশূন্য আলিমের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ইবাদতের মধ্যে গণ্য এবং তাহার জন্য জগতের আর সকলকেই পরিত্যাগ করা যায়।

শেষ যুগের অল্প কার্যে অধিক পুণ্য—হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে– "এমন এক সময় আসিবে যখন লোকে তোমাদের এক-দশমাংশ ইবাদত করিয়াও পরিত্রাণ পাইবে।" এই আশ্বাস বাণী হাদীসে না থাকিলে বর্তমানকালে লোকের পক্ষে নিরাশ হইয়া পড়ার আশংকাই ছিল। কিন্তু অধুনা সামান্য সৎকার্যেই অধিক পুণ্য লাভের আশা আছে, কেননা, ধর্ম-কর্মে এমন কোন সহায়ক নাই, খাঁটি ধর্মও বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ধর্মপথে চলিতে চাহিলে সাধারণত তাহাকে একাকীই চলিতে হয়, কেহই

তাহার সাহায্যকারী হয় না। সুতরাং তাহাকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হয়। এমতাবস্থায়, অল্প কার্যেই পরিশ্রান্ত হইয়া সে পরিতুষ্ট থাকে।

দ্বিতীয় কারণ—সংসার-বিরাগ ও ইবাদতের দরুন অহংকার। ইহার কারণ এই যে, অধুনা আবিদ, সংসার-বিরাগী সূফী দরবেশগণও অহংকারশূণ্য নহে। এমনকি তাহারা অপর লোকের পক্ষে তাহাদের দর্শনলাভ পুণ্যজনক বলিয়া মনে করে। ইবাদত করিয়া যেন তাহারা অপর লোকের উপকার করিতেছে, এইরূপ ধারণা করে। তাহারা আরও মনে করে যে, অপর লোক আল্লাহ্‌র শাস্তিতে ধ্বংস হইবে এবং একমাত্র তাহারাই মুক্তি লাভ করিবে। তাহাদিগকে কেহ কোন কষ্ট দিলে অকস্মাৎ সে যদি কোন কষ্টে নিপতিত হয়, তবে ইহাকে তাহারা নিজেদের কারামত (অলৌকিক কার্য) বলিয়া মনে করে এবং বলে– "আমাদের সহিত যে অসদ্ব্যবহার করে তাহার পরিণাম এইরূপ হইয়া থাকে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি বলে যে, অপর লোক বিনষ্ট হইল, সে নিজেই বিনষ্ট হইবে।" কারণ, সেই ব্যক্তি অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া নিজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। তিনি আরও বলেন,– "কোনও মুসলমান ভ্রাতাকে তুচ্ছজ্ঞান করা মহাপাপ! যে আবিদ নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অপর মুসলমানকে তুচ্ছজ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি, আর যে ব্যক্তি অপর মুসলমানকে উৎকৃষ্ট জানিয়া তাহার নিকট হইতে পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনে ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহ্‌র জন্য তাহাকে ভালবাসে, এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে যে, মহাপ্রভু আল্লাহ্ এইরূপ অহংকারী আবিদকে ইবাদতের পুণ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে দরবেশীর উন্নত মর্যাদা প্রদান করিবেন।

কাহিনী—বনী ইসরাঈল বংশে একজন খুবই দীনদার আবিদ ছিল, আবার অপর এমন এক দুরাচার পাপিষ্ঠও ছিল যে, তাহার কোন জোড়া ছিল না। একবার দেখা গেল যে, ঐ আবিদ উপবেশন করিয়া রহিয়াছে এবং এক খণ্ড মেঘ তাহার মস্তকোপরি ছায়া প্রদান করিতেছে। ইহা দেখিয়া পাপিষ্ঠ ব্যক্তি মনে করিল, ঐ আবিদের সঙ্গে উপবেশন করিলে তাঁহার বরকতে আল্লাহ্ হয়ত আমাকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন।তৎপর সে যাইয়া আবিদের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। আবিদ তাহাকে বলিল– "রে নরাধম, তোর মত পাপিষ্ঠ দুনিয়াতে আর কে আছে ? কোন্ সাহসে তুই আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলি ? শীঘ্র দূর হ'।" ইহাতে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি উঠিয়া চলিল; কিন্তু উক্ত মেঘ খণ্ডটিও তাহার মস্তকোপরি ছায়া প্রদান করিতে করিতে যাইতে লাগিল। তৎকালীন নবী আলায়হিস সালামের প্রতি আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন– "সেই পাপিষ্ঠ ও আবিদ উভয়কে নতুনভাবে ইবাদতকার্য আরম্ভ করিতে বলিয়া দাও। কারণ, সুধারণার ফলে পাপীর পাপ মোচন হইয়াছে এবং অহংকারের দোষে আবিদের ইবাদতসমূহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

জনৈক ব্যক্তি এক দরবেশের গ্রীবাদেশে স্বীয় পদ স্থাপন করিল। দরবেশ সেই ব্যক্তিকে বলিল– "পা সরাইয়া লও। অন্যথায় আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি তোমার উপর দয়া করিবেন না।" তদানীন্তন নবী আলায়হিস সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল– সেই দরবেশকে বলিয়া দাও, সে আমার শপথ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে নিষেধ করিতেছে, বরং আমি সেই দরবেশকেই ক্ষমা করিব না।"

সচরাচর দেখা যায়, কেহ কোন দরবেশকে কষ্ট দিলে তিনি মনে করেন, কষ্টদাতা আল্লাহ্‌র বরকত হইতে বঞ্চিত থাকিবে এবং তদ্রূপ স্থলে হয়ত দরবেশ এমন উক্তিও করেন– "যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে অতি সত্বর স্বীয় ধৃষ্টতার শাস্তি ভোগ করিবে।" আবার ঘটনাক্রমে তাহার উপর কোন বিপদ আসিলে দরবেশ বলে– "দেখিলে, তাহার কি হইয়াছে? আমার অলৌকিক ক্ষমতাবলেই ইহা ঘটিয়াছে।" অথচ এই নির্বোধ দরবেশ ভাবিয়া দেখে না যে, বহু কাফির রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্ ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে, তাহাদের অনেকেই তিনি ইসলামরূপ অমূল্যরত্নে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ রক্ষা করুন! ঐ নির্বোধ দরবেশ কি নিজকে নবী সম্রাট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে যে, আল্লাহ্ তাহার নিমিত্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন ? মুর্খ দরবেশ এইরূপেই হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের উপর কোন বিপদ আসিলে বুদ্ধিমান দরবেশ মনে করেন যে, তাঁহার পাপ ও কপটতার দরুনই এই বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর জীবন অতি পবিত্র ও তাঁহার নিয়ত নিতান্ত বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি হযরত হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন– "দেখুন ত, আমাতে কপটতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা ?"

মোটের উপর কথা এই যে, খাঁটি মুসলমানগণ পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে। আর মুর্খ দরবেশগণ প্রকাশ্যে ইবাদত করে বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় অহংকার ও গর্বে অলুষিত থাকে; অথচ এইজন্য তাহারা বিন্দুমাত্রও ভয় করে না। বাস্তবিক পক্ষে যে ব্যক্তি নিজকে অপর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে মুর্খতার কারণে সে স্বীয় ইবাদত নষ্ট করিয়া ফেলে, কেননা মুর্খতা অপেক্ষা বড় পাপ আর নাই। সাহাবাগণ (রা) একদা জনৈক ব্যক্তির প্রশংসা করিতেছিলেন। এমন সময় ঘটনাক্রমে সেই ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন– "এই ব্যক্তিরই আমরা প্রশংসা করিতেছিলাম।" হযরত (সা) বলিলেন– "এই ব্যক্তির মধ্যে কপটতার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছে।" সমবেত সাহাবাগণ (রা) ইহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সেই ব্যক্তি হযরতের (সা) নিকটবর্তী হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "ওহে, সত্য করিয়া বলত, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমিই সর্বোকৃষ্ট, এই

ধারণা কি তোমার হৃদয়ে উদিত হয় ?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল– "হ্যাঁ।" হযরত (সা) নবুওয়াতের আলোকে তাহার ভিতরের অপবিত্রতা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং ইহাকে কপটতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। দরবেশ ও আলিমদের মধ্যে অহংকারই অতি বড় মারাত্মক আপদ।

অহংকারী দরবেশ ও আলিমের শ্রেণীবিভাগ—অহংকার বিষয়ে দরবেশ ও আলিমদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণী– এই শ্রেণীর লোকগণ নিজ নিজ হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অহংকারশূন্য করিতে অক্ষম হইলে কষ্টেসৃষ্টে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে। যে লোক নিজকে অপর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না, তাহারা তদ্রূপ লোকের ন্যায়ই আচরণ করিয়া থাকে। বাক্যে ও কার্যে কোন প্রকারেই তাহাদের অহংকার প্রকাশ পায় না। এই শ্রেণীর লোকেরা অহংকাররূপ বৃক্ষ স্ব স্ব হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিতে না পারিলেও ইহার শাখা-প্রশাখাসমূহ একেবারে কাটিয়া ফেলিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—অন্তরের গুপ্ত অহংকার লুকাইবার উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের রসনা সংযত রাখে এবং বলে– "আমি নিজকে সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করি।" কিন্তু তাহাদের ব্যবহার ও আচরণে এমন সব বিষয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহাতে তাহাদের অন্তরস্থ গুপ্ত অহংকারের প্রমাণ পাওয়া যায়; যেমন– সভা-সমিতিতে গমন করিলে সভাপতির আসনের জন্য লালায়িত থাকে এবং পথ চলিবার কালে অগ্রে অগ্রে চলে। এই শ্রেণীর আলিম নিজদিগকে লাজুক প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় মস্তক একদিকে ঝুঁকাইয়া রাখে। আবার এই শ্রেণীর দরবেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাখে, যেন মনে হয় লোকের উপর তাহারা রাগান্বিত। এইরূপ নির্বোধ দরবেশ ও আলিমগণ বুঝিতে পারে না যে, মাথা ঝুঁকানো এবং ভ্রূকুঞ্চিত করা ইলম ও আমল নহে। বরং হৃদয়ের সহিত ইলম ও আমলের সম্পর্ক। বিনয়, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিখিল বিশ্বে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আলিম এবং চূড়ান্ত অধিক প্রসন্নতা ও বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সকলের সহিতই মেলামেশা করিতেন।

মহাপ্রভু আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলেন–

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আর আপনি স্বীয় বাহুকে সেই মু'মিন ব্যক্তির জন্য অবনত করুন, যে আপনার অনুসরণ করে।" (সূরা শুয়ারা, ১১ রুকূ, ১৯ পারা।) আল্লাহ্ আরও বলেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ -

"অনন্তর আল্লাহ্‌রই করুণার দরুন আপনি তাহাদের সহিত কোমল হৃদয় রহিয়াছেন। আর আপনি যদি কর্কশ ও কঠোর স্বভাবী হইতেন তবে তাহরা আপনার পার্শ্ব হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত।" (সূরা আল ইমরান, ১৭ রুকূ, ৪ পারা)।

তৃতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর দরবেশ ও আলিম বাক্যে অহংকার প্রকাশ করে এবং নিজেদের বাহাদুরী অপরকে শুনাইয়া আত্মগর্ব অনুভব করে। দরবেশগণের উন্নত অবস্থা ও অলৌকিক ক্ষমতা লাভ না করিয়াও তাহারা উহার অধিকারী হইয়াছে বলিয়া দাবী করে। এইরূপ দরবেশ ত বলিয়া থাকে– "অমুক ব্যক্তির কি গুণ আছে ? তাহার ইবাদতই-বা কতটুকু ? আমি সারা বৎসর নিরবচ্ছিন্ন রোযা রাখি, সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া নামায পড়ি এবং প্রত্যহ কুরআন শরীফ খতম করি। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অমুক ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়াছিল। তাহার ধন ও সন্তান-সন্ততি সর্বস্ব বিনাশ হইয়াছে।" এই শ্রেণীর দরবেশগণ ঝগড়া-বিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপর লোককে তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে দেখিলে তাহারা এত দীর্ঘ নামায পড়ে যাহাতে অন্য লোকেরা অপারগ হইয়া হার মানিয়া যায়। এইরূপ অহংকারী দরবেশগণ রোযা রাখিলে ইফতারের সময় হওয়া সত্ত্বেও আহারে অযথা বহু বিলম্ব করিয়া থাকে।

তদ্রূপ অহংকারী আলিম বলিয়া থাকে– "আমি এত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি যে, অমুক ব্যক্তি আমার তুলনায় কিছুই জানে না। সে ত কত নগণ্য। তাহার উস্তাদ-বা কি জানে ?" এমন অহংকারী আলিম নিজের মত ভুল হইলেও প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধ পরাজিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। দুর্বল ও ছন্দময় বাক্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুনাইয়া বক্তৃতাবলে অপর লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিমিত্ত তাহারা দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত থাকে। কখন কখন তাহারা আবার বিরল ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ও হাদীস-বাক্য মুখস্থ করিয়া লয়, যাহাতে লোকসমক্ষে নিজেদের উৎকর্ষ ও অপরের জ্ঞানের স্বল্পতা প্রকাশ করিতে পারে। বর্তমানকালে কোন্ আলিম আর কোন্ দরবেশ একেবারে অহংকারশূণ্য ? অল্প-বিস্তর সকলের মধ্যে অহংকার রহিয়াছে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যাহার হৃদয়ে রেণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম।" যে ব্যক্তি এই হাদীস-বাক্য বিশ্বাস করিয়াছে, সে সর্বদা ভয়ে ভীত, ব্যথিত ও অহংকার হইতে বিরত থাকিবে। আর তখন সে আল্লাহ্‌র এই বাণীও সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবে, আল্লাহ্ বলেন– "হে মানব, তুমি তোমার দৃষ্টিতে হেয় হইলে আমার নিকট প্রচুর সম্মান পাইবে। আর তুমি নিজকে সম্মানী বলিয়া মনে করিলে আমার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ হইবে।" যাহার ধর্ম সম্বন্ধে এতটুকু জ্ঞান নাই তাহাকে আলিম না বলিয়া জাহিল (মূর্খ) বলাই সঙ্গত।

অহংকারের তৃতীয় কারণ—কৌলিন্য। উচ্চ বংশসম্ভূত বলিয়া লোকে অহংকার করিয়া থাকে। উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা অপর পরহেযগার ও আলিম

ব্যক্তিগণকেও নিজেদের দাসানুদাস বলিয়া মনে করে। তাহারা অহংকার বাহিরে প্রকাশ না করিলেও ইহা তাহাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। ক্রোধের সময় তাহারা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে এবং তখন বাক্যে ও কার্যে তাহাদের অহংকার প্রকাশ পাইয়া থাকে। এমতাবস্থায়, তাহারা অপরকে সম্বোধন করিয়া বলে– "কোন সাহসে তুমি আমার সহিত কথা বলিতে আসিলে ? তোমার অবস্থা সম্বন্ধে কি তুমি অবগত নও ?" অহংকারের বশবর্তী হইয়া তাহারা অপর লোককে এবং বিধ আরও বহু কথা বলিয়া থাকে। হযরত আবু যর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "একদা এক ব্যক্তির সহিত ঝগড়াকালে আমি তাহাকে বলিলাম– "হে হাব্‌শী সন্তান!" (ইহা শুনিয়া) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– 'হে আবু যর, অপ্রকৃতিস্থ হইও না, কেননা কৃষ্ণাঙ্গের উপর গৌরাঙ্গের কোন ফযীলত (মাহাত্ম্য) নাই।" হযরত আবু যর রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন– '(ইহা শুনিয়া) আমি ভূতলশায়ী হইলাম এবং যাহার সহিত আমি ঝগড়া করিয়াছিলাম তাহাকে বলিলাম – 'তোমার পাখানি আমার মুখের উপর স্থাপন কর।"

প্রিয় পাঠক, অনুধাবন কর, তাঁহার বাক্য অহংকারসূচক ছিল বুঝিতে পারিয়া ইহা বিনাশের নিমিত্ত তিনি কতটুকু বিনয়াবনত হইয়াছিলেন।

দুইজন লোক একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে গর্ব করিতেছিল। একজন অপর জনকে বলিল– "আমি অমুকের পুত্র অমুক, তুমি কে?" ইহা শুনিয়া হযরত (সা) বলিলেন– "ঠিক এমনভাবে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সম্মুখে দুই ব্যক্তি গর্ব করিয়াছিল। তাহাদের একজন বলিল– 'আমি অমুকের পুত্র অমুক।' এইরূপে সে তাহারা কালের ঊর্ধ্বতন নয় পুরুষের নাম উল্লেখ করিল। হযরত মূসা আলায়হিস সাল্লামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল –"ঐ ব্যক্তিকে বলিয়া দাও, উক্ত নয় জন দোযখে গিয়াছে এবং তুমি তাহাদের দশম ব্যক্তি।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যাহারা দোযখের অগ্নিতে জ্বলিয়া কয়লা হইয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া গৌরব করিও না। অন্যথায় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমরা মানুষের মলমুত্র আঘ্রাণ ও আস্বাদনকারী বিষ্ঠাপোকা অপেক্ষা মন্দ হইয়া পড়িবে।"

অহংকারের চতুর্থ কারণ—সৌন্দর্য। সৌন্দর্যজনিত অহংকার সাধারণত স্ত্রীলোকদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আন্‌হা এক মহিলাকে খর্ব বলিয়া উল্লেখ করিলেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনিয়া বলিলেন– "তুমি গীবত করিলে।" এই উক্তিতে স্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠব লইয়া অহংকার করা হইয়াছিল; কেননা তিনি খর্ব হইলে অপরকে খর্ব বলিতেন না।

অহংকারের পঞ্চম কারণ—ধন। ধনীলোক অপর লোককে বলিয়া থাকে– "আমার ধন-সম্পদ কত অধিক। অমুক ব্যক্তি কত নিঃসম্বল ও কপর্দকহীন। আমি

ইচ্ছা করিলে তাহার মত বহু দাস খরিদ করিয়া রাখিতে পারি।" ধনীগণ এবং বিধ আরও বহু উক্তি করিয়া থাকে। কুরআন শরীফে সূরা কাহাফে দুই ভ্রাতার ঘটনা বর্ণিত আছে। তাহাদের একজন অপরজনকে বলিয়াছিল–

اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَّ اَعَزُّ نَفَرًا

"ধনবলে তোমা অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে অধিক গৌরবান্বিত।" (সূরা কাহাফ, ৫ রুকূ, ১৫ পারা)। ইহাও এই শ্রেণীর অহংকারই ছিল।

অহংকারের ষষ্ঠ কারণ—দৈহিক বল। দৈহিক বলে বলীয়ান ব্যক্তিগণ অপর দুর্বল লোকের নিকট অহংকার করিয়া থাকে।

অহংকারের সপ্তম কারণ—প্রভুত্ব। যাহার অধীনে বহু লোক থাকে, যেমন শিষ্য, কর্মচারী, চাকর, দাস-দাসী ইত্যাদি, সেই ব্যক্তি আজ্ঞাধীন লোকের বাহুল্য লইয়া অংহকার করিয়া থাকে।

মোটের উপর কথা এই যে, মানুষ পদার্থকে নিয়ামত বলিয়া মনে করে, তাহা বাস্তবিকপক্ষে নিয়ামত না হইলেও ইহা অবলম্বনে সে অহংকার করে। এমনকি নপুংসকত্বের আধিক্যহেতু এক নপুংসক অপর নপুংসকের নিকট অহংকার করিয়া থাকে। উল্লিখিত সাতটিই অহংকারের কারণ।

অহংকার প্রকাশ পাওয়ার কারণ—শত্রুতা, ঈর্ষা ইত্যাদি কারণে অহংকার প্রকাশ পায়। কারণ, মানুষ কাহাকেও শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিলে সে তৎপ্রতি কোন না কোন প্রকারের অহংকার প্রকাশ করিয়া থাকে। আবার কখন কখন রিয়ার বশবর্তী হইয়া লোকের ভক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ভক্তিভাজন ব্যক্তির প্রতিও অহংকার করা হয়। যেমন মনে কর, দুই ব্যক্তির মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। একজন অপর জনকে খুব বড় জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া মনে মনে ভক্তি করে, তথাপি, অপর লোকে যেন তাহাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করে, তজ্জন্য ঐ ব্যক্তি তাহার প্রতি অহংকার প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রিয় পাঠক, তুমি যখন অহংকারের কারণসমূহ অবগত হইলে তখন উহার প্রতিষেধকও তোমার জানিয়া লওয়া আবশ্যক।

অহংকাররূপ ব্যাধির প্রতিকার—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, যে দোষ রেণু পরিমাণ থাকিলেও সৌভাগ্যের পথ ও বেহেশতের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, ইহার প্রতিকার অবশ্য কর্তব্য। কেহই অহংকাররূপ পীড়া হইতে মুক্ত নহে। ইহার প্রতিকার দ্বিবিধ। প্রথমটি সংক্ষিপ্ত ও দ্বিতীয়টি বিশিষ্ট। প্রথমটি ইলম (জ্ঞান) ও আমল (অনুষ্ঠান) এই দুইটির মিশ্রণে প্রস্তুত হয়।

অহংকারের জ্ঞানমূলক প্রতিকার—মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র সম্যক পরিচয় জ্ঞানলাভ। এ কথা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইতে হইবে যে, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য শোভা পায় না। তৎপর নিজেকেও চিনিয়া লইতে হইবে।

হৃদগতভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, নিজের ন্যায় নীচ, হীন ও অপদার্থ আর কেহই নাই। এই দ্বিবিধ উপলব্ধি জোলাপস্বরূপ হৃদয় হইতে অহংকারের জড় ও মূল উৎপাটন করিয়া ফেলে। অহংকার বিনাশের অব্যর্থ মহৌষধ সম্বন্ধে অবগত হইতে চাহিলে কুরআন শরীফের এই উক্তি যথেষ্ট–

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهُ - مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ - مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ - ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ - ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهُ -

"(ইসলামে অবিশ্বাসী) মানবের উপর আল্লাহ্‌র বিনাশ ক্রিয়া আসুক। (কারণ) সে কত অকৃতজ্ঞ! (সে কি অনুধাবন করে না যে), আল্লাহ্ তাহাকে কিরূপ (নিকৃষ্ট) বস্তু হইতে সৃজন করিয়াছেন। শুক্র হইতে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অনন্তর তাহাকে সর্বাঙ্গ সুসমঞ্জসভাবে তৈয়ার করিয়াছেন। তৎপর (মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গমনের) পথ তাহার জন্য সুগম করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর (ইহজীবন শেষ হইলে) তাহাকে মৃত্যু দিয়াছেন ও কবরে স্থাপন করিয়াছেন। তৎপর আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করিবেন তখন তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবেন" (সূরা-আবাসা, ৩০ পারা)।

উপরিউক্ত আয়াতে মহাপ্রভু আল্লাহ্ মানুষকে স্বীয় অসীম ক্ষমতা বুঝাইয়া দিতেছেন এবং তৎসঙ্গ তাহার আদিম, অন্তিম ও মধ্যবর্তী অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন। তাহার আদিম অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলেন– مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ "আল্লাহ্ তাহাকে কিরূপ (নিকৃষ্ট) বস্তু হইতে সৃজন করিয়াছেন।" মানুষের জানা উচিত যে, জগতে 'নাস্তি' (অবিদ্যমানতা) অপেক্ষা অধিক অপদার্থ আর কিছুই নহে। পূর্বে মানবের কোন অস্তিত্ব, নাম ও নিশানা ছিল না। আদিমকাল হইতে জন্ম মুহূর্ত পর্যন্ত সে প্রচ্ছন্নতার আবরণে লুক্কায়িত ছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

"মানুষের উপর এমন সময় নিশ্চয়ই আসিয়াছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না" (সূরা দাহর, ১ রুকু, ২৯ পারা)। অনন্তর আল্লাহ্ মৃত্তিকা সৃজন করিলেন। ইহা অপেক্ষা অধিক তুচ্ছ পদার্থ আর কি আছে? তৎপর তিনি এক বিন্দু রক্ত ও পানি হইতে শুক্র সৃষ্টি করিলেন। ইহার পর এই শুক্র হইতে এক বিন্দু জমাট রক্ত প্রস্তুত করেন। ইহা অপেক্ষা অধিক অপবিত্র আর কোন বস্তু নাই। এইরূপে আল্লাহ্ মানুষকে 'নাস্তি' হইতে অস্তিত্বের মধ্যে আনয়ন করেন। অতএব তুচ্ছ মাটি, পুতিগন্ধময় শুক্র বিন্দু ও অপবিত্র রক্ত হইতে মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপর সে একখণ্ড মাংসপিণ্ড ছিল। ইহার শ্রবণ শক্তি, দর্শন ক্ষমতা, বাক-শক্তি ও চলিবার ক্ষমতা কিছুই ছিল না। তখন ইহা একটি জড় পদার্থ মাত্র ছিল; তখন অপর পদার্থের বিষয় ত দূরের কথা সে নিজ সম্বন্ধেও একেবারে অজ্ঞাত ছিল।

তৎপর মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র স্বীয় অসীম ক্ষমতায় সেই মাংস খণ্ডকে শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, বাক-শক্তি, বল, হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদান করিলেন। কিন্তু মৃত্তিকা, শুক্র, জমাট রক্ত এই সমস্ত মূল উপাদানসমূহে উল্লিখিত গুণাবলীর কোনটিই বিদ্যমান ছিল না। এই মূল বস্তুসমূহের কেমন আশ্চর্য কৌশলে কেমন অপূর্ব বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে একদিকে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা, অনন্ত গৌরব ও অপার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং অপরদিকে নিজের হীনতা, অপদার্থতা ও তুচ্ছতা বুঝা যায়। এমতাবস্থায়, মানুষ তখন অহংকার করিবে কিরূপে ? আদিম নাস্তির অবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থা উপনীত হওয়া পর্যন্ত সে স্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠবের কোন কিছুই নিজ চেষ্টায় করিয়া লইতে পারে নাই, যেজন্য সে গর্বিত হইতে পারে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মহাপ্রভু আল্লাহ্ বলেন–

وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ

“আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এই যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছেন; তৎপর তোমরা মানুষ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলে” (সূরা রূম, ৩ রুকূ, ২১ পারা)। অতএব সর্বাগ্রে মানুষকে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত– তাহার কি অহংকার করিবার কোন স্থান আছে ? না তাহার সর্বদা লজ্জিত ও অবনত থাকিতে হইবে ?

প্রিয় পাঠক, মানবের জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী অবস্থা একবার পর্যালোচনা করিয়া দেখ। মহাপ্রভু আল্লাহ্ এক নির্দিষ্টকালের জন্য তাহাকে এ নশ্বর জগতে আনয়ন করিয়াছেন এবং অযাচিতভাবে খাদ্যদ্রব্যাদি ও নানাবিদ সম্পদ দান করিয়াছেন। মানবের কাজ তাহার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিলে সে মহা ভুলে নিপতিত হইত এবং সে মনে করিত– 'আমি একজন।' সুতরাং তাহাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পীড়া, শীত, গ্রীষ্ম, দুঃখ– যন্ত্রণা এবং আরও লক্ষ অভাব-অভিযোগ ও বিপদাপদে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, যেন এক মুহূর্তের জন্যও সে নিরাপদ হইতে না পারে। নিমিষের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, অথবা অন্ধ, রোগাক্রান্ত বা পাগল হইয়া যাইতে পারে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তাহার জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কাও আছে। এই সমুদয় অশান্তি হইতে অব্যাহতির উপায় তিনি আবার তিক্ত ঔষধে নিহিত রাখিয়াছেন। স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে তিক্ত ও বিস্বাদ ঔষধ সেবনের কষ্ট তাহাকে অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। অপরপক্ষে, মানবের অনিষ্ট তিনি আপাতমধুর প্রলোভনের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। ইহাতে ভুলিয়া ক্ষণিক আনন্দ লাভ করিলে পরিণামে তাহাকে অসীম যাতনা ভোগ করিতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য করিবার ক্ষমতা মানুষকে অর্পণ করা হয় নাই। এমনকি, সে যাহা জানিতে ইচ্ছা করে তাহাই সে জানিতে পারে

না এবং যাহা সে ভুলিতে চায় তাহাই সে ভুলিতে পারে না; যে কথা সে চিন্তা করিতে চায় না, তাহাই তাহাকে তন্ময় করিয়া ফেলে; আবার যাহা সে স্মরণ করিতে চায়, তাহা বহু দূরে সরিয়ে পড়ে। মানুষকে এইরূপ আশ্চর্য কৌশল ও অতুলনীয় সৌন্দর্য সহকারে সৃজন করা সত্ত্বেও সে সর্বাপেক্ষা অসহায় দুর্ভাগা, হীন ও দুর্বল।

মানুষের অন্তিম অবস্থা মৃত্যু। তখন এই বল, শ্রবণ-শক্তি, দর্শন-ক্ষমতা, সৌন্দর্য, শরীর এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছুই থাকিবে না। বরং সমস্ত অঙ্গসৌষ্ঠব শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ঘৃণিত মৃতদেহে পরিণত হইবে এবং পচিয়া এমন বীভৎস হইয়া পড়িবে যে, ইহার দুর্গন্ধে লোকে নাসিকা বন্ধ করিবে। তৎপর ইহা নানাবিধ কীট ও পোকার উদরস্থ হইয়া ইহাদের মলমূত্ররূপে বাহির হইবে এবং পুনরায় তুচ্ছ মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। এইরূপে মৃত্তিকায় মিশিয়া যাওয়াই মানুষের শেষ পরিণতি হইলে সে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় উদাসীনভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু এই সৌভাগ্যও তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। বরং শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিবে। তাহার চক্ষের সম্মুখে আকাশ ফাটিয়া যাইবে, গ্রহ-নক্ষত্র খসিয়া পড়িবে, চন্দ্র-সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে, পাহাড়-পর্বত ধোনিত তুলার মত উড়িতে থাকিবে এবং পৃথিবী রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। ফেরেশতাগণ ফাঁদ বিস্তার করিবে এবং দোযখ উচ্ছলিত হইয়া গর্জন করিতে থাকিবে। ফেরেশ্‌তাগণ প্রত্যেক নরনারীর হস্তে আমলনামা (জীবনের কার্য-তালিকা) প্রদান করিবে। ইহাতে স্বীয় জীবনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি অপকর্ম সে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবে। এক একটি আমলনামা পাঠ করা হইবে। ফেরেশ্‌তাগণ তাহাকে বলিবে– “উত্তর দাও, তুমি এরূপ কাজ কেন করিয়াছিলে ? কেন বসিয়াছিলে ? কেন উঠিয়াছিলে ? কেন দেখিয়াছিলে ? কেন এইরূপ ধারণা করিয়াছিলে ?” এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারিলে ফেরেশ্‌তা তাহাকে দোযখে লইয়া যাইবে। এমন সময় সেই ব্যক্তি গভীর পরিতাপের সহিত বলিবে– “হায়! আমি যদি দুনিয়াতে শূকর বা কুকুররূপে জন্ম গ্রহণ করিতাম তবে উহাদের ন্যায় মাটিতে মিশিয়া যাইতাম। এইরূপ কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত না।” অতএব যে মানুষের পরিণাম শূকর এবং কুকুর অপেক্ষাও মন্দ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে কিরূপে অহংকার করিতে পারে ? গর্ব করিবার তাহার কি আছে ? ভূমণ্ডল ও গগন-মণ্ডলের প্রতিটি রেণু ও বালুকা কণা যদি তাহার বিপদে রোদন করে এবং তাহার দুর্গতিলিপি পাঠ করে তবুও ইহার অন্ত হইবে না।

প্রিয় পাঠক, তুমি কি এমন কোন কয়েদী দেখিয়াছ যে, রাজকীয় আদেশে কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছে, বিচারান্তে যাহার ফাঁসি হইতে পারে, অথচ সে গর্ব ও অহংকারে প্রবৃত্ত থাকে ? জগতবাসী তদ্রূপ সংসাররূপ কারাগারে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র আদেশে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার পাপ ও অপরাধ অসংখ্য অগণিত। বিচারান্তে মহাপ্রভু আল্লাহ্ তাহার প্রতি কি আদেশ দিবেন, তাহাও জানা নাই। এমতাবস্থায়,

যথায় কঠিন বিপদ ও অসীম যাতনার সম্ভাবনা আছে, তথায় কিরূপে গর্ব ও অহংকার করা যাইতে পারে ? অতএব এই কথাগুলি হৃদগতভাবে বুঝিয়া লইলে ইহাই অহংকার বিদূরণে জোলাপের ন্যায় কাজ করিবে। এই উপলব্ধি মানবের মন হইতে অহংকারের মূল কর্তন করিয়া দিবে। তখন সে কাহাকেও নিজ অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করিবে না এবং বলিতে পারিবে। "হায়! আমি যদি মাটি, জড় পদার্থ বা কোন জন্তু হইতাম তবে পরিণামে ভীষণ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতাম।"

অহংকারের অনুষ্ঠানমূলক প্রতিকার—সর্বাবস্থায় ও বাক্যে বিনয়ী ও নম্র লোকদের পথে অবলম্বন করা; যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আহারের সময় হেলান দিয়া বসিতেন না এবং বলিতেন– "আমি একজন দাস। অতএব আমার পক্ষে দাসের ন্যায় আহার করা উচিত।" লোকে হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিল– "আপনি নতুন পোশাক পরিধান করেন না কেন ?" উত্তরে বলিলেন– "স্বাধীন হইতে পারিলে পরকালে নতুন বস্ত্র পরিধান করিব।"

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, বিনয় নামাযের অন্যতম গূঢ় উদ্দেশ্য। রুকূ ও সিজদায় ইহা প্রকাশ পায়। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মুখমণ্ডল সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন। সিজদার সময় সে উহা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ পদার্থ মাটিতে স্থাপন করে। এইজন্যই আরব জাতি এত অহংকারী ছিল যে, তাহারা কাহারও সম্মুখে মস্তক অবনত করা ত দূরের কথা, স্বীয় পৃষ্ঠও অবনত করিত না। যাহাই হউক, অহংকার যাহা করিতে আদেশ করে ইহার বিপরীত কাজ করা মানুষে কর্তব্য। আকৃতি, পোশাক, বাক্য, দর্শন, উপবেশন, গাত্রোত্থান প্রভৃতি যাবতীয় গতিবিধি ও অবস্থিতিতে অহংকার প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় অহংকার দূর করা আবশ্যক যেন বিনয় ও নম্রতা মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া গড়ে।

অহংকারীর নিদর্শন—অহংকারের নিদর্শন বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। ইহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ঃ (১) অহংকারী লোক একাকী কোন স্থানে যায় না। সুতরাং এইরূপ অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। হযরত আবু দারদা রাযিআল্লাহু আন্হু বলেন– "তোমার সঙ্গে যত অধিক লোক হইবে, আল্লাহ্ হইতে তুমি তত দূরবর্তী থাকিবে।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লোকের সঙ্গে গমনকালে মধ্যস্থানে থাকিতেন। আবার যখন এমনও হইত যে, সকলকে অগ্রে দিয়া তিনি পশ্চাতে চলিতেন। (২) অহংকারী ব্যক্তির অপর এক নিদর্শন এই যে, লোককে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিতে সে ভালবাসে এবং সে উপস্থিত হইলে লোকেরা যেন দাঁড়াইয়া তাহাকে সম্বর্ধনা জানায়, এইরূপ ইচ্ছা রাখে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হওয়াকে তিনি ঘৃণা করিতেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহূ বলেন– "কেহ দোযখী লোক দেখিতে চাহিলে সে যেন ঐ ব্যক্তিকে দেখে, যে নিজে বসিয়া থাকে এবং অপর লোক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে।" (৩) অহংকারী লোক অপরের সহিত দেখা করিতে যায় না। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) মক্কা শরীফে উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট হইতে হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম আদ্হাম (র) তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) তদনুযায়ী হযরত ইবরাহীম আদ্হামের (র) নিকট গমন করিলে তিনি বলিলেন– "আপনার বিনয় পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে আহ্বান করিয়া ছিলাম।" (৪) অহংকারী লোক দরিদ্রকে তাহার নিকট বসিতে দেয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন দরিদ্রের হস্তে স্বীয় মুবারক হস্ত স্থাপন করিতেন তখন যে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি স্বয়ং ছাড়িয়া না যাইত সেই পর্যন্ত তিনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া থাকিতেন। আর যে রোগী হইতে মানুষ দূরে সরিয়া থাকে, তিনি তাহার সহিত একত্রে আহার করিতেন। (৫) অহংকারী লোকের আর এক নিদর্শন এই যে, তাহারা স্বহস্তে নিজ গৃহে কোন কাজ করে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমস্ত কাজ স্বহস্তে করিতেন। ইসলাম জগতের সম্রাট হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের (র) গৃহে এক রজনীতে এক ব্যক্তি অতিথি হইয়াছিলেন। তৈল নিঃশেষ হওয়াতে প্রদীপ নির্বাপ হইবার উপক্রম হইল। অতিথি তখন তেল আনিবার জন্য গাত্রোত্থান করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন– "অতিথি দ্বারা কোন কার্য করাইয়া লওয়া মনুষ্যত্ব বিরুদ্ধ।" অতিথি নিবেদন করিল– "হে ইসলাম জগতের সম্রাট, এইরূপ কাজ আপনি নিজে করেন?" তিনি বলিলেন– "হাঁ, কাজ করিবার পূর্বে আমি যে উমর ছিলাম, কাজ করার পরও আমি সেই উমরই আছি।" (৬) অহংকারী লোকের অপর এক চিহ্ন এই যে, তাহারা নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া বাজার হইতে নিজেরা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাজার হইতে একটি দ্রব্য খরিদ করিলেন। এক ব্যক্তি ইহা বহন করিয়া তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে হযরত (সা) বলিলেন– "না, যাহারা জিনিস তাহার পক্ষেই ইহা বহন করা উত্তম।" হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আন্হু লাক্ড়ির বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেন এবং সঙ্কীর্ণ পথে লোকেরা ভিড় দেখিলে বলিতেন– "তোমাদের আমীরকে একটু পথ দাও।" ইহা তৎকালের ঘটনা যখন তিনি শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্হু গোশ্ত বিক্রয়পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বাজারে গমনের সময় তাঁহার এক হস্তে গোশতের ঝুড়ি অপর হস্তে দুর্রা (শাসন দণ্ড) থাকিত। (৭) অহংকারীদের অপর এক চিহ্ন এই যে, তাহারা উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান না করিয়া বহির্গত হইতে পারে না। ইসলাম জগতের একচ্ছত্র সম্রাট হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্হু একটি চৌদ্দ তালিযুক্ত চাদর পরিধানপূর্বক একটি দুর্রা হস্তে বহির্গত হইতেন। বস্ত্র খণ্ডের অভাবে কোন কোন তালি আবার পুরাতন চর্মের থাকিত। হযরত আলী রাযিআল্লাহু আন্হু সর্বদা অপ্রশস্ত বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং বলিতেন– "এইরূপ পরিচ্ছদে মন বিনয়ী

থাকে, অপর লোক অনুবর্তী হয় এবং দরিদ্রগণ আনন্দিত হয়।” হযরত তঊস রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– “আমি নবধৌত পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিলে যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা মলিন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মন পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসে না।” অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধানে তিনি অহংকার উপলব্ধি করিতেন। খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা মূল্যের বস্ত্র আনিয়া দিলে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ইহা দেখিয়া বলিতেন– “ইহা ভাল বটে; তবে ইহা অপেক্ষা কোমল বস্ত্রের আবশ্যক।” কিন্তু খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁহার জন্য পাঁচ রৌপ্য মুদ্রা মূল্যের বস্ত্র খরিদ করিয়া আনিলে তিনি বলিতেন– “ইহা ত অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু ইহা অপেক্ষা মোটা বস্ত্রের আবশ্যক।” লোক এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন– “মহাপ্রভু আল্লাহ্ আমাকে এমন এক প্রবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে সে নিত্য নতুন সুখ-ভোগে লালায়িত; একবার যে সুখ সে ভোগ করিয়াছে দ্বিতীয়বার ইহা ভোগ করিতে চায় না। আমার প্রবৃত্তি খলীফা পদের সুখ ভোগ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা অধিক সুখের দুনিয়াতে আর কিছুই নাই। এখন সে চিরস্থায়ী রাজত্বের সুখ ভোগের জন্য লোলুপ এবং ইহার অন্বেষণেই সে ব্যাপৃত রহিয়াছে।”

সর্বস্থানে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ অহংকার পরিচায়ক নহে—প্রিয় পাঠক, সর্বস্থানে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ অহংকার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিও না। কারণ, উৎকৃষ্ট জিনিস পছন্দ করাই মানুষের স্বভাব। কেহ যদি নির্জনে একাকী অবস্থানকালেও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে ভালবাসে তবে ইহাকে অহংকারের নিদর্শন বলা যাইবে না। আবার কেহ কেহ পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র পরিধানপূর্বক অহংকার করিয়া থাকে। কারণ, তদ্রূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহারা নিজদিগকে পরহেযগার সংসার বিরাগী বলিয়া পরিচয় দেয়। অতএব যাহারা বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা করিতে চায় তাহাদের পক্ষে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত্র অধ্যয়ন ও তাঁহার অনুসরণ করা আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আচার-ব্যবহার– আবূ সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে পশুকে আহার দিতেন, উট বাঁধিতেন এবং ছিন্ন বস্ত্রে তালি লাগাইতেন। তিনি পরিচারকের সহিত একত্রে আহার করিতেন; ভৃত্য আটা পিশিতে পিশিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে সাহায্য করিতেন। বাজার হইতে সওদাপত্র খরিদ করত নিজেই বহন করিয়া আনিতেন। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সকলকেই তিনি সর্বাগ্রে সালাম দিতেন এবং সকলের সহিতই মুসাফাহ (করমর্দন) করিতেন; ধর্ম কার্যে ছোট-বড়, গোলাম-প্রভুর মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না এবং দিবারাত্র একই প্রকার পোশাক পরিধান করিতেন। নিমন্ত্রণ করিলে নিতান্ত দরিদ্রের গৃহেও তিনি গমন করিতেন এবং সামান্য খাদ্য-সামগ্রী সম্মুখে

উপস্থিত দেখিলেও তিনি ইহার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। রাত্রির খাদ্য-সামগ্রী সকালের জন্য এবং সকালের খাদ্য-সামগ্রী রাত্রির জন্য রাখিতেন না। হযরত (সা) অত্যন্ত সু-স্বভাবী, নিতান্ত দানশীল ছিলেন। বন্ধুতার সহিত প্রসন্ন বদনে সকলের সহিত মিলিবার মিশিবার আগ্রহ তাঁহার আচরণে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত। তিনি মৃদু হাসিতেন, কখনও উচ্চ হাস্য করেন নাই। অপরের দুঃখ দর্শনে ভ্রূ কুঞ্চিত না করিয়া তিনি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেন। তিনি অপার বিনয় প্রদর্শন করিতেন। অথচ ইহাতে নীচতা থাকিত না। তিনি অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতাপশালী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে কাঠিন্য বা কর্কশ ভাব প্রকাশ পাইত না। তিনি নিতান্ত দানশীল ও দয়ালু ছিলেন; কিন্তু তিনি অপব্যয় করিতেন না। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল; সকলের উপরই তিনি করুণা ও দয়া বিতরণ করিতেন। তাঁহার শরম ও লজ্জা অধিক ছিল বলিয়া তিনি মাথা নোয়াইয়া রাখিতেন। তিনি কাহারও প্রত্যাশী ছিলেন না। অতএব যাহারা সৌভাগ্য লাভের আশা করে তাহারা যেন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুকরণ ও অনুসরণ করে। তাঁহার উত্তম স্বভাবের দরুনই মহাপ্রভু আল্লাহ্ প্রশংসা করিয়া বলেন– اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ। “নিশ্চয়ই আপনি অতি মহান চরিত্রের অধিকারী।” (সূরা কলম, ১ রুকূ, ২৯ পারা)।

অহংকারের বিশিষ্ট প্রতিকার

উচ্চ বংশজনিত অহংকারের প্রতিকার—কি কারণে হৃদয়ে অহংকার আসে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিয়া দেখিবে। বংশমর্যাদার শ্রেষ্ঠতা অবলম্বনে যদি অহংকার আসিয়া থাকে তবে তোমার জন্মের আদিম অবস্থার কথা স্মরণ কর। মহাপ্রভু আল্লাহ্ বলেন–

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ - ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ -

“আর মাটি দ্বারা তিনি মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন; তৎপর হীন পানি-নিঃসৃত শুক্র হইতে তাহার বংশ চালাইয়াছেন।” (সূরা সিজদা, ১ রুকূ, ২১ পারা)। অর্থাৎ তোমার সৃষ্টির মূল বস্তু মাটি এবং তৎপর শুক্র দ্বারা তোমার বংশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। অতএব শুক্র হইল তোমার পিতা আর মাটি, পিতামহ। এই উভয় বস্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কি আছে ? আর তুমি যদি বল যে, একজন পিতাও ত আছেন, তবে দেখ, তোমার ও তোমার পিতার মধ্যবর্তী স্থলে শুক্র, জমাট রক্ত, ঘৃণিত গোশতের টুকরা ইত্যাদি বহু অপবিত্রতা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল বিষয় তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ না কেন? বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, কাহারও পিতা ক্ষৌরকার বা মেথর হইলে তুমি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কর এবং বল যে, অপবিত্র পদার্থ নাড়াচাড়া করে বলিয়া সে নিজেও অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একবারও চিন্তা করিয়া দেখ না যে, তুমি নিজেই তুচ্ছ মাটি ও অপবিত্র রক্ত হইতে সৃষ্টি হইয়াছ।

তবে অহংকার কর কেন? তুমি যদি এই ব্যাপারে সম্যকরূপে অবগত হইয়া থাক তবে তোমার অবস্থা এইরূপ হইবে যে, মনে কর, এক ব্যক্তি নিজকে 'সৈয়দ' বলিয়া পরিচয় দিল। এমন সময় দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইল যে, সে গোলামের সন্তান বা অমুক ক্ষৌরকারের পুত্র। এমতাবস্থায়, সে কি আর বংশ লইয়া অহংকার করিতে পারিবে? অতএব তুমিও তোমার আদিম অবস্থা অবগত হইলে আর অহংকার করিতে পারিবে না। আবার দেখ, যে ব্যক্তি বংশ লইয়া অহংকার করে সে পূর্বপুরুষের গুণের জন্য অহংকার করিয়া থাকে। গুণ ত তাহার নিজস্ব হওয়া উচিত। কারণ, মানুষের মূত্র হইতে যে কীট জন্মে, ইহা কোনক্রমেই অশ্বের মূত্রজাত কীট হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

সৌন্দর্যজনিত অহংকারের প্রতিকার—শারীরিক সৌন্দর্যের কারণেও মানব-হৃদয়ে অহংকার জন্মিয়া থাকে। এমতাবস্থায়, তাহাকে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। তাহা হইলে সে স্বীয় কদর্যতা বুঝিতে পারিবে। চিন্তা করিয়া দেখ, মানুষের পেট, মূত্রথলি, রগ, নাসিকা, কর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন জঘন্য মলমূত্র ও অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যে মলমূত্রের ঘ্রাণ লওয়া, এমনকি, উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও মানবের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে, তাহাই সে প্রত্যহ দুইবার নিজ হস্তে পরিষ্কার করিতেছে এবং উহার বোঝা সে দিবারাত্র বহন করিয়া যাইতেছে। আরও ভাবিয়া দেখ, ঋতুর রক্ত ও শুক্র হইতে মানুষের জন্ম হইয়াছে। এই উভয় পদার্থই আবার অপবিত্র মূত্রনালীর ভিতর দিয়া বাহির হয়। হযরত তউস (র) এক ব্যক্তিকে ঠাট-ঠমকের সহিত মনোরম গতিতে চলিতে দেখিয়া বলিলেন– "যে সকল ঘৃণিত ও অপবিত্র পদার্থ পেটে রাখিয়া বহন করা হইতেছে, ইহা যে ব্যক্তি অবগত আছে, সে কখনও এইরূপ পদ বিক্ষেপে চলিতে পারে না।" মানুষ যদি মাত্র একদিন মলমূত্র পরিত্যাগ করত নিজকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখিত তবে সে আবর্জনার স্তূপ ও পায়খানা অপেক্ষা অধিক বীভৎস হইয়া পড়িত। কারণ যে সকল ঘৃণিত বস্তু সে উদরে বহন করিয়া চলে এবং যাহা তাহার পেট হইতে নির্গত হয়, উহা অপেক্ষা অপবিত্র বস্তু আবর্জনার স্তূপ ও পায়খানাতে পতিত হয় না। অপরপক্ষে, সৌন্দর্য কাহারও নিজের অর্জিত নহে যে, ইহা লইয়া সে অহংকার করিবে। আবার মানবের শারীরিক কদর্যতার জন্য সে নিজে দায়ী নহে যে, তজ্জন্য তাহার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যাইতে পারে। আবার দেখ, মানুষের সৌন্দর্য ও সুন্দর আকৃতি চিরস্থায়ী নহে। কারণ, সামান্য পীড়াতেই সমস্ত সৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পীড়ার মধ্যে বসন্ত মানুষকে সর্বাধিক কদাকার করিয়া ফেলে। সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর শারীরিক সৌন্দর্য লইয়া অহংকার করা শোভা পায় না।

দৈহিক বলজনিত অহংকারের প্রতিকার– অহংকারের কারণ যদি দৈহিক বল হইয়া থাকে তবে ভাবিয়া দেখ, সামান্য একটি শিরায় বেদনা হইলে মানুষ হতভম্ব ও

সর্বাধিক দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তখন একটি মাছি তাহাকে বিরক্ত করিতে থাকিলেও সে ইহাকে তাড়াইতে পারে না। একটি ক্ষুদ্রতম কীট বা একটি পিপীলিকা তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে সে মরিয়া যাইতে পারে। পায়ে একটি কাঁটা বিঁধিলে মানুষ অচল হইয়া পড়ে। আবার দেখ, মানুষ যথেষ্ট বলবান হইলেও হাতী ও গাধার ন্যায় বলবান হইতে পারে না। ইহারা মানুষ অপেক্ষা অধিক বলবান। অতএব যে বল পশুর মধ্যেও অধিক আছে, ইহা লইয়া অহংকার করা মানবের পক্ষে কিরূপে শোভা পাইতে পারে!

ধনজনিত অহংকারের প্রতিকার—ধন-সম্পদ, দাস-দাসী, প্রভুত্ব, নেতৃত্ব ইত্যাদি কারণে অহংকার আসিলে মনে করিবে তৎসমুদয় বস্তু দেহ হইতে বাহিরে। ধন-সম্পদ চোরে লইয়া গেলে বা বাদশাহ প্রভুত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারিত করিলে তাহার অধিকারে ও ক্ষমতায় কিছুই থাকে না। আবার ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকিলেও ইহা লইয়া অহংকার করিতে পার না। কারণ, বহু কাফিরেরও তোমা অপেক্ষা অধিক ধন আছে। তদ্রূপ রাজকীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও অহংকার করা চলে না। কেননা, বহু মূর্খ ও নীচ প্রকৃতির লোকও তোমা অপেক্ষা দশগুণ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রবল প্রতাপে প্রভুত্ব করিয়া যাইতেছে। মোটের উপর, যে পদার্থ তোমার শরীরের সহীত আবদ্ধ নহে, ইহা তোমার নিজস্ব নহে। আর যাহা তোমার নিজস্ব নহে, ইহা লইয়া অহংকার করা বেহুদা ও নিরর্থক। ধন, প্রভুত্ব, নেতৃত্ব ইত্যাদি কোনটিই তোমার দেহের সহিত সংযুক্ত ও নিজস্ব নহে।

ইল্‌ম ও ইবাদতজনিত অহংকারের প্রতিকার—অহংকারের অন্যতম কারণ ইলম ও ইবাদত এবং এই শ্রেণীর অহংকার নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কেননা, ইল্‌ম একটি উৎকৃষ্ট গুণবিশেষ এবং আল্লাহ্‌র নিকট ইহা অতি প্রিয়। ইল্‌ম অতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র গুণরাজির অন্যতম। আলিমের পক্ষে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত না করা নিতান্ত দুষ্কর। কিন্তু দুইটি উপায়ে উহা সহজ হইয়া উঠে। **প্রথম**– ইহা ভালরূপে বুঝিয়া লওয়া যে, ইলমের দরুন আলিমকে অত্যন্ত কঠিনভাবে ধরপাকড় করা হইবে এবং তাহার জন্য পরকালে নিতান্ত ভয়ের কারণ রহিয়াছে। কেননা, মূর্খ লোকের বহু ত্রুটি উপেক্ষিত হইবে এবং আলিমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ত্রুটিও নিতান্ত গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আর আলিমের সম্বন্ধ হাদীস শরীফে যে-সকল উক্তি আছে তৎসমুদয়ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে হইবে। যে আলিম স্বীয় ইল্‌ম অনুযায়ী আমল (কাজ) করে না তাহাকে আল্লাহ্ কুরআন শরীফে গর্দভ বলিয়াছেন; কারণ সে ভারবাহী গর্দভের ন্যায় শুধু বোঝা বহন করিয়াই চলিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

অর্থাৎ "আমলহীন আলিম ভারবাহী গর্দভতুল্য।" তদ্রূপ আলিমকে কুকুরের সহিত তুলনা করিয়া আল্লাহ্ আবার বলেন–

كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

"(আমলহীন আলিম) কুকুরের ন্যায়। যদি কুকুরের উপর বোঝা চাপাইয়া দাও তবে ইহা জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে, আবার বোঝা না চাপাইলেও হাঁপাইতে থাকে" (সূরা আ'রাফ, ২২ রুকূ, ৯ পারা)। অর্থাৎ তদ্রূপ ব্যক্তি জ্ঞানী হউক, কি মূর্খ থাকুক, তাহার স্বভাব পরিবর্তন হয় না। কুকুর ও গর্দভ অপেক্ষা অধম জন্তু আর কি আছে ? বস্তুত, আলিম ব্যক্তি পরকালে পরিত্রাণ না পাইলে সে অধম পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। এমনকি জড় পদার্থ কঙ্কর এবং প্রস্তরও তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

উপরিউক্ত কারণেই একজন সাহাবী রাযিআল্লাহু আন্হু বলিতেন–"হায়! আমি যদি পাখি হইতাম।" অপর এক সাহাবী রাযিআল্লাহু আন্হু বলিতেন–"আহা! আমি যদি ছাগল হইতাম এবং আমাকে যবেহ্ করিয়া লোকে খাইয়া ফেলিত।" আরও এক সাহাবী রাযিআল্লাহু আন্হু বলিতেন–"হায়! আমি যদি ঘাস হইতাম।" মোটের উপর কথা এই যে, পরকালের ভয় যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে সে কখনও অহংকার করিতে পারে না। এইরূপ লোক তদপেক্ষা মূর্খ ব্যক্তিকে বলে–"এ ব্যক্তি অজ্ঞ ; তাহার পাপ মার্জনীয় এবং সর্বাবস্থায় সে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" তদ্রূপ লোক নিজ অপেক্ষা বড় আলিম দেখিলে বলে–"তিনি এমন বিষয় জানেন যাহা আমি জানি না। সুতরাং তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" সেই ব্যক্তি কোন বৃদ্ধকে দেখিয়া মনে করে–"তিনি আল্লাহ্র ইবাদত আমা অপেক্ষা অধিক করিয়াছেন। অতএব তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" এমনকি পরকালের ভয়ে ভীত আলিম ব্যক্তি কোন কাফিরকে দেখিয়াও অহংকার করে না এবং বিবেচনা করে–"হয়ত এই ব্যক্তি মুসলমান হইতে পারে এবং তাহার পরিণাম উত্তম হইতে পারে। আল্লাহ্ না করুক, আমি হয়ত ঈমান হারাইয়া মরিতে পারি।" ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্হুকে দর্শন করত বহু মুসলমানই তাহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া অহংকার করিত। কিন্তু হযরত উমর (রা) তৎপর ইহ-পরকালের কিরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সুতরাং তাহাদের ঐরূপ অহংকার আল্লাহ্র নিকট ভ্রমাত্মক ছিল। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব পরকালের পরিত্রাণের উপর নির্ভর করে; আর পরিণাম কাহারও জানা নাই। অতএব পরিণামের ভয়ে সকলকেই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা উচিত। তাহা হইলে কাহারও মনে অহংকার আসিতে পারে না।

আবার ইহাও বুঝিয়া লও যে, অহংকার একমাত্র আল্লাহ্র পক্ষেই শোভা পায়। যে-ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অবলম্বনে অহংকার করে, সে যেন উহা লইয়া মহাপ্রভু আল্লাহ্র সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়। তদ্রূপ, বিরোধী শত্রুকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।

তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আদেশ করিয়াছেন–"তুমি যখন নিজকে তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করিবে তখন আমার নিকট সম্মান পাইবে।" মনে কর, কোন ব্যক্তি পরকালে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়া জানে; তথাপি, মহাপ্রভু আল্লাহ্র উক্ত আদেশ স্মরণ রাখিয়া অহংকার করা সঙ্গত নহে। এইজন্যই প্রত্যেক নবীই বিনীত ও নম্রভাবে চলিয়াছেন। তাঁহারা ভালরূপে অবগত ছিলেন যে, অহংকার করাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

ইবাদতজনিত অহংকারের প্রতিকার—ইবাদত করিয়া আবিদের পক্ষে আলিমের প্রতি অহংকার করা উচিত নহে। আবিদের মনে করা উচিত যে, ইলমের কল্যাণেই হয়ত আলিম পরকালে পরিত্রাণ পাইবে এবং তাহার সকল পাপ মোচন করা হইবে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আবিদ অপেক্ষা আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব এত অধিক যেমন সাহাবা অপেক্ষা আমার শ্রেষ্ঠত্ব অধিক।" যাহার অবস্থা জানা নাই এমন মূর্খ ব্যক্তিকে দেখিয়া আবিদের এইরূপ চিন্তা করা উচিত–"হয়ত এই মূর্খ ব্যক্তি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আবিদ হইতে পারে। কিন্তু সে নিজকে প্রকাশ করে নাই। দুষ্ক্রিয়াশীল হৃদয়ে যে-সকল কুচিন্তা ও কুভাব উদয় হয়, তৎসমুদয়ই পাপ; হৃদয় দ্বারা লুক্কায়িতভাবে উহা সম্পন্ন হয় এবং প্রকাশ্য পাপ অপেক্ষা অধিক মন্দ। ইহা বিচিত্র নহে যে, আমার অজ্ঞাতসারে আমার অন্তরে এমন বহু মারাত্মক পাপ জড়িত ও ঘনীভূত হইয়া থাকিতে পারে যাহার ফলে আমার সমস্ত জীবনের ইবাদত বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অপরপক্ষে, এই ফাসিকের হৃদয়ে হয়ত এমন সদ্ভাব আছে যাহার কল্যাণে তাহার সমুদয় প্রকাশ্য পাপ ক্ষমা করা হইবে। আবার সে তওবা করত পাপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে এবং তাহার পরিণাম শুভ হইতে পারে। আমার হয়ত এমন পাপ হইতে পারে যাহার কারণে মৃত্যুকালে আমার ঈমান হারাইবার আশংকা থাকে।" মোটের উপর আবিদের নামও আল্লাহ্র নিকট হতভাগাদের তালিকাভুক্ত থাকা বিচিত্র নহে। এমতাবস্থায়, ইবাদত লইয়া অহংকার করা মূর্খতা মাত্র। এইজন্যই কামিল দরবেশগণ সর্বদা বিনীত ও নম্রভাবে জীবন যাপন করেন।

আত্মগর্ব ও ইহার আপদসমূহ

আত্মগর্বের অনিষ্টকারিতা—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, আত্মগর্ব একটি জঘন্যতম মন্দ স্বভাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন–"তিনটি পদার্থ নিতান্ত মারাত্মক, (ইহারা হইতেছে) কৃপণতা, লোভ ও আত্মগর্ব।" লোকে হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আন্হাকে জিজ্ঞাসা করিল–"মানুষ কখন দুষ্ক্রিয়াশীল হয়?" তিনি বলিলেন–"যখন সে নিজকে সৎকর্মী বলিয়া বিবেচনা করে।" নিজকে সৎকর্মী বলিয়া মনে করা আত্মগর্বের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু আন্হু বলেন–"দুইটি পদার্থ সর্বনাশের কারণ, (ইহারা হইতেছে) আত্মগর্ব ও নৈরাশ্য।" এইজন্য বুযুর্গগণ বলেন–"হতাশ

লোক কর্তব্য-কর্মে শিথিল হইয়া থাকে এবং আত্মগর্বী লোক মনে করে, চেষ্টা ও পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই।" (কারণ, তাহাদের সমস্তই তাহারা সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া জ্ঞান করে।) হযরত মুতার্‌রাফ (র) বলেন-"সমস্ত রাত্রি নামাযে রত থাকিয়া প্রভাতে তজ্জন্য আত্মগর্ব প্রকাশ করা অপেক্ষা সমস্ত রজনী নিদ্রায় অতিবাহিত করত প্রাতে ভয় ও ক্ষুন্ন মনে শয্যা ত্যাগ করাকে আমি অধিক পছন্দ করি।" একদা হযরত শাববীর ইবনে মুনসুর রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি দীর্ঘকাল নামাযে ব্যাপৃত ছিলেন। এক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিলে নামাযান্তে তিনি বলিলেন-"আশ্চর্যবোধ করিবার কি আছে ? শয়তান দীর্ঘকাল ইবাদত করিয়াছিল; আর তাহার পরিণাম কি হইয়াছে তাহা তুমি জান।"

আত্মগর্বের জ্ঞানসমূহ—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, আত্মগর্ব বহু আপদের আকর। ইহার প্রথম আপদই অহংকার এবং অহংকারের বশীভূত হইয়াই মানুষ নিজকে অপর লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে। আত্মগর্বী লোক নিজের পাপ দেখিতে পায় না এবং ইহার ক্ষতিপূরণে যত্নবান হয় না। সে নিজকে সকল আপদমুক্ত মনে করে এবং তাহার মন হইতে ভয়-ভীতি অন্তর্হিত হয়। মহাপ্রভু আল্লাহ্ হইতে সে নির্ভয় হইয়া পড়ে ইবাদত করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ইহার প্রতিদান দাবী করে। সে আত্মপ্রশংসা করে ও নিজকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। সে নিজের জ্ঞানকে পূর্ণ বলিয়া ভাবে এবং তজ্জন্য অন্যের নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করে না। স্বীয় মতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তৎপ্রতি সে কর্ণপাতও করে না। তদ্রূপ, সে কাহারও উপদেশ শ্রবণ করে না; সুতরাং সে পূর্ণতা লাভে বঞ্চিত থাকে।

আত্মগর্ব ও অভিমানের পরিচয়—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, মহাপ্রভু আল্লাহ্ যাহাকে ইলম বা ইবাদতের শক্তিরূপ কোন পরম সম্পদ দান করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যদি উহা উপলব্ধি করত ইহা বিনষ্ট হওয়া বা ফিরাইয়া নেওয়ার ভয়ে শঙ্কিত থকে তবে তাহাকে আত্মগর্বী বলা চলে না। আবার উক্ত সম্পদের বিনাশ ভয় অন্তরে না থাকিলেও উহাকে আল্লাহ্‌র দান বলিয়া আনন্দিত হইলে এবং নিজস্ব গুণ বলিয়া মনে না করিলে এমন ব্যক্তিকেও আত্মগর্বী বলা যায় না। কিন্তু উহাকে নিজস্ব গুণ বলিয়া আনন্দিত হওয়াকে আত্মগর্ব বলে। আবার সেই গুণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কোন প্রতিদান দাবী করিলে বা ইবাদতকে আল্লাহ্‌র উপযুক্ত খেদমত বলিয়া মনে করিলে ইহাকে অভিমান বলে। কাহাকেও কিছু দান করত যদি কেহ মনে করে যে, একটি বড় কাজ করিলাম, তবে ইহাকে আত্মগর্ব বলে। আর দানের সাথে কিছু প্রতিদানের আশা থাকিলে ইহাকে অভিমান বলে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে ব্যক্তি নামায পড়িয়া অভিমান করে সে নামাযের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয় না।" তিনি আর বলেন যে, স্বীয় দোষ-ত্রুটি স্বীকার করিয়া হাস্য করা অপেক্ষা অন্যায় করিয়াছে ভাবিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে রোদন করা ভাল।

আত্মগর্বের প্রতিকার—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, আত্মগর্বরূপ পীড়া একমাত্র মূর্খতা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, পূর্ণ জ্ঞানই ইহার অব্যর্থ মহৌষধ।

সামর্থ্যবাদের ভ্রম খণ্ডন—যে ব্যক্তি দিবারাত্র ইবাদতে ব্যাপৃত আছে তাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব-তোমার ইবাদত কি তোমার বিনা শক্তি ও সামর্থ্যে স্বতঃই তোমার উপর আসিয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং তুমি ইহার প্রকাশ স্থল হইতেছ ? অথবা, তুমি কি এই মনে করিয়া আত্মগর্ব অনুভব কর যে, তোমা হইতেই ইহা উদ্ভূত ও তোমার নিজস্ব ক্ষমতায়ই ইহা সম্পন্ন হইতেছে ? উত্তরে যদি বল যে, তোমার ইবাদত কার্য অপর কাহারও দ্বারা পরিচালিত হইয়া তোমার উপর প্রকাশ পাইতেছে এবং তুমি ইহার প্রকাশ-স্থলমাত্র, তাহা হইলে তো তোমার আত্মগর্ব শোভা পায় না। কারণ, তোমার স্বাধীন প্রবর্তন-ক্ষমতায় উক্ত কার্য সম্পন্ন হয় নাই, তুমি অন্যের হস্তে আজ্ঞাধীন যন্ত্রস্বরূপ কাজ করিয়াছ মাত্র। আর যদি বল যে, কাজটি তুমি নিজেই সম্পন্ন করিয়াছ এবং তোমার স্বাধীন শক্তি ও সামর্থ্যে ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব-তুমি কি জান, যে সঙ্কল্প ও শক্তি দ্বারা হস্তপদাদি অঙ্গ-সঞ্চালনে কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, উহা কে দান করিয়াছেন এবং কোথা হইতেইবা তুমি উহা পাইলে ? ইহাতে যদি বল যে, তোমার স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবেই কার্য-নির্বাহ হইয়াছে তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব-সেই ইচ্ছা তোমার হৃদয়ে কে সৃজন করিয়া দিয়াছে, এই কার্য করিতে তোমাকে কে বাধ্য করিল ? কারণ, যে ইচ্ছাশক্তি তোমার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ইহাই তোমাকে তাড়না করিয়া কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণ করা তোমার ক্ষমতা-বহির্ভূত ছিল। যে-ইচ্ছাশক্তি বলপ্রয়োগে তোমাকে কর্মে রত করিয়াছে, ইহা তোমার আজ্ঞাধীন নহে। ফল কথা এই যে, তোমার ইচ্ছা, শক্তি, হস্তপদাদি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই আল্লাহ্‌র মহাদান। উহার মধ্যে কোনটিই তোমার নিজস্ব জিনিস নহে। অতএব তোমার কাজ উত্তম বলিয়া আত্ম-গরিমা করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এমতাবস্থায়, আল্লাহ্‌র করুণা স্মরণ করিয়া তোমর বিস্মিত হওয়া উচিত যে, তিনি বহু লোককে উদাসীন রাখিয়াছেন এবং তাহাদের ইচ্ছাকে মন্দ কার্যে লিপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দয়া করিয়া ভাল কার্যের ইচ্ছাকে তোমার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার ক্রোধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত তোমাকে তাঁহার সন্নিধানে লইয়া যাইতেছেন।

যোগ্যতাবাদের ভ্রম খণ্ডন—বাদশাহ যদি বিনা পরিচর্যায় অযাচিতভাবে গোলামকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ দান করেন, তবে তাহার পক্ষে বিস্মিত হওয়া উচিত যে, ইহা পাওয়ার কোন অধিকার না থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দয়া করত উক্ত সম্মানসূচক পরিচ্ছদ তাহাকে দান করিলেন। কিন্তু সে গোলাম যদি বলে-বাদশাহ বিচক্ষণ ব্যক্তি; উপযুক্ততা বিচার না করিয়া তিনি পরিচ্ছদ দান করেন নাই, তবে আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব-তুমি উপযুক্ততা কোথা হইতে অর্জন করিলে ? আর

এই যোগ্যতাও যদি বাদশাহ্‌রই পূর্বদান হইয়া থাকে, তবে তোমার আত্ম-গরিমা করিবার স্থান কোথায় ? ইহার উদাহরণ এইরূপ—মনে কর, বাদশাহ্ তোমাকে একটি অশ্ব দান করিলেন এবং তুমি ইহাতে আত্মগর্ব কর না। তৎপর তিনি তোমাকে একজন সহিস দান করিলেন। এখন তুমি বলিতে লাগিলে—আমার অশ্ব ছিল বলিয়াই তো সহিস পাইলাম। অন্যের ছিল না বলিয়াই সে পায় নাই। এমতাবস্থায়, সহিস প্রাপ্তিকে নিজের যোগ্যতার উপর আরোপ করা অন্যায়, কেননা অশ্বটিও বাদশাহ্‌র অযাচিত দান। সুতরাং মানবের জন্য আত্মগর্বের কোন সঙ্গত কারণই নাই। অশ্ব ও সহিস উভয়টি একবারে দান করিলেও যোগ্যতার দাবী উত্থাপন করত আত্মগর্বের কোন কারণ থাকিত না। তদ্রূপ, যদি বল যে, তুমি আল্লাহ্‌কে ভালবাস বলিয়াই তিনি তোমাকে ইবাদতের শক্তি দান করিয়াছেন, তবে আমরা উত্তরে বলিব—আচ্ছা, বল তো, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালাবাসা তোমার হৃদয়ে কে জন্মাইয়া দিল ? যদি বল— আমি তাঁহার পরিচয়-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য দেখিয়াছি বলিয়াই ভালবাসি। তবে আমরা আবার জিজ্ঞাসা করিব—এই পরিচয়-জ্ঞান ও দর্শন তোমাকে কে দান করিল ? ফল কথা এই যে, সমস্ত বস্তুই তাঁহার প্রদত্ত; সুতরাং যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার মধ্যে এই সমস্ত গুণ ও উপযুক্ততা, শক্তি ও ইচ্ছা সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার দান স্মরণ করত কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত। কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় তুমি কেবল মধ্যবর্তী স্থলমাত্র ; তুমি কিছুই নও। কোন কিছুই তোমা হইতে হয় না। তুমি মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র ক্ষমতা পরিচালনের ক্ষেত্রমাত্র এবং তোমার উপর দিয়াই তাঁহার কার্য সম্পন্ন হইতেছে।

প্রশ্ন ও উত্তর—এমন স্থলে যদি কেহ বলে—আমি যখন কিছুই করি না, বরং আল্লাহ্ই সব কিছু করিয়া থাকেন, এমতাবস্থায়, প্রতিদানের আশা কিরূপে করা যাইতে পারে ? কেবল আমাদের স্বাধীন ক্ষমতায় সম্পন্ন স্বীকৃত কার্যের জন্যই আমরা প্রতিদান আশা করিতে পারি। প্রকৃত ও ঠিক উত্তর এই যে, তুমি মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রমাত্র; নিরপেক্ষভাবে তুমি স্বয়ং কিছুই নও। আল্লাহ্ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা), যাহা আপনি করিলেন তাহা আপনি করেন নাই, বরং আল্লাহ্ই ইহা সম্পন্ন করিলেন।" মহাপ্রভু আল্লাহ্ জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছা সৃষ্টির পর অঙ্গ-পরিচালনা সৃজন করিয়া দিয়াছেন। তোমার অঙ্গ সঞ্চালনে কার্য সম্পন্ন হইল বলিয়া তুমি মনে কর, তুমিই ইহা করিলে।

প্রিয় পাঠক, এই রহস্য নিতান্ত নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম। তুমি এখন ইহা বুঝিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকিলে 'তাওয়াক্কুল ও তাওহীদ' নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু আভাস দেওয়া হইবে। তবে তোমাদের বোধশক্তির অনুরূপ এস্থলে কিছু বুঝিয়া লও। ধরিয়া লও যে, কার্য তোমার স্বীয় ক্ষমতা প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু কোন কার্যই শক্তি, ইচ্ছা ও জ্ঞান ব্যতিরেকে নির্বাহ হয় না এবং এই তিনটিই তোমার কার্যের কারণ বা কুঞ্জী। এই তিনটি বস্তুই আল্লাহ্ প্রদত্ত তিনটি মহাদান। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, এক সুদৃঢ় ধনাগারে বহু ধন-সম্পদ রহিয়াছে। তোমার নিকট ইহার চাবি নাই বলিয়া তুমি ইহার কিছুই লইতে পারিতেছ না। কিন্তু খাজাঞ্চী দয়া করিয়া তোমাকে চাবিটি দিয়া দিলেন এবং তুমি ইহা দ্বারা কপাট খুলিয়া ইচ্ছামত ধন বাহির করিয়া লইলে। এমতাবস্থায়, তোমার ধন প্রাপ্তির কারণ কাহাকে বলিবে ? যিনি তোমাকে চাবি দিলেন তাঁহাকে কারণ বলিবে ? না, যে হস্ত দ্বারা তুমি ধন তুলিয়া লইলে ইহাকে ধন লাভের কারণ বলিবে ? তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, তিনি যখন চাবি দিলেন, তখন ধন তুলিয়া লওয়া কোন দুঃসাধ্য কাজ নহে। সুতরাং যিনি চাবি দিয়াছেন, তিনিই তোমার ধন লাভের প্রধান মূল কারণ। ফল কথা এই যে, কাজের চাবিস্বরূপ তোমার শক্তি ও ইহার সমুদয় উপকরণ একমাত্র মহাপ্রভু আল্লাহ্ই তোমাকে অনুগ্রহপূর্বক দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আশ্চর্য বোধ করা উচিত যে, তিনি ইবাদত-কার্যের চাবি তোমাকে দান করিয়াছেন এবং ফাসিক দুরাচারদিগকে ইহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আর অপর লোককে পাপের চাবি প্রদান করত তাহাদের জন্য ইবাদতের ধন-ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ধারণা করিও না যে, তাহাদের কোন পাপের জন্য তাহাদের প্রতি ইবাদতের ধন-ভাণ্ডার রুদ্ধ রাখা হইল, বরং যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই এইরূপ করা হইয়াছে। অপরপক্ষে তোমাকে যে ইবাদতের ধন-ভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হইয়াছে, ইহা তোমার নিজস্ব কোন গুণের কারণে নহে; বরং শুধু অনুগ্রহপূর্বক তিনি তোমাকে ইহা দান করিয়াছেন। যাহাই হউক, যে ব্যক্তি একত্ববাদের গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সে কখনই আত্মগর্ব করিতে পারে না।

একেবারে নিঃস্ব নিঃসম্বল অথচ বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি অভিযোগ করিয়া বলে—"মহাপ্রভু আল্লাহ্ মূর্খকে ধন দান করিলেন, আর আমার মতো বুদ্ধিমানকে নির্ধন রাখিলেন।" তবে ইহাতেও আত্মগর্ব প্রকাশ পায়। এমন বুদ্ধিমানের জানা উচিত যে, বুদ্ধি সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। ইহাও আল্লাহ্ প্রদত্ত এক মহাদান। আল্লাহ্ একজনকে বুদ্ধি ও ধন, উভয় উৎকৃষ্ট পদার্থ দান করত নির্বোধকে উভয় হইতে বঞ্চিত রাখিলে ন্যায়-সঙ্গত হইত না। আর অভিযোগকারী বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বিনিময়ে ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না। এক দরিদ্র পরম রূপবতী মহিলা কোন কদাকার মহিলাকে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত দেখিয়া বলিতে পারে—"হে আল্লাহ্, তুমি এই কদাকার মহিলাকে যে প্রচুর ধন-দৌলত দান করিয়াছ, উহা তাহার জন্য একেবারেই শোভা পায় না।" তদ্রূপ রূপবতীকে ইহা বুঝা উচিত যে, আল্লাহ্ তাহাকে যে সৌন্দর্য দান

করিয়াছেন, তাহা ঐ কদাকার মহিলার অলঙ্কার ও ধন অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। ধন ও সৌন্দর্য একজনকে দান করিয়া অপরজনকে উভয় বস্তু হইতে বঞ্চিত রাখিলে অবিচার করা হইত। বাদশাহ্ এক ব্যক্তিকে অশ্ব ও অপরকে ভৃত্য দান করিলেন। এমতাবস্থায়, অশ্বগ্রহীতার পক্ষে এ কথা বলা সঙ্গত হইবে না যে, বাদশাহ্ তাহাকে অশ্ব ও ভৃত্য উভয়টি দিলেন না কেন ? অপরকে ভৃত্য দিলেন কেন ? এমন কথা বলা নিতান্ত মূর্খতা।

হযরত দাঊদ আলায়হিস সালাম একদা আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করিলেন–"আমার সন্তানগণের মধ্যে কেহ না কেহ সারারাত্রি নামায পড়ে না, এমন কোন রজনী রাখে না, এইরূপ কোন দিন গত হয় না।" তখন ওহী অবতীর্ণ হইল–"হে দাঊদ, আমি তাহাদিগকে এই ক্ষমতা না দিলে কিরূপে তাহারা তদ্রূপ কাজ করিতে পারিত ? এখন ক্ষণকালের জন্য তোমাকে তোমার বিচার-বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিলাম।" আল্লাহ্ যখন হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামকে নিমিষের জন্য তাঁহার বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিলেন, তখন তিনি এমন ভুল করিয়া ফেলিলেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হইল। হযরত আয়ূব আলায়হিস সালাম নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্, তুমি আমার উপর যে বিপদ অবতীর্ণ করিয়াছ, ইহা আমি অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছি। তুমি যাহা করিতেছ, ইহাতেই আমি পরিতুষ্ট রহিয়াছি এবং একটুও অধৈর্য প্রদর্শন করি নাই।" তৎক্ষণাত তিনি গায়েবী বাণী শুনিতে পাইলেন–"হে আয়ূব, এইরূপ ধৈর্য-শক্তি তোমাকে কে দান করিল ?" ইহা শুনিয়া হযরত আয়ূব (আ) সতর্ক হইলেন এবং মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করত নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্, একমাত্র তোমার অনুগ্রহ ও সাহায্যেই আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিয়াছি।" আল্লাহ্ বলেন–"আমার দয়া না হইলে কেহই সৎকর্মের পথ অবলম্বন করিতে পারিত না।" এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,–"কেহই স্বীয় কার্যের কারণে পরিত্রাণ পাইবে না।" ইহা শুনিয়া সাহাব্রাগণ নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনিও কি পাইবেন না ?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত আমিও পাইব না।" এইজন্যই বড় বড় সাহাবাগণ বলিতেন–"হায়! আমি যদি মাটি হইতাম বা আমার জন্মই না হইত।"

অতএব যে ব্যক্তি উপরিউক্ত বিষয়সমূহ সম্যকরূপে অবগত হইয়াছে, সে কখনও অহংকার ও আত্মগর্ব করিতে পারে না।

কৌলীন্য ও গুণজনিত আত্মগর্ব—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, শক্তি, সৌন্দর্য ও কৌলীন্য কাহারও আয়ত্ত এবং স্বীয় চেষ্টায় অর্জিত নহে। অথচ কোন কোন লোক এত মূর্খ যে, উহা লইয়া তাহারা আত্মগর্বে মাতিয়া উঠে। ইহা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। আলিম ও আবিদ স্বীয় অর্জিত ইল্ম ও অনুষ্ঠিত ইবাদত লইয়া আত্মগর্ব করিবার অবকাশ আছে বলিয়া হয়ত কল্পনা করিতে পারে। কিন্তু অনায়ত্ত ও অনর্জিত বিষয় অবলম্বনে

গর্ব করা নিরেট মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোকে রাজপুরুষদের সহিত সম্বন্ধ লইয়া বৃথা গর্ব করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল রাজপুরুষ দোযখে কিরূপ শাস্তি পাইবে, ইহা যদি তাহারা দেখিতে পাইত, তবে তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইবার ইচ্ছা করিত না; বরং তাহাদের সম্বন্ধ উল্লেখ করিতে নিতান্ত লজ্জাবোধ করিত। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বংশ অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশ আর নাই। তথাপি এই বংশ লইয়াও গর্ব করা নিরর্থক। কোন কোন লোক পবিত্র বংশজাত বলিয়া এত গর্বিত যে, তাহারা মনে করে পাপ তাহাদের কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। এই শ্রেণীর লোক যথেচ্ছা পাপ করিয়া বেড়ায়। তাহারা বুঝে না যে, পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধাচরণ করত পাপ করিলে পূর্ব সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাদের পূর্বপুরুষগণ বংশ সম্বন্ধকে কৌলীন্যের কারণ না জানিয়া নিজেদের পরহেযগারী ও সৎস্বভাবকে কৌলীন্যের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। কেননা, পূর্বপুরুষদের মধ্যে এমন লোকও থাকিতে পারে যাহারা দোযখী।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বংশ লইয়া গর্ব করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলেন–"সকল লোকই হযরত আদম আলায়হিস সালামের সন্তান এবং তিনি মাটি হইতে সৃজিত।" হযরত বিলাল রাযিআল্লাহু আন্হু আযান দিতে আরম্ভ করিলে কুরায়শগণ বলিত–"এই হাবশী গোলামকে এই সম্মানজনক পদ প্রদান করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?" এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের নিমিত্ত আল্লাহ্ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেযগারগণ আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত" (সূরা হুজুরাত, ২ রুকূ, ২৬ পারা।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আদেশ হইল–

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ

"আর আপনি অতি নিকট সম্বন্ধের আত্মীয়গণকে (আখিরাতের) ভয় প্রদর্শন করুন।" (সূরা শুআরা, ১১ রুকূ।) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি হযরত ফাতিমা রাযিআল্লাহু আন্হাকে বলিলেন–"হে মুহাম্মদ তনয়া, স্বীয় পরিত্রাণের উপায় কর; (অন্যথা) কিয়ামত দিবসে আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারিব না।" তৎপর তিনি হযরত সুফিয়া রাযিআল্লাহু আন্হাকে বলিলেন–"হে মুহাম্মদের (সা) ফুফু, নিজ ইবাদত কার্যে ব্যাপৃত থাকুন। (তাহা না হইলে কিয়ামত দিবস) আমি আপনার কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।" হযরতের সহিত বংশগত সম্বন্ধ থাকাতে যদি পরকালে উপকার হইত, তবে তিনি স্বীয় কন্যাকে পরহেযগারীর কষ্ট হইতে মুক্তি

দিতেন যেন হযরত ফতিমা রাযিআল্লাহু আন্হা আনন্দ ও সুখে জীবন-যাপন করত উভয় লোকে অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারেন। তবে ইহা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) আত্মীয়-স্বজনগণই তাঁহার শাফা'আতের বেশী আশা করিতে পারেন। কিন্তু পাপ করত শাফা'আতের অযোগ্য না হওয়া আবশ্যক। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

"আর (আল্লাহ্) যাহাকে পছন্দ করেন, তাহাকে ব্যতীত তাঁহারা শাফা'আত (সুপারিশ) করিবেন না" (সূরা আম্বিয়া, ২ রুকূ, ১৭ পারা)।

শাফা'আতের উপর নির্ভর করত যদৃচ্ছা পাপ করিয়া যাওয়া এবং নির্ভীক থাকা এইরূপ, যেমন নিজের পিতা সুদক্ষ চিকিৎসক বলিয়া কোন রোগী ইচ্ছামত কুপথ্য সেবন করে। এইরূপ রোগীকে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, এমন পীড়াও আছে যাহার কোন চিকিৎসা নাই; এবং নিতান্ত সুদক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসাও উহার জন্য উপকারী হয় না। চিকিৎসকের পক্ষে উপসর্গ উপশম করা যেন সহজ হয়, রোগীর স্বভাব তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। অপরপক্ষে বাদশাহ্ যাহাকে ভালবাসেন তাহার সকল সুপারিশই তিনি গ্রহণ করিবেন ইহাও সঠিক নহে। বাদশাহ্‌র মহাশত্রুর জন্য অনুরোধ করিলে ইহা উপেক্ষিত হইয়া থাক। প্রতিটি পাপই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি টানিয়া আনে ; কারণ, মহাপ্রভু আল্লাহ্ পাপের অন্তরালে স্বীয় অসন্তুষ্টি লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। যে পাপকে তুমি লঘু বলিয়া মনে করিতেছ, বিচিত্র নহে যে, ইহাই আল্লাহ্‌র মহা অসন্তুষ্টির কারণ হইয়া উঠিবে। যেমন আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন–"তোমরা যাহাকে লঘু বলিয়া মনে কর, আল্লাহ্‌র নিকট উহা অতি গুরু।" প্রত্যেক মুসলমানই শাফা'আতের আশা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক এই আশার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। আর যাহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, সে কখনও অহংকার ও আত্মগর্ব করিতে পারে না।

দশম অধ্যায়

উদাসীনতা অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার প্রতিকার

পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকার কারণে– প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, পারলৌকিক লাভে কেহ বঞ্চিত থাকিলে ইহাই বুঝিতে হইতে যে, সে পরকালের পথ আদৌ অবলম্বন করে নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে, সে পথটি সম্বন্ধেই অজ্ঞ ছিল অথবা অবগত থাকিলেও এই পথ চলিতে পারে নাই। চলিতে না পারিবার কারণ এই যে, সে কুপ্রবৃত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল এবং ইহা হইতে সে মুক্তি পায় নাই। এইজন্যই সে অমনোযোগী ও উদাসীন ছিল; পথ ভুলিয়া গিয়াছিল বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে সঠিক পথ হারাইয়া বসিয়াছিল। পথ চলিবার অক্ষমতা হইতে যে দুর্ভাগ্য ঘটে, ইহা ইতঃপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। অজ্ঞানতার কারণে যে দুর্ভাগ্য ঘটে, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

অক্ষমতাজনিত ধর্মপথে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকতা—যাহারা অক্ষমতার কারণে ধর্মপথে চলিতে না পারিয়া সৌভাগ্য বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে দুর্বল পথিকের সহিত তুলনা করা চলে। চলিবার যথেষ্ট ইচ্ছা তাহাদের থাকিলেও পথ নিতান্ত দুর্গম ও বিপদসংকুল বলিয়া নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাহারা ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। ধর্মপথে ধন-লিপ্সা, প্রভুত্ব প্রিয়তা ও সম্মান-কামনা, ভোজন-লালসা, কামরিপু প্রভৃতি বিপদ-সঙ্কুল গিরিসংকট রহিয়াছে। ধর্মপথ-যাত্রীগণের কেহ তন্মধ্যে একটি কেহ দুইটি, কেহবা তিনটি গিরিসংকট অতিক্রম করতে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সবগুলি গিরিসংকট অতিক্রম না করিয়া কেহই গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে পারে না।

ধর্মপথ-যাত্রীর অজ্ঞতাজনিত দুর্গতি—তিন প্রকার অজ্ঞতাবশত ধর্মপথ যাত্রীর দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। প্রথম প্রকার অজ্ঞানতা হইল উদাসীনতা। ইহার উপমা এইরূপ– মনে কর, কোন পথিক স্বীয় গন্তব্য পথ পাইল; কিন্তু সেই পথে মাথা রাখিয়া সে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিল। সহযাত্রীদল প্রস্থান করিল। এমতাবস্থায়, কেহ তাহাকে না জাগাইলে তাহার সর্বনাশ হইবে। দ্বিতীয় প্রকার অজ্ঞানতা হইল পথভ্রান্তি। ইহার উদাহরণ এই যে, মনে কর যাহারা গন্তব্য স্থান পূর্ব দিকে সেই ব্যক্তি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল। এমতবস্থায়, সে যতই ধাবিত হইবে ততই অভিলাষিত স্থান হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে। ইহাই মহা পথভ্রষ্টতা। তৃতীয় প্রকার অজ্ঞনতা হইল, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করিয়া

ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া। একটি উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। হজ্জযাত্রী জানে যে, আরবের মরুপ্রান্তরে পাথেয়স্বরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণের আবশ্যক। সুতরাং সে তাহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করত স্বর্ণে পরিণত করিয়া লইল। কিন্তু বিশুদ্ধ স্বর্ণ ভ্রমে সে কৃত্রিম ও দোষযুক্ত স্বর্ণ গ্রহণ করত ভাবিতে লাগিল যে, পাথেয় সঞ্চিত হইয়াছে এবং অনায়াসে সে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া যাইবে। কিন্তু আরব প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য যখন সে সেই মেকী স্বর্ণ বাহির করিবে, তখন ইহা গ্রহণ করা ত দূরে থাকুক, ইহার প্রতি কেহই দৃষ্টিপাতও করিবে না। তখন সেই নিঃসহায় বিদেশী পথিকের অনুতাপ ও পরিতাপের অন্ত থাকিবে না। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন লোকে সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন, "আমি কি তোমাদিগকে এমন লোকের কথা বলিব যাহারা কার্য করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে? তাহাদের জীবনব্যাপী পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। অথচ তাহারা মনে করিত যে, তাহারা উত্তম কার্য করিয়াছে" (সূরা কাহাফ, ১২ রুকূ, ১৬ পারা)।

ধর্মপথ-যাত্রীর কর্তব্য—উল্লিখিত হজ্জ-যাত্রীর পক্ষে সর্বাগ্রে পোদ্দারি শিক্ষা করত তৎপর পাথেয় স্বর্ণ সংগ্রহ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে কৃত্রিম অকৃত্রিম স্বর্ণ সে চিনিয়া লইতে পারিত। নিজে পরীক্ষা করিতে না জানিলে অভিজ্ঞ স্বর্ণ-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লওয়া আবশ্যক ছিল। ইহাও করিতে অক্ষম হইলে একটি কষ্টি-পাথর সংগ্রহ করিয়া লওয়া কর্তব্য ছিল। স্বর্ণ-পরীক্ষক সুনিপুণ পীর ও উস্তাদসদৃশ। সুতরাং, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ ও অসৎ চিনিবার ক্ষমতা অর্জন করত সুদক্ষ পীরের তুল্য হওয়া আবশ্যক। ইহাতে অক্ষম হইলে কোন অভিজ্ঞ পীরের সাহচর্যে নিজে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে। এই উভয়টির কোনটিই করিতে না পরিতে অন্ততপক্ষে তাহাকে কষ্টি পাথরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষের কুপ্রবৃত্তিই এই কষ্টি-পাথর। কুপ্রবৃত্তি যাহা করিতে আদেশ করে বাতিল ও মিথ্যা জ্ঞানে ইহা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলে কখন কখন ভুলভ্রান্তিও হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কার্য ঠিকভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অতএব মানুষের দুর্গতির মূল কারণ অজ্ঞানতা। ইহা তিন প্রকার। এই তিন প্রকার অজ্ঞানতার বিস্তৃত পরিচয় এবং দূর করিবার উপায় অবগত হওয়া সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য। মূল কারণ, ইলম এবং ইহার দ্বিবিধ মূল সূত্র আছে। প্রথম, পথের পরিচয় লাভ ও দ্বিতীয়, পথে চলা। এই দুইটি মূল সূত্র লাভ হইলে সৌভাগ্য পাইবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই জন্যই হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু আন্হু সংক্ষেপে দোয়া করিতেন–

اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهٗ

"হে আল্লাহ্, আমাদের নিকট সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন কর এবং তদনুসারে চলিতে আমাদিগকে ক্ষমতা দান কর।"

ইতিপূর্বে পথ-চলার অক্ষমতা দূরীকরণের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এখন পথ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দূরীকরণের উপায় বর্ণিত হইবে।

উদাসীনতা ও অজ্ঞানতা-পাশ হইতে অব্যাহতির উপায়—প্রিয়, পাঠক, অবগত হও, অধিকাংশ লোক যে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে, উদাসীনতা ইহার একমাত্র কারণ। শতকরা নিরানব্বই জনের পক্ষে এই কথা খাটে। পরকালের ভয় হইতে উদ্বেগহীন হওয়াকে এস্থলে উদাসীনতা বলা হইয়াছে। মানব পরকালের সংকট সম্পর্কে সতর্ক থাকিলে পাপ করিতে পারিত না। কারণ, মহাপ্রভু আল্লাহ্ ইহা মানবের প্রকৃতিগত করিয়া দিয়াছেন যে, যাহাতে তাহার প্রাণনাশের আশঙ্কা রহিয়াছে সে ইহার ত্রিসীমায়ও যায় না। ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইলেও সে উহা অম্লান বদনে সহ্য করে।

মোহাচ্ছন্ন মানবজাতির পথ-প্রদর্শক—পরকালের বিপদ সামান্য জ্ঞানে বুঝা যায় না। কেবল নবীগণ নবুওয়াতের আলোকে উহা অবগত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে যাঁহারা জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও উহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আবার নবীগণের স্থলাভিষিক্ত আলিমগণও উহা জানিতে পারিয়াছেন। সাধারণ লোককে উক্ত তিন শ্রেণীর লোকেরা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করত মানিয়া লইতে হইবে। যে ব্যক্তি পথিমধ্যে ঘুম ঘোরে অচেতন রহিয়াছে কোন জাগ্রত দয়ালু বন্ধুকে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত নিদ্রিত জনের আর উপায় নাই। মোহ-ঘুমে অচেতন মানবজাতিকে স্নেহভরে ডাকিয়া জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু আল্লাহ্ বিশ্বমাবতার পরম বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জগতে প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রতিনিধি আলিমদগণও সর্বদা মানবজাতিকে সতর্ক করিয়া আসিতেছেন। মহাপ্রভু আল্লাহ্ সকল নবীকেই এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এক স্থানে এই সম্বন্ধে যাহা বলেন, ইহার ভাবার্থ এই হে মুহাম্মদ (সা), মোহ-ঘুমে অচেতন মানবজাতিকে জাগ্রত করিবার জন্য আমি আপনাকে জগতে পাঠাইয়াছি। আপনি সমস্ত লোককে জানাইয়া দেন যে, ঈমানদার ও সৎলোক ব্যতীত আর সকলেই দোযখের প্রান্তে অবস্থিত রহিয়াছে। অপর একস্থানে তিনি যাহা বলেন তাহার ভাবার্থ এই– যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়াছে ও কুপ্রবৃত্তির আদেশ মানিয়া চলিতেছে, সে দোযখে পতিত হইয়াছে। মানুষের কুপ্রবৃত্তিসমূহ দোযখ গর্তে বিছানো পুরাতন চাটাইসদৃশ। যে ব্যক্তি এইরূপ চাটাইর উপর দিয়া চলিবে, সে অবশ্যই দোযখে যাইয়া পড়িবে। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

কুপ্রবৃত্তিসমূহ বেহেশতে গমনের পথে বিপদসঙ্কুল দুর্গম গিরিসংকট তুল্য। যে ব্যক্তি ইহা অতিক্রম করিতে পারিবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশতে পৌঁছিবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন– "দোযখ মনোরম কুপ্রবৃত্তি দ্বারা বেষ্টিত এবং বেহেশ্‌ত অপ্রীতিকর দুঃখ-কষ্ট দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে।" মানব-বসতি হইতে বিচ্ছিন্ন বনভূমি ও পর্বতের অধিবাসীগণের মধ্যে আলিম নিতান্ত বিরল। সুতরাং তাহারা মোহ-ঘুমে অচেতন ও কর্তব্য কর্মে উদাসীন থাকে। পরকালের বিভীষিকা সম্পর্কে তো তাহারা নিজেরা অজ্ঞাত, আর তাহাদিগকে কেহ জাগ্রতও করে না। এই কারণে তাহারা ধর্মপথ হইতে বিমুখ। পল্লীবাসীদের অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা পল্লীগ্রামেও আলিম নিতান্ত কম হইয়া থাকে। তাই পল্লীগ্রামকে কবরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন–

اَهْلُ الْكُوْرِ اَهْلُ الْقُبُوْرِ

"পল্লীবাসী কবরে স্থাপিত লোকের তুল্য।"

খাঁটি উপদেষ্টার অভাবে মানবের দুর্গতি—যে শহরে কোন আলিম নাই বা থাকিলেও তাহারা লোকদিগকে উপদেশ দান করে না, কেবল সংসার লইয়া মত্ত থাকে এবং ধর্ম-কর্মে বিমুখ, সেই শহরের অধিবাসীগণও মোহে অচেতন থাকে। কারণ, যাহারা লোকদিগকে জাগ্রত করিবে তাহারা নিজেরাই ঘুমঘোরে অচেতন। এমতাবস্থায়, কিরূপে তাহারা অপরকে জাগাইবে? আবার যে শহরের আলিমগণ উপদেশ দানের নিমিত্ত বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হয়, ওয়াযের সভা অনুষ্ঠিত করে এবং বাজে ও অসার বক্তাদের ন্যায় ভাষণ দান করে, হাস্যোদ্দীপক উক্তি ও নিরর্থক সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করে, আর আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া লোককে ধোঁকা দিয়া যেন বুঝাইয়া দেয় যে, তাহারা খাঁটি ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে যে কোন রীতিনীতি অবলম্বন করুক না কে, কখনই তাহারা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত হইবে না, তবে সেই শহরের লোকের অবস্থা মোহাচ্ছন্ন অচেতন লোকের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয়। এমন লোকের দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, মনে কর, কেহ পথিমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়া তীব্র মদিরা পান করাইল এবং ফলে সে ঘোর মাতাল হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ইতিপূর্বে তদ্রূপ অজ্ঞ ও নিদ্রিত হতভাগা ত সকলের কথাই শুনিতে পাইত এবং অপরের আহ্বানে অনায়াসে জাগ্রত হইতে পারিত। কিন্তু এখন তাহার এই অবস্থা দাঁড়াইল যে, তাহার মাথায় পঞ্চাশ লাথি মারিলেও সে কিছুমাত্রই টের পাইবে না।

নির্বোধ লোকেরা সংসারমত্ত উক্তরূপ উপদেশকের কথা শুনিলে এমন হয় যে, পরকালের চিন্তাও তাহাদের মনে উদয় হয় না এবং পরকালের ভয় দেখাইলে তাহারা বলে– "ওহে, আল্লাহ্ নিতান্ত দয়ালু এবং অসীম অনুগ্রহকারী। আমার পাপে তাঁহার কি ক্ষতি হইবে? তাঁহার বেহেশ্‌ত এত প্রশস্ত যে, ইহাতে আমার ন্যায় বহু পাপীর জন্য স্থানের অনটন ঘটিবে না।" এইরূপ আরও বহু অসার কল্পনা তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয়। একমাত্র নিরেট মূর্খগণই তেমন উক্তি করিয়া থাকে। যে সকল বক্তা ঐ প্রকার বক্তৃতা দ্বারা লোকের মনে তদ্রূপ অসার কল্পনার সঞ্চার করে তাহার লোকের ধর্মভাব বিনাশের চেষ্টায় তৎপর রহিয়াছে। যে চিকিৎসক উষ্ণতাজনিত পীড়ায় মুমূর্ষু রোগীকে মধু সেবনের ব্যবস্থা দেয় এবং মনে করে যে, ইহাতে রোগের উপশম হইবে তাহার সহিত তদ্রূপ উপদেশকের তুলনা করা চলে। এই কথা জন্মে মধু কেবল তৎসমুদয়ই দূর করিতে পারে।

রহ্‌মতসূচক আয়াত ও হাদীস বিবিধ পীড়ানাশক—কুরআন শরীফের যে সকল আয়াত ও হাদীস বাণী আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণার আশা বৃদ্ধি করে উহা অবশ্য মানসিক পীড়ার ঔষধ বটে। কিন্তু শুধু দুই প্রকার রোগী এই ঔষধে উপকার পাইয়া থাকে। **প্রথম প্রকার**—যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পাপ করত আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইয়াছে এবং হতাশায় পাপ হইতে তওবা করিয়া সৎপথে প্রত্যাবর্তন করিতে সাহস পাইতেছে না এবং মনে করে যে, আল্লাহ্ তাহার তওবা কবুল করিবে না, এমন হতাশ লোকের পক্ষে রহমতসূচক আয়াত ও হাদীস বাণী মহৌষধ বটে। এই রহমতসূচক একখানা আয়াতের ভাবার্থ এই– আল্লাহ্ বলেন, "হে মুহাম্মদ (সা), আমার বান্দাগণকে অবহিত করুন যে, হতাশা যেন তাহাদের হৃদয়ে স্থান না পায়। তাহারা যদি তওবা করিয়া তৎপ্রতি প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁহার আদেশ মানিয়া চলে, তবে আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন।" **দ্বিতীয় প্রকার**—যাহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে অস্থির হইয়াছে, এক মুহূর্তের জন্যও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না– অনাহারে অনিদ্রায় সর্বদা কঠোর পরিশ্রম ও অসীম সাধনায় নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত করিয়া শরীরপাত করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু ইহাতেও সে পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না, এমন ব্যথাতুর লোকের পক্ষে রহ্‌মত প্রকাশক আয়াত শান্তিদায়ক হইয়া থাকে।

রহমতসূচক আয়াত ও হাদীস পাঠে স্থলবিশেষে ক্ষতি—পরকালের প্রতি ভয়শূণ্য লোকদিগকে করুণার বাণী শুনাইলে কাটা ঘায়ে লবণ ছিটার ন্যায় কাজ করে। অর্থাৎ তাহাদের মানসিক পীড়া অধিকতর বৃদ্ধি পায়। কোন চিকিৎসক উষ্ণতাজনিত রোগে মধু সেবনের ব্যবস্থা দিয়া যেমন রোগীর প্রাণনাশ করে এবং নিজেও অপরাধী হয়, তদ্রূপ সংসারাসক্ত ঐ প্রকার উপদেশকে আলিমও উদাসীন লোকের ধর্মজীবন বিনাশ করতে পাপী হয়। তেমন আলিম দজ্জালের সাথী ও শয়তানের পরম বন্ধু। যে স্থানে এই প্রকার আলিমের আবির্ভাব হয়, তথায় শয়তানের কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ, তদ্রূপ আলিমই তথায় শয়তানের সুনিপূর্ণ প্রতিনিধিরূপে কাজ করিয়া থাকে। আবার যে সকল আলিম ইলম অনুযায়ী কাজ করে না, তাহাদের খাঁটি উপদেশও ধর্মের প্রতি লোকের শিথিলতা বিদূরিত হয় না।

সংসারাসক্ত উপদেশক আলিমের অবস্থা—সংসারাসক্ত উপদেশক আলিমের অবস্থা এইরূপ– মনে কর, এক ব্যক্তি সুস্বাদু 'লোযিনা' নামক লোভনীয় হালুয়া সম্মুখে রাখিয়া খাইতেছে এবং সুললিত বচনে অপর লোককে ডাকিয়া বলিতেছে– "হে লোকগণ, তোমরা ইহার ত্রিসীমানায়ও আসিও না। ইহাতে মারাত্মক বিষ মিশানো আছে।" এমতাবস্থায়, বক্তার কথা শুনিয়া লোকের মনে 'লোযিনা' ভক্ষণের লোভ অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। আর তাহারা মনে করিবে– "এই ব্যক্তি একাই সবগুলি ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়েই হয়তো অপরকে ইহার নিকটবর্তী হইতেও নিষেধ করিতেছে।"

প্রকৃত উপদেশক আলিমের পরিচয়—প্রকৃত উপদেশক আলিমের কথাও কার্য, উভয়ই পূর্বকালের বুযুর্গগণের অনুরূপ শরীয়ত-সঙ্গত হইয়া থাকে। তদ্রূপ ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ করিলে মোহ-মুগ্ধ অচেতন লোক জাগরিত হইবে। উপদেশককে জনপ্রিয় না হইলে সব লোক তাহার উপদেশ শুনিতে আসিবে না। এমতাবস্থায়, ধর্মপ্রাণ খাঁটি আলিমের পক্ষে যথাসাধ্য অপরের গৃহে গমন করত মধুর বচনে লোককে বুঝাইয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে আনয়নের চেষ্টা করা উচিত।

লোকের দূরবস্থার কারণ—উল্লিখিত বিস্তৃত বর্ণনা হইতে ইহা প্রমাণিত হইল যে, বর্তমানকালে হাজারের মধ্যে নয় শত নিরানব্বাই জন লোকই পরকালের কথা ভুলিয়া সংসারের মোহে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আর মোহ এমন এক সাংঘাতিক পীড়া যে, ইহার চিকিৎসা রোগী করাইতে পারে না। কেননা, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি যে মোহ-রোগে আক্রান্ত সে নিজেই ইহা জানে না। সুতরাং সে রোগের চিকিৎসা করাইবে কিরূপে? বালক-বালিকা যেমন মাতা-পিতা বা শিক্ষকের আহ্বানে জাগরিত হয়, আবাল-বৃদ্ধবণিতা তদ্রূপ খাঁটি উপদেশক আলিমের কথা শুনিয়া সচেতন হইতে পারে। প্রকৃত আলিমের সংখ্যা জগতে দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এইজন্যই মোহ-পীড়া মানব সমাজ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অপরপক্ষে, উপদেশকগণ পরকালের কথা কিছু বলিলেও তাহাদের নিজেদের হৃদয়ে পরকালের ভয় লেশমাত্রও নাই। এমন উপদেশকের কথায় সমাজের কোন উপকারই হয় না।

পথভ্রান্তি ও ইহার প্রতিকার

পরকাল সম্পর্কে ভ্রান্তির কারণ—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, অনেক লোক পরকাল সম্পর্কে একেবারে অচেতন নহে। কিন্তু ভ্রমাত্মক ধারণার বশীভূত হইয়া তাহারা সৎপথ হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং এই পথভ্রান্তিই তাহাদের জন্য এক বিষম পর্দা হইয়াছে। ইহা সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য পাঁচটি উপমা দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম উপমা—কেহ কেহ পরকালকে একেবারে অস্বীকার করত বলে, মানুষ মরিলেই সব শেষ হইল; তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। যেমন প্রদীপের

তৈল নিঃশেষ হইলেই আলো নিবিয়া ফুরাইয়া যায়, মানুষের পরিণামও তদ্রূপ। এইজন্যই তাহারা পরহেযগারী পরিত্যাগ করত আমোদ-প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করে এবং মনে যে, নবীগণ মানবজাতির শুধু পার্থিব বিষয়াদি সংশোধনের উদ্দেশ্যে বা লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত নিজ-নিজ মতাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পরকালে অবিশ্বাসী লোকেরা মনে করে, বালক-বালিকাদিগকে ভয় দেখাইয়া যেমন বলা হইয়া থাকে যে, তোমরা পাঠশালায় না গেলে তোমাদিগকে ইঁদুরের গর্তে পুরিয়া রাখিব, দোযখের ভয়ও তদ্রূপ অসম্ভব কল্পনামাত্র। পরকালে অবিশ্বাসীগণ যদি এই দৃষ্টান্তটিকে মনোযোগের সহিত বুঝিবার চেষ্টা করিত, তবে পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হইত যে, পাঠশালায় না যাওয়ার কারণে ভবিষ্যত জীবনে বালক-বালিকাগণকে যে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, ইহা ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ভীতিপ্রদ। কারণ, যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র দীদার হইতে বঞ্চিত থাকার যাতনা দোযখের শাস্তি অপেক্ষা ভীষণ পীড়াদায়ক। কু-প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণের দরুনই পরকালে অবিশ্বাসীগণ এইরূপ উক্তি ও ভ্রমাত্মক ধারণা করিয়া থাকে এবং উহা তাহাদের স্বভাবগত হইয়া পড়ে। শেষ যমানায় বহু লোকের অন্তরে পরকালের প্রতি অবিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠিবে। তাহারা ভাষায় কিছু ব্যক্ত না করিলেও অন্তরস্থ লুক্কায়িত তাহাদের কর্ম ও হাবভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। তাহাদের বুদ্ধির এমন বিভ্রাট ঘটিয়াছে যে, সংসারের ক্ষণভঙ্গুর বিপদাশঙ্কায় তাহারা সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে। কিন্তু পরকালে বিশ্বাসী হইলে পরকাল-ভীতিকে তাহারা এত লঘু বলিয়া মনে করিত না।

পরকাল-অবিশ্বাস দূরীকরণের উপায়—যাহাদের হৃদয়ে পরকালে অবিশ্বাসরূপ পীড়া প্রবেশ করিয়াছে, পরকালের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া লওয়াই ইহার একমাত্র ঔষধ। তিনটি উপায়ে পরকালের অবস্থা জানা যাইতে পারে।

প্রথম উপায়—প্রত্যক্ষ দর্শন। বেহেশ্‌ত, দোযখ এবং পরহেযগার ও পাপিষ্ঠলোকদের পরিণাম প্রত্যক্ষভাবে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলে পরকালে অবিশ্বাস বিদূরিত হয়। কিন্তু ইহা একমাত্র নবী ও ওলীগণের পক্ষেই সম্ভবপর। তাঁহারা সংসারে অবস্থানকালেও সকল পার্থিব বিষয় ও সম্পর্ক ভুলিয়া পরকালে পরকালের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতে পান। জীবিতাবস্থায় মানবের শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং উহা হইতে উৎপন্ন সংস্কার ও আসক্তি বিজড়িত হইয়া পরকালের অবস্থা দর্শনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। দর্শন-পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায় এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। যাহাই হউক, নবী ও ওলীগণের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন ক্ষমতা নিতান্ত দুর্লভ। যাহারা পরকালেই অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ নিদর্শনের বিষয় বলিয়াই বা লাভ কি?

বলিলেও তাহারা উহা কিরূপে করিবে এবং চেষ্টা করিলেও তাহারা কি প্রকারে ইহা লাভ করিবে?

দ্বিতীয় উপায়—যুক্তি প্রমাণ। যুক্তি-প্রমাণাদি দ্বারা দ্বারা মানুষ আত্মা ও ইহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিলে বুঝিতে পারে যে, আত্মা এমন একটি অস্তিত্ব যাহা স্বয়ং বিদ্যমান। ইহা শরীরের আশ্রয় সাপেক্ষ নহে, বরং নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং বিদ্যমান আছে; দেহ সৃজনের পূর্বেও ছিল এবং দেহ না থাকিলেও বর্তমান থাকিবে। মধ্যবর্তীকালে দেহকে সৃজন করিয়া শুধু আত্মার বাহনস্বরূপ নিযুক্ত করা হইয়াছে। আত্মার সহিত দেহের কোন সাদৃশ্য নাই। মৃত্যুর পর দেহ মাটির সহিত মিশিয়া গেলেও আত্মা পূর্বের ন্যায় স্বীয় সত্ত্বায় বিদ্যমান থাকিবে। এই প্রকার অন্তর্দৃষ্টি লাভের পন্থাও নিতান্ত দুর্গম ও কঠিন। বিশেষ অভিজ্ঞ আলিমগণের পক্ষেই এইরূপ যুক্তি ও প্রমাণের পথ প্রশস্ত দর্শন-পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় উপায়—অনুসরণ। সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত পথ। নবী, ওলী ও অভিজ্ঞ আলিমগণের দর্শন লাভ করিলে পরকালের জ্ঞানালোক অন্তরে প্রবেশ করে। তাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া যে সৌভাগ্য লাভ হয়, ইহাকে প্রকৃত ঈমান বলে। কামিল পীর ও পরহেযগার আলিমের সংসর্গে থাকিয়াও যে ব্যক্তির ধর্মজ্ঞান জন্মে না, সে পরম হতভাগা। আবার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে পীর ও আলিম যত উন্নত হন, তাঁহাদের সংসর্গে লোকের ঈমানও তত দৃঢ় ও সতেজ হইয়া উঠে। এইজন্যই সাহাবাগণ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) দর্শন ও সংসর্গের কল্যাণে নিতান্ত অটল ঈমান এবং পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালের যাঁহাদের ভাগ্যে হযরতের (সা) দর্শন ঘটে নাই, তাঁহার সাহাবাগণের (রা) দর্শন ও সংসর্গ লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট মানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন– "আমার সময়ের লোক (অর্থাৎ সাহাবাগণ) সর্বোৎকৃষ্ট; তৎপর যাহারা তাহাদের (অর্থাৎ সাহাবাদের) দর্শন লাভ করিয়াছে (অর্থাৎ তাবিয়ীগণ)।" সাহাবা ও তাবিয়ীগণের উদাহরণ এই যে, মনে কর, এক বালক দেখে যে, তাহার মাতাপিতা সর্প দেখিয়া পলায়ন করে; এমনকি তাহারা সর্প দেখিয়া স্বীয় ঘরবাড়ী পর্যন্ত পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায়, মাতা-পিতার সর্প-ভীতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, সর্প নিশ্চয়ই অনিষ্টকর প্রাণী এবং ইহা হইতে পলায়ন করাই উত্তম। তৎপর এই বালক কোন স্থানে সর্প দেখামাত্রই তথা হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিবে। এমনও হইতে পারে যে, বালক কখনও সর্প দেখে নাই, ইহার নাম শুনিয়াছে মাত্র; তথাপি মাতাপিতার সর্পভীতি দেখিয়া তাহাদের হৃদয়ে সর্প ভয়ে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। নবীগণের অন্তদৃষ্টি প্রত্যক্ষ দর্শনতুল্য। যেমন মনে কর, এক

ব্যক্তি দেখিতে পাইল অমুককে সাপে কাটিয়াছিল, সে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে এবং অমুককে কাটিয়াছিল, সেও মরিয়াছে। এইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শনে সর্প বিষের অনিষ্টকারিতা অবগত হওয়া যায় এবং প্রত্যক্ষ দর্শনেই বিশ্বাসের পূর্ণতা লাভ হয়।

গভীর জ্ঞানসম্পন্ন সুনিপুণ আলিমগণের উদাহরণ এইরূপ যে, মনে কর, এক ব্যক্তি সর্প-বিষে মানুষ মরিতে দেখে নাই। কিন্তু সে বিষ ও মানুষে প্রকৃতি এবং মানুষের উপর বিষক্রিয়ার অনিষ্টকারিতা জ্ঞান বলে বুঝিয়া লইয়াছে। এমন পরিপক্ক জ্ঞান দ্বারাও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনে বিশ্বাস যত দৃঢ় হয়, জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস তত দৃঢ় হয় না। অভিজ্ঞ আলিমগণ ব্যতীত সাধারণ লোকের বিশ্বাস পরিপক্ক আলিম ও বুযুর্গগণের সংসর্গ প্রভাব জন্মিয়া থাকে এইরূপ লোকের সংসর্গলাভ করত পথভ্রান্তিরূপ রোগের প্রতিকার করা সাধারণ লোকের পক্ষেও নিতান্ত সহজসাধ্য।

দ্বিতীয় উপমা—কতক লোক এমন আছে যে, তাহারা পরকালে একেবারে অবিশ্বাসী নহে এবং পরকালের অস্তিত্বই নাই বলিয়া তাহারা মনে করে না। কিন্তু এই বিষয়ে তাহারা সর্বদা অস্বস্তি অনুভব করে, কিছুতেই নিঃসন্দেহ হইতে পারে না এবং বলে– "পরকালের যথার্থতা বুঝিবার উপায় নাই।" শয়তান এই সুযোগে প্ররোচনা দিয়া বলিতে থাকে– "দুনিয়া নিশ্চিত এবং পরকাল সন্দেহপূর্ণ। নিশ্চিত পদার্থকে অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে।" এইরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক। কারণ, ঈমানদারদের নিকট পরকাল নিশ্চিত সত্য। পরকালে এমন সন্দিহান লোকদের সন্দেহ দূরীকরণের উপায় এই ঃ রোগ হইলে ঔষধ সেবনের তিক্ততাবোধটি অবধারিত ধ্রুব সত্য। কিন্তু রোগ-মুক্তি সন্দেহপূর্ণ। তদ্রূপ বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্র যাত্রার কষ্ট অবধারিত এবং বাণিজ্যের লাভ সন্দেহজনক। রোগ- মুক্তির আশায় ঔষধ সেবনের তিক্ততা সহ্য করিয়া থাক। আর লাভের আকাঙ্ক্ষায় সমুদ্রযাত্রীরা কষ্ট স্বীকার কর। এমতাবস্থায়, ক্ষণভঙ্গুর দুনিয়া পরিত্যাগ করত পরকালের নিশ্চিত ও চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জনে তৎপর হইবে না কেন? আবার মনে কর, তুমি প্রবল পিপাসার্ত হইয়া পানি পান করিতে উদ্যত হইয়াছ, এমন সময় এক ব্যক্তি বলিল– "এই পানিতে সাপে মুখ দিয়াছিল।" পানি পানে বিরত থাকিলে পিপাসার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে সত্যই বিষ মিশ্রিত থাকিলে ইহা পানে মৃত্যু অবধারিত। পিপাসার কষ্ট সহ্য করা যায়; কিন্তু প্রাণনাশের যন্ত্রণা সহ্য করা যাইতে পারে না।"

তোমার কথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, দুনিয়ার সুখ দীর্ঘ হইলেও একশত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী থাকিবে না। পরমায়ু শেষ হইলে জীবনকালটা একটি অলীক স্বপ্ন বা কল্পনা বলিয়া মনে হইবে। অপরপক্ষে, পরকাল চিরস্থায়ী। চিরকালের

দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করা যাইতে পারে না। কিন্তু পরকাল যদি মিথ্যা হয়, তবে মনে কর, দুনিয়াতে তুমি যে সময়টুকু থাকিবে, ইহাও মিথ্যা, যেমন জন্মের পূর্বে তুমি কিছুই ছিলে না এবং মৃত্যুর পরও কিছুই থাকিবে না। অপরপক্ষে, পরকাল যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, আর তুমি ইহাকে অবিশ্বাস কর, তবে অনন্তকালের কষ্ট কিরূপে সহ্য করিবে? এমতাবস্থায়, পরকাল বিশ্বাস করত তদনুযায়ী কাজ করিলেই অনন্তকালের ভীষণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইতে পার। এই কারণেই হযরত আলী (রা) এক অবিশ্বাসীকে বলিয়াছিলেন– "তুমি যাহা মনে করিতেছ, তাহাই সত্য হইলে সকলেই মুক্তি পাইল। আর তোমার ধারণা মিথ্যা হইলে আমরা (পরকালে বিশ্বাসীগণ) মুক্তি পাইব এবং তোমরা (পরকালে অবিশ্বাসীগণ) শাস্তিতে নিপতিত হইবে।"

তৃতীয় উপমা—কতক লোক এমন আছে যাহারা পরকাল বিশ্বাসী বটে, কিন্তু তাহারা বলে– "দুনিয়া নগদ, আর পরকাল বাকী; নগদ বাকী অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট।" তাহারা বুঝে না যে নগদ আর বাকী সমান সমান হইলে নগদ অবশ্যই উৎকৃষ্ট। কিন্তু যে স্থানে নগদ এক গুণমাত্র এবং বাকী ইহার সহস্রগুণ, সেই স্থানে নগদ হইতে বাকীই উত্তম। সংসারের ব্যবসা, বাণিজ্য এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই চলিতেছে। যে ব্যক্তি এতটুকু বুঝিতে পারে না, সে নিতান্ত পথভ্রান্তিতে নিপতিত রহিয়াছে।

চতুর্থ উপমা—কতক লোক পরকালে বিশ্বাসী বটে, কিন্তু তাহারা দুনিয়াতে নানাবিধ উপাদেয় বস্তু ভোগ করিতে পাইতেছে ও সচ্ছলতার সহিত জীবন যাপন করিতেছে দেখিয়া মনে করে– "দুনিয়াতে আল্লাহ্ আমাদিগকে যেরূপ সুখ-সাচ্ছন্দের সহিত রাখিয়াছেন, পরকালেও তিনি আমাদিগকে তদ্রূপ অবস্থায় রাখিবে; কারণ, আল্লাহ্ আমাদিগকে ভালবাসেন বলিয়াই আমাদিগকে উপাদেয় দ্রব্যসামগ্রী ও সচ্ছলতা দান করিয়াছেন, পরকালেও তিনি আমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহারই করিবেন।" সূরা কাহাফে বর্ণিত এক ভ্রাতা-ভগ্নীর কাহিনীর সহিত তাহাদের এইরূপ উক্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ধনী ব্যক্তি দরিদ্রকে বলিল–

وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا

"আর যদি আমি আমার প্রভুর দিকে ফিরিয়াই যাই (তবে) ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফিরিয়া যাইবার স্থান পাইব।" (সূরা কাহাফ, ৫ রুকূ ১৫ পারা)।

অপর ব্যক্তি বলিল– اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى

"নিশ্চয়ই আমার জন্য যাহা উত্তম তাহা তাঁহার (আল্লাহ্‌র) নিকটে আছে।" (সূরা হা-মীম সিজদা, ৬ রুকু ২৫ পারা)। এইরূপ পথভ্রান্তির প্রতিকার এই ঃ ভাবিয়া

দেখ, সন্তান প্রাণ-প্রিয় হইলেও ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য সর্বদা তাহাকে শিক্ষকের শাসনাধীনে রাখা হয়। অপরপক্ষে, গোলাম অপ্রিয় হইলেও তাহাকে স্বেচ্ছায় চলিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আর সে স্বেচ্ছায় আমোদ-প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করে। কারণ এই যে, প্রভু গোলামের ভবিষ্যত দুর্ভাগ্যের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে না। ইহাতে যদি গোলাম মনে করে যে, প্রভু তাহাকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষা অধিক ভালবাসে, তবে ইহা গোলামের নিতান্ত মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। মহাপ্রভু আল্লাহ্ও এই সাধারণ নিয়ম প্রচলিত রাখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রিয়-পাত্রদিগকে তিনি দুনিয়ার ঐশ্বর্য ও আমোদ-প্রমোদ ছাড়িয়া দেন নাই। অথচ তাঁহার শত্রুদিগকে তিনি অতুল ঐশ্বর্য ও আমোদ-প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। যে কৃষক আমোদ-প্রমোদে বিভোর থাকিয়া আলস্য-শয্যায় শয়ন করত বীজ বপন করে না, সে যথাসময়ে শস্যও কর্তন করিতে পাইবে না। পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে এইরূপ কৃষকের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

পঞ্চম উপমা- কতক লোক বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ নিতান্ত দয়ালু ও দানশীল। তিনি সকলকেই বেহেশ্‌ত দান করিবেন। মূর্খেরা বুঝিতে পারে না যে, তিনি তাঁহার করুণা লাভের সকল উপকরণ দান করিয়াছেন; ইহা অপেক্ষা অধিক দয়ার আর কি হইতে পারে? ভাবিয়া দেখ, তুমি ভূমিতে একটি বীজ বপন কর এবং ইহার বিনিময়ে সাত শত শস্যদানা লাভ করিয়া থাক; আর সামান্য ইবাদতের পরিবর্তে চিরস্থায়ী রাজত্বের (বেহেশ্‌তের) অধিকারী হও। আল্লাহ্‌র করুণা ও দয়ার যদি এই অর্থ হয় যে, বীজ বপন না করিয়াই শস্য পাইবে, তবে কৃষি-বাণিজ্যে ও জীবিকা-অর্জনে এত ছুটাছুটি কর কেন? এই সকল ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট চিত্তে বসিয়া থাক, কোন কাজই করিও না। কারণ, আল্লাহ্ পরম দানশীল ও সর্বশক্তিমান। তিনি বিনা চাষে বিনা বীজ বপনেও শস্য জন্মাইয়া থাকেন। তদুপরি জীবিকা সম্বন্ধে আল্লাহ্ স্বয়ং বলিতেছেন-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

অর্থাৎ "পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই যাহার জীবিকার ভার স্বয়ং আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত নহে।" (সূরা হুদ, ১ রুকু, ১২ পারা)। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা সাংসারিক কার্যে আল্লাহ্‌র করুণা ও বদান্যতা উপর নির্ভর করত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পার না। আর পারলৌকিক ব্যাপারে ঐরূপ বিশ্বাস করিয়া গা ছাড়িয়া দাও, অথচ পারলৌকিক বিষয়ে আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন-

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى

"আর এই যে, মানুষ যতটুকু চেষ্টা করিয়াছ ততটুকু ভিন্ন তাহার জন্য আর কিছুই নাই।" (সূরা নজম, ৩ রুকু, ২৭ পারা)। ইহা সত্ত্বেও সাংসারিক কার্যের জন্য আল্লাহ্‌র করুণার উপর নির্ভর না করিয়া কেবল পারলৌকিক কার্যের বেলায় সকল চেষ্টা যত্ন পরিত্যাগ করত তাঁহাকে করুণাময় বলিয়া নিশ্চিত থাকা নিতান্ত পথ-ভ্রান্তি। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে, অথচ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সুফল পাইবার আশা করে, সে নিতান্ত নির্বোধ।" আল্লাহ্ অসীম ক্ষমতাশীল। তিনি বিনা সহবাসে বিনা বীর্যে সন্তান জন্মাইতে পারেন। তথাপি যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সন্তান কামনা করে, সে নিতান্ত নির্বোধ। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করিয়া বীর্য স্থাপনপূর্বক আশা করে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ গর্ভস্থ বীর্যকে সকল বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করত সন্তান উৎপন্ন করিয়া দিবেন, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। এইরূপে যে ব্যক্তি ঈমান আনে নাই বা ঈমান আনিয়াও সৎকার্য করে নাই, অথচ পরকালে পরিত্রাণের আশা করে, সেই ব্যক্তি নিতান্ত নির্বোধ।

যে ব্যক্তি ঈমান আনয়নপূর্বক সৎকর্ম করিয়া আল্লাহ্‌র করুণার উপর এইরূপ আশা করে যে, তিনি মৃত্যুর আপদ হইতে রক্ষা করত নিখুঁত ঈমান সহকারে পরলোকে পার করিয়া লইবেন, সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি বলে- আল্লাহ্ আমাকে ইহলোকে উত্তম অবস্থায় রাখিয়াছেন এবং পরলোকেও তদ্রূপ রাখিবেন। কারণ, তিনি নিতান্ত দয়ালু ও দানশীল। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর অহেতুক অভিমান ও অহংকার করিয়া থাকে মাত্র। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নগদ ও অবধারিত এবং পরকালকে বাকী ও সন্দেহপূর্ণ বলিয়া মনে করে, সে দুনিয়ার প্রলোভনে ভুলিয়া অচেতন হইয়া রহিয়াছে। এই উভয় অবস্থা পরিত্যাগ করিবার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন- "হে মানবজাতি, আমার অঙ্গীকার ধ্রুব সত্য। কারণ, যাহার কর্ম ভাল হইবে, সে উত্তম পুরস্কার পাইবে। আর যে মন্দ কার্য করিবে, সে কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।" আল্লাহ্‌র এই অঙ্গীকার গভীর মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। দুনিয়াতে মত্ত হইয়া থাকিও না এবং মনে করিও না যে, আল্লাহ্ করুণাময় বলিয়া তুমি যাহা করিবে তাহাই তিনি ক্ষমা করিবেন।

গুরুর (ভ্রম-বিশ্বাসে ধোঁকায় পড়া) ও ইহার প্রতিকার

ভ্রম-বিশ্বাসজনিত ধোঁকায় পতিত লোকের বিবরণ—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, কতক লোক মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ জানিয়া বিষম ধোঁকায় পতিত রহিয়াছে। তাহারা নিজকে ভাল বলিয়া মনে করে এবং নিজের কার্য-কলাপকে উত্তম বলিয়া

জানে। আর এইরূপ ধারণার আপদসমূহ হইতে তাহারা একেবারে উদাসীন। এই শ্রেণীর লোকেরা স্বর্ণ পরীক্ষাজ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করে নাই। কেবল বাহিরের বর্ণ ও আকৃতি দেখিয়াই মেকী স্বর্ণকে বিশুদ্ধ মনে করিয়া ধোঁকায় পতিত রহিয়াছে। এইজন্যই তাহারা ভাল-মন্দে তারতম্য করিতে পারে না। যাহারা জ্ঞানান্বেষণ ও সৎকর্ম অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছে এবং পথভ্রান্তি ও ধর্ম-কর্মে শিথিলতার আবরণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের শতকরা নিরান্নব্বই জনই তদ্রূপ ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছে। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, মহাপ্রভু আল্লাহ্ কিয়ামত দিবস হযরত আদমকে (আ) তাঁহার সন্তানদের মধ্যে দোযখবাসীদিগকে পৃথক করিয়া দিতে আদেশ করিবেন। তিনি বলিলেন- "হে আল্লাহ্, কত জনের মধ্যে কত জনকে পৃথক করিব?" আল্লাহ্ বলিবেন- "হাজার প্রতি নয়শত নিরান্নব্বই জন দোযখী পৃথক করিয়া ফেল। যদিও তাহারা সর্বদা দোযখে থাকিবে না, তথাপি অবশ্যই একবার দোযখে যাইবে।" ইহার কারণ এই যে, উহাদের কতক উদাসীন, কতক পথভ্রান্ত, কতক ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল জ্ঞানে ধোঁকায় পতিত এর কতক অসহায় স্বীয় কুপ্রবৃত্তির কবলে নিষ্পেষিত থাকিবে। ত্রুটি স্বীকার করিলেও তাহারা একবার দোযখে প্রবেশ করিবে। ভ্রম-বিশ্বাসজনিত ধোঁকায় পতিত লোকের সংখ্যা অসংখ্য অগণিত। তথাপি তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা ঃ (১) আলিম, (২) আবিদ, (৩) সূফী ও (৪) ধনী।

আমলহীন আলিমের ভ্রম-বিশ্বাসজনিত ধোঁকা—এই শ্রেণীর কতক আলিম আজীবন চেষ্টায় অগাধ ইলমের অধিকারী হয় বটে, কিন্তু তদনুসারে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কার্য করে না। তাহারা স্বীয় হস্ত, চক্ষু, রসনা ও গুপ্তাঙ্গকে পাপ হইতে বিরত রাখে না। অথচ মনে করে যে, তাহারা এত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে যে, ইহার কল্যাণে পরকালে তাহাদের মোটেই শাস্তি হইবে না, ব্যবহারিক জীবনে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাহাদের ধর-পাকড় হইবে না এবং সকল লোক তাহাদের সুপারিশেই পরিত্রাণ পাইবে। এমন আলিম এইরূপ রোগী সদৃশ, যে স্বীয় রোগের চিকিৎসায় সুদক্ষ, সমস্ত রজনী রোগ নির্ণয়ে ও পঠিত গ্রন্থের আলোচনায় অতিবাহিত করত ব্যবস্থাপত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছে, রোগ ও ইহার ঔষধ তিক্ততা সহ্য করিতে চায় না। এমতাবস্থায়, ঔষধের ফল ও ক্রিয়ার ব্যাখ্যা বারবার পাঠ করিলে তাহার কি উপকার হইবে? আল্লাহ্ বলেন- "নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি মুক্তি পাইবে, যে পবিত্র হয়।" যে ব্যক্তি কেবল পবিত্রতা জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, সে মুক্তি পাইবে, এই কথা আল্লাহ্ কখনই বলেন নাই। তিনি অন্যত্র বলেন- "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিবে সেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" যে ব্যক্তি শুধু জানে যে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।

আমলহীন আলিমের উক্তরূপ ভ্রমবিশ্বাস যদি নির্বুদ্ধিতা ও ইলমের ফযীলত বর্ণনা সম্বলিত হাদীস বাণী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এমন ব্যক্তি বেআমল (অনুষ্ঠানশূন্য) আলিমের নিন্দা প্রকাশক আয়াত ও হাদীসের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়া দেখে না কেন? কুরআন শরীফে বেআমল আলিমকে এমন গর্দভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যাহার পৃষ্ঠে ইলমের উপকরণ গ্রন্থসমূহের বোঝা রহিয়াছে। অন্যত্র তাহাকে প্রস্তরসদৃশ বলা হইয়াছে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "বেআমল আলিম দোযখে এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হইবে যে, তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং গর্দভ যেরূপে আটার মেশিন ঘুরায় অগ্নি তাহাকে তদ্রূপ ঘুরাইবে। (তাহার দুর্গতি দেখিয়া) সমস্ত দোযখবাসী তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে- 'ওহে, তুমি কে এবং কি কারণে তোমাকে এইরূপ কঠিন শাস্তি দেওয়া হইতেছে?' সেই ব্যক্তি বলিবে- 'আমি অপরকে সৎকার্যের আদেশ করিতাম; কিন্তু নিজে তদনুযায়ী কাজ করিতাম না।" তিনি অন্যত্র বলেন–"বেআমল আলিম অপেক্ষা অধিক শাস্তি আর কাহাকেও দেওয়া হইবে না।" হযরত আবূ দরদা রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন–"মূর্খ লোকের দুর্গতি অপেক্ষা বেআমল আলিমের দুর্গতি সাতগুণ শোচনীয় হইবে।" কারণ ইলমই তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে এবং তাহাকে বলা হইবে–"তুমি জানিয়া-শুনিয়া পাপ করিয়াছ।"

কুপ্রবৃত্তি দমনে অক্ষম আলিমের ভ্রম—কোন কোন আলিমের জ্ঞান ও অনুষ্ঠান উভয়টিতেই ত্রুটি থাকে না। তাহারা প্রকাশ্য ইবাদতসমূহ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অন্তরের পবিত্রতা বিধানে একেবারে উদাসীন। অহংকার, ঈর্ষা, রিয়া, সম্মান-লিপ্‌সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা, পরের অনিষ্ট কামনা, অপরের শোকে আনন্দবোধ ও সুখে কষ্টানুভব ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি হইতে তাহারা স্বীয় হৃদয়কে মুক্ত রাখে না। কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তৎসমূদয়ের প্রতি তাহারা মনোনিবেশ করিয়া দেখে না। তিনি বলেন–"বিন্দুমাত্র রিয়াও শিরক।" "যাহারা হৃদয়ে রেণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।" "অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বালাইয়া দেয়, ঈর্ষাও তদ্রূপ ঈমান নষ্ট করিয়া ফেলে।" "আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তিনি তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন।"

মন্দ স্বভাব মন্দ কার্যের মূল উৎস। ইহার মূলোৎপাটন করিয়া দূর করা আবশ্যক। যাহার বাহিরের আকার সুশোভিত, কিন্তু ভিতর অপবিত্র ও পুতিগন্ধময় তাহাকে এমন পায়খানার সহিত তুলনা করা যায় যাহার বাহিরের অংশ চুনকাম করাতে শুভ্র পবিত্র বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভিতর মল-মূত্র একেবারে অপবিত্র ও দুর্গন্ধময়। অথবা

তাহাকে কবরের সহিত তুলনা করা চলে। কবর বাহিরে সুন্দর দেখায়, কিন্তু ভিতরে মৃতদেহ পচিয়া বীভৎস আকার ধারণ করে। অথবা তদ্রূপ লোককে এমন অন্ধকারময় গৃহের তুল্য বলা যায় যাহার বাহিরের প্রাচীর পৃষ্ঠ প্রদীপের আলোকে উজ্জ্বল থাকে, অথচ গৃহাভ্যন্তরভাগ ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেআমল আলিমকে চালনির সহিত তুলনা করিয়াছেন। চালনির ছিদ্র দিয়া তো উৎকৃষ্ট আটা পাওয়া যায়; কিন্তু ভুসিগুলি ইহাতে আটকানো থাকে। বেআমল আলিমও তদ্রূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য বাহির করিয়া ফেলে, কিন্তু মন্দ বাক্যসমূহ তাহার অন্তরে থাকিয়া যায়।

আত্মপবিত্র বিশ্বাসী আলিম ব্যক্তির ভ্রম—কোন কোন আলিম কুপ্রবৃত্তিকে নিতান্ত অনিষ্টকর বলিয়া জানে এবং উহা হইতে হৃদয় পবিত্র রাখাও আবশ্যক বলিয়া মনে করে। অথচ স্বীয় হৃদয়কে কুপ্রবৃত্তিশূন্য পবিত্র বলিয়া ধারণা করে। এই প্রকার আলিম যাহারা কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলে তাহাদের অপেক্ষাও মন্দ। কারণ, আলিমগণই কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক অবগত আছে, তথাপি তাহাদের অন্তরে অহংকারের প্রভাব দেখা দিলে শয়তান তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, উহা অহংকার নহে, বরং ইহাতেই ইসলাম ধর্মের সম্মান ও গৌরব নিহিত আছে। তোমরাই ধর্মের বাহক, তোমরা যদি নিজেদের সম্মান রক্ষা করিয়া না চল তবে ইসলাম কিরূপে সম্মান লাভ করিবে ? তদ্রূপ আলিম যদি উত্তম পরিচ্ছদে স্বীয় দেহ সুশোভিত করে, অশ্ব এবং বহুমূল্য ও সুন্দর সুন্দর গৃহ-সামগ্রী ব্যবহার করে তবে শয়তান বুঝাইয়া দেয় যে, উহা গর্ব ও সংযমহীনতা নহে, বরং ইসলামের শত্রুদিগের পরাভব ও হীনতা প্রতিপন্ন করাই উহার উদ্দেশ্য। কারণ, ধর্ম-কর্মে কুসংস্কার প্রবর্তকগণ আলিমদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জাঁক-জমকপূর্ণ দেখিলেই সংযত ও বশীভূত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর আলিমগণ কি রাসূলুল্লাহ্ (সা), খুলাফায়ে রাশিদীনের (রা) জীবনচরিত্র ভুলিয়া গিয়াছে এবং মনে করে যে, তাঁহাদের কার্যাবলী ও জীবন ধারণ-প্রণালী ইসলামে অসম্মান ও দীনতাহীনতা আনিয়া দিয়াছিল? আর তাহাদের নিজেদের শান-শওকতে ইসলাম এখন সমুন্নত ও সম্মানিত হইবে?

তদ্রূপ, আলিমের হৃদয়ে ঈর্ষার উদ্রেক হইলে বলিয়া থাকে- ইহা ঈর্ষা নহে, বরং ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে পাপীদের প্রতি কঠোরতা মাত্র। রিয়া আসিলে তেমন ব্যক্তি বলে- ইহা রিয়া নহে, মানব সমাজের উপকার করিবার ইচ্ছামাত্র। কারণ, আমাদের ইবাদত কার্য দেখিয়া অপর লোকে অনুকরণ করতে সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইবে। ঐরূপ আলিম রাজ দরবারে যাতায়াত করিলে বলে- আমরা অত্যাচারী শাসনকর্তাদের দরবারে তাহাদের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে যাই না। ইহা যে হারাম, আমরা তাহা অবগত আছি। তবে আমরা মুসলমানদের সহিত হিত-সাধনের জন্য অনুরোধ

করিতে রাজ দরবারে যাইয়া থাকি। হারাম ধন গ্রহণের সময় তদ্রূপ আলিম বলিয়া থাকে- এই ধনের কোন উত্তরাধিকারী নাই। আমরা ইহা গ্রহণপূর্বক ধর্ম-কর্মে ব্যয় করিব।

এই শ্রেণীর আলিমগণ ন্যায়-বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে, মানুষকে সংসারাসক্তি হইতে ফিরাইতে পারিলে সমাজের যত মঙ্গল সাধিত হয় ততটুকু অন্য কোন উপায়েই হইতে পারে না এবং তাহাদের কারণেই সংসারাসক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এবংবিধ আলিমের অস্তিত্ব না থাকিলেই ইসলামের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং তদ্রূপ কুপ্রবৃত্তিপূর্ণ হৃদয় বিশিষ্ট আলিমের আবশ্যকতা ইসলামে নাই।

যাহাই হউক, উল্লিখিতরূপ ভ্রান্ত ধারণা এবং ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল জ্ঞানে ধোঁকায় পতিত হওয়ার অন্ত নাই। উহার বিস্তারিত বর্ণনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

মঙ্গলজনক ইলম নির্বাচনে ভ্রম—কতক আলিম মঙ্গলজনক ইলম নির্বাচনেই ভ্রমে পড়িয়া রহিয়াছে। তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, আধ্যাত্মিক বিদ্যা, সৎস্বভাব ও চরিত্র উন্নতিকর বিদ্যা, কুপ্রবৃত্তি দমনে সাধনাবিদ্যা, এই গ্রন্থের যে সকল জ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে উহা পরকালের পথের পরিচয়, ধর্মপথের আপদসমূহের জ্ঞান এবং মুরাকাবার উপায় ইত্যদি শিক্ষা করা সকলের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য (ফরযে আইন) ও নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাহারা এবংবিধ জ্ঞানার্জনে যত্নবান হয় না। তাহারা ইহাও অবগত নহে যে, এই প্রকার জ্ঞানকেই প্রকৃত ইলম বলা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর আলিমগণ তর্ক শাস্ত্র, মযহাবী পক্ষপাতিত্ব, ফত্ওয়া বা মানব জাতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টিকারী বিদ্যা অর্জনে জীবন বিনষ্ট করে। অথবা তাহারা এমন বিদ্যা অর্জনে জীবন বিনষ্ট করে যাহা অল্পে তুষ্টি, ধর্ম-কার্যে আন্তরিকতা ও পরহেযগারীর দিকে আহ্বান করে না বা রিয়া ও ধর্ম-কর্মে শিথিলতা বৃদ্ধি করে। আধ্যাত্মিক বিদ্যা অর্জনে ব্যাপৃত ব্যক্তি কোন মঙ্গলজনক ইলম শিক্ষা করিতেছে বলিয়া তাহারা কল্পনাও করে না এবং মনে করে যে, এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত ইলম অর্জনে বিরত রহিয়াছে। এইরূপ ভ্রমবিশ্বাসের বিস্তৃত বর্ণনা এই গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। 'এহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থের 'গুরুর' অধ্যায়ে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

উপদেশক আলিমের ভ্রম—কতক আলিম বক্তৃতা করিয়া বেড়ায়। তাহাদের বক্তৃতা ছন্দোময় এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ব অথচ অসাড় কথায় পরিপূর্ণ থাকে। বক্তৃতাকালে তাহারা এমন সুন্দর সুন্দর শব্দ খুঁজিয়া লয় শ্রোতৃমণ্ডলী যাহা শুনিয়া বাহ্বা প্রদান করে ও বক্তার প্রশংসায় লিপ্ত হয়। শ্রোতার হৃদয়ে পরকাল ভয়ের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেওয়া যাহাতে পরকালের শাস্তি তাহাদের চক্ষের উপর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে এবং

তাহারা পরকালের ভয়ে রোদন করিতে থাকে, ইহাই যে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য ইহা তাহারা উপলব্ধি করে না। তাহারা ইহাও ভুলিয়া যায় যে, প্রকৃত উপদেশ পরকাল ভয়ে জর্জরিত প্রাণের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। যে উপদেশকের মনে পরকাল ভয়ের লেশমাত্রও নাই, কেবল ইহার ভান করে মাত্র, এমন ব্যক্তির উপদেশ কাহারও মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। পরকালে ভয়শূণ্য উপদেশক আলিম সংসারে কম নহে। ইহার বিবরণও অতি বিস্তৃত।

ফিকাহ্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিমের ভ্রম—কতক আলিম ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়নে জীবন অতিবাহিত করে। তাহারা ইহা বুঝে না যে, ফিকাহ্ শাস্ত্র পার্থিব শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিধি-নিষেধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরকাল পথের জ্ঞানই অন্যবিধ। ফিকাহ্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিম অবগত আছে যে, যাহা প্রকাশ্য ফিকাহ্ অনুযায়ী বৈধ তাহাই পরকালেও মঙ্গলজনক হইবে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই স্বীয় যাকাতের মাল তদীয় পত্নীর নিকট বিক্রয় করত তাহারা মাল সে ক্রয় করিয়া লইল। এমতাবস্থায়, সেই ব্যক্তি প্রকাশ্য ফতওয়া অনুসারে যাকাতদানের দায় হইতে মুক্তি পাইবে। রাজকর্মচারী তাহার নিকট হইতে যাকাত চাহিতে পারিব না; কেননা তাহার দৃষ্টি কেবল বাহ্য ধনের উপর নিবদ্ধ এবং পূর্ণ এক বৎসরের পূর্বেই উক্ত ধন হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ফিকাহ্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিমও হয়ত উক্ত ব্যক্তিকে যাকাত দানের দায় হইতে মুক্ত বলিয়া ফতওয়া দিবে এবং এই ধারণাও করিবে না যে, যে ব্যক্তি যাকাতের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার এইরূপ চালাকি করিবে, সে মহাপ্রভু আল্লাহ্ শাস্তি ও রোষে নিপতিত হইবে। যে ব্যক্তি আদৌ যাকাত দেয় না তৎপ্রতি আল্লাহ্ যেমন ক্রুদ্ধ হন, যাকাতের দায় হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে ব্যক্তি তদ্রূপ চালাকি করিয়া থাকে তৎপ্রতিও তিনি তদ্রূপই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন। কারণ, কৃপণতা মানব হৃদয়ের একটি মারাত্মক দোষ এবং যাকাত দিলে কৃপণতার অপবিত্রতা হইতে মানবাত্মা পবিত্র হয়। কৃপণতাররূপ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিলে ইহা নিতান্ত মারাত্মক হইয়া উঠে। তদ্রূপ চালাকি দ্বারা কৃপণতারূপ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা হয়। সুতরাং চালাকি দ্বারা যখন কৃপণতা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হইল তখন বিনাশ সাধনের আর কিছুই বাকী রহিল না। আচ্ছা বলত, তেমন প্রতারণাকারী ব্যক্তি কিরূপে পরকালে শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে?

তদ্রূপ, আপন স্ত্রীকে জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির করত মহরের দাবী ত্যাগ করাইয়া তাহার দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইলে প্রকাশ্য ফতওয়া অনুযায়ী বৈধ হইবে বটে; কেননা কাযী বাহ্য উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ফতওয়া দিয়া থাকেন; অন্তরের ভেদের কথা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। কিন্তু সেইরূপ তালাক গ্রহণকারী ব্যক্তি

পরকালে আল্লাহ্‌র বিচারে ধৃত হইবে; কেননা, তদ্রূপ খোলা তালাক বলপ্রয়োগে সম্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে লোক সমক্ষে কাহারও নিকট কিছু চাহিলে লজ্জায় পড়িয়া সে দেয় তবে প্রকাশ্য ফত্‌ওয়া অনুসারে তো ইহাতে কোন দোষ নাই; কিন্তু বাস্তবপক্ষে বলপ্রয়োগে ইহা ছিনাইয়া লওয়ারই শামিল। কারণ, প্রকাশ্যভাবে লাঠি মারিয়া কাড়িয়া লওয়া, আর লজ্জার চাবুক মারিয়া লওয়া একই কথা। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহারা প্রকাশ্য ফিকাহ্‌ শাস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই জানে না তাহারা এবংবিধ ভ্রমে নিপতিত রহিয়াছে।

শুচিবাই আবিদের ভ্রম—ভ্রম-বিশ্বাসী আবিদগণ ফযীলত লাভের আশায় ফরয কার্য ছাড়িয়া দিতে দেখা যায়। যেমন, পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিহান ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ে। অপরদিকে, মাতা-পিতা ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে; অথচ পানির অপবিত্রতা সম্বন্ধে ক্ষীণতম কল্পনাও তাহার নিকট দৃঢ়তর হইয়া উঠে। আবার আহারে বসিলে সে সকল বস্তুকেই হালাল বলিয়া মনে করে; এমন কি স্পষ্ট হারাম হইতেও বিরত থাকে না। অপবিত্র বস্তু পায়ে লাগিবার ভয়ে পাদুকা পরিধান ব্যতীত সে পথ চলে না, অথচ একেবারে হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর আবিদগণ সাহাবাগণের (রা) জীবনচরিত ভুলিয়া গিয়াছে। হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন— "আমি হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে সত্তর হালাল পরিত্যাগ করিয়াছি।" এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও তিনি এক য়াহুদী স্ত্রীলোকর পাত্র হইতে পানি লইয়া ওযু করিয়াছিলেন। এই সকল ভ্রান্ত আবিদ আহারকালে হালাল-হারামে কোন প্রভেদ না করিয়া কেবল অঙ্গ-শুদ্ধির বেলায় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। কাহাকেও ধোপার ধোওয়া কাপড় পরিধান করিতে দেখিলে তাহারা মনে করে যে, সে বড় পাপ করিল। অথচ কাফিরগণ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে উপঢৌকনস্বরূপ যে বস্ত্র প্রদান করিত, তিনি ইহা পরিধান করিতেন। যুদ্ধ বিজয়ের পর কাফির দল হইতে যে দ্রব্যসম্ভার পাওয়া যাইত তন্মধ্য হইতে বস্ত্রও তিনি বিনা-দ্বিধায় পরিধান করিতেন। তিনি উহা ধৌত করিয়া পরিধান করিতেন বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। কাফিরদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তলওয়ার পরিধান করিয়া তিনি নামায পড়িতেন। এই তলওয়ারে যে লোহা ইত্যাদি থাকিত বা ইহার উপর যে চর্ম লাগানো থাকিত উহাকে কেহই অপবিত্র বলিয়া মনে করিতে না। সুতরাং যে ব্যক্তি উদর, রসনা, হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গসমূহকে হারাম বিষয়ে সংযত রাখে না, কেবল ওযু, গোসলের পবিত্রতা লইয়া বাড়াবাড়ি করে, সে শয়তানের নিকট হাস্যাস্পদ। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে, কিন্তু ধুইবার বাড়াবাড়ি দ্বারা অধিক পানি অপচয় করে বা একবার ওযু করিয়া ইহা সন্দুর মত হইল না ভাবিয়া বারবার ওযু

করিয়া সময় নষ্ট করত আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ে না, এমন ব্যক্তিও ভ্রান্ত-বিশ্বাসীদের অন্তর্গত। ইবাদত পুস্তকে অঙ্গ-শুদ্ধি অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

সন্দেহবাতিক আবিদের নামায সংক্রান্ত ভ্রম—কতক আবিদের নামাযের নিয়তে নানারূপ সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠে। নিয়ত নির্ভুল হইল না ভাবিয়া তাহারা বারবার নিয়ত করিতে থাকে। এমন কি নিয়ত বাঁধিবারকালে তাহারা উচ্চ রব করে এবং হাত নাড়াইয়া থাকে। এইরূপ সন্দেহবাতিক লোকেরা বুঝে না যে, ঋণ পরিশোধ, যাকাত দান এবং নামাযের নিয়তের বিধান, একইরূপ। নিয়ত বিশুদ্ধ হইল না ভাবিয়া কেহই দুইবার ঋণ পরিশোধ করে না বা দুইবার যাকাত দেয় না। আবার কেহ কেহ নামায পড়িবার কালে কুরআন শরীফের অক্ষরগুলির প্রকৃত উচ্চারণ লইয়া বাড়াবাড়ি করে। অক্ষরগুলি ঠিকভাবে উচ্চারণ করিতেই তাহারা ব্যস্ত থাকে। কুরআন শরীফের যে অংশ নামাযে পড়া হয়, ইহার অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। 'আলহামদুলিল্লাহ্‌' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য) বলিবার কালে যেন সমস্ত দেহ-মন কৃতজ্ঞতাভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমা হইতেই সাহায্য প্রার্থনা করি) উচ্চারণের সময় এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কে সর্বব্যাপী সর্বময় এবং নিজকে নিতান্ত অসহায় ও দুর্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। اِهْدِنَا (আমাদিগকে পথ দেখাও) বলারকালে নিজের দুর্বলতা, আত্মোৎসর্গ ও কাকুতিতে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি শুধু উচ্চারণের পারিপাট্য লইয়া ব্যাপৃত, তাহার হৃদয়ে এইরূপ ভাবসমূহ কিরূপে উদয় হইবে" তেমন নামাযীর দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, মনে কর, এক ব্যক্তি নিজের অভাব অভিযোগ বাদশাহ্‌র নিকট জ্ঞাপন করিতে যাইয়া তাঁহাকে সম্বোধণ করিয়া বলিল يَا اَيُّهَا الْاَمِيْرُ (হে বাদশাহ্‌) এবং সে বারবার এই বাক্যটিই উচ্চারণ করিতে লাগিল; আর اَيُّهَا শব্দ ঠিকভাবে উচ্চারণ হইতেছে কিনা তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল এবং اَمِير শব্দের মীম অক্ষর সুন্দরভাবে উচ্চারণে ব্যাপৃত রহিল। এমতাবস্থায়, বাদশাহ্‌ অবশ্যই তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন।

কুরআন শরীফ পাঠ সংক্রান্ত ভ্রম—আর এক শ্রেণীর আবিদ লোক প্রত্যহ একবার কুরআন শরীফ খতম করে এবং তজ্জন্য তাহারা অতি দ্রুতবেগে পাঠ করে। কিন্তু তাহাদের মন কুরআন শরীফের প্রতি একবারে উদাসীন থাকে। গণনায় খতম বৃদ্ধি করত লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যেই তাহারা এত দ্রুত পাঠ করিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে, কুরআন শরীফের প্রতিটি আয়াত মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তাঁহার বান্দার নিকট এক একটি স্বতন্ত্র অনুশাসনপত্র। ইহাদের কতকগুলিতে আদেশ, কতকগুলিতে নিষেধ, অপর কতকগুলিতে দানের প্রতিশ্রুতি ও

শাস্তি প্রদানের ভীতি, আবার কতকগুলিতে উপমা ও উপদেশ রহিয়াছে এবং কতকগুলিতে ভয় ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। মোটের উপর এবংবিধ সকল কথাই কুরআন শরীফে আছে। পাঠকের পক্ষেও আবশ্যক ভয়সূচক আয়াত পাঠকালে নিজের সমস্ত দেহমন ভয় প্রকম্পিত করে, প্রতিশ্রুতিসূচক আয়াত পাঠ করিয়া তদ্রূপভাবে আনন্দিত হয়, উপমার আয়াত পাঠকালে নিজকে উপমাস্থল মনে করিয়া উপদেশ গ্রহণ করে, উপদেশমূলক আয়াত পাঠকালে যেন সর্বাঙ্গ প্রয়োগ শ্রবণ করে, ভয় প্রদর্শনের আয়াত অধ্যয়নের সময় যেন ভয়ে নিমজ্জিত হয়। এই অবস্থাসমূহ অন্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্তরে এইরূপ অবস্থা না জন্মাইয়া শুধু জিহ্বার অগ্রভাগ দ্রুত সঞ্চালনে কি লাভ? এমন দ্রুত পাঠককে নিম্নোক্ত মূর্খের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মনে করে, বাদশাহ্ এক প্রজার নিকট কোন নির্দেশপত্র পাঠাইলেন। সে নির্দেশপত্র পাইয়া মুখস্ত করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে যে আদশ ও নিষেধ রহিয়াছে, উহার প্রতি সে মোটেই মনোযোগ করিল না এবং নির্দেশপত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন রহিল।

হজ্জ সংক্রান্ত ভ্রম—কতক লোক হজ্জে গমন করে এবং কা'বা গৃহের খাদেমরূপে তথায় অবস্থান করিতে থাকে। তাহারা রোযা রাখে; কিন্তু হৃদয় ও রসনা সংযত রাখিয়া রোযার হক আদায় করে না এবং কা'বাগৃহের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহার উপযুক্ত সম্মানও করে না। তাহারা বিশুদ্ধ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া হজ্জ যাত্রার গৌরবও রক্ষা করে না। তাহাদের মন সর্বদা মানুষের সহিত আবদ্ধ থাকে। কা'বা শরীফের খাদেম বলিয়া তাহারা অপরের সম্মানভাজন হইতে আশা করে এবং লোকসমক্ষে বলে— "আমি এতবার আরাফার মাঠে দণ্ডায়মান হইয়াছি এবং এত বৎসর কা'বা শরীফে অবস্থান করিয়াছি।" এই প্রকার হাজীর জানা উচিত, কা'বা শরীফে অবস্থানকালে স্বীয় গৃহের জন্য উদ্গ্রীব থাকা, কা'বা শরীফের খাদেম বলিয়া মনে সম্মান-লালসা জাগিয়া উঠা এবং সর্বদা অপরের নিকট হইতে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা অপেক্ষা নিজ গৃহে অবস্থান করত কা'বা শরীফের প্রতি উদ্গ্রীব থাকা বহু গুণে ভাল। কেহ তাহাদের নিকট হইতে কিছু চাহিয়া লয় কিনা, এই শ্রেণীর লোকের অন্তরে এই ভয় সর্বদা জাগরূক থাকে। তাই তাহাদের প্রতিটি গ্রাস অন্নে তাহাদের কৃপণতা বৃদ্ধি পায়।

পরহেযগার আবিদের ভ্রম—কতক পরহেযগার আবিদের অবস্থা এই যে, তাহারা সাধারণ পোশাক পরিধান করে, অল্প আহার করে এবং ধনাসক্তি পরিহার করে। কিন্তু লোকর ভক্তি ও সম্মান পাওয়ার লোভ তাহারা সংবরণ করিতে পারে না। লোকজন বরকত লাভের আশায় আগমন করিলে তাহারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং লোকসমক্ষে নিজদিগকে বেশ সাজাইয়া রাখে। তাহারা জানে না যে, ধনাসক্তি অপেক্ষা সম্মান-লিপ্সা অধিক অনিষ্টকর, সম্মান-লিপ্সা দমন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কারণ, সম্মান-লালসায় মুগ্ধ হইয়া মানুষ অম্লানবদনে সকল কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ পরহেযগার। কখন কখন এইরূপও হইয়া থাকে যে, অপরিপক্ক পরহেযগারদিগকে কিছু দিতে গেলে তাহারা উহা গ্রহণ করে না। তাহারা মনে করে অপরের নিকট হইতে কিছু লইলে লোকে বলিবে, এই ব্যক্তি পরহেযগার নহে। গোপনে গ্রহণ করত উপযুক্ত দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে বলিলে ইহা তাহাদের নিকট স্বীয় মৃত্যু-বার্তার ন্যায় বলিয়া মনে হয়। লোকে পরহেযগার বলিয়া সম্মান করিবে না ভাবিয়া এইরূপ পরহেযগারগণ হালাল ধনও গ্রহণ করে না। এই জন্যই তাহারা দরিদ্রের অপেক্ষা ধনীদিগকে অধিক সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকে এবং তাহাদের মন যোগাইবার চেষ্টা করে। এই সমস্তই ভ্রমবিশ্বাস ও অজ্ঞানতার কারণে হইয়া থাকে।

অসৎ-স্বভাবী আবিদের ভ্রম—এই শ্রেণীর আবিদগণ প্রকাশ্যভাবে সকল সৎকার্যই করিয়া থাকে; যেমন– প্রত্যহ রাক'আত নফল পড়ে, হাজার তস্‌বীহ পড়ে, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ইবাদত করে এবং প্রত্যহ রোযা রাখে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি হইতে হৃদয় পবিত্র করিতে তাহারা যত্নবান হয় না। অতএব তাহাদের হৃদয় ঈর্ষা, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। এই প্রকার আবিদ বদমেযাজী ও কর্কশ-স্বভাবী হইয়া থাকে। তাহারা অকারণে আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে। বোধ হয় যেন তাহারা প্রত্যেকের উপরই অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাহারা মনে করে না যে, বদমেযাজ সকল ইবাদত বিনাশ করিয়া ফেলে এবং খোশমেযাজ সকল ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বদমেযাজী আবিদগণ ইবাদত করিয়া মনে করে যেন অপর লোকের কিছু উপকার করা হইল। তাহারা ইবাদত করিয়া অন্য লোককে ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং অপর লোকের ছোঁয়াচ লাগিবে ভাবিয়া সযত্নে দূরে থাকে। তাহাদের জানা উচিত যে, রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিদ ও পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা প্রসন্ন বদনে হাসিমুখে সকলের সহিত মিশিতেন। যে নিতান্ত দীনহীন মলিন ব্যক্তিকে লোকে তাহাদের ত্রিসীমায় আসিতে দিত না তিনি তাহাকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইতেন এবং অগ্রে স্বীয় পবিত্র হস্ত মুসাফাহার (করমর্দনের) জন্য সেই ব্যক্তির হস্তে স্থাপন করিতেন। যে ব্যক্তি জগতের শিক্ষাগুরু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা পবিত্রতা ও পরহেযগারী বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে বলিয়া কল্পনা করে, সে নিতান্ত নির্বোধ। এই শ্রেণীর আবিদগণ শরীয়ত অনুযায়ী চলে বলিয়া দাবি করে বটে; কিন্তু তাহারা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা অধিক নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে?

সূফীদের ভ্রম—সূফীগণই সর্বপেক্ষা অধিক গর্বিত ও ধোঁকায় পতিত হইয়া থাকে। কারণ, রাস্তা যত সূক্ষ্ম ও উদ্দেশ্য যত প্রিয় হয়, ধোঁকা ও সন্দেহ সেই রাস্তায় তত অধিক আসিয়া পড়ে। সূফীদের প্রাথমিক ধাপে উন্নীত ধর্ম-পথযাত্রীদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী—তাহাদের প্রবৃত্তি ও রিপুসমূহ পরাস্ত ও পরাভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বাসনা-কামনা, লোভ-লালসা, ক্রোধ প্রভৃতি সমূলে উৎপাটিত না হইলেও ইহাদের কোন স্বাধীন ক্ষমতা থাকে না; শরীয়তের নির্দেশ ব্যতীত তখন ইহারা কোন কর্মেই প্রবৃত্ত হয় না। কোন দুর্গ অধিকৃত হইলে বিজেতা যেমন দুর্গবাসিগণকে হত্যা না করিয়া সর্বতোভাবে বশীভূত করিয়া রাখে তদ্রূপ সূফীর হৃদয়-দুর্গ শরীয়তরূপ বাদশাহর অধিকারে আসিলে হৃদয়ের প্রবৃত্তিসমূহ ইহার আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর সূফীর দৃষ্টি হইতে ইহকাল ও পরকাল লোপ হইয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, সে তখন অনুভব ও কল্পনার রাজ্য অতিক্রমপূর্বক পরপারে চলিয়া যায়। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কল্পনাগম্য বস্তু শুধু মানুষের সহিত সীমাবদ্ধ নহে, বরং পশুদের বেলায়ও ইহা সমভাবে থাকে। আর এই প্রকার বস্তু চক্ষু, উদর ও কাম-প্রবৃত্তির উপভোগ্য হইয়া থাকে। বেহেশ্‌তও কল্পনারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। যাহারা সুমিষ্ট হাল্‌ওয়া ভোগ করিয়াছে তাহাদিগকে শুষ্ক তৃণ আহার করিতে দিলে ইহা যেমন হেয় ও তুচ্ছ হইয়া পড়ে। এই জন্যই তাঁহারা বেহেশতের নিমিত্তও লালায়িত হন না। তাঁহারা মনে করেন যে, সোজা ও সরলপ্রাণ লোকেরাই বেহেশতের লোভে ভুলিতে পারে। এইজন্য উক্ত আছে–

اَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ

"অধিকাংশ বেহেশ্‌তবাসীই সোজা ও সরল।"

তৃতীয় শ্রেণী– এই শ্রেণীর সূফীকে আল্লাহ্ অপার সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব একেবারে বেষ্টন করিয়া থাকে। বেহেশ্‌ত ও বাড়ীঘর, অনুভব ও কল্পনার সমস্ত সম্পর্ক তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যায়। চক্ষু যেমন শব্দ শুনিতে পায় না, কর্ণ যেমন বর্ণ দেখিতে পারে না, এই শ্রেণীর সূফীও তদ্রূপ কল্পনা ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কিছু অনুভব করিতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি তখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু হইতে উদাসীন হইয়া যায়। এই সোপানে উপনীত হইলে সূফী সবেমাত্র দরবেশীর পথে পদস্থাপন করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। ইহা ছাড়া এই শ্রেণীর সূফীর সহিত তখন মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র যে সম্বন্ধ ঘটে, তাহা বর্ণনাতীত। কেহ এই সম্বন্ধকে একত্ব, কেহ বা হুলুল[১] নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরিপক্ক ও গভীর জ্ঞানে অনভিজ্ঞ সূফী এইরূপ কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি তাহা বর্ণনা করিতে পারেন না। তিনি এই সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ করেন তাহা অপরের নিকট পরিষ্কার কুফ্‌রী কথা বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অথচ তিনি প্রকৃত সত্য কথাই বলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তিনি ইহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। এই পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহা সূফীদের পথের একটি ছায়ামাত্র।

১. দুই বা ততোধিক দ্রব্যের এইরূপ মিশ্রণকে হুলুল বলে যাহাতে মিশ্রিত দ্রব্যসমূহকে কিছুতেই পৃথক করা চলে না। – অনুবাদক

বেশভূষা ও আচরণ সূফীদের ভ্রম—প্রিয় পাঠক, অনুধাবন কর, সূফীগণ কিরূপ ধোঁকায় নিপতিত রহিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ সুফীদের জায়নামায ও দরবেশী পরিচ্ছদ ব্যতীত আর কিছুই পায় নাই এবং তাহারা সূফীদের বেশভূষা ধারণপূর্বক সূফী সাজিয়া বসিয়াছে। তাহারা প্রকৃত সূফীদের ন্যায় দরবেশী-গদিতে উপবেশনপূর্বক গ্রীবা অবনত করত নিজদিগকে সূফী মনে করিয়া মাথা নাড়াইতে থাকে। আর এইরূপ আচরণকেই তাহারা দরবেশীর চূড়ান্ত বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার সূফীদের বাহ্য বেশ-ভূষাও অবলম্বন করিতে পারে নাই। বরং তাহারা সুন্দর-সুন্দর পরিচ্ছদ ও সূক্ষ্ম নীল রঙ্গের লুঙ্গী পরিধান করত মনে করে– আমরা গৈরিক বসন পরিধানপূর্বক সম্পূর্ণরূপে সূফী হইয়া পড়িয়াছি। তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে, গৈরিক বস্ত্র শীঘ্রই মলিন হয় না এবং ইহা বারবার ধৌত করিতে হয় না। বলিয়াই সূফীগণ তদ্রূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম-পথের আপদে জড়িত হইয়া সূফীদের হৃদয়ে যে কষ্ট ও যাতনা রহিয়াছে, ইহার প্রতীক স্বরূপ তাঁহারা নীলাভ বস্ত্র পরিধান করেন। কিন্তু কৃত্রিম সূফীগণ এমন কোন চিন্তায় আবদ্ধ নহে যে, তাহাদের বস্ত্র ধৌত করিয়া লইবার অবসর মিলে না; তাহারা ধর্ম-পথের আপদেও নিপতিত নহে যে, তজ্জন্য শোক প্রকাশক বস্ত্র পরিধান করিবে, অথবা তাহারা এমন নিঃস্ব ও নিঃসম্বল নহে যে, ছিন্ন বস্ত্রে তালি লাগাইয়া দরবেশদের ন্যায় পোশাক পরিধান করিবে। তাহারা স্বেচ্ছায় নতুন বস্ত্র ছিন্ন করত তালি লাগাইয়া দরবেশী পোশাক তৈয়ার করিয়া লয়। সুতরাং এই হতভাগাগণ বাহ্যিক অবস্থায়ও প্রকৃত সূফীদের সাদৃশ্য লাভে সমর্থ হয় নাই। সর্বপ্রথম হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্‌হু তালিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার বস্ত্রে চৌদ্দটি তালি ছিল এবং বস্ত্রের অভাবে ইহাদের কয়েকটি পুরাতন চর্ম দ্বারা লাগানো হইয়াছিল।

কৃত্রিম সূফীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা লজ্জাবশত যেমন অপ্রশস্ত ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে পারে না তদ্রূপ সর্বপ্রকার ফরয কার্য করিবার এবং পাপ হইতে বিরত থাকিবার ক্ষমতাও তাহাদের থাকে না। তদুপরি অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা যে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির শৃংখলে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের এই অসহায়ত্ব এবং ত্রুটিও তাহারা স্বীকার করে না। অথচ তাহারা বলে– "হৃদয়ের সহিত কার্যের সম্বন্ধ। প্রকাশ্যে কাজ করিয়া লোককে দেখাইলে কি লাভ?" তাহারা আরও বলে– "আমার হৃদয় সর্বদা নামাযে রত আছে; আল্লাহ্‌র নিকট সর্বদা গোপন প্রার্থনা জানাইয়া থাকি। প্রকাশ্য নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের কি দরকার? যাহারা কুপ্রবৃত্তির বন্ধনে আবদ্ধ তাহাদের জন্যই এই প্রকাশ্য নামায-রোযা। কঠোর সাধনায় আমার প্রবৃত্তি মরিয়া গিয়াছে। আমার ধর্ম 'দহ্ দর দহ্' জলাশয়তুল্য; কোন অপবিত্রতাই ইহাকে কলুষিত করিতে পারে না।" তাহারা অপরকে ইবাদত করিতে দেখিয়া বলে– "এই হতভাগাগণ বৃথা পরিশ্রম করিতেছে।" আলিমগণকে দেখিয়া তাহারা বলে– "তাহারা কিতাবী কথায় গোলমালে আবদ্ধ রহিয়াছে; হাকীকত (প্রকৃত

তত্ত্ব) কিছুই বুঝিতে পারে নাই।" এই শ্রেণীর ভণ্ড সূফীদিগকে হত্যা করা (রাষ্ট্রের পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। সর্ববাদীসম্মত মতে তাহাদিগকে হত্যা করা নির্দোষ।

কেহ কেহ প্রকৃত সূফীদের খেদমতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, নিঃস্বার্থভাবে এই সকল সূফীর খেদমত করিলে, স্বীয় জানমাল তাঁহাদের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিলে এবং তাঁহাদের ভালবাসায় নিজকে ভুলিয়া গেলে পরম সৌভাগ্য লাভ করা যায়। অপরপক্ষে এমন কতক লোক আছে, যাহারা ধন ও সম্মান-লালসায় তাঁহাদের নিকট মুরীদ হয়; নিজকে সূফীর খাদেমরূপে পরিচয় দিয়া লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং হারাম-হালালের ভেদাভেদ না করিয়া ধন পাইলেই সংগ্রহ করে। এইরূপে তাহারা প্রসার লাভ করিতে চায়। তাহারা নিতান্ত ধূর্ত ও প্রবঞ্চক।

কতক সূফী কঠোর সাধনায় ধর্ম-পথযাত্রী সকল সোপান অতিক্রম করত স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া লন এবং নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট উৎসর্গ করিয়া দিয়া নির্জন কক্ষে অবস্থান করেন। তখন তাঁহাদের কাশ্‌ফ হইতে থাকে। এমন কি কোন পদার্থের সংবাদ জানিতে চাহিলে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পান এবং তাঁহাদের কোন ত্রুটি হইলে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাঁহাদেরকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। কখন কখন তাঁহারা নবী ও ফেরেশতাগণকে সুন্দর-সুন্দর আকৃতিতে দেখিয়া থাকেন এবং নিজকে আকাশমণ্ডলে দেখিতে পান। এই সকল দৃশ্য যদি প্রকৃত সত্য হয়, তবে ইহাদের মর্যাদা সঠিক স্বপ্নের সমান। নিদ্রিত ব্যক্তির কল্পনায় যেরূপ স্বপ্ন ঘটে জাগ্রত রুগ্ন ব্যক্তিরও কখন কখন সেরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তখন এই শ্রেণীর সুফী ধোঁকায় পড়িয়া বলে যে, ভূতল ও নভোমণ্ডলে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাকেই তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম বলিয়া গণ্য করেন; অথচ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে যত বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য রহিয়াছে, যত আশ্চর্য কার্য অহরহ চলিতেছে, উহার বিন্দুমাত্রও সে জানিতে পারে নাই। কিন্তু তদ্রূপ সূফী সৃষ্টির সবকিছু জানিয়েছেন, দেখিয়েছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এবং নিজকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে উপনীত ভাবিয়া অধিকতর উন্নতির চেষ্টা ছাড়িয়া দেন। এমনও হইয়া থাকে যে, এতদিন যে সকল কুপ্রবৃত্তি বশীভূত ও পরাভূত ছিল, সুযোগ বুঝিয়া ইহারা আবার বলবান হইয়া উঠে। তিনি আরও মনে করেন– "আমি যখন এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইতেছে, তখন আমার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছে; আর কখনও কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" ইহা অতি বিষম ক্ষতিকর আত্ম-প্রবঞ্চনা। নিজের অবস্থার প্রতি নির্ভর করিয়া সাধক কখনও স্থিতিশীল হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার অবস্থা যখন এইরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, সাধনার প্রভাবে তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং শরীয়তের আদেশানুসারে চলিতে তাঁহার আনন্দ হয় ও আচার-ব্যবহারে তিল পরিমাণও ত্রুটি না ঘটে, তখন হয়ত তাঁহাকে প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা হইতে নিরাপদ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

হযরত শাইখ আবুল কাসিম গুরগানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– "পানির উপর দিয়া চলা, বাতাসে উড়া, গোপন বিষয়ের সংবাদ বলা কোনই কারামত (অলৌকিক কার্য) নহে। বরং নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র আদেশে পরিচালিত হইবার অভ্যস্ত করিয়া তোলাই প্রকৃত কারামত। অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ও আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শরীয়তের আজ্ঞাবহ হইয়া যাওয়া এবং কখনও শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ না করাকেই কারামত বলে। কেহ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহার উপর নির্ভর করা চলে। শয়তানের সাহায্যেও পানির উপর দিয়া চলা এবং বাতাসে উড়া যাইতে পারে। শয়তানও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত আছে। আবার বেঈমান গণক-যাদুকরগণও গুপ্ত বিষয়ের সংবাদ দেয় এবং তাহাদের মাধ্যমে বিস্ময়কর ঘটনাবলীও প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং এবং বিধ অলৌকিক কার্যাবলী বুযুর্গির নিদর্শন নহে। বরং নিজের অস্তিত্বও আমিত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়া কুপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ করত শরীয়তের আদেশ অনুসারে চলিবার অভ্যাস পরিপক্ক করিয়া লওয়াকেই বুযুর্গি বলে। এইরূপে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে না পারিলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ, তুমি তোমার হৃদয়মধ্যস্থ ক্রোধরূপ ব্যাঘ্রকে পদদলিত করিয়া বশীভূত করিতে পারিয়াছে। অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিতে না পারিলেও কিছু আসে যায় না; কেননা কুপ্রবৃত্তির প্রতারণা সম্বন্ধে সম্যকরূপ অবগত হওয়াই তোমার পক্ষে অদৃশ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার তুল্য। পানির উপর দিয়া চলিতে ও বাতাসে উড়িতে না পারিলেও কোন ক্ষতি নই; কারণ, তুমি অনুভব ও কল্পনার সীমা অতিক্রম করত এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছ এবং এমন উচ্চ স্থানে বিচরণ করিতেছ, যাহা পানির উপর দিয়া চলা এবং বাতাসে উড়ার তুল্য। এক রাত্রে বিস্তৃত জঙ্গল ও দুর্গম মরুপথ অতিক্রম করিতে না পারিলেও কোন সংশয়ের কারণ নাই; কেননা তুমি যখন সংসারের মরীচিকাপূর্ণ মরুভূমি ও কুপ্রবৃত্তিরূপ কন্টকপূর্ণ বন-জঙ্গল পার হইতে পারিলে এবং পার্থিব সকল বিষয় পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে পারিলে, তখন তুমি অতি বিস্তৃত ময়দান ও অতি গভীর বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া গিয়াছ। নিমিষে পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিতে না পারিলেও কিছু আসে যায় না; কারণ, তুমি যে সন্দেহযুক্ত ধনে পদাঘাত করিয়া পলায়ন করিতে পারিয়াছে, ইহাই তোমার পক্ষে পাহাড়-পর্বত উত্তীর্ণ হওয়া। কারণ, মহাপ্রভু আল্লাহ্ ধর্ম-পথযাত্রীর এই সকল বিপদসংকুল স্থানকে দুর্গম গিরিসংকট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধক সূফীদের ভ্রম-বিশ্বাসে ধোঁকায় পতিত হওয়ার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে।

ধনীদের ভ্রম-বিশ্বাস—ধনীদের মধ্যেও বহু লোক মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ জ্ঞানে ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা হারাম উপায়ে অর্জিত ধন মসজিদ ও পান্থশালা নির্মাণ-কার্যে ব্যয় করিয়া থাকে এবং ইহাকে অতীব পূণ্যের কাজ বলিয়া মনে করে। হারাম উপায়ে অর্জিত ধন ইহার প্রকৃত অধিকারীকে ফেরত দেওয়া অবশ্য

কর্তব্য। কারণ, এইরূপ ধন সৎকার্যে ব্যয় করিয়া সওয়াব পাওয়ার আশা ত দূরে থাকুক, বরং ইহাতে বহু পাপ হইয়া থাকে।

রিয়ার বশবর্তী হইয়া ধন ব্যয়—কতিপয় ধনী ব্যক্তি আবার হালাল উপায়ে অর্জিত ধন তদ্রূপ সৎকার্যে ব্যয় করে। কিন্তু ইহা দেখিয়া যেন লোকে তাহাদিগকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, ধন ব্যয়ের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। একটি মুদ্রা ব্যয় করিয়াই তাহারা চায় যে, প্রস্তরফলকে নিজেদের নাম খোদিত করত মসজিদ বা পান্থশালায় লাগাইয়া দেওয়া হউক। এমন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ ত নির্মাণকারীকে ভালরূপে জানেন; কাজেই প্রস্তরফলকে নাম খুদিয়া লাগাইবার প্রয়োজন হইলে অপর লোকের নাম লাগাও, তবে কখনও সে সম্মত হইবে না। পাড়া-প্রতিবেশী যখন অনাহারে কষ্ট পাইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে ধন দানে বিরত থাকিলেই এই প্রকার রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। পাড়া-প্রতিবেশীর অভাব মোচনার্থ ধন দান করা উত্তম ও অতি পূণ্যের কাজ। কিন্তু দীন-দুঃখী পাড়া-প্রতিবেশীর অভাব মোচনে ধন ব্যয় না করিয়া মসজিদ, পান্থশালা প্রভৃতি নির্মাণ কার্যে মুক্ত হস্ত হওয়ার কারণ এই যে, তাহাদের দুঃখ-দরিদ্রতা মোচনে ব্যয় করিলে প্রস্তরফলকে তদ্রূপ কোন প্রশংসার কথা খোদিত করিয়া তাহাদের পোড়া কপালে লাগানো যাইবে না।

মসজিদের সৌষ্ঠব বর্ধনে অতিরিক্ত ব্যয় অসঙ্গত—কতিপয় ধনী ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিয়তে ধন ব্যয় করে বটে কিন্তু মসজিদের সৌষ্ঠব বর্ধন ও নানারূপ বিচিত্র কারুকার্যে ব্যয় করিয়া তাহারা মনে করে– "বড় পূণ্য কাজ করিলাম।" অথচ এইরূপ কার্যে দুই প্রকার অনিষ্টের উদ্ভব হয়। **প্রথম**– নানারূপ বিচিত্র কারু-কার্য-খচিত মসজিদে নামায পড়িবার সময় নামাযীর মন সৌষ্ঠবের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। **দ্বিতীয়**—মসজিদে চিত্র-বিচিত্র কারুকার্য দেখিয়া নিজ গৃহে সেইরূপ সৌষ্ঠব করিবার ইচ্ছা জন্মে। দুনিয়া তাহার নিকট অতি সুশোভিত ও সুসজ্জিত হইয়া উঠে এবং সে এই কারু-কার্যকে অতি আবশ্যক বলিয়া ধারণা করে। রাসূলে মাক্বওল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "তোমরা যদি মসজিদে চিত্র-বিচিত্র কারু-কার্য কর এবং কুরআন শরীফের উপর স্বর্ণ খচিত কর, তবে তোমাদের পক্ষে ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়।" নামাযীগণ যদি বিনয়াবনত ও আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-বিহবল হয় এবং তাহাদের মনে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা থাকে, তবেই মসজিদ সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইয়া উঠে। বাহ্য কারুকার্য ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারে না। আর যে বস্তু নামাযীর হৃদয় হইতে বিনয় ও ভয়-ভীতি বিদূরিত করে এবং দুনিয়াকে সুশোভিত করিয়া তোলে, ইহাই মসজিদকে উজার ও উৎছন্ন করিবার প্রকৃত উপকরণ। অথচ যে হতভাগা মসজিদকে বিচিত্র সৌষ্ঠবে সজ্জিত করিয়া উৎছন্নে ফেলিয়া সে মনে করিল– "আমি উত্তম কার্য করিলাম।"

ধন বিতরণে ভ্রম—কতক ধনী লোক স্বীয় গৃহদ্বারে ভিক্ষুক ও দরিদ্রদিগকে সমবেত করিয়া ধন বিতরণ করাকে নির্দোষ বলিয়া মনে করে। দেশে তাহাদের দানের সংবাদ পরিব্যপ্ত হউক, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে। কেহ কেহ আবার বাক্‌পটু ও সুপরিচিত ভিক্ষুককে দান করিয়া থাকে, যেন সে দেশময় দাতার যশ গাহিয়া বেড়াইতে পারে। কেহ বা হজ্জ যাত্রীগণকে ধন দান করিয়া থাকে অথবা খানকাহে অবস্থিত দরবেশদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। এমন দানের উদ্দেশ্য এই যে, বহু লোকে তাহাদের দানের সংবাদ পাইবে এবং তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। এইরূপ দাতাগণকে যদি বলা হয়– "হজ্জ যাত্রীগণকে দান করা অপেক্ষা য়াতীমদিগকে গোপনে সাহায্য করিলে অধিক পুণ্য পাওয়া যাইবে; তুমি পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালক-বালিকাদিগকে সাহায্য কর"– তবে তাহারা য়াতীমদিগকে দান করিবে না। কারণ, লোকমুখে প্রশংসা গান শুনিলে তাহারা খুব আনন্দ উপভোগ করে এবং তদ্রূপ কার্যে অর্থ সাহায্য করিয়া মনে করে– "মহাপুণ্যের কাজ করিলাম।"

এক ব্যক্তি হযরত বিশরে হাফীর (র) নিকট আবেদন করিল– "আমার নিকট দুই সহস্র মুদ্রা আছে। আমি হজ্জে যাইতে চাই।" তিনি বলিলেন– "তুমি কি খেলতামাশা দেখিতে চাও? না আল্লাহ্র প্রসন্নতা লাভ করিতে চাও?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল– "গৃহে ফিরিয়া দশজন ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও; দশজন য়াতীমকে বণ্টন করিয়া দাও বা বহু পরিবারবিশিষ্ট দরিদ্র মুসলমানকে দান কর। কেননা এক মুসলমানের মনে শান্তি প্রদান করা ফরয হজ্জ ভিন্ন শত হজ্জ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" সেই ব্যক্তি আবার নিবেদন করিল– "হজ্জে যাইবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে।" তিনি বলিলেন– "ইহার কারণ এই যে, তুমি অকারণে এবং অবৈধ উপায়ে এই ধন উপার্জন করিয়াছ। সুতরাং ইহা অনুপযুক্ত স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত তুমি শান্তি পাইবে না।"

যাকাত ও উশর প্রদানে ভ্রম—কতিপয় ধনী ব্যক্তি যাকাত এবং উশর ব্যতীত এক কপর্দকও ব্যয় করে না; আবার উহাও নিজের কারবার ও ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া থাকে। কেহ কেহ যেমন শিক্ষক ও ছাত্রগণকে দান করে; কারণ এই শ্রেণীর লোকগণ দাতার চারিদিকে ভিড় করিয়া থাকিলে তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তি অটুট থাকে। কোন কোন স্থানে শিক্ষক স্বীয় ছাত্রগণকে যাকাত দিয়া থাকে; উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রগণ তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবে। তাহারা যদি অধ্যয়ন না করে তবে তাহাদিগকে যাকাতও দেওয়া হয় না। এইরূপ দানকে এক প্রকার বেতন বলা চলে। শিক্ষকও জানে যে, শিষ্যত্বের বিনিময়ে তাহাদিগকে দান করা হইতেছে, অথচ মনে করে যে, যাকাত দেওয়া হইল। কোন কোন ধনী ব্যক্তি আবার বুযুর্গগণের খাদেমদিগকে যাকাত দান করে। আবার কখন কখন তাহাদের চেষ্টা ও অনুরোধে অপর লোককেও দিয়া থাকে এবং তাহাদের উপকার করিল মনে করিয়া গাহিয়া বেড়ায়। এই সামান্য যাকাত দানের বিনিময়ে সে বহু উদ্দেশ্য সাধন করিতে চায়।

কখন কখন লোকমুখে প্রশংসা গান ও সুখ্যাতির কথা শুনিবার লালসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। অথচ তদ্রূপ উদ্দেশ্যমূলকভাবে দান করিয়াও মনে করে যে, যাকাত দেওয়া হইল।

যাকাত দানে বিমুখ সৎকাজে রত ধনীর ভ্রম—কতিপয় ধনী ব্যক্তি এমনও আছে যাহারা কখনই যাকাত দেয় না এবং কেবল ধন সঞ্চয় করিয়া রাখে। আবার তাহারা নিজদিগকে পুণ্যবান বলিয়া দাবি করে; সর্বদা রোযা রাখে এবং সমস্ত রজনী জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করে। এইরূপ ব্যক্তি এমন শিরোপীড়াগ্রস্ত রোগীর তুল্য যে, মাথার বেদনায় অস্থির, অথচ সে যথাস্থানে ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া পায়ের গোড়ালিতে ঔষধ লাগায়। তদ্রূপ হতভাগা ধনী ব্যক্তি বুঝে না যে, সে কৃপণতারূপ ভীষণ রোগে আক্রান্ত। অতি ভোজনে এই রোগের উপশম হইবে না; বরং অধিক দানে ইহা উপশম হইবে। ধনীগণ এই প্রকার বহু ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ধর্ম-পথযাত্রীর মুক্তির উপায়— উপরিউক্ত ভুল-ভ্রান্তি হইতে কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তবে এই গ্রন্থে ইবাদতের আপদ, প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা, শয়তানের প্রতারণা প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ কথা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয় যে ব্যক্তি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করত শিক্ষানুযায়ী কাজ করিতে পারিয়াছে, যাহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং যে অভাব মোচনের পরিমিত ধনে সন্তুষ্ট থাকিয়া দুনিয়াকে বিষবৎ বর্জন করিতে পারিয়াছে, যাহার হৃদয়ে মৃত্যুর চিন্তা সর্বদা জাগ্রত থাকে এবং যে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কেবল তেমন ব্যক্তিই ভ্রম-বিশ্বাস ও ধোঁকা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তবে পরম দয়ালু আল্লাহ্ যাহার জন্য সহজ করিয়া দেন, তাহার জন্যই উহা সহজ হইয়া থাকে।